يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

তাবলীগী নেছাব নং ৭

ফাজায়েলে দরূদ শরীফ

বা

দরূদ শরীফের ফজিলত

মূল লিখক

শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (রঃ)

কর্তৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

বাংলা ইসলামিক একাডেমি

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

نحمده ونصلى على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما - الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. والصلوة والسلام على سيد الموجودات الذى قال انا سيد ولد ادم ولا فخر وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الحشر

পরওয়ারদেগারে আলমের অফুরন্ত দান ও বখ্‌শিশ এবং তাঁহার মাহবুব বান্দাদের নেক নজর ও মেহেরবানীর বরকতে এই অধম কর্তৃক ফাজায়েল সম্পর্কীয় কয়েকটি কিতাব লিখিত হইয়াছে। ঐসব কিতাব তাবলীগী নেছাবের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধু-বান্ধবদের অগণিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে ঐসব কিতাব দ্বারা উম্মত খুব বেশী বেশী উপকৃত হইতেছে। এই অধমের ইহাতে কোন প্রকার কৃতিত্ব নাই যেহেতু উহা শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের মেহেরবানী এবং হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর কালামে পাকের বরকত যাহার তরজমা ঐসব গ্রন্থে করা হইয়াছে। তদুপরি ঐ সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের বরকত যাহাদের হুকুমে ঐ গ্রন্থসমূহ রচিত হইয়াছে ইহা আল্লাহ পাকের বহুত বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, ঐসব বরকতসমূহে এই নাপাক পাপীর পাপের অপবিত্রতা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ اَللّٰهُمَّ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

এই অধ্যায়ের প্রথম গ্রন্থ ফাজায়েলে কোরান নামে লিখিত হয়। উহা কুতুবে আলম হজরত রশীদ আহমদ গংগুহী (রঃ) এর খলীফা হজরত শাহ্ মোহাম্মদ ইয়াছীন (রঃ)-এর আদেশ অনুসারেই রচিত হয়। হজরত শাহ ছাহেব ১৩.০ হিজরী ৩০শে শাওয়াল বৃহস্পতিবার রাত্রে এন্তেকাল করেন।

হজরত শাহ ছাহেবের এন্তেকালের পূর্বে তাঁহার বুজুর্গ খলীফা মাওলানা আবদুল আজীজের মারফত বান্দার নিকট এই অছিয়ত পাঠান যে, আমার মন চায় ফাজায়েলে দরূদও যেন লেখা হয়। হজরত শাহ

ছাহেবের এন্তেকালের পর মাওলানা মরহুম আমাকে বারবার তাঁহাকে অছিয়ত স্মরণ করাইয়া দেন এবং স্বীয় অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই অধমেরও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যেন এই সৌভাগ্য হাছিল হইয়া যায়। শাহ ছাহেব ব্যতীত আরও অনেক বুজুর্গ এই বিষয় তাকীদ করিতে থাকেন কিন্তু ছাইয়েদুল কাওনাইন ফখরে মোরছালীন হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লামের বুজুর্গ শানের এমন প্রভাব আমার উপর পড়িয়াছিল যে, যখনই আমি লিখিবার ইচ্ছা করিতাম তখনই এই ভয়ে কম্পিত হইয়া যাইতাম যে, কি জানি হুজুরের বুলন্দ শানের বরখেলাপ কোন কিছু লেখা হইয়া যায় নাকি। এই টালবাহানার ভিতর গত বৎসর প্রিয়তম মাওলানা ইউসুফের অনুরোধে তৃতীয় বার হেজাজ শরীফ যাইবার এবং চতুর্থ বার হজ্ব করিবার সৌভাগ্য নছীব হয়। হজ্বের শেষে মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছার পর মনের মধ্যে বারংবার শুধু এই প্রশ্ন জাগ্রত হইতেছিল যে ফাজায়েলে দরূদ না লেখার জবাব কি? যদিও বিভিন্ন ওজর আপত্তি দাঁড় করাইতেছিলাম তবুও এবারে সংকল্প করিলাম যে দেশে ফিরিয়াই ইনশা'আল্লাহ্ এই মোবারক কিতাব অবশ্যই রচনা করিব। কিন্তু দেশে ফিরিয়া আবার আজ কাল করিতে করিতে বিলম্ব হইতেছিল। কারণ "বদ অভ্যাসের শত বাহানা।" অবশেষে রমজানের এই মোবারক মাসে বহুদিনের আকাংখাকে তাজা করিয়া অদ্য পঁচিশে রমজান জুমার নামাজের পর আল্লার নাম নিয়া শুরু করিয়াই দিলাম। আল্লাহ পাক তাঁহার খাছ রহমতে এই কাজ সুসম্পন্ন করিবার তওফীক দান করুন। এবং এই কিতাবে ও তার পূর্বে লিখিত যাবতীয় উর্দু আরবী কিতাবের সমস্ত ভুল ত্রুটিকে স্বীয় দয়া ও করুণার দ্বারা মাফ করিয়া দিন।

এই বইতে কয়েকটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: দরূদ শরীফের ফজীলত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: দরূদ শরীফ না পড়ার শাস্তি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: বিভিন্ন উপকারিতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দরূদ শরীফ সম্পর্কীয় ঘটনাবলী।

আল্লাহ পাক সবাইকে বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়ার তওফীক দান করুন। এই কিতাব পাঠ করিলে প্রত্যেকেই অনুভব করিবে যে দরূদ শরীফ কত বড় সম্পদ আর ইহাতে অবহেলাকারী কত বড় দৌলত হইতে বঞ্চিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফের ফজীলত

দরূদ শরীফের ফজীলত সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামে এরশাদ রহিয়াছে। উহা এই যে—

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ ছালাত ও ছালাম পাঠাইয়া থাকেন) হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর ও ছালাম পাঠাও।"

ফায়েদা: আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে পাকে নামাজ রোজা হজ্ব ইত্যাদি সম্পর্কীয় বহু হুকুম আহকাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। এমনি ভাবে বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের নানাবিধ প্রশংসাও করিয়াছেন। হজরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করিয়া তাঁহাকে ছেজদা করার জন্য ফেরেশতাদিগকে নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন হুকুম বা নবীর সম্মানে এই কথা বলেন নাই যে, আমি এই কাজ করিয়া থাকি কাজেই তোমরাও এই কাজ কর। এই মহান মর্য্যাদা একমাত্র প্রিয়নবী ফখরে দো-জাহান (ছঃ)-এর শানেই ফরমাইয়াছেন যে, আমার নবীর উপর আমি স্বয়ং এবং আমার ফেরেশতারা দরূদ পাঠ করেন সুতরাং হে মোমেনগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর।

ইহার চেয়ে উচ্চতর ফজীলত আর কি হইতে পারে যে আল্লাহ পাক এই আয়াতে দরূদ ও ছালাম প্রেরণের এই মহান কাজে তাঁহার ও ফেরেশতাদেয় সাথে মোমেনদিগকেও শরীক করিয়াছেন, তদুপরি আরবী ভাষায় যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারা জানেন যে আয়াতটি "ইন্না" শব্দ দ্বারা শুরু করা হইয়াছে যাহার অর্থ হইল নিশ্চয়, এমনিভাবে ইউছাল্লুন শব্দের তাৎপর্য হইল আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ সর্বদা পাঠ করিয়া থাকেন। আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করিয়াছেন অর্থ হইল সর্বদা আল্লাহ ও তদীয় ফেরেশতাদের তরফ হইতে অনবরত রহমত বর্ষিত হইতে থাকে।

রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাকের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুর আকরাম (ছঃ)-কে মোকামে মাহমুদ অর্থাৎ সুপারিশের মোকামে পৌছান। আর ফেরেশতাদের দরূদের অর্থ হইল হুজুরের উচ্চ মর্যাদার জন্য দোয়া করা এবং উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং মোমেনদের দরূদের অর্থ হইল হুজুরের তাবেদারী করা। তাঁহার সহিত মহব্বত রাখা আর তাঁহার মহান গুণাবলীর প্রশংসা করা।

উক্ত গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে হুজুরের এই মর্যাদা আদম (আঃ) এর ঐ মর্যাদার চেয়ে উচ্চতর যেখানে হজরত আদমকে ফেরেশতাদের দ্বারা ছেজদা করাইয়াছেন। কেননা সেখানে সম্মান শুধু ফেরেশতাদের দ্বারা দেখানো হইয়াছে আর এখানে সম্মান প্রদর্শনে স্বয়ং আল্লাহ পাকও শরীক আছেন।

عقل دور اندیش میداند که تشریف چنیں

هیچ دیں پرور ندید و هیچ پیغمبر نیافت

দূরদর্শী বিবেক বুদ্ধির নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, এতবড় মর্য্যাদার অধিকারী অন্য কোন ধর্ম প্রচারক বা পয়গাম্বর লাভ করেন নাই।

یصلی علیه الله جل جلاله ـ بهذا بدا للعالمین کماله

"স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রিয় নবীর (ছঃ)-এর উপর রহমত প্রেরণ করেন ইহাতেই সারা বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন আয়াত শরীফে হুজুর (ছঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ কোরানে পাকের মধ্যে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতেও প্রিয় নবীর বিশেষ মর্য্যাদার দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে। এমন কি একই আয়াতে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সহিত

হুজুর পাকের আলোচনা 'নবী' শব্দ দ্বারাই করা হইয়াছে। যেমন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ

তবে যে সমস্ত আয়াতে হুজুরের নাম লওয়া হইয়াছে সেখানে বিশেষ হেকমতের কারণেই লওয়া হইয়াছে।

এখানে আর একটি বিষয় জানিয়া রাখা বিশেষ জরুরী। উহা এই যে আলোচ্য আয়াতে "ছালাত" শব্দ আল্লাহ, ফেরেশতা এবং মোমেন সকলের দিকেই সম্বোধন করা হইয়াছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ পাক রহমত এবং মেহেরবানীর দ্বারা হুজুরের সম্মান এবং প্রশংসা করেন। আবার এই মেহেরবানীও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন পিতার মেহেরবানী পুত্রের জন্য পুত্রের মেহেরবানী পিতার জন্য, ভাইয়ের মেহেরবানী ভাইয়ের জন্য এই সব মেহেরবানীর মধ্যে স্তর হিসাবে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই ভাবে আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ও ফেরেশতাদের মেহেরবানীর মধ্যে আপন আপন শান অনুসারে পার্থক্য রহিয়াছে। ইমাম বোখারী বর্ণনা করেন আল্লার দরূদ পড়ার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের সামনে হুজুরের প্রশংসা করা। ফেরেশতাদের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুরের জন্য দোয়া করা। এবনে আব্বাছের রেওয়ায়েত মোতাবেক অর্থ হইল বরকতের জন্য দোয়া করা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে এই আয়াত নাজেল হওয়ার পর ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! ছালামের তরীকাত আমরা আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে এইভাবে জানিয়াছি যে, 'আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবিউ ওয়রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহু' এবার আমাদিগকে 'ছালাত' অর্থাৎ দরূদ পড়ার তরীকাও শিক্ষা দিন। প্রিয়নবী এরশাদ করেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اِلَخ

আলোচ্য আয়াত শরীফে আল্লাহ পাক মোমেনদিগকে দরূদ পড়িতে নির্দেশ দিয়াছেন, আর হুজুর (ছঃ) উহার তরীকা এইভাবে শিক্ষা দিয়াছেন তোমাদের পাঠানো এইভাবে যে তোমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি যেন বেশী বেশী রহমত অনন্তকালের জন্য নবীর উপর পাঠাইতে

থাকেন। কারণ তাঁহার রহমত সীমাহীন। ইহাও আল্লাহ পাকের রহমত যে আমাদের দরখাস্তের পর তিনি যে হুজুরে পাকের উপর বেশী বেশী রহমত নাজেল করিবেন। উহাকে আমাদের মত দুর্বল এবং দ্বীনহীনদের তরফ হইতে উক্ত হাদিয়া পেশ হইতেছে বলিয়া স্বীকার করেন। যেমন নাকি আমরাই রহমত পাঠাইতেছি, অথচ যে কোন অবস্থায় একমাত্র রহমত পাঠাইবার যোগ্যতা তাঁহারই। বান্দার কি ক্ষমতা আছে যে হুজুরের মর্য্যাদা অনুসারে তাঁহার উপর রহমতের হাদিয়া পেশ করিবে।

হজরত শাহ্ আব্দুল কাদের লিখিতেছেন যে, আল্লাহর নিকট হুজুরের জন্য ও তাঁহার পরিবার পরিজনের জন্য দোয়া করিলে নিঃসন্দেহে উহা কবুল হয়। হুজুরের মর্য্যাদানুসারে তাঁহার উপর রহমত অবতীর্ণ হয়। একবার দরূদ পড়িলে পড়নেওয়ালার উপর দশটি রহমত নাজেল হয়। অতএব যার যত ইচ্ছা হাছেল করিতে পারে।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকে দরূদ পড়িতে বলেন আর আমরা উহার উত্তরে এইরূপ বলিয়া থাকি যে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদ" হে খোদা! আপনিই নবীজীর উপর ছালাত অর্থাৎ রহমত প্রেরণ করুণ। এখানে ব্যাপারটা কেমন হইল, যাহা করিতে আমাদিগকে আদেশ করা হইল উলটা আমরা উহা স্বয়ং আল্লাহকেই করিতে দরখাস্ত করিলাম। তার উত্তর দুই প্রকার দেওয়া চলে। প্রথমতঃ হুজুর আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর আল্লামা ছাখাবী 'কওলে' বদীয়ে' এবং আমীর মোস্তফা তুর কামানী তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দিয়াছেন যে, হুজুরে পাক হইলেন পাক, পুত-পবিত্র, আমরা হইলাম পাপে তাপে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাহারা আপাদমস্তক দোষ-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ তাহারা কিভাবে হুজুরের সেই মহান দরবারে হাদিয়া পেশ করিতে পারে? কাজেই আমরা দরখাস্ত করিয়া থাকি যে হে পরওয়ারদেগার হুজুরের শান মোতাবেক আপনিই তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুণ। আল্লামা নিশাপুরীও তাঁহার লাতায়েফে হেকাম গ্রন্থে এইভাবে উত্তর দিয়াছেন। তাছাড়া আমরা হুজুরের শান সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই যিনি শান সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল একমাত্র তিনিই শান মোতাবেক ছালাত ও ছালাম পাঠাইতে পারেন। উহার দৃষ্টান্ত; যেমন আল্লাহ পাকের শানে হুজুর এরশাদ ফরমাইতেছেন—

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

অর্থাৎ : 'হে খোদা ! আপনার যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে আমি অক্ষম। আপনি ঠিক সেই রকম, যেই রকম স্বীয় প্রশংসা আপনি করিয়াছেন।'

আল্লামা ছাখাবী বলেন, কাজেই হুজুরের শিক্ষা মোতাবেক আমাদিগকে দরূদ পড়িতে হইবে এবং গুরুত্বসহকারে সেই দরূদ পড়াকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। কেননা বেশী বেশী দরূদ পড়ার বেশী মহব্বতে পরিচয়। প্রবাদ আছে—

من أحب شيئا أكثر من ذكره

'যে কোন বস্তুকে ভালবাসে সে বারে বারে তাহাকে স্মরণ করিয়া থাকে।'

ইমাম জয়নুল আবেদীন হইতে বর্ণিত আছে হুজুরের উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়া আহ্‌লে সুন্নত অল জমাত হওয়ার পরিচয়। অর্থাৎ সে ছুন্নী বলিয়া পরিচিত। শরহে মাওয়াহেবে আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন, দরূদ শরীফের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করা। এবং প্রিয় নবীর হকের সামান্যতম অংশ আদায় করা।

হাফেজ এজ্জদিন এব্‌নে আবদুছ ছালাম বলেন, আমাদের দরূদ হুজুরের জন্য সুপারিশ নয়। কেননা আমাদের মত পাপীরা হুজুরের জন্য কি সুপারিশ করিতে পারি ? এবং কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক আমাদিগকে হুজুরের দান ও এহ্‌ছানের বদলা দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যেহেতু হুজুরের চেয়ে বড় দাতা আর কেউ নাই। আর আমরা সেই দাতার এহ্‌ছানের বদলা দিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। মেহেরবান আল্লাহতায়ালা আমাদের এই অক্ষমতাকে দেখিয়াই নির্দেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহার উপর দরূদ পাঠ কর। ওদিকে আমরা এই কাজেও অক্ষম, কাজেই মাওলায়ে করীমের দরবারে দরখাস্ত করিতেছি যে, হে খোদা ! আমার প্রিয় নবীজীর শান মোতাবেক আপনিই বদলা দিয়া দিন।

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু দরূদ পড়ার হুকুম করা হইয়াছে, তাই

ওলামাগণ দরূদ পড়াকে ওয়াজেব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ পরিচ্ছেদে আসিতেছে।

ইমাম রাজী তাফছীরে কবীরে লিখিয়াছেন, এখানে একটি প্রশ্ন জাগে তাহা এই যে, যখন আল্লাহ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করেন তখন আমাদের দরূদ পড়ার কি প্রয়োজন? উহার উত্তর এই যে আমাদের দরূদ হুজুরের প্রয়োজনে নয়। যদি তাহাই হইত তবে আল্লাহ পাকের দরূদের পর ফেরেশতাদের দরূদেরও প্রয়োজন ছিল না। বরং আমাদের দরূদ হুজুরের আজমত এবং বুজুর্গী প্রকাশের জন্য। যেমন আল্লাহ পাক তাঁহার পবিত্র জিকির করার জন্য বান্দাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন অথচ আমাদের জিকির করার তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই।

হাফেজ এব্নে হাজার বলেন, এখানে আর একটি প্রশ্ন এই জাগে যে আয়াতে পাকে আল্লাহতায়ালা এবং ফেরেশতাগণ ছালাত পাঠ করেন বলা হইয়াছে ছালাম নয়। তার উত্তর আমি ইহা দিতেছি যে সম্ভবতঃ এইজন্য যে, ছালামের দুই অর্থ হইতে পারে দোয়া এবং তাবেদারী করা। আর আল্লাহ এবং ফেরেশতাদের ব্যাপারে তাঁহারা হুজুরের তাবেদারী করেন এই কথা ঠিক হয় না। পক্ষান্তরে মোমেনদিগকে বলা হইয়াছে যে তোমরা দরূদ পড় এবং হুজুরের তাবেদারী কর।

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটি উপদেশ পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আহমদ ইয়ামনী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন ছনআ শহরে দেখিতে পাইলাম একটি লোকের চতুর্দিকে লোকজনের খুব ভিড় পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা কি আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই লোকটা খুব সুন্দর আওয়াজে কোরান শরীফ পড়িতেছিল। সে যখন এই আয়াত শরীফে পৌঁছিল তখন يصلون على النبي এর পরিবর্তে يصلون على على النبي পড়িল। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ হজরত আলীর উপর দরূদ পাঠ করেন। যিনি নবী। (সম্ভবতঃ লোকটা রাফেজী সম্প্রদায়ের ছিল) ইহা পড়া মাত্রই লোকটা বোবা হইয়া যায় এবং শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। তদুপরি অন্ধ ও অবশ হইয়া যায়। আল্লাহ ও রাছুলের শানে বে-আদবী করার ইহাই হইল পরিণতি। আল্লাহ পাক সকলকে হেফাজত করুন।

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

"আপনি বলিয়া দিন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আল্লাহ পাকের নির্বাচিত পছন্দনীয় ব্যক্তিদের উপর ছালাম।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, এই আয়াত শরীফ সামনে বর্ণিত বিষয় বস্তুর ভূমিকা স্বরূপ। এখানে হুজুরে আকরাম (ছঃ)-কে আল্লাহর প্রশংসা এবং তাহার নির্বাচিত বান্দাদের উপর ছালাম প্রেরণ করার হুকুম করা হইয়াছে। তাফছীরে এবনে কাছীরে লিখিত আছে নির্বাচিত বান্দা অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হইয়াছে—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

ইমাম ছওরী এবং ছুদ্দী বর্ণনা করেন যে আয়াতের দ্বারা ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝান হইয়াছে। অবশ্য উভয় রেওয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই কেননা পছন্দীদা বান্দা দ্বারা যদি ছাহাবাকে বুঝান হয় তবে আরও পছন্দীদা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ অনায়াসেই উহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন।

(৩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَشْرًا - (مسلم و ابوداؤد)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাঁহার উপর দশবার রহমত পাঠাইয়া থাকেন।

ফায়েদাঃ আল্লাহ পাকের তরফ হইতে সমস্ত দুনিয়ার জন্য একটি মাত্র রহমতই যথেষ্ঠ। প্রথম এখানে দশটি রহমত পাঠান হইতেছে। দরূদ শরীফ পড়ার ফজীলত ইহার উপর আর কি হইতে পারে যে স্বয়ং আল্লার তরফ হইতে দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়। কতবড় সৌভাগ্যবান ঐসব বুজুর্গানে দ্বীন যাহারা দৈনিক সোয়া লক্ষ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া থাকেন। আমার বংশের কোন কোন বুজুর্গেরও এইরূপ আমল ছিল বলিয়া আমি

শুনিয়াছি।

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠ করেন। আবদুল্লাহ এব্‌নে ওমরের রেওয়ায়েতে রহিয়াছে ফেরেশতাগণও তাহার উপর দশবার দরূদ পড়িয়া থাকেন। আল্লামা ছাখাবী অন্য জায়গায় লিখিতেছেন যে, আল্লাহ পাক যেমন নাকি কালেমায়ে শাহাদাতের মধ্যে আপন পবিত্র নামের সহিত হুজুরের পাক নামকেও শামিল করিয়াছেন এবং নিজের তাবেদারীকে হুজুরের তাবেদারী বলিয়া এবং হুজুরের মহব্বতকে নিজের মহব্বত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ঠিক তদ্রূপ হুজুরের উপর দরূদ পড়াকে নিজের দরূদের সহিত শরীক করিয়াছেন। সুতরাং যেমন নাকি বলিয়াছেন "তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব" ঠিক তেমনি বলিয়াছেন, যে আমার নবীর উপর একবার দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর দশবার দরূদ পড়িব।

তারগীব গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন আমর হইতে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি হুজুরের উপর একবার দরূদ পড়িবে আল্লাহতায়ালা ও তাঁহার ফেরেশতাগণ সেই ব্যক্তির উপর সত্তর বার দরূদ অর্থাৎ রহমত পাঠাইতে থাকেন।

এখানে একটি কথা বুঝিয়া লইবার বিষয় এই যে, যেখানে কোন আমলের ব্যাপারে ছওয়াব কম বেশী হওয়ার কথা উল্লেখ রহিয়াছে যেমন এখানে এক হাদীছে দশবার ও অন্য হাদীছে সত্তর বারের উল্লেখ রহিয়াছে, ওলামাগণ এই সমস্যার সমাধান এইভাবে করিয়াছেন যে এই উম্মতের উপর আল্লাহ পাকের এহছান ধাপে ধাপে তরক্কী করিবে। অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় দশবার রহমতের ওয়াদা ছিল পরে বর্দ্ধিত হইয়া উহা একশত রহমতে পৌঁছিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন এইরূপ পার্থক্য ব্যক্তি, স্থান ও কাল বিশেষে হইয়া থাকে, মোল্লা আলী কারী বলেন সত্তর রহমত ওয়ালা হাদীছ সম্ভবতঃ জুমার দিনের বিষয় বলা হইয়াছে। কারণ একটি হাদীছে আসিয়াছে, জুমার দিনে যে কোন নেকীর মাত্রা সত্তরগুণ বাড়িয়া যায়।

(৪) وَعَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ص قَالَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلْيُصَلِّ عَلَىَّ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ مَرَّةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَفِىْ رِوَايَةٍ

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّ

عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ - (احمد والنسائی)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার সামনে আমার আলোচনা হইবে সে যেন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে। যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠাইবেন। এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার দশটি মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিবেন। তারগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে একবার দরূদ পড়া দশটি গোলাম আজাদের সমতুল্য।

তিবরানী শরীফে একটি হাদীছ আছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত পাঠান, আর যে আমার উপর দশবার দরূদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার উপর একশত রহমত প্রেরণ করেন। আর যে আমার উপর একশত বার দরূদ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার কপালে লিখিয়া দিবেন "বারা-আতুম মিনান্নেফাকে অ-বারা-আতুম মিনান্নারে।" অর্থাৎ এই ব্যক্তি মোনাফেকী হইতেও মুক্ত জাহান্নাম হইতেও আজাদ এবং কেয়ামতের দিন শহীদানের সহিত তাহার হাশর হইবে। হজরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে ইহাও বর্ণিত আছে, যে আমার উপর একশত বার দরূদ পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এক হাজার বার রহমত পাঠাইবেন এবং যে আবেগ ও মহব্বতের সহিত আরও বেশী বেশী পড়িবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী হইব ও সুপারিশ করিব।

হজরত আবদুর রহমান এবনে আউফ বলেন আমরা চার পাঁচজন লোকের মধ্যে কেহ না কেহ হুজুরের সাথে সব সময় এই জন্য থাকিতাম যে হুজুরের কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমরা যেন উহা সঙ্গে সঙ্গে পুরা করিতে পারি। একদা হুজুর একটি বাগানে তাশরীফ নিয়া যান। আমিও হুজুরের পিছনে পিছনে গিয়া হাজির হইলাম, হুজুর সেখানে গিয়া নামাজে দাঁড়াইলেন এবং এত লম্বা ছেজদা করিলেন যে হুজুরের রূহ মোবারক উড়িয়া গেল নাকি এই সন্দেহে আমি প্রিয় নবীজীর নিকট গিয়া কাঁদিতে

লাগিলাম। হুজুর ছেজদা শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আবদুর রহমান তুমি কেন কাঁদিতেছ ? আমি আমার সন্দেহের কথা বর্ণনা করিলাম। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, আল্লাহ পাক আমার উম্মতের বিষয় আমার উপর পুরস্কার দান করিয়াছেন তাহার শোকরে আমি এতবড় ছেজদা করিয়াছি। পুরস্কার হইল এই যে আল্লাহ পাক বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার আমল নামায় দশটি নেকী লিখিয়া দিবেন এবং দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর (ছঃ) বলেন, আবদুর রহমান তুমি কি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবে না ? যে আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন, যে আপনার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর দরূদ পড়িব আর যে আপনার উপর ছালাম পাঠাইবে আমি তাহার উপর ছালাম পাঠাইব। (তারগীব)

হজরত আবু তালহা আনছারী (রঃ) বলেন, একদিন হুজুর (ছঃ)-কে খুব বেশী হাসিখুশী অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন এমন কি সন্তুষ্টির নুরানী চমকে হুজুরের চেহারা মোবারক জলমল করিতেছিল, ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুরের চেহারায় আজকের মত এতবেশী আনন্দের লক্ষণ অন্য কোন সময় আমরা দেখিতে পাই নাই। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা ঠিকই বলিয়াছ, আমার নিকট আমার প্রভুর তরফ হইতে পয়গাম আসিয়াছে, তিনি বলেন যে ব্যক্তি তোমার উম্মতের মধ্যে একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন এবং তাহার দশটি গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য দশটি মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন, লোকটি যাহা বলিবে ফেরেশতাও তাহাই বলিবে। হুজুর বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জিব্রাঈল ! সে কেমন ফেরেশতা ? জিব্রাঈল বলিল আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দিবেন যে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিতে থাকিবে যে—

وَاَنْتَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ

আল্লামা ছাখাবী এখানে একটা প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন উহা এই যে কোরান পাকে বর্ণিত আছে—

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا

"যে একটি নেকী করিবে উহার বদলে সে দশটি নেকী পাইবে" দরূদ শরীফের বেলায়ও ঐরূপ হইলে উহার বিশেষত্ব কি রহিল ? প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লামা ছাখাবী এইভাবে দিতেছেন যে প্রথমতঃ দশবার আল্লাহ্ পাকের দরূদ পড়া সাধারণ দশগুণ ছওয়াবের চেয়ে অনেক বেশী। তদুপরি দশটা মর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং দশটা গোনাহ মাফ হওয়া এবং দশজন গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পাওয়া ইত্যাদি অতিরিক্ত দান স্বরূপ।

জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে হজরত থানবী (রঃ) ফরমাইয়াছেন, যেই ভাবে একবার দরূদ পড়িলে দশটি রহমত পাওয়া যায় তদ্রূপ কোরানে পাকের ইশারায় বুঝা যায়, একবার হুজুরের সহিত বেআদবী করিলে 'নাউজুবিল্লাহ' তার উপর আল্লাহর তরফ হইতে দশটি লা'নত অবতীর্ণ হয়। যেমন কুখ্যাত অলীদ এবনে মুগীরার ব্যাপারে আল্লাহ পাক ঠাট্টা করিয়া দশটি দুর্ণাম সুচক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এরশাদ হইতেছে—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ

"আপনি এমন লোকের কথা মানিবেন না, যে কথায় কথায় কছম করে। মর্য্যাদাহীন গালিগালাজ করিতে অভ্যস্ত, চোগলখোর, নেক কাজে বাধা প্রদানকারী সীমা লংঘনকারী, বদ মেজাজ, তদুপরি হারামজাদাও বটে। এইজন্য যে তাঁর ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি রহিয়াছে, যখন তাহার সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পড়া যায় তখন সে বলে এইসব ত প্রমাণ বিহীন পুরান জমানার কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

(৫) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَكْثَرُهُمْ

ـلّى صَلٰوةً - (ترمذی)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়িত।

হযরত আনাছের রেওয়ায়েতে আছে কেয়ামতের দিন প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী ঐ ব্যক্তি হইবে যে আমার উপর বেশী করিয়া দরূদ পড়িত। অন্যত্র হুজুর বলেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড় কেননা কবরে সর্বপ্রথম আমার বিষয় প্রশ্ন করা হইবে। আর একটি হাদিছ আছে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়া কেয়ামতের দিন পুলছেরাতের অন্ধকারে নূর স্বরূপ। এবং যে মিজানের পাল্লায় আপন আমল নামাকে ভারী করিতে চায় সে যেন আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়ে। হযরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছিবতে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী নাজাতওয়ালা হইবে যে দুনিয়াতে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িত। হুজুর আরও বলেন যে আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িবে সে আরশের নীচে ছায়া লাভ করিবে। আল্লামা ছাখাবী হাদীছ বর্ণনা করেন, যেই দিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না সেই দিন তিন ব্যক্তি আরশের ছায়া তলে আশ্রয় লাভ করিবে।

(১) যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদকে ছুটাইয়া দিবে।
(২) যে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িবে।
(৩) যে আমার ছুন্নতকে জিন্দা করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে আপন মজলিছ সমূহকে দরূদ দ্বারা সজ্জিত রাখ কেননা আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের জন্য কেয়ামতের দিন নূর স্বরূপ হইবে। আল্লামা ছাখাবী কুওয়াতুল কুলুব গ্রন্থের বরাত দিয়া বর্ণনা করিতেছেন যে, অধিক পড়ার নিম্নস্তর হইল কমপক্ষে তিনশত বার পড়া। হজরত গঙ্গুহী (রঃ) মুরীদানদিগকে তিনশত বার করিয়া পড়িবার নির্দেশ দিতেন।

আল্লামা ছাখাবী, এবনে হাব্বান, খতীবে বাগদাদী, আবু ওবায়দা প্রমুখ (রঃ) লিখিতেছেন হুজুরের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী কেয়ামতের দিন মোহাদ্দেছীনে কেরাম হইবেন। কেননা তাঁহারা হাদীছ লিখিবার সময়,

পড়াইবার সময় যখনই হুজুরের নাম মোবারক আসে তখনই তাঁহাদের দরূদ শরীফ বেশী বেশী পড়িবার বা লিখিবার সুযোগ আসে। এখানে মোহাদ্দেছীন দ্বারা শুধু যে হাদীছ শাস্ত্রের ইমামগণকে বুঝায় তা নয় বরং যাহারা হাদীছের কিতাব আরবী উর্দু যে কোন ভাষায় পড়ে বা পড়ায় সকলকেই বুঝায়।

ইমাম তিবরানী জাহুছ ছায়ীদ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। যেই ব্যক্তি কোন কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখিয়া থাকে, যতদিন পর্যন্ত ঐ কিতাবে আমার নাম থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ফেরেশ্তাগণ তাঁহার উপর দরূদ পড়িতে থাকিবে। হুজুর আরও বলেন, যে ব্যক্তি সকাল এবং সন্ধ্যায় আমার উপর দশ দশ বার করিয়া দরূদ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। ইমাম মোস্তাগফেরী হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার একশত হাজত পূর্ণ হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে তিরিশটা দুনিয়াতে ও বাকী সব আখেরাতে।

(৬) عن ابن مسعود رضـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام - (رواه النسائى)

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাকের কিছু সংখ্যক ফেরেশ্তা জমীনের উপর বিচরণ করিতে থাকে। তাহারা আমার উম্মতের তরফ হইতে আমার নিকট ছালাম পৌঁছাইতে থাকে।

হজরত আলী (রঃ) হইতেই এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজরত হাছান হুজুরের হদীছ বর্ণনা করেন তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পাঠাইতে থাক। নিশ্চয় তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। আমি তাহার উত্তরে দশটি দরূদ পঠাইয়া থাকি। উহা ব্যতীত তাহার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়।

(৭) عن عمار بن ياسر رضـ قال قال رسول الله صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيٰمَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ ـ

হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লারতায়ালা আমার কবরের উপর এমন একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যাহার সমস্ত মাখলুকের কথা শুনিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তিই কেয়ামত পর্যন্ত আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সেই ফেরেশতা তাহার এবং তাহার পিতার নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, অমুকের বেটা অমুক আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন অতঃপর আল্লাহ পাক প্রত্যেক দরূদের পরিবর্তে তাহার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন। অন্য হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) বলেন আমি আমার প্রভুর নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম, যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে তিনি যেন দশবার তাহার উপর দরূদ পড়েন আল্লাহ পাক আমার এই দরখাস্ত কবুল করিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি জুমার দিন অথবা জুমার রাত্রে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়িবে আল্লাহ পাক তাহার একশত জরুরত পুরা করিবেন এবং আমার কবরের উপর নিয়োজিত ফেরেশতা আমার নিকট এমনভাবে তাহার দরূদ পৌছায়, যেমন তোমাদের নিকট হাদিয়া পৌছান হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে একদল ফেরেশতা ঘুরিয়া বেড়ায় যাহারা দরূদ শরীফ হুজুরের দরবারে পৌছাইয়া থাকে। এখানে বর্ণীত হইয়াছে যে, একজন নিয়োজিত ফেরেশতা হুজুর পর্যন্ত দরূদ পৌছাইয়া থাকে। তার উত্তর এই যে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। কেননা যে কবর শরীফে নিযুক্ত রহিয়াছে সে শুধু দরূদ পৌছাইয়া থাকে আর যাহারা বিচরণকারী তাহারা জিকিরের হাল্‌কা তালাশ করে, কোথাও দরূদ শরীফ পড়া হইলে তাহারাও সেই দরূদের সংবাদ হুজুরের দরবারে পৌছায়। যেমন সাধারণভাবে দেখিতে

পাওয়া যায় কোন বড় লোকের খেদমতে কোন খবর পৌছাইতে হইলে সকলেই ইচ্ছা করে যে এই খবরটা যেন আমি পৌছাইতে পারি। এখানে ফখ্‌রে আম্বিয়া (ছঃ)-এর খেদমতে যত ফেরেশতাই পৌঁছায় না কেন উহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

(৮) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَىَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهُ - (مشكوٰة)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে আমার উপর পড়িয়া থাকে তাহা আমার নিকট পৌছান হয়। (মেশকাত, বয়হকী)

এই হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে কবরের কাছে দাঁড়াইয়া হুজুরের উপর ছালাম পাঠ করিলে হুজুর উহা স্বয়ং শুনিয়া থাকেন। আর দূরে থাকিয়া দরূদ ছালাম পাঠ করিলে ফেরেশতার মারফত উহা হুজুরের খেদমতে পৌঁছান হয়। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী-র মধ্যে ছোলায়মান এবনে ছোহায়েম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) এর স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! যাহারা আপনার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আপনার উপর ছালাম করিয়া থাকে আপনি কি উহা বুঝিতে পারেন? হুজুর এরশাদ করিলেন হাঁ বুঝিয়া থাকি এবং তাহাদের ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এব্‌নে শায়বান (রঃ) বলেন আমি হজ্ব সম্পাদন করিয়া মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছি। হুজুরের কবর শরীফে যখন ছালাম পাঠ করি তখন হুজুরা শরীফ হইতে অ-আলাইকাছ ছালামু শব্দ শুনিতে পাই।

মোল্লা আলী কারী বলেন কবরে আত হারের নিকট দরূদ শরীফ পড়া দূর হইতে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা নিকটে থাকিয়া পড়িলে হুজুরে কলব এবং খুশু খুজু যেইরূপ হাছিল হয় দূরে থাকিয়া পড়িলে সেইরূপ হাছিল হয় না। মাজাহেরে হক ওয়ালা লিখিতেছেন ছালাম দূরে থাকিয়া পড়া হউক বা নিকটে উভয় ছুরতে হুজুর (ছঃ) উত্তর দিয়া থাকেন। ইহা তার

প্রতীয়মান হয় যে দরূদ এবং ছালাম পড়নেওয়ালার কতবড় বুজুর্গী। যদি সারাজীবনে একটি মাত্র ছালামের উত্তরও আসিয়া যায় তবুও সৌভাগ্য অথচ অবস্থা এই যে হুজুর প্রতিটি ছালামেরই উত্তর দিয়া থাকেন।

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) উল্লেখ করেন কোন বান্দার সৌভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে হুজুরের দরবারে তাঁহার নাম সুনামের সহিত আসিয়া যায়। সেই প্রসঙ্গে এই বয়াতটি বলা হইয়াছে।

ومن خطرت منه ببالك خطرة

حقيق بان يسمو ا ن يتقد ما

আপনার অন্তরে যেই ভাগ্যবানের খেয়ালই আসিয়া যায় সে যত গর্বই করুক না কেন তাহার জন্য শোভা পায়। কবি বলেন

ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے

এই রেওয়ায়েত অনুসারে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর স্বয়ং শ্রবণ করার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসিতে পারে না কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ কবরের মধ্যে জীবিত আছেন। কওলে বাদীর মধ্যে আল্লামা ছাখাবী উল্লেখ করেন আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি যে হুজুরে পাক (ছঃ) কবর শরীফে জীবিত আছেন এবং তাঁহার শরীর মোবারককে মাটি কিছুতেই খাইতে পারে না। এই ব্যাপারে ওলামাগণ সম্পূর্ণ একমত। আম্বিয়ায়ে কেরাম যে জীবিত আছেন ইমাম বয়হকী এই বিষয়ে একটি কিতাবও লিখিয়াছেন। হজরত আনাছের হাদীছ—

اَلْاَنْبِيَاءُ اَحْيَاءٌ فِىْ قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ

অর্থাৎ নবীগণ আপন আপন কবরে জীবিত আছেন এবং নামাজ পড়েন। মোছলেম শরীফে হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে। হুজুর বলেন শবেমে'রাজে আমি হজরত মূছার নিকট দিয়া গমন করি। তিনি আপন কবরে নামাজ পড়িতেছেন দেখিয়াছি। অন্যত্র আছে আমি নিজেকে আম্বিয়াদের একটি জমাতের মধ্যে দেখিয়াছি। সেখানে হজরত ঈছা এবং হজরত ইব্রাহীমকে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছি।

হুজুর (ছঃ)-এর এন্তেকালের পর হজরত ছিদ্দীকে আকবর হুজুরের লাশ মোবারকের নিকট হাজির হইয়া চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়া বলেন আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক হে আল্লার নবী!

আপনার উপর দুইটি মৃত্যু একত্রিত হইবে না। আপনার জন্য নির্দ্ধারিত প্রথম মৃত্যু আপনি লাভ করিয়াছেন। (বোখারী)

আল্লামা ছুয়ুতী (রঃ) হায়াতে আম্বিয়ার উপর একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করিয়াছেন মদীনায়ে পাকের ঘর বাড়ী ও বৃক্ষসমূহ দৃষ্টিগোচর হইলে মোস্তাহাব হইল দরূদ শরীফ বেশী বেশী করিয়া পড়িতে হইবে এবং ঐসব যতবেশী নিকটবর্তী হইতে থাকিবে দরূদ শরীফও তত বেশী বেশী পড়িতে থাকিবে। কেননা ঐসব স্থান অহী এবং কোরানে করীম অবতীর্ণ হইবার কেন্দ্রভূমি ছিল। ঐসব পবিত্র স্থানে হজরত জিব্রাঈল এবং মিকাঈল বারংবার আসা যাওয়া করিতেন। সেখানের মাটিতে হুজুর শোয়া আছেন দ্বীন এবং দুনিয়ের নেয়ামত ওখান হইতেই প্রকাশিত হয়। সেখানে পৌছিয়া অন্তরে এমন ভয়ভীতি ও আজমত পয়দা করিবে যেমন হুজুরকে স্বয়ং দেখিতেছে কেননা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে হুজুর (ছঃ) ছালাম শুনিয়া থাকেন। আপোসে ঝগড়া বিবাদ আজেবাজে কথাবার্তা বন্ধ করিয়া কেবলার দিক হইতে কবর শরীফে হাজির হইবে এবং চার হাত দুরে দাঁড়াইয়া নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নেহায়েত খুশু খুজু ও আদবের সহিত এইভাবে ছালাম পাঠ করিবে —

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيْرَةَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا بَشِيْرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَذِيْرُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى
اَهْلِ بَيْتِكَ الطَّاهِرِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَزْوَاجِكَ

الطاهرات امهات المؤمنين السلام عليك وعلى اصحابك
اجمعين السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين
وسائر عباد الله الصالحين جزاك الله عنا يا رسول الله
افضل ما جزا نبيا عن قومه ورسولا عن امته وصلى الله
عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون
وصلى الله عليك في الاولين وصلى عليك في الآخرين
افضل واكمل واطيب ما صلى على احد من الخلق اجمعين
كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العمى
والجهالة اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده
ورسوله وامينه وخيرته من خلقه واشهد انك قد بلغت
الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله
حق جهاده -

اللهم انه نهاية ما ينبغي ان يأمله الآملون

অর্থ : হে আল্লাহ্‌র রাছুল ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র নবী ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র পেয়ারা ! আপনার উপর ছালাম।
হে আল্লাহ্‌র হাবীব ! আপনার উপর ছালাম।
হে নবীদের সর্দার ! আপনার উপর ছালাম।

হে শেষ পয়গাম্বর ! আপনার উপর ছালাম।
হে বিশ্ব প্রতিপালকের রাছুল ! আপনার উপর ছালাম।
হে সুসংবাদ দাতা ! আপনার উপর ছালাম।
হে ভয় প্রদর্শক ! আপনার উপর ছালাম।

হে নবী। আপনার প্রতি ও আপনার পূতপবিত্র পরিবার পরিজনের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি ও আপনার বিবি ছাহেবান তথা সমস্ত মোমেনদের আম্মাজানদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং আপনার ছাহাবাদের প্রতি ছালাম। আপনার প্রতি এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আল্লাহ্‌র সমস্ত নেক বান্দাদের প্রতি ছালাম।

হে আল্লাহ্‌র রাছুল ! আল্লাহ্ পাক কোন নবীকে তাঁর কওমের তরফ হইতে এবং কোন রাছুলকে তাঁর উম্মতের তরফ হইতে যতটুকু বখ্‌শিশ ও দান করিয়া থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশী উত্তম প্রতিদান আমাদের তরফ হইতে আপনাকে দান করুণ। আপনার উপর আল্লাহ্‌র রহমত তখনই বর্ষিত হউক যখনই কোন লোক আপনাকে স্মরণ করে বা কোন লোক আপনাকে ভুলিয়া যায়। আল্লাহ পাক আপনার প্রতি পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী লোকদের মধ্যে রহমত প্রেরণ করুণ। ঐ সমস্ত রহমত হইতে উত্তম যাহা কোন মাখলুকের প্রতি আল্লাহ পাক বর্ষণ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক আপনার বরকতে আমাদিগকে গোমরাহী হইতে নাজাত দান করিয়াছেন। এবং আপনার দরুণ আমাদিগকে অন্ধত্ব হইতে চক্ষু দান করিয়াছেন। তাই আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহর বান্দা এবং তাঁহার রাছুল ও আমানতদার। এবং সমগ্র মাখলুকের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতর পছন্দনীয় মাহবুব। এবং এই কথারও সাক্ষ্য দিতেছি যে আপনি আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। এবং আমানত আদায় করিয়া দিয়াছেন আর উম্মতের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। এবং আল্লাহর ব্যাপারে চেষ্টার যথাযথ হক আদায় করিয়া দিয়াছেন। হে খোদা ! কোন ব্যক্তি যতটুকু আশা পোষণ করিতে পারে আপনি হুজুরকে তার চেয়ে বেশী দান করিয়া দিন।" (এই পর্য্যন্ত ছালামের বাংলা অনুবাদ শেষ হইল)

তারপর নিজের জন্য এবং সমস্ত মুছলমানের জন্য দোয়া করিবে। অতঃপর হজরত আবু বকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমর ফারূকের উপর ছালাম পাঠ করিবে. তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবে। তাঁহারা হুজুরের প্রতি যে

অবর্ণনীয় সাহয্য সহযোগিতা করিয়াছেন সেইজন্য আল্লাহ পাক যেন তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রতিদান দেন তার জন্য দোয়া করিবে। আল্লামা ছাখাবীর মতে কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আচ্ছালামু আলাইকা বলা আচ্ছালাতু আলাইকা বলার চেয়ে উত্তম। আল্লামা রাজী বলেন ছালামের চেয়ে দরূদ পড়া উত্তম। আল্লামা ছাখাবী বলেন ছালাম এই জন্য উত্তম যে আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যদি কেহ আমার কবরের নিকটে দাঁড়াইয়া ছালাম পাঠ করে তবে আল্লাহ পাক আমার রূহকে আমার উপর ফিরাইয়া দেন এমন কি আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। কিন্তু এই অধমের মতে যেহেতু অনেক হাদীছে দরূদ পড়িবারও ফজীলত আসিয়াছে কাজেই প্রত্যেক স্থানে ছালাম শব্দের সহিত ছালাত অর্থাৎ দরূদকে মিলাইয়া পড়াই সবচেয়ে উত্তম। যেমন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ! না বলিয়া আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ, আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ, এইভাবে শেষ পর্যন্ত ছালামের সহিত ছালাত শব্দ মিলাইয়া পড়া সবচেয়ে উত্তম। এইভাবে পড়িলে আল্লামা রাজী এবং ছাখাবী উভয়ের কথার উপর আমল হইয়া যায়।

আল্লামা ছামেরী হাম্বলী মোস্তাওয়াব গ্রন্থে কবর শরীফে জিয়ারতের আদাব সমূহ লিখিবার পর লিখিতেছেন তারপর কবর শরীফের নিকট আসিয়া কবরের দিকে মুখ করিয়া মিম্বার শরীফকে বাম দিকে রাখিয়া দরূদ ও ছালামের সহিত এই দোয়াও পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ فِىْ كِتَابِكَ لِنَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَوْ
اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ وَاِنِّىْ قَدْ اَتَيْتُ نَبِيَّكَ
مُسْتَغْفِرًا فَاَسْئَلُكَ اَنْ تُوْجِبَ لِىَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا
لِمَنْ اَتَاهُ فِىْ حَيَاتِهٖ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ صَلَّى

اللہ علیہ وسلم

অর্থঃ হে খোদা! আপনি কোরানে মজীদে আপনার হাবীবে পাককে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—'তাহারা যদি নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া আপনার নিকট হাজির হইয়া যাইত এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালাকে তওবা কবুলকারী এবং দয়ালু পাইত।"

অতএব আমি আপনার নবীর দরবারে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি আপনার নিকট আমি ইহা চাহিতেছি যে আপনি আমাকে মাফ করিয়া দিবেন যেমন মাফ করিয়া দিতেন ঐ ব্যক্তিকে যে হুজুরের জীবিতাবস্থায় তাঁহার খেদমতে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিত। হে খোদা! আমি তোমার নবীর উছিলায় তোমার দিকে রুজু করিতেছি।

(৫) عَنْ اُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ رض قَالَ قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ اِنِّیْ اُکْثِرُ الصَّلٰوۃَ عَلَیْکَ فَکَمْ اَجْعَلُ لَکَ مِنْ صَلٰوتِیْ فَقَالَ مَا شِئْتَ قُلْتُ الرُّبُعَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ النِّصْفَ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ الثُّلُثَیْنِ قَالَ مَا شِئْتَ فَاِنْ زِدْتَّ فَھُوَ خَیْرٌ لَّکَ قُلْتُ اَجْعَلُ لَکَ صَلٰوتِیْ کُلَّھَا اِذًا تُکْفٰی ھَمَّکَ وَیُکَفِّرُ لَکَ ذَنْبَکَ ۔

হজরত উবাহ বিন্ কায়াব (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়িতে চাই, তবে আমার দোয়ার সময়ের মধ্যে কতটুকু সময় উহার জন্য নির্দ্ধারিত করিব? হুজুর এরশাদ করিলেন যতটুকু তোমার অন্তর চায়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ এক চতুর্থাংশ? হুজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে উহার

চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। তখন আমি আরজ করিলাম অর্দ্ধেক সময় নির্দ্ধারিত করিব? হুজুর বলিলেন সেটা তোমার ইচ্ছা তবে তার চেয়ে বেশী হইলে ভাল হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্। তাহা হইলে আমি আমার পুরা সময়কে আপনার উপর দরূদ পড়ার জন্য নির্দ্ধারিত করিলাম। হুজুর এরশাদ করিলেন তবে ইহার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার যাবতীয় চিন্তার অবসান হইয়া যাইবে এবং গুনাহ্ও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

ফায়েদা: অর্থাৎ ছাহাবী আরজ করিয়াছিল হুজুর! আমি প্রতিদিন কিছু সময় দোয়া, জিকির ফিকিরের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছি! সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য হইতে কতটুকু সময় দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করিব? আল্লামা ছাখাবী অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে জনৈক ছাহাবী বলেন হুজুর আমি যদি আমার আজিফার যাবতীয় সময় শুধু দরূদ শরীফের জন্য ব্যয় করি তবে কেমন হইবে? হুজুর ফরমাইলেন এমতাবস্থায় তোমার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজের জন্য আল্লাহ পাকই যথেষ্ট। অন্য হাদীছে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার জিকিরের দরুণ দোয়া করিবার সময় পায় নাই আমি তাহাকে প্রার্থনা কারীদের চেয়ে বেশী দান করিয়া দিব।" আল্লামা ছাখাবী বলেন যেহেতু দরূদ শরীফে আল্লার জিকির ও হুজুরের দরূদ উভয়ের সমষ্টি কাজেই শুধুমাত্র দরূদ পড়িলেই আল্লাহ পাক যাবতীয় কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাজাহেরে হক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যখন বান্দা আল্লার রেজামন্দীকে প্রাধান্য দিয়া নিজের আশা আকাংখ্যাকে জলাঞ্জলী দিয়া শুধু মাহবুবের জিকিরে মশগুল হয় তখন আল্লাহ পাক তাঁহার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম করিয়া দেন।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

"যে আল্লার হইয়া যায় আল্লাহ পাকও তাহার হইয়া যান।"

শায়েখ আবদুল ওহাব মোত্তাকী (রঃ) যখন শায়েখ আবদুল হক ছাহেবকে মদীনায়ে মোনাওয়ারায় জিয়ারতের জন্য বিদায় দিতেছিলেন, তখন এই অছিয়ত করিয়াছিলেন যে খুব ভাল করিয়া জানিয়া লও যে, এই ছফরে ফরজ আদায়ের পর হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার চেয়ে অন্য কোন বড় এবাদত আর নাই। কাজেই নিজের সমস্ত সময়টুকু

অন্য কাজে ব্যয় না করিয়া শুধু দরূদ শরীফে ব্যয় করিবে। তিনি আরজ করিলেন উহার জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে? শায়েখ বলিলেন এখানে সংখ্যার কোন প্রশ্ন নাই এত অধিক পরিমাণ পড়িবে যেন উহা দ্বারা তোমার জিহ্বা ভিজিয়া যায়। এবং উহার রঙে রঙিন হইয়া যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে ইহা দ্বারা বুঝা যায় দরূদ শরীফ যাবতীয় নফল এবাদত হইতে শ্রেষ্ঠ। অথচ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে অন্যান্য এবাদতকেও আফজল বলা হইয়াছে। যেমন কোথাও বলা হইয়াছে আল-হামদুলিল্লাহ শ্রেষ্ঠ দোয়া, আবার কোথাও আসিয়াছে এস্তেগফার শ্রেষ্ঠ দোয়া ইত্যাদি। এই প্রশ্নের উত্তর হইল হুজুর (ছঃ) অবস্থাভেদে ব্যবস্থা বাত্‌লাইয়াছেন। অর্থাৎ যার মধ্যে যেই জিনিসের স্বল্পতা ছিল অথবা যেই সময় যেই জিনিসের বেশী প্রয়োজন ছিল হুজুর সেই মোতাবেক আদেশ করিয়াছেন।

তারগীব গ্রন্থে উল্লেখ আছে যখন রাত্রির এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হইত তখন হুজুর (ছঃ) দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং এরশাদ করিতেন হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, হে মানুষ! আল্লাহর জিকির কর, বারংবার বলিতেন। আরও বলিতেন 'রাজেফা' আসিয়াছে 'রাদেফা' আসিতেছে। এই কথা দ্বারা ছুরায়ে নাজেয়াতের কয়েকটি আয়াতের দিকে ইংগীত রহিয়াছে। সেখানে বর্ণিত হইয়াছে "কেয়ামত নিশ্চয় আসিবে যেদিন কম্পন সৃষ্টিকারী সমস্ত বস্তুকে কম্পিত করিয়া দিবে। ইহার অর্থ সিঙ্গার প্রথম ফুঁক, তারপর পরে আগমনকারী বস্তু আসিয়া পড়িবে। ইহার অর্থ, সিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁক। বহু অন্তর সেইদিন ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কাঁপিতে থাকিবে। লজ্জায় তাহাদের চক্ষু অবনত হইয়া যাইবে।

(১০) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص مَنْ صَلّٰى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِىْ عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি সকাল-বিকাল দশ দশবার করিয়া আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার

সুপারিশ লাভ করিবে।

হজরত ছিদ্দীকে আকবর হইতেও বর্ণিত আছে যে আমার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। হজরত আবু হোরায়রার বর্ণনায় আছে আমি সুপারিশও করিব সাক্ষীও হইব। অন্য হাদীছে আছে যে এই দরূদ পড়িবে—

তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

আবু হোরায়রার বর্ণনায় আছে, যে আমার কবরের নিকট দরূদ পড়ে আমি উহা শুনিয়া থাকি। আর যে দূর হইতে পড়ে আল্লাহ পাক তাহার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে আমার নিকট উহা পৌঁছাইয়া থাকেন। এবং তাহার দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কাজ সমাধা হইয়া যায়। আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী থাকি এবং সুপারিশ করিব। অর্থাৎ কাহারও জন্য হুজুর সাক্ষী হইবেন আবার কাহারও জন্য সুপারিশও করিবেন। যেমন মদীনাবাসীদের জন্য সাক্ষী আর অন্যান্যদের জন্য সুপারিশ বা অনুগতদের জন্য সাক্ষী আর পাপীদের জন্য সুপারিশ করিবেন।

(১০) عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ صَلّٰى عَلَىَّ صَلٰوةً اِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتّٰى يُحَيِّىَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى قَبْرِ عَبْدِىْ تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتُقِرُّ بِهَا عَيْنُهُ .

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিলে একজন ফেরেশতা উহাকে নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির করে। সেখানে আল্লার তরফ হইতে হুকুম দেওয়া হয় যে এই দরূদকে আমার বান্দার কবরের নিকট লইয়া যাও। ইহা পড়নেওয়ালার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং ইহার দরুন তাঁহার চক্ষু তৃপ্তি লাভ করিবে।

ফায়েদা ঃ জাদুহ ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে কেয়ামতের দিবস কোন মোমেন বান্দার নেকী যখন কম হইয়া যাইবে তখন হুজুরে পাক (ছঃ) আঙ্গুলের মাথা বরাবর একটা কাগজের টুক্‌রা মীজানের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যার দরুন তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। সেই মোমেন বান্দা বলিয়া উঠিবে আপনি কে? আপনার ছুরত-ছীরত কতই না সুন্দর। তিনি বলিবেন আমি হইলাম তোমার নবী এবং ইহা হইল আমার উপর পড়া তোমার দরূদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।

এখানে এই প্রশ্ন করা অবান্তর যে এতটুকু ছোট একটা টুকরার দ্বারা পাল্লা কি করিয়া ভারী হইয়া যাইবে। কেননা আল্লাহ্ পাকের দরবারে এখলাছের দামই বেশী। আমলের মধ্যে এখলাছ যত বেশী হইবে উহা তত বেশী ওজনী হইবে। যেমন কালেমায়ে শাহাদাতের বিষয় বর্ণিত আছে উহা যখন নেকের পাল্লায় রাখা হইবে অপরদিকের পাপে বোঝাই নিরান্নব্বই দপ্তর উড়িতে থাকিবে।

(١٢) عن أبي سعيد الخدري رضـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكوة وقال لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون

مِنْتِهَا هُ الْجَنَّةُ (ترغيب)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যাহার নিকট ছদকা করিবার মত কোন বস্তু নাই সে যেন এই দোয়া করে—

"হে খোদা। তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর প্রতি রহমত পাঠাও যিনি তোমার বান্দা এবং রাছুল। এবং মোমেন পুরুষ মেয়েলোক আর মুছলমান পুরুষ মেয়েলোকের উপর রহমত বর্ষণ কর" এই দোয়া তাহার জন্য ছদকা করার সমতুল্য। হুজুর আরও বলেন মোমেনের উদর বেহেশ্‌তে পৌঁছা পর্যন্ত নেক কাজ দ্বারা ভর্তি হয় না।

ওলামাদের মধ্যে এই বিষয় মতভেদ রহিয়াছে যে ছদকা উত্তম না দরূদ শরীফ উত্তম। কাহারও মতে ছদকা হইতে দরূদ উত্তম। কেননা দরূদ এমন একটি আমল যাহা শুধু বান্দার উপর নয় বরং স্বয়ং আল্লাহ পাক এবং ফেরেশতাগণও ঐ আমল করিয়া থাকেন। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন তোমরা আমার উপর দরূদ পড়িতে থাক কেননা উহা ছদকার সমতুল্য। হুজুর আরও বলেন আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়া সমূহের জন্য রক্ষা কবচ স্বরূপ। যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং তোমাদের আমল সমূহকে পবিত্র করিয়া দেয়। আরও বর্ণিত আছে আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের গোনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ এবং ছদকার সমতুল্য।

হাদীছের অর্থ—নেকীর দ্বারা মোমেনদের পেট ভরে না, এখানে নেকীর অর্থ কেহ কেহ এলেম দ্বারা করিয়াছেন। আবার অনেকে এলেম এবং অন্য যে কোন নেকী বলিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ ছাহেবও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মাজাহেরে হক এবং মেরকাত গ্রন্থে উহার অর্থ এলেম লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ এলেমের দ্বারা মোমেনের পেট কখনও ভর্তি হয় না মৃত্যু পর্য্যন্ত সে উহার তালাশেই থাকে। হাদীছে এলেম তলবকারীদের জন্য সুসংবাদ রহিয়াছে যে, ইনশাল্লাহ্‌ তাহারা দুনিয়া হইতে ঈমানের সহিত বিদায় নিবে। তালেবে এলেমের মধ্যে দ্বীনী শিক্ষায় মশগুল থাকা এবং ধর্মীয় কিতাব পত্র লেখাও শামিল রহিয়াছে।

সারাংশ

দরূদ শরীফের ফাজায়েল সম্পর্কীয় রেওয়ায়েত সমূহ একত্র করা দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই যে যদি একটি ফজিলতও বর্ণিত না হইত তবুও উম্মতের উপর হুজুরের অকুরন্ত এহ্ছান হিসাবে যতবেশী সংখ্যক দরূদই হুজুরের উপর পড়া হইত উহাই কম ছিল। এবং তাঁহার এহ্ছানের সামান্যতম হকও আদায় হইত না। কিন্তু মেহেরবান খোদা দরূদ পড়ার বিনিময়ে হক আদায়ের সাথে সাথে হাজার হাজার

ছওয়াবের ও ব্যবস্থা রাখিয়াছেন।

আল্লামা ছাখাবী দরূদ শরীফের ছওয়াবের ব্যাপারে লিখিতেছেন—

আল্লাহ পাকের তরফ হইতে বান্দার উপর রহমত প্রেরণ, ফেরেশতাদের রহমতের জন্য প্রার্থনা করা এবং স্বয়ং প্রিয় নবীজী কর্তৃক দরূদ পড়নেওয়ালার জন্য দোয়া করা, তাহাদের গুনাহ সমূহ মাফ হওয়া, আমল সমূহ পবিত্র হওয়া, তাহাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হওয়া স্বয়ং দরূদ শরীফ কর্তৃক পাঠকদের জন্য, ক্ষমা চাওয়া, তাহাদের আমল নামায় এক কীরাত অর্থাৎ অহুদ পাহাড় পরিমাণ পুণ্য লিপিবদ্ধ হওয়া, উহার ছওয়াব মীজানের পাল্লায় অত্যধিক ভারী হওয়া পাঠকের দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন হওয়া, পাপ সমূহ মাফ হওয়া, গোলাম আজাদ হইতেও অধিকতর ছওয়াব হাছিল হওয়া দরূদের বরকতে যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্ত থাকা কেয়ামতের দিন হুজুর কর্তৃক তাহার জন্য সাক্ষাৎ দান করা, এবং হুজুরের শাফায়াত ওয়াজেব হওয়া আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং রহমত অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া, কেয়ামতের দিন আরশের নীচে ছায়া লাভ করা, নেক আমলের পাল্লা ঝুঁকিয়া যাওয়া, হাওজে কাওছার নছীব হওয়া, কেয়ামতের ভীষণ তৃষ্ণা হইতে নাজাত লাভ করা, জাহান্নাম হইতে মুক্তি হাছেল হওয়া, পুলছেরাতের উপর দিয়া সহজে পার হওয়া, মৃত্যুর পূর্বেই বেহেশতের মধ্যে আপন ঠিকানা দেখিয়া লওয়া, এবং তথায় বেশী বেশী বিবি লাভ হওয়া, দরূদের দ্বারা বিশবার জেহাদ করার চেয়ে বেশী ছওয়াব হাছিল হওয়া এবং দরীদ্র লোকদের জন্য ছদকার সমকক্ষ হওয়া, ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

তদুপরি দরূদ শরীফ হইল জাকাত এবং পবিত্রতা। ধন সম্পদে বরকতের উপকরণ। উহা দ্বারা একশত হাজত পুরা হয় বরং তার চেয়ে বেশীও পূর্ণ হয়। দরূদ স্বয়ং এবাদত এবং আমলের মধ্যে আল্লার নিকট সব চেয়ে প্রিয়। মজলিসের রওনক, উহার উছিলায় অভাব অনটন দূর হয়। উহা দ্বারা সৎপথ সমূহ তালাশ করা হয়। কেয়ামতের দিন দরূদ পড়নেওয়ালা হুজুরের সব চেয়ে বেশী নিকটবর্তী হইবে। উহা দ্বারা স্বয়ং পড়নেওয়ালা এবং তাহার পুত্র পৌত্র সকলেই উপকৃত হয়। বরং যাহার জন্য ইছালে ছওয়াব করা হয় সেও উপকৃত হয়। উহা দ্বারা আল্লাহও রাছুলের নৈকট্য লাভ হয়। উহা নিঃসন্দেহে নূর স্বরূপ, শত্রুর উপর জয়লাভ করার উছিলা। অন্তরকে ময়লা ও কপটতা হইতে পাক করে। উহা দ্বারা মানুষের অন্তরে মহব্বত পয়দা হয়। স্বপ্নে হুজুরে পাকের জিয়ারত নছীব হয়। উহা পড়িলে লোকের গীবত শেকায়েত হইতে রক্ষা পাওয়া

যায়। দরূদ শরীফ সব চেয়ে উত্তম আমল, দ্বীন ও দুনিয়ার সব চেয়ে বেশী উপকৃত আমল। এই দরূদ শরীফ শুরু জমানা হইতে সমস্ত আওলিয়াদের সকাল বিকালের অফিজা হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা এমন একটি ব্যবসা যাহাতে লোকছানের কোন আশংকা নাই। কাজেই যতটুকু সম্ভব সকাল বিকাল জমিয়া জমিয়া বসিয়া দরূদ পাঠ করিলে অন্তর আলোকিত হয়। যাবতীয় গোমরাহী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং কেয়ামতের ভয়ঙ্কর মছিবতে নাজাত লাভ হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের ফজীলতের বর্ণনা

(১) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِىْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِىْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - (بخارى)

অর্থ: হজরত আবদুর রহমান বিন আবি লাইলা বলেন, আমার সহিত হজরত কা'ব বিন উজরার সাক্ষাত হইয়াছিল তিনি আমাকে বলেন আমি কি তোমাকে হুজুর (ছঃ) হইতে প্রাপ্ত একটা হাদিয়া দান করিব না?

আমি বলিলাম নিশ্চয় দান করুন। তিনি বলিলেন আমরা হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম হুজুর! আল্লাহ পাক ত আমাদিগকে ছালামের তরীকা শিক্ষা দিয়াছেন কিন্তু আমরা আপনার ও আপনার পরিবার পরিজনের উপর কি ভাবে দরূদ পাঠ করিব? হুজুর বলেন এই ভাবে বল "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিঁও অআলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আ-লে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীতুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক আলা মোহাম্মাদিঁও অ-আলা আ-লে মোহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইব্রাহীমা অ-আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীতুম মাজীদ। (বোখারী)

হাদিয়া দেওয়ার অর্থ হইল সেই সব বুজুর্গেরা বন্ধু বান্ধবদিগকে খানা পিনার আছবাবের পরিবর্তে হুজুর (ছঃ) এর হাদীছ এবং জিকির আজকার হাদিয়া দিতেন। কেননা তাঁহাদের নিকট এই সব বস্তুর কদর জড়বাদী বস্তু সমূহ হইতে অনেক বেশী ছিল। তাই হজরত কা'ব হাদীছ বয়ান করাকে হাদিয়া বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

আল্লামা ছাখাবী এই হাদীছকে বিভিন্ন তরীকায় বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি হজরত হাছান হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন ইন্নাল্লাহা অমালায়েকাতাহু—এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন ছাহাবারা হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর! আপনার উপর ছালামের তরিকাত আমরা জানিতে পারিলাম, এখন দরূদ কি করিয়া পড়িতে হইবে তাহা শিক্ষা দিন, হুজুর তখন বলেন তোমরা এই ভাবে বলিবে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ الخ -

অন্য রেওয়ায়েতে আছে হযরত বশীর (রাঃ) হুজুরকে প্রশ্ন করেন হুজুর! আমাদিগকে দরূদ শরীফ পড়িবার তরীকা বাতলাইয়া দিন। হুজুর কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, এই ভাবে বলিবে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিঁও অ-আলা আলে মোহাম্মাদিন—কিছুক্ষণ চুপ থাকার অর্থ হইল তখন হুজুরের উপর অহী অবতীর্ণ হইতেছিল। অন্যত্র বর্ণিত আছে, ছাহাবারা বলেন আমাদের উপস্থিতিতে একব্যক্তি হুজুরের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আমরা ছালামের তরীকা ত জানিলাম, কিন্তু ছালাত অর্থাৎ আপনার উপর দরূদ আমরা নামাজের মধ্যে কিভাবে পড়িব? হুজুর চুপ হইয়া রহিলেন। আমরা হুজুরের কষ্ট হয় নাকি এই ভয়ে চিন্তা করিতে লাগিলাম যে লোকটা হুজুরকে প্রশ্ন কেন করিল? তার

পর হুজুর বলিলেন, নামাজের মধ্যে দরূদ এই ভাবে পড় "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আল্লা মোহাম্মাদি"ও—এই দরূদ শরীফ বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে এবং হানাফী মজহাব মতে ইহাই নামাজে পড়া হয়। মোহাদ্দেছীণগণের মতে এই দরূদ শরীফই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ। এমন কি আল্লামা নববী রওজা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ যদি কছম খাইয়া বসে যে আমি সর্বশ্রেষ্ট দরূদ পড়িব তখন আমরা যাহা নামাজের মধ্যে পড়িয়া থাকি উহা পড়িলে কছম পুরা হইয়া যাইবে। হেছনে হাছীনে উল্লেখ আছে ইহাই হইল সব চেয়ে শুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দরূদ। নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে উহাকেই বেশী বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এই হাদীছের মধ্যে যে বর্ণিত আছে আমরা ছালামের তরীকা জানিয়াছি, উহার অর্থ হইল, "আত্তাহিয়্যাতু'র মধ্যে শিখিয়াছি—আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকা-তুহু।

এখানে একটা প্রশ্ন এই জাগে যে, কোন জিনিসকে যখন অন্য জিনিসের সহিত তুলনা করা হয় যেমন কেহ বলিল অমুক ব্যক্তি হাতেম তাইর মত দাতা, তখন দানের ব্যাপারে হাতেম তাই যে শ্রেষ্ঠ উহাই প্রতিপন্ন হয়। ঠিক এই রকম দরূদ শরীফের মধ্যেও হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দরূদ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যায়। হাফেজ এব্‌নে হাজার এই প্রশ্নের দশটি উত্তর লিখিয়াছেন। আলেম হইলে ফত্‌হুল বারী গ্রন্থ দেখিয়া নিতে পারেন। তা না হইলে কোন আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া নিবেন। সব চেয়ে সহজ উত্তর হইল এই যে, সাধারণ নিয়মানুসারে প্রশ্ন ঠিকই হইয়াছে। তবে কোন কোন সময় উহার ব্যাতিক্রমও হইয়া থাকে যেমন কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ

অর্থাৎ, আল্লার নূর হইল যেমন ঐ চেরাগদান যাহার উপর চেরাগ রহিয়াছে। অথচ আল্লাহর নূরের সহিত চেরাগের নূরের কি তুলনা হইতে পারে?

আর একটা প্রশ্ন হইল সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র ইব্রাহীম (আঃ) এর দরূদের কেন উল্লেখ করা হইল। আওজাজ গ্রন্থে এবং হজরত থানবী (রঃ) প্রণীত জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে ইহার অনেক উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বান্দার নিকট সবচেয়ে উত্তম এই যে, আল্লাহ পাক হজরত ইব্রাহীমকে

খলীলরূপে ভূষিত করিয়া যেমন ফরমাইয়াছেন "অত্তাখাযাল্লাহু ইব্রাহীমা খালীলা" কাজেই আল্লাহর তরফ হইতে ইব্রাহীম (আঃ) এর উপর যে দরূদ উহা মহব্বতের লাইনের দরূদ হইবে। আর মহব্বতের লাইনের যাবতীয় বস্তুই সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ওদিকে আমাদের প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাক হাবীবুল্লাহ নামে আখ্যায়িত করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ের দরূদই মহব্বত ও ভালবাসার লাইন হিসাবে সামঞ্জস্য পূর্ণ।

মেশকাত শরীফে হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) হইতে একটা ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদিন ছাহাবায়ে কেরাম আম্বিয়ায়ে কেরামের উল্লেখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, হজরত ইব্রাহীম হইলেন খলীলুল্লাহ, মুছা হইলেন কালীমুল্লাহ, ঈছা হইলেন রুহুল্লাহ, আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ। ইত্যবসরে হুজুরে আকরাম (ছঃ) সেখানে তাশরীফ আনিয়া বলিলেন আমি তোমাদের সব কথা শুনিতে পাইয়াছি। নিশ্চয় আদম (আঃ) ছফিউল্লাহ মুছা (আঃ) কালীমুল্লাহ, ঈছা (আঃ) রুহুল্লাহ্ ইব্রাহীম (আঃ) খলীলুল্লাহ্। কিন্তু খুব মনযোগ সহকারে শুন! কথা হইল এই যে, আমি হইলাম হাবীবুল্লাহ। অবশ্য ইহাতে আমি কোন গর্ব করি না। এবং কেয়ামতের দিন আমার হাতে 'লেওয়ায়ে হাম্দ' অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ডা থাকিবে, সেই ঝাণ্ডার নীচে হজরত আদম (আঃ) এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম হইবেন। অবশ্য ইহার উপর আমি কোন ফখর করিতেছিনা। আবার সর্ব প্রথম আমিই শাফায়াত করিব এবং আমার সাফায়াতই কবুল হইবে। উহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই এবং আমিই সর্বপ্রথম বেহেশ্তে প্রবেশ করিব এবং আমার উম্মতের মধ্যে গরীব শ্রেণীর লোক প্রবেশ করিবে। উহার উপরও আমি কোন গর্ব করি না এবং আগের পাছের সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বেশী সম্মানিত। ইহার উপরও আমার কোন গর্ব নাই।

বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমানিত হয় যে, হুজুরই একমাত্র হাবীবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লার খাছ বন্ধু। এখানে হুজুরের দরূদকে ইব্রাহীমের দরূদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। তদুপরি পিতার সহিত পুত্রের তুলনা স্বাভাবিক এখানে মেশ্কাতের শরাহ্ "লোমআত" গ্রন্থে আর একটি সূক্ষ্ম কথা লেখা হইয়াছে যে, খেতাব হিসাবে হাবীবুল্লাহ হইল সবচেয়ে উঁচু ধরনের। যেহেতু উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহার মধ্যে কালীম হওয়া ছফী হওয়া, খলীল হওয়া সব কিছুই একত্রে বিদ্যমান। বরং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে সব গুণ নাই হাবীব শব্দের ভিতর ঐ সবও বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা একমাত্র হুজুরের জন্যই খাছ।

(২) عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يكتال بالمكيال الاوفى اذا صلى علينا اهل البيت فليقل اللهم صل على محمد ن النبى الامى وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد (ابوداؤد)

অর্থ ঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই ইচ্ছা পোষণ করে যে যখন সে আমার পরিবারের উপর দরূদ পড়ে তার আমল নামা বহুত বড় টুক্‌রিতে ওজন দেওয়া হউক সে যেন এই শব্দ দ্বারা দরূদ পড়ে—

اللهم صل على محمد النبى الامى

অর্থাৎ হে খোদা। তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ পাঠাও যিনি উম্মী (নিরক্ষর) নবী এবং তাঁহার বিবি ছাহেবানদের উপর যাঁহারা সমস্ত মোমেনীনের জননী এবং তাঁহার আওলাদ ও পরিবারের উপর যেমন তুমি দরূদ পাঠাইয়াছ ইব্রাহিম (আঃ) এর উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় বুজুর্গ।

নবীয়ে উম্মী হুজুরের একটি বিশেষ উপাধি। তৌরীত ইঞ্জীল এবং সমস্ত আছমানী কিতাবে হুজুরকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে।

হুজুরকে নবীয়ে উম্মী কেন বলা হয় ওলামাগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা হইল এই যে, উম্মী অর্থ নিরক্ষর, যিনি পড়া লেখা জানেন না। হুজুরের ইহা একটি গুরুত্ব পূর্ণ মোজেজা যে, যিনি একেবারেই লেখা পড়া জানেন না তিনি ফাছাহাত বালাগাতে পরিপূর্ণ অর্থাৎ অলংকার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম কিতাব কোরানে করীম কি করিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইলেন। এই মোজেজার কারণেই পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে হুজুরকে এই উপাধিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

یتیمے کہ نا کردہ قرآں درست
کتب خانۂ چند ملت بشست

"যেই এতীম সপূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি কতশত ধর্মকে বিকল

نگار من که بمکتب نرفت و خط ننوشت
بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

"আমার মাহবুব যিনি কখনও কোন মকতবেও যান নাই এবং লেখা পড়াও শিখেন নাই তিনি আপন ইশারায় শত সহস্র ওস্তাদের ওস্তাদ বনিয়া গেলেন।

হজরত শাহ্ অলি উল্লাহ্ (রঃ) হেরজে ছামীন গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমার আব্বাজান আমাকে এই দরূদ শিক্ষা দিয়াছেন।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আমি স্বপ্নযোগে এই দরূদ শরীফকে হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে পেশ করিয়াছি, হুজুর ইহাকে পছন্দ করিয়াছেন।

হাদীছে বর্ণিত বহুত বড় টুক্‌রিতে ওজন দেওয়া হইবে। উহার অর্থ হইল আরব দেশের দস্তুর হইল খেজুর ইত্যাদিকে টুক্‌রিতে ওজন করিয়া বিক্রী দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে এই সব বস্তু নিপ্তিতে ওজন দেওয়া হয়। কাজেই বহুত বড় টুকরি অর্থ হইল বহুত বড় নিপ্তিতে যাহার পরিমাণ হয় অনেক বেশী। এখানে নিপ্তি না বলিয়া টুক্‌রি এই জন্য বলা হইয়াছে যে সাধারণতঃ বেশী জিনিস তরাজুতে ওজন করা সম্ভব নয় কাজেই উহা টুক্‌রিতে ওজন করা হয়। হজরত এব্‌নে মাছউদ এবং হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি চায় যে, তাহার দরূদ বড় টুক রিতে করিয়া ওজন করা হউক সে যেন আমার পরিবারবর্গের উপর এই ভাবে দরূদ পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

এবং হজরত হাছান বছরী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর হাওজে কাওছার হইতে পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করিতে চায় সে যেন এই

দরূদ পড়ে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিও অ-আলা আ-লিহী অ-আছ্হা-বিহী অ-আওলা-দিহী অ-আজ্ওয়াজিহী অজুর্রিয়াতিহী অ আহলে বায়তিহী অ-আছহারিহী অ-আনছা-রিহী অ-আশইয়াইহী অ-মোহেব্বিহী অ-উম্মাতিহী অ-আলাইনা মাআহুম আজমাঈন ইয়া আর হামার রা-হেমীন।" কাজী এয়াজ এই হাদীছকে শেফা গ্রন্থে নকল করিয়াছেন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা
আলা-হাবী-বেকা খাইরিল খাল্কে কুল্লেহিম।

(৩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ
عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلٰوتُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ
وَبَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ - (ترغيب ابن ماجه)

অর্থঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাক কেননা উহা এমন একটি মোবারক দিন যেদিন ফেরেশ্তা অবতরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে সে দরূদ শেষ করার সাথে সাথেই আমার নিকট উহা পেশ হয়। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম হুজুর! আপনার এন্তেকালের পরেও কি এইরূপ হইবে। হুজুর বলিলেন এন্তেকালের পরেও এইরূপ হইবে। কেননা আল্লাহ পাক মাটির জন্য নবীদের শরীরকে খাওয়া হারাম করিয়া দিয়াছেন। নবীগণ কবরে জীবিত আছেন

এবং তাঁহাদের নিকট রিজিক পৌঁছিয়া থাকে।

ফায়েদা ঃ মোল্লা আলী কারী বলেন, আল্লাহ পাক নবীদের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের হায়াত এবং মউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। হাদীছে এই ইশারাও পাওয়া যায় যে দরূদ শরীফ রুহ মোবারক এবং শরীর উভয়টার মধ্যেই পেশ করা হয়। নবীগণ জীবিত আছেন ইহা দ্বারা প্রত্যেক নবীই হইতে পারেন কেননা হুজুর হজরত মুছা (আঃ) এবং হজরত ইব্রাহীম (আঃ) কে কবরের মধ্যে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন। রিজিক অর্থ রুহানী রিজিক অথবা বাহ্যিক রিজিক দুইটাই হইতে পারে।

আল্লামা ছাখাবী হজরত আওছ উইতে বর্ণনা করেন; হুজুর এরশাদ করেন। তোমাদের জন্য শ্রেষ্ঠতম দিন হইল জুমার দিন কেননা সেইদিন হজরত আদম (আঃ) জন্ম লাভ করেন এবং ঐদিনই এন্তেকাল করেন। সেইদিন প্রথম শিঙ্গার ফুঁক এবং দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুঁক অনুষ্ঠিত হইবে। কাজেই জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়িতে থাক। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। ছাহাবারা আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ। আমাদের দরূদ আপনার উপর কিভাবে পেশ করা হয়? অথচ আপনিত কবরে পঁচিয়া গলিয়া যাইবেন। তখন হুজুর এরশাদ করেন আল্লাহ পাক নবীদের শরীর খাইয়া ফেলা মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে, আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড় কেননা আমার উম্মতের দরূদ আমার নিকট শুক্রবার দিন পেশ করা হয়। সুতরাং যেই ব্যক্তি আমার উপর অধিক পরিমাণ দরূদ পড়িবে কেয়ামতের দিন সে আমার অধিক নিকট-বর্তী হইবে। হজরত ওমরের হাদীছে ইহাও রহিয়াছে দরূদ শরীফ পেশ হওয়ার পর আমি তোমাদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করিয়া থাকি। হজরত হাছান বছরী, এব্‌নে ওমর ও খালেদ বিন মা'দান হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। হজরত ছোলায়মান এব্‌নে ছোহায়েম বলেন আমি স্বপ্নযোগে হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ। যাহারা আপনার দরবারে হাজির হইয়া আপনার উপর ছালাম পাঠ করে আপনি কি তাহা শুনিতে পান? হুজুর বলেন হাঁ আমি তাহার ছালামের উত্তরও দিয়া থাকি। ইব্রাহীম এব্‌নে শাইবান বলেন, আমি হজ্জ করিয়া রওজায়ে আতহারে হাজির হইয়া যখন ছালাম করি

তখন কবর শরীফ হইতে অ-আলাইকুমুছ ছালামু শব্দের উত্তর শুনিতে পাই। বুলুগুল মোহাব্বত গ্রন্থে হাফেজ এব্‌নে কাইয়্যেম হইতে বর্ণিত আছে জুমার দিন দরূদ শরীফের ফজীলত এই জন্য বেশী যে জুমার দিন হইল সমস্ত দিনের সর্দার আর হুজুর (ছঃ) হইলেন সমস্ত মাখ্‌লুকের সর্দার। কাজেই সেইদিন দরূদ পড়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে যাহা অন্য দিনের মধ্যে নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হুজুরে পাক (ছঃ) তাঁহার পিতার পৃষ্ঠ হইতে মায়ের গর্ভে জুমার দিন তাশরীফ আনেন।

আল্লামা ছাখাবী বলেন জুমার দিন দরূদ পড়ার ফজীলত হজরত আবু হোরায়রা, হজরত আনাছ, আউছ এব্‌নে আউছ, আবু ওমামা, আবু দারদা, আবু মাছউদ, হজরত ওমর এবং এব্‌নে ওমর প্রমুখ ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা, আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ عَلَىَّ نُوْرٌ عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ صَلّٰى عَلَىَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَامًا ـ

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়া পুলছেরাতের উপর নূর স্বরূপ। এবং যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশী বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

হজরত আবু হোরায়রা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর আপন জায়গা হইতে উঠিবার আগে আশী বার এই দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

"আল্লা হুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদেনি ন্নাবিয়্যিল উম্মিয়ে অ-আলা আলিহী অ ছাল্লেম তাছলীমা।

তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এবং আশী বৎসরের এবাদতের ছওয়াব তাহার জন্য লেখা যাইবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর এই দরূদ পড়িতে বলিয়াছেন –

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন আবদেকা অ নাবিয়্যেকা অ-রাছূলেকান্নাবীয়্যিল উম্মিয়ে। ইহা পড়িয়া একটি আঙ্গুল বন্ধ করিবে অর্থাৎ আঙ্গুলে গুণিয়া গুণিয়া পড়িবে।

বহু হাদীছে আঙ্গুলে গুণিয়া গুণিয়া পড়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। কেননা এই আঙ্গুল কেয়ামতের দিন আমাদের নেকীর বিষয় সাক্ষী দান করিবে। আমরা দৈনন্দিন এই হাত দ্বারা কতশত গোনাহের কাজই না করিয়া থাকি, কেয়ামতের কঠিন ময়দানে যদি অতশত গোনাহের সাক্ষ্য দেওয়ার সাথে সাথে কিছুটা নেকীর সাক্ষ্যও দেয় তবুও কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি শুক্রবার দিন আমার উপর একশত বার দরূদ পাঠ করিবে তার সহিত কেয়ামতের দিন এমন একটি নুর (জ্যোতি) আসিবে যাহা সমস্ত মাখলুখের উপর ভাগ করিয়া দিলেও সমস্তের জন্যই উহা যথেষ্ট হইয়া যাইবে।

হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি জুমার দিন আছরের পর 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবিয়্যল উম্মিয়ে অ আলা আলিহী অ ছাল্লেম' আশী বার পাঠ করিবে উহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত আনাছ হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়িবে ও উহা কবুল হইবে, তবে তাহার আশী বৎসরের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দোর্‌রে মোখ্‌তারের হাওলা দিয়া এই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

দরূদ শরীফের মধ্যেও কবুল হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শামী বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শায়েখ আবু ছোলায়মান দারানী বর্ণনা করেন যে কোন এবাদত কবুল হওয়ার বিষয় সন্দেহ আছে। কিন্তু হুজুরে পাকের উপর দরূদ পড়ার বিষয় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

কেননা উহা কবুল হইয়া থাকে। বহু ছুফীয়ায়ে কেরামেরও ইহাই অভিমত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ - (طبرانى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি দরূদ এইভাবে পড়িবে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিন, অ আনজেলহুলমাক আদাল মোকাররাবা ইন্দাকা ইয়াওমাল কেয়ামাতে' তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়।

ফায়েদাঃ উক্ত দরূদ শরীফের অর্থ হইল এই যে, "হে খোদা। আপনি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ পাঠান এবং কেয়ামতের দিন তাঁহাকে এই মোবারক স্থানে পৌঁছাইয়া দিন যাহা আপনার সবচেয়ে নিকটবর্তী।

ওলামাগণ নিকটবর্তী ঠিকানার কয়েক অর্থ করিয়াছেন। আল্লামা ছাখাবী বলেন উহার অর্থ হইল, অছীলা অথবা মোকামে মাহমুদ, অথবা হুজুরের আরশে আজীমে অবস্থান অথবা হুজুরের সেই সু উচ্চ আসন সবচেয়ে উপর হইবে। হেরজে ছামীন গ্রন্থে উহাকে কুরছী বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন মাকআদে মোকাররায় অর্থ মোকামে মাহমুদ'। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে বেহেশ্‌তের মধ্যে' শব্দ আসিয়াছে। তখন অর্থ হইবে অছীলা যাহা জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন। কোন কোন ওলামাদের মতে হুজুরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুইটা মোকাম হইবে। প্রথমতঃ ঐ মোকাম যাহা সুপারিশের ময়দানে আরশের ডান দিকে হইবে। উহার উপর সৃষ্টির শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলে ঈর্ষা করিবে। দ্বিতীয় মোকাম হইল জান্নাতে, যাহা জান্নাতের সর্বোচ্চ আসন হইবে।

বোখারী শরীফে একটা লম্বা হাদীছ বর্ণিত আছে যেখানে হুজুরের জান্নাত ও জাহান্নাম দেখার একটি স্বপ্নের বর্ণনা রহিয়াছে। সেখানে সুদখোর, জিনাকার ইত্যাদির ঠিকানা দেখান হইয়াছে। অবশেষে হুজুর বলেন, সেই দুই জন ফেরেশ্‌তা আমাকে এমন এক ঘরে নিয়া গেলেন যাহার চেয়ে সুন্দর ঘর আমি ইতি পুর্বে দেখি নাই। সেখানে অনেক গুলো বৃদ্ধ, যুবতী, শিশুকে দেখিতে পাই, তারপর তাহারা আমাকে একটি গাছের তলায় নিয়া যায় সেখানে একটি ঘর আগের ঘরের চেয়েও উন্নত মানের দেখিতে পাই। আমি জিজ্ঞাসা করার পর তাহারা বলিল প্রথম ঘর আপনার সাধারণ উম্মতের জন্য আর এই ঘর শহীদানের জন্য তারপর তাহারা আমাকে বলিল, হুজুর! আপনি একটু উপরের দিকে মাথা উঠান। আমি উপরের দিকে তাকাইয়া একটা মেঘ খণ্ডের মত দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া ফেরেশ্‌তাদ্বয়কে বলিলাম আমি উহাকে দেখিব। তাহারা বলিল, আপনার বয়স এখনও বাকী রহিয়াছে। উহা পূর্ণ হইলেই আপনি উহাতে পৌছিয়া যাইবেন।

দরূদ শরীফ পড়িলে হুজুরের শাফায়াত হাছিল হইবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা উহা প্রমাণিত হইয়াছে ও হইবে। কোন কয়েদী বা অপরাধী যদি এই কথা জানিয়া লয় যে অমুক ব্যক্তির হাকিমের দরবারে বেশ প্রভাব রহিয়াছে বরং তাহার সুপারিশ হাকিমের দরবারে নিশ্চিতভাবে কবুল হইয়া থাকে তখন সেই প্রভাবশালী ব্যক্তির কতইনা খোশামদ করা হয় আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে বিরাট বিরাট পাপে লিপ্ত হয় নাই এবং হুজুর (ছঃ) এর মত সুপারিশ করনেওয়ালা, যিনি আল্লার হাবীব এবং সমস্ত নবীদের সর্দার আর সমস্ত মাখলুকের সর্দার তিনি সহজ বস্তুর উপর সুপারিশের ওয়াদা করিতেছেন বরং এত বেশী গুরুত্ব সহকারে ওয়াদা করিতেছেন যে, আমার উপর সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। ইহা সত্বেও যদি কোন ব্যক্তি উহা দ্বারা উপকৃত না হয় তবে উহা কতইনা দুর্ভাগের বিষয়। আমরা বৃথা কত সময় নষ্ট করিতেছি বেহুদা কেচ্ছা কাহিনীতে বরং গীবত শেকায়েতে অমুল্য সময় নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, এই মূল্যবান সময়কে যদি দরূদ শরীফ পড়ায় ব্যয় করা হইত তবে কতই না সৌভাগ্যের কথা ছিল।

ইয়া রাবে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা

আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৬) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ اَتْعَبَ سَبْعِيْنَ كَاتِبًا اَلْفَ صَبَاحٍ - (ترغيب طبرانى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি এই দোয়া করিবে—জাজাল্লাহু আন্না মোহাম্মদাম মা হুয়া আহ্‌লুহু (অর্থাৎ পুরস্কার দাও মোহাম্মদ (ছঃ) কে আমাদের তরফ হইতে যেই পুরস্কারের তিনি যোগ্য) এই দোয়া সত্তর জন ফেরেশ্‌তাকে এক হাজার দিন পর্য্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। তিবরানী শরীফের অন্য রেওয়াতে আসিয়াছে; যে পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاجْزِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهْلُهٗ -

এই দোয়াও ইহার ছওয়াব লিপিবদ্ধকারী ফেরেশ্‌তাদিগকে এক হাজার দিন পর্যন্ত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেয়।

কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ইহার ছওয়াব এক হাজার দিন পর্য্যন্ত লিখিতে লিখিতে অবশেষে ফেরেশতাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। 'যেই পুরস্কারের হুজুর যোগ্য' কোন কোন আলেমগণ ইহার পরিবর্তে বলিয়াছেন যেই পুরস্কার আল্লাহপাকের শানের মোনাছেব। অর্থাৎ হে খোদা! যত বড় পুরস্কার তোমার শান অনুসারে তুমি দিতে পার তত বড় পুরস্কার তুমি দান কর। হজরত হাছান বছরীর রেওয়ায়েতে ইহাও রহিয়াছে—

وَاجْزِهٖ عَنَّا خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا مِّنْ اُمَّتِهٖ

অর্থাৎ হে খোদা! হুজুরকে তুমি আমাদের তরফ হইতে উহার চেয়ে অধিক পরিমাণ নেয়ামত দান কর যতটুকু তুমি কোন নবীকে তাঁহার উম্মতের তরফ হইতে দান করিয়াছ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যেই ব্যক্তি এই শব্দগুলো পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضَاءً وَّلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَّاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مِنْ اَفْضَلِ مَا جَزَيْتَ نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

যেই বক্তি সাত জুমা পর্যন্ত প্রত্যেক জুমার দিন সাতবার করিয়া এই দরূদ শরীফ পড়িবে তাহার জন্য সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়।

এবনুল মোশতাহের নামক জনৈক বুজুর্গ বলেন, যে ব্যক্তি ইহা চায় যে সে আল্লাহ পাকের এমন এক প্রশংসা করিবে যাহা জমীন এবং আছমানের জিন এনছান এবং ফেরেশতা কেহই আজ পর্যন্ত করে নাই। এবং যদি এমন দরূদ পড়িতে চায় যে উহা ইতি পূর্বে পঠিত যাবতীয় দরূদ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং যদি এমন প্রার্থনা করিতে চায় যে আজ পর্যন্ত যত প্রার্থনা হইয়াছে সকলের চেয়ে তাহার প্রার্থনা উত্তম হয় সে যেন ইহা পড়ে—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهٗ وَافْعَلْ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔

আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা-আনতা আহলুহু ফাছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন কামা আনতা আহলুহু অফআল বিনা মা আনতা আহলুহু, ফাইন্নাকা আনতা আহলুত্তাকওয়া অ আহলুল মাগফিরাতে।

অর্থ : হে খোদা! তোমার শান অনুসারে তোমার জন্য যাবতীয় প্রশংসা, তোমার শান অনুসারে তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর দরূদ

পাঠাও। এবং আমাদের সহিত তোমার শান অনুসারে তুমি ব্যবহার কর। নিশ্চয় তুমি ইহার যোগ্যতা রাখ যে তোমাকেই একমাত্র ভয় করা যায় ক্ষমা করিবার উপযুক্ত।

আবুল ফজল কাওমানী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে আসিয়া আমার নিকট বয়ান করিল আমি মদীনা শরীফে থাকা কালীন স্বপ্নযোগে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হুজুর আমাকে এরশাদ করেন, যখন তুমি হামাদান যাইবা তখন আবুল ফজল এবনে জীরককে আমার পক্ষ হইতে ছালাম বলিবা, আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! এইরূপ কেন? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, সে আমার উপর দৈনিক একশত বার বা তার চেয়েও বেশী এই দরূদ পড়ে—

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়ে অ আলা আলে মোহাম্মাদিন জাজাল্লাহু মোহাম্মাদান ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লামা আন্না মা হুয়া আহলুহু।

আবুল ফজল বলেন, লোকটি কছম করিয়া বলিল যে, আমাকে অথবা আমার নাম হুজুর (ছঃ) এর বলার আগে সে জানিত না।

আবুল ফজল আরও বলেন আমি লোকটিকে কিছু দান করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু সে অস্বীকার করিয়া বলিল আমি হুজুরের পয়গামকে বিক্রী করিব না। অতঃপর লোকটিকে আমি আর কখনও দেখি নাই।

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৭) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رض انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلوة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا ينبغى الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو فمن سال لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة -

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যখন তোমরা আজানের আওয়াজ শুনিতে পাও, তখন মোয়াজ্জেন যাহা বলে তোমরাও তাহা বলিতে থাক। অতঃপর তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশবার দরূদ পাঠাইবেন। তারপর আল্লার দরবারে আমার জন্য মোকামে অছিলার দোয়া কর। উহা বেহেশতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানের নাম, আল্লাহ পাকের একজন মাত্র বান্দা উহার অধিকারী হইবে। আমি আশা করি সেই বান্দা একমাত্র আমিই হইব। যেই ব্যক্তি আমার জন্য অছিলার দোয়া করিবে তাহার জন্যে আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া যায়। বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি আজান শুনিয়া এই দোয়া পড়িবে—

আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে আ-তে মোহাম্মাদানিল অছীলাতা অল ফাজিলাতা অব আছহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাজি ওয়াত্তাহু।"

তাহার জন্য আমার সুপারিশ জরুরী হইয়া পড়ে। হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, আজানের আওয়াজ শুনিলে হুজুর স্বয়ং এই দোয়া পড়িতেন।

'আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-জিহিদ্দাওয়াতিত্তাম্মাতে অছ-ছালাতিল কায়েমাতে ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন অ আতেহী ছল্লাহু ইয়াওমাল কেয়ামাতে।

হুজুর এই দোয়া এত জোরে পড়িতেন যে নিকটবর্তী লোকেরাও শুনিতে পাইতেন। হুজুর আরও এরশাদ করেন, তোমরা যখন আমার উপর দরূদ পড়িবে তখন আমার জন্য 'অছীলার' প্রার্থনাও করিবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর অছীলা কি জিনিস? হুজুর উত্তর করিলেন উহা বেহেশতের মধ্যে একটা স্থান। যাহা একজন মাত্র লোকের ভাগ্যেই জুটিবে। আমি আশা করি সেই ব্যক্তি একমাত্র আমিই হইব। অছীলার আভিধানিক অর্থ হইল যদ্দারা কোন রাজা বাদশার দরবারে নৈকট্য হাছেল করা যায়। কিন্তু এখানে সুউচ্চ মরতবাকে বলা হয়। কোরান শরীফে বর্ণিত আছে—

وَ ابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ

মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথম অর্থ হইল যাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। হযরত এবনে আব্বাছ, মুজাহেদ, আতা (রাঃ) উহাকে সমর্থন করেন। অন্য অর্থ হইল হযরত কাতাদার মতে যেই জিনিস আল্লাহকে রাজী করিতে পারে উহা দ্বারা আল্লার নৈকট্য হাছিল কর। আল্লামা ওয়াহেদী বগবী, এবং জমখশরীর মতে অছীলা ঐ সব বস্তু অথবা আমলকে বলা হয় যদ্দারা আল্লার নৈকট্য লাভ হয়। এই অর্থে হুজুর (ছঃ) এর মারফত অছীলা হাছেল করাও শামেল। আল্লামা জাজারী হেছনে হাছীন গ্রন্থে লিখিয়াছেন –

وَأَنْ يَتَوَسَّلَ إِلَى اللهِ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِهِ

অর্থাৎ অছীলা হাছেল করিবে আল্লার নিকট তাহার নবীগণের দ্বারা নেক বান্দাদের দ্বারা। হাদীছে পাকের মধ্যে ফজীলত শব্দের দ্বারা ঐ উচ্চ মর্যাদাকে বুঝায় যাহা সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সুউচ্চ আসন। অথবা অন্য কোন মর্যাদাও হইতে পারে বা উহার অর্থ হইল মাকামে মাহমুদ। যেমন কোরানে পাকে বর্ণিত আছে—

عَسٰى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

আশা করা যায় যে, আপনাকে আপনার প্রভু মাকামে মাহমূদে পৌছাইবেন।"

ওলামাগণ মাকামে মাহমূদের কয়েক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল 'লেওয়ায়ে হামদ' অর্থাৎ প্রশংসার ঝাণ্ডা। কেহ বলেন, উহা হইল আল্লাহ পাক কর্তৃক তাঁহাকে রোজ কেয়ামতে আরশের উপর বসান অথবা কুরছীর উপর বসান। আবার কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল শাফায়াত। কেননা সমস্ত মাখলুক সেখানে হুজুরের প্রশংসা করিবে।

আল্লামা ছাখাবী ও তাঁহার ওস্তাদ হাফেজ এব্নে হাজার বলেন এই কয়েকটি রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কেননা সম্ভাবনা আছে আরশে এবং কুরছীতে বসাইয়া শাফায়াতের অনুমতি দিবেন ও তারপর হামদের পতাকা হুজুরের হাতে দিবেন। অতঃপর হুজুর উম্মতের জন্য সাক্ষী দান করিবেন। এব্নে হাব্বান রেওয়ায়েত করেন হুজুর এরশাদ করেন

আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে উঠাইয়া আমাকে সবুজ রং এর একটা জোড়া পরাইবেন তারপর আল্লার ইচ্ছামত আমি যাহা বলিবার তাহাই বলিব। ইহারই নাম 'মাকামে মাহমূদ।' 'যাহা বলিবার তাহাই বলিব' এবনে হাজার ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, শাফায়াতের পূর্বে হুজুর আল্লাহ পাকের যে প্রশংসা করিবেন উহাই। এই সমস্ত জিনিসের সমষ্টি গত নাম হইল মাকামে মাহমূদ।

বোখারী এবং মোছলেম শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন আমি যখন আল্লাহ পাকের জিয়ারত করিব তখন ছেজদায় পড়িয়া যাইব, তারপর আল্লাহ পাকের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ আমি ছেজদায় পড়িয়া থাকিব। অতঃপর পরওয়ারদেগার বলিবেন, হে মোহাম্মদ! (ছঃ) মাথা উঠাও এবং তুমি বল কি বলিতে চাও। তুমি সুপারিশ কর তোমার সুপারিশ কবুল করা যাইবে। প্রার্থনা কর তোমার প্রার্থনা কবুল করা হইবে। হুজুর বলেন এই হুকুম পাইয়া আমি মাথা উঠাইব এবং আল্লাহ তায়ালার ঐসব প্রশংসা করিব যাহা তখন আমার অন্তরে ঢালা হইবে। তারপর আমি উম্মতের জন্য সুপারিশ করিব।

(٦) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ أَوْ أَبِيْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فِي
الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ
أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى
النَّبِيِّ ص ثُمَّ لِيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ (ابوداود نسائي)

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

অর্থঃ হুজুর এরশাদ করেন যখন কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে তারপর এই দোয়া পড়িবে "আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়া-বা রাহমাতেকা। হে খোদা তুমি আমার উপর রহমতের দরওয়াজা খুলিয়া দাও। আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইবে তখনও নবীয়ে করীমের উপর দরূদ পাঠ করিবে ও

এই দোয়া পড়িবে 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাজলেকা'' হে খোদা তুমি আমার উপর তোমার পছন্দসই রিজিকের দরওয়াজা খুলিয়া দাও।

ফায়েদা : মসজিদে প্রবেশের সময় রহমতের দোয়া এই জন্য করা হয় যে, মসজিদে একমাত্র আল্লার এবাদতের জন্যই যাওয়া হয়। কাজেই সে বেশী বেশী রহমতের ভিখারী থাকে। কারণ আল্লাহ পাকের রহমতেই মানুষ এবাদত করিতে পারে এবং উহা কবুল হইতে পারে। মাজাহেরে হকে লেখা হইয়াছে, রহমতের দরওয়াজা খোল এই ঘরের বরকতে, অথবা ইহাতে নামাজ পড়ার তওফীক দান করিয়া, অথবা নামাজের হাকীকত প্রকাশ করিয়া আর ফজল শব্দের অর্থ হইল হালাল রিজিক, কেননা মসজিদ হইতে বাহির হইয়া মানুষ রিজিকই তালাশ করিয়া থাকে। এখানে কোরানে পাকের এই আয়াতের দিকে ইশারা রহিয়াছে

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ ـ

অর্থাৎ 'নামাজ শেষ হইয়া গেলে তোমরা জমীনে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ পাকের মনোনীত হালাল রুজী অন্বেষণ কর '

হজরত আলী হইতেও মসজিদে প্রবেশ করিয়া দরূদ পড়ার রেওয়ায়েত আসিয়াছে। হুজুরের কন্যা হজরত ফাতেমা বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন প্রথমে নিজের উপর দরূদ ও ছালাম পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন—

আল্লাহুম্মাগফির লী যুনূবী অফ্‌তাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

আবার যখন মসজিদ হইতে বাহির হইতেন তখন নিজের উপর দরূদ পাঠ করিয়া এই দোয়া পড়িতেন

আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনূবী অফ্‌তাহলী আবওয়াবা ফাজলেকা।

হজরত আনাছ বলেন, হুজুর যখন মসজিদে প্রবেশ করিতেন তখন পড়িতেন—বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন [illegible] হুজুরে পাক (দঃ) আপন নাতী হজরত হাছানকে এই দোয়া শিখাইয়াছেন যখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করিবেন তখন প্রথমে হুজুরের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তারপর পড়িবেন—

"আল্লাহুম্মাগফির লানা যুনূবা-না অফ্‌ তাহ্‌লানা আবওয়াবা

রাহমাতেকা।" আর বাহির হইবার সময় 'আবওয়াবা রাহমাতেকার পরিবর্তে আবওয়াবা ফাজলেকা পড়িবে।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত, হুজুর বলেন, তোমরা মসজিদে প্রবেশ করিতে দরূদ পড়িয়া আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহমাতেকা পড়িবে, আর বাহির হইবার সময় দরূদ পড়িবে 'আল্লাহুম্মা আ'ছেমনী মিনাশ শাই তানির রাজীম" পড়িবে। হযরত কা'ব হজরত আবু হোরায়রাকে বলেন, আমি তোমাকে দুইটা কথা শিখাইতেছি উহাকে কখনও ভুলিবেনা। প্রথমতঃ মসজিদে প্রবেশ করিতে হুজুরের উপর দরূদ পড়িয়া 'আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহমাতেকা' পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ বাহির হইবার সময় 'আল্লাহুম্মাগফিরলী অহ্‌ফেজনী মিনাশ শাইতা নির রাজীম' পড়িবে।

আবু দাউদ শরীফে মসজিদে প্রবেশ করিতে এই দোয়াও আসিয়াছে, "আউজু বিল্লাহিল আজীম অ বে- অজহি হিল কারীম অ ছোলতা-নিহিল কাদীম মিনাশ শাইতানির রাজীম, পড়িবে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর বলেন, এই দোয়া পড়িলে শয়তান এই কথা বলে যে, এই ব্যক্তি সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া গেল।

হেছনে হাছীনে বর্ণিত আছে- মসজিদে প্রবেশ করিতে বিছমিল্লাহে অছছালামু আলা রাছুলিল্লাহে পড়িবে। অন্যত্র আছে অ আলা ছুন্নাতে রাছুলিল্লাহ পড়িবে। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন ও অ-আলা আ লে মোহাম্মাদিন, প্রবেশ করিবার সময় এবং মসজিদে প্রবেশ করিবার পর "আচ্ছালামু আলাইনা অ আলা এবাদিল্লা হিচ্ছালেহীন পড়িবে। আর বাহির হইতে পড়িবে "বিছমিল্লাহে অচ্ছা- লামু আলা রাছুলিল্লাহে। অন্য হাদিছে আসিয়াছে—

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اعصمني من

الشيطان الرجيم পড়িবে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্‌কে কুল্লেহিম।

স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত

এমন মুছলমান কে আছে যে স্বপ্নে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারতের

আকাংখা না করে। এশ্ক ও মহব্বতের মাত্রা হিসাবে সেই আকাংখাও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন আপন আপন অভিজ্ঞতা অনুসারে অনেক প্রকার আমল এবং দরূদ শরীফ বাতলাইয়া গিয়াছেন যদ্দারা হুজুরের জিয়ারত নছীব হয়।

আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদী'র মধ্যে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন—

مَنْ صَلَّى عَلَى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهٖ فِى الْقُبُوْرِ۔

যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর রুহ মুবারকের উপর এবং তাঁহার দেহ মুবারকের উপর এবং তাঁহার কবর শরীফের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিবে সে ব্যক্তি স্বপ্ন যোগে আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে। আর যে স্বপ্নে আমাকে দেখিবে সে কেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে। আর যে কেয়ামতের দিন আমাকে দেখিতে পাইবে তাহার জন্য আমি সুপারিশ করিব। আর যার জন্য আমি সুপারিশ করিব সে আমার হাওজ হইতে পানি পান করিবে এবং আল্লাহ পাক তাহার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করিয়া দিবেন।

অন্য জায়গায় লিখিত আছে। যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে হুজুরের জেয়ারত লাভ করিতে ইচ্ছা করে সে যেন এই দরূদ শরীফ পাঠ করে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّىَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى۔

যেই ব্যক্তি এই দরূদ শরীফ বেজোড় সংখ্যায় পড়িবে সে স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভে ধন্য হইবে। তারপর এই দোয়াও পড়িতে হইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى

القبور ـ

হজরত থান্‌বী (রঃ) জাদুচ্ছায়ীদ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন দরূদ শরীফের মধুরতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, উহার বরকতে প্রেমিকগণ স্বপ্ন-যোগে প্রিয়নবীর জেয়ারত লাভ করিয়া থাকে। বুজুর্গানে দ্বীন কোন কোন দরূদ শরীফকে পরীক্ষাও করিয়াছেন।

হজরত শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী লিখিয়াছেন, জুমার রাত্রে প্রথমে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে এগার বার আয়াতুল কুরছী এবং এগার বার কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে ও ছালামের পর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইনশা'আল্লা তিন জুমা অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হইবে এই দরূদ পাঠ করিবে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ ـ

আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদে নিন্নাবীয়্যিল উম্মিয়্যে অ আ লিহী অ-আছহাবিহী অ-ছাল্লেম।

হজরত শায়েখ অন্য তদবীর এইরূপ লিখিয়াছেন, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদুর পর ২৫ বার কুলহুয়াল্লাহ শরীপ পড়িবে ও ছালাম ফিরাইবার পর 'ছাল্লাল্লাহু আলান্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যে এই দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িবে। ইনশাআল্লা খাবে হুজুরের জিয়ারত নছীব হইবে।

তৃতীয় তদবীর এই যে, শুইবার সময় নিম্ন লিখিত দরূদ শরীফ সত্তর বার পড়িয়া শুইলে জিয়ারত নছীব হইবে। দরূদ শরীফ এই—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَحْرِ اَنْوَارِكَ وَمَعْدَنِ اَسْرَارِكَ وَلِسَانِ حُجَّتِكَ وَعَرُوْسِ مَمْلَكَتِكَ وَاِمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيْقِ شَرِيْعَتِكَ الْمُتَلَذِّذِ بِتَوْحِيْدِكَ اِنْسَانِ عَيْنِ الْوُجُوْدِ وَالسَّبَبِ فِىْ كُلِّ مَوْجُوْدٍ

مِنْ أَشْهَا بِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُوْرِ ضِيَائِكَ صَلْوَاةً تَدُوْمُ

بِدَوَامِكَ وَتَبْقَى بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُوْنَ عِلْمِكَ صَلوٰةً

تُرْضِيْكَ وَتُرْضِيْهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ـ

অন্য তদবীর শায়েখ ইহাও লিখিয়াছেন, শুইবার সময় ইহাকে বারবার পড়িলে জিয়ারত নছীব হইবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ

الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِنَّا

السَّلَامَ ـ

কিন্তু মনে রাখিবেন, এত বড় দৌলত নছীব হওয়ার জন্য শর্ত হইল দিলের পরিপূর্ণ আবেগ ও আগ্রহ এবং জাহেরী বাতেনী পাপ সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকা।

হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখার জন্য হজরত খিজিরের বাতলান তদবীর

হজরত শাহ অলি উল্লাহ (রঃ) নাওয়াদের গ্রন্থে হজরত খিজির (আঃ) এর বাতলান কোন কোন অলি আবদাল হইতে কিছু সংখ্যক আমল বর্ণনা করিয়াছেন (তবে মনে রাখিবে খিজিরের বাতলান তরীকা কোন ফেকাহ শাস্ত্রের মাছআলা নয় বরং উহা স্বপ্ন যোগের সুসংবাদ মাত্র। কাজেই উহা দলীল হওয়ার উপর কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই)।

তন্মধ্যে একটি এই যে, জনৈক আবদাল হজরত খিজির (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, হুজুর রাত্রি বেলায় পালন করিবার জন্য আমাকে একটা আমল বাতলাইয়া দিন। তিনি বলিলেন মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত নফল নামাজে মশগুল থাকিবে। কাহারও সহিত কথা বলিবেনা। নফলের দুই দুই রাকাত পড়িয়া ছালাম ফিরাইবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ পড়িয়া তিনবার কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে। এশার পর কোন

কথাবার্তা না বলিয়া ঘরে গিয়া দুই রাকাত নফল আদায় করিবে। প্রত্যেক রাকাতে একবার আলহামদু শরীফ ও সাতবার কুলহুয়াল্লাহ শরীফ পড়িবে। তারপর একটি সেজদা করিবে যাহার মধ্যে সাতবার আস্তাগফেরুল্লাহ ও সাতবার দরূদ শরীফ এবং সাতবার এই তাছবীহ পড়িবে। ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, লা হাওলা অলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।" অতঃপর ছেজদাহ হইতে মাথা উঠাইয়া দোয়ার জন্য হাত উঠাইবে এবং দোয়া পড়িবে।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اِلٰهَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ ـ

অতঃপর ঐ অবস্থায় হাত উঠাইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে এবং দাঁড়ান অবস্থায় এই দোয়া আবার পড়িবে তারপর ডান দিকে কাৎ হইয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া পড়িবে। এবং ঘুম আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে যেই ব্যক্তি একীন এবং নেক নিয়তের সহিত এই আমল করিতে থাকিবে সে মৃত্যুর পূর্বে পূর্বে নিশ্চয় হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিবে। কোন কোন লোক এই তদবীরকে পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহারা বেহেশতের মধ্যে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও হুজুরে পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত কথা বলিবার সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন। এই আমলের আরও অনেক ফজীলত বর্ণিত আছে।

আল্লামা দামীরী হায়াতুল হায়ওয়ান গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুমার নামাজের পর অজু অবস্থায় মোহাম্মদ রাছুলুল্লাহ। আহমদ রাছুলুল্লাহ পঁয়ত্রিশবার লিখিবে এবং সে কাগজটা নিজের সাথে রাখিবে আল্লাহ পাক তাহাকে এবাদতের শক্তি এবং বরকত দান করিবেন। শয়তানের ধোঁকা হইতে তাহাকে হেফাজত করিবেন। আর যদি সেই কাগজের টুকরাকে প্রতিদিন সূর্য উঠার সময় দরূদ পড়িতে পড়িতে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে থাকে তবে সে বেশী বেশী করিয়া স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ করিবে।

স্বপ্নে প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ করা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট সৌভাগ্যের

ব্যাপার। তবে এবিষয়ে দুইটি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ যাহা থানবী (রঃ) নশরুত্তীব গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ এবিষয় সকলেরই জানা উচিত যে, জাগরণ অবস্থায় যাহারা নবীজীর পবিত্র দর্শন লাভের সুযোগ পায় নাই তাহাদের জন্য স্বপ্নে তাঁহার জিয়ারত লাভ একটা সান্ত্বনার বস্তু এবং প্রকৃত পক্ষে একটি বিরাট নেয়ামত। এবং এই সৌভাগ্য হাছেলের পিছনে চেষ্টা তদবীরের কোন হাত নাই। ইহা শুধুমাত্র আল্লার দানেই সম্ভব হয়। কবি বলিয়াছেন।

'এই সৌভাগ্য যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ পাক দান না করেন কাহারও বাহুবলের দ্বারা সম্ভব হয় না।

লক্ষ লক্ষ জীবন এই আক্ষেপেই শেষ হইয়া গিয়াছে। তবু হুজুরের জিয়ারত লাভ সম্ভব হয় নাই। হাঁ অধিক মাত্রায় দরূদ শরীফ পড়া এবং ছুন্নতের পরিপূর্ণ তাবেদারী ও মহব্বতের আবেগেই উহা সম্ভব হইয়া থাকে। তবে এইসব গুণে গুনান্বিত হইলেই জিয়ারত নছীব হইবে ইহা কোন জরুরী নয়। কারণ কাহারও না দেখার ভিতরও বিরাট হেকমতে রহিয়াছে। কাজেই দুঃখ করার কোন কারণ নাই। প্রকৃত প্রেমিকের আসল উদ্দেশ্য হইল মাশুকের সন্তুষ্টি, মিলন হউক বা না হউক তাহাতে কোন আফছোছ নাই। কবি বলেন—

أُرِيْدُ وِصَالَهُ وَيُرِيْدُ هَجْرِي

فَأَتْرُكُ مَا أُرِيْدُ لِمَا يُرِيْدُ

আমি মাহবুবের মিলন চাই আর মাহবুব চায় আমার বিচ্ছেদ। কাজেই মাহবুবের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে আমার ইচ্ছা ত্যাগ করিলাম।

আরেকে শীরাজী বলেন —

অর্থাৎ : মিলন বা বিচ্ছেদের দিকে না তাকাইয়া শুধু মাহবুবের সন্তুষ্টিই তলব কর। কেননা মাহবুবের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাঁহার নিকট অন্য কিছু চাওয়া জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ যোগ্য এই যে, তাবেদারীর সহিত সন্তুষ্টি বিধান না করিয়া জিয়ারত হাছেল হইলেও তাহাতে কোন লাভ

নাই। যেমন হুজুরের জমানায় কত লোক বাহ্যিক নজরে তাঁহাকে দেখিয়াও বাতেন হিসাবে তাহারা মাহরুম থাকিয়া যায়। আবার অনেক লোক বাহ্যত মোলাকাত না করিয়াও প্রকৃত পক্ষে প্রিয়নবীর প্রিয় ভাজন হয়, যেমন হজরত ওয়ায়েছ করনী (রঃ)। এমন কি ছাহাবাদিগকে হুজুর এরশাদ করেন ·তোমাদের মধ্যে কেহ ওয়ায়েছের সাক্ষাৎ লাভ করিলে সে যেন তাহার নিকট দোয়ার জন্য প্রার্থনা করে। হজরত ওমর হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক একবার তাহার নিকট হজরত ওয়ায়েছের জিকির করিয়া বলেন, ওয়ায়েছ যদি কোন বিষয় কছম খাইয়া বসে তবে আল্লাহ পাক উহা নিশ্চয় পুরা করিবেন। কাজেই তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া চাহিও।

گو تھا اویس دور مگر ہو گیا قریب
بوجہل تھا قریب مگر دور ہو گیا

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি নবীয়ে করীমকে স্বপ্নে দেখিল সে নিশ্চয় হুজুরের জিয়ারত লাভ করিল। কারণ ছহী হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহ পাক শয়তানকে এই শক্তি দান করেন নাই যে স্বপ্নের মধ্যে সে যে কোন ভাবে হুজুরের ছুরত ধরিয়া আত্ম প্রকাশ করে। যেমন শয়তান এই কথা বলিতে পারিবে না যে আমি নবী। অথবা যে, স্বপ্নে দেখে সেও শয়তানের বিষয় এই কথা বুঝিতে পারিবেনা যে এই লোকটা নবী। কারণ ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি কেহ নবীয়ে করীম (ছঃ) কে তাঁহার আসল ছুরতে না দেখিয়া অন্য কোন শানে বা ছুরতে দেখিতে পায় তবে উহা দর্শকেরই ত্রুটি মনে করিতে হইবে। যেমন কোন এক ব্যক্তি চোখে লাল অথবা সবুজ চশমা পরিল তাহার সামনে যে কোন বস্তুকে লাল অথবা সবুজই দেখা যাইবে এমনিভাবে চক্ষু রোগের দরুণ এক বস্তুকে দুইটি দেখিলে তাহা বস্তুর নয় দর্শকের দোষ। এইভাবে হুজুরের নিকট শরীয়তের বরখেলাফ কোন কিছু শুনিতে পাইলে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে না বরং মনে করিতে হইবে উহা নবীজীর তরফ হইতে ধমক স্বরূপ। যেমন সাধারণতঃ কোন ব্যাপারে পুত্র পিতার কথা অমান্য করিলে পিতা রাগ করিয়া বলিতে থাকে কর তুই এই কাজ কর অর্থাৎ ইহার মজা দেখিবি। প্রকৃত পক্ষে এখানে করার জন্য কোন আদেশ নয় বরং ইহা ক্রোদের সুরে নিষেধের শব্দ।

বস্তুতঃ স্বপ্নের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা একটি সূক্ষ্ম বিদ্যা। তাতীর আনাম

ফীতাবীর মানাম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্নে একজন ফেরেশতাকে বলিতে দেখে যে তোমার স্ত্রী তোমাকে অমুক দোস্তের সাহায্যে তোমাকে বিষ পান করাইতে চায়। জনৈক বিজ্ঞ লোক উহার এই তা'বীর করিল যে লোকটি তোমার স্ত্রীর সহিত জিনায় লিপ্ত আছে। তা'বিরটি সঠিকই ছিল। মাজাহেরে হক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে হুজুরকে দেখিল সে যে কোন ছুরতেই দেখুকনা কেন যথার্থই হুজুরকে দেখিল। ভাল ছুরতে দেখিলে দ্বীনের ব্যাপারে নিজের মজবুতি মনে করিবে আর তার বিপরীত দেখিলে দ্বিনের ব্যাপারে দর্শকের দুর্বলতাই মনে করিতে হইবে।

এতএব প্রিয়নবীর জিয়ারত লাভ দর্শকের অবস্থা জানার জন্য একটি কষ্টি পাথর স্বরূপ। উহার দ্বারা আত্মশুদ্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় শ্রবণ শক্তির ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন নৈগনিক দরবেশ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল হুজুর নাকি তাহাকে বলিতেছেন তুমি শরাব পান কর। স্বপ্ন বিশারদগণ ইহার বিভিন্ন ব্যখ্যা করিল। কিন্তু মদীনা শরীফের জনৈক অভিজ্ঞ আলেম বলিলেন প্রকৃত পক্ষে হুজুর বলিলেন শরাব পান করিও না, লোকটি শুনিতে ভুল করিয়াছে। কিন্তু আমার মতে শরাব পান কর এই কথা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ উহাতে ধমক বুঝায়। উহা বর্ণনা ভঙ্গির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে দরূদ এবং ছালামের একটা চল্লিশ হাদীছ (ছেহেল হাদীছ) লিখিয়াছেন। এই পুস্তিকায় তরজমাসহ উহা লেখা যাইতেছে। এই চল্লিশ হাদীছের মধ্যে পঁচিশটা দরূদ সম্পর্কে ও পনেরটা ছালাম সম্পর্কে। হাদীছে বর্ণিত আছে, যে আমার উম্মতের নিকট চল্লিশটি হাদীছ পৌঁছাইয়া দিবে আল্লাহ পাক তাহাকে আলেমদের দলভুত করিয়া হাশর করিবেন ও আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। তাই হাদীছগুলি প্রচারে দরূদ এবং তাবলীগ এই দ্বিগুণ ছওয়াবের আশা করা যায়। বরকতের জন্য প্রথমে ছালাম শব্দ সম্বলিত দুইটি আয়াতও পেশ করা যাইতেছে।

কোরানের আয়াত :

(১) سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দাদের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

(২) سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ

প্রেরীত পুরুষগণের উপর ছালাম বর্ষিত হউক।

চল্লিশ হাদীছ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ -

হে আল্লাহ্! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর দরূদ প্রেরণ কর এবং তোমার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছাইয়া দাও।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنِّيْ رِضًا لَّا تَسْخَطُ بَعْدَهٗ اَبَدًا -

হে খোদা! কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী দাওয়াত এবং উপকারী রহমতের মালিকের তরফ হইতে প্রিয় নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর এবং আমার উপর এমনি ভাবে রাজী হও যেন তারপর আর কখনও নারাজ না হও।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ -

হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা এবং রাছুল মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর এবং মোমেন মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উপর।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ
حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর রহমত প্রেরণ কর। এবং বরকত প্রেরণ কর মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর যেমন তুমি ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি রহমত এবং বরকত প্রেরণ করিয়াছ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى
اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হে খোদা! মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ কর যেমন তুমি দরূদ প্রেরণ করিয়াছ ইব্রাহীম (আঃ) এর আওলাদের উপর। নিশ্চয় তুমি বুজুর্গ প্রশংসিত। হে খোদা! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ) ও তাঁহার আওলাদের উপর বরকত দান কর যেমন বরকত দান করিয়াছ ইব্রাহীম ও তাঁহার আওলাদের প্রতি নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত বুজুর্গ।

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على
ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال
محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ۔

اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت
على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على
ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على
محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد
مجيد ۔

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على
ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت

على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ـ

اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ

اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ـ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على محمد وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم ترحم على محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ـ

(١٧) اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وال محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد .

উল্লেখিত দরূদ সমূহকে নামাজ ওয়ালা দরূদ বলা হয়। এইগুলির অর্থ প্রায় সবগুলিরই একই প্রকার।

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم .

اللهم صل على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد ن النبى الامى كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبى الامى وعلى ال محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذى وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين .

اللهم صل على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد ن النبى الامى وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد

اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى اهل بيته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد .

اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد ن النبى الامى .

اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد

كما جعلتها على آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل
ابراهيم انك حميد مجيد ۔

وصلى الله على النبى الامى

ছালাম শব্দ সম্বলিত হাদীছ

التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها
النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ۔ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا
عبده ورسوله ۔

অর্থ : মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক যাবতীয় এবাদত একমাত্র আল্লার জন্য। হে নবী ! আপনার উপর ছালাম আল্লাহর রহমত এবং বরকত অবতীর্ণ হউক। ছালাম আমাদের উপর আল্লার নেক বান্দাদের উপর। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লার বান্দা এবং তাঁহার রাছুল।

التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبى
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها
النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد
ان محمدا عبده ورسوله ۔

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك
ايها النبى ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله ۔

بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام
عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا

عبده ورسوله اسأل الله الجنة واعوذ بالله من النار ـ

التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ـ

بسم الله وبالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعة اتية لا ريب فيها السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفرلي واهدني ـ

التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته ـ

بسم الله التحيات لله الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان محمدا رسول الله ـ

التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ـ

التحيات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ـ

التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ـ

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد

اللهم انت ربى اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله -

بسم الله و السلام على رسول الله

আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে খাছ খাছ সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ দরূদ শরীফের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অজু ও তায়াম্মুম শেষ করার পর, ফরজ গোছল আদায় করার পর, হায়েজ হইতে পাক হওয়ার পর, নামাজের ভিতরে, নামাজের, পরে নামাজ কায়েম হইবার সময়, ফজর এবং মাগরিবের পর, আত্তাহিয়্যাতুর পর, দোয়া কুনুতের মধ্যে তাহাজ্জুদের মধ্যে এবং পরে। মসজিদ দেখিলে এবং উহাতে প্রবেশ করিলে ও বাহির হইবার সময়, আজানের উত্তরের পর, জুমার রাত্রে এবং দিনে শনিবার সোমবার এবং মঙ্গলবারের, জুমা এবং উভয় ঈদের খোতবার মধ্যে, এস্তেস্কা নামাজে। কুছুফ এবং খুছুফ নামাজের খোতবার মধ্যে ঈদ এবং জানাজার তাকবীরাতের মাঝখানে, মুর্দাকে কবরে রাখিবার সময় শাবান মাসে, বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় হজ্বের মধ্যে ছাফা মারওয়ায় উঠিবার সময়, লাব্বায়েক বলার পর, হাজরে আছওয়াদ চুম্বনের সময়, মোলতাজেমকে জড়াইয়া ধরিয়া, আরফাতের সন্ধ্যায়, মিনার মসজিদে, মদীনায়ে পাকে দৃষ্টি পড়িলে, হুজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, এবং তথা হইতে রোখছতের সময়, হুজুরের নিশান সমুহের উপর এবং তাঁহার চলার পথে, যেমন বদর ইত্যাদিতে চলিবার সময়, জানোয়ার জবেহ করার সময়, তেজারতের সময়, অছিয়ত নামা লিখিবার সময়, বিয়ের খোতবায়, দিনের শুরুতে এবং শেষ ভাগে, শয়নের সময়, ছফরের সময়, ছওয়ারীতে উঠার সময়, নিদ্রা কম হইলে, বাজারে যাওয়ার কালে, দাওয়াতে যাইবার সময়, ঘরে প্রবেশ করিতে। কিতাব লিখিবার শুরুতে, বিছমিল্লার পর, পেরেশানীর সময়, বিপদের সময়, অভাবের সময়, ডুবিয়া যাওয়ার সময়, প্লেগের জমানায়, দোয়ার শুরুতে এবং শেষে ও মধ্যভাগে কানে এবং পায়ে অসুখ হইলে, হাঁছি আসিলে। কোন জিনিস রাখিয়া ভুলিয়া গেলে, কোন জিনিস ভাল লাগিলে, মুলা খাওয়ার জন্য, গাধায় আওয়াজ দেওয়ার সময়, গোনাহ হইতে তওবা করার সময়, কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে। এবং প্রত্যেক সময়, যাহাকে কোন অপবাদ দেওয়া হয়, বন্ধুদের সহিত

সাক্ষাতের সময়, লোকজনের একত্রিত হওয়ার সময় এবং পৃথক হইবার সময়, কোরান শরীফ খতম করার সময়, কোরান শরীফ হেফজ করার দোয়ার মধ্যে, মজলিস শেষ হইলে পর, জিকিরের মজলিসে কথা বলার শুরুতে প্রিয়নবীর জিকির হইলে, এলেম এবং হাদীছ চর্চার সময়, ফতুয়া এবং ওয়াজের সময়; হুজুরের নাম মোবারক লিখিবার সময়।

আল্লামা ছাখাবী এই সব বিশেষ বিশেষ সময়ের উল্লেখ করিয়া উহার সমর্থনে হাদীছও পেশ করিয়াছেন। তবে একটা কথা এখানে লক্ষণীয় যে আল্লামা ছাখাবী শাফেয়ী মজহাবের অনুসারী কাজেই উল্লেখিত সময় সমূহের দরূদ পড়া তাঁহাদের মজহাব মোতা'বেক ছুন্নত। হানাফীদের মতে অনেক ক্ষেত্রে পড়া মাকরূহ। আল্লামা শাফেয়ী লিখিয়াছেন নামাজের শেষ বৈঠকে সর্বদা ছুন্নত ছাড়াও নফল সমূহের প্রথম বৈঠকে এবং জানাজা নামাজেও দরূদ পড়া ছুন্নত। আর যে কোন সময়ই দরূদ পড়া সম্ভব তাহা মোস্তাহাব। তবে শর্ত হইল তাহাতে যদি কোন ওজর না থাকে। কোন কোন ওলামা দরূদ পড়া মোস্তাহাব লিখিয়াছেন, জুমার দিন এবং রাতে শনিবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে, সকাল বিকাল এবং মসজিদে প্রবেশ এবং বাহির হইবার সময়, হুজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের সময়, ছাফা মারওয়ার মধ্যে, ঈদে ও জুমার খুতবার মধ্যে আজানের উত্তরের পর, তাকবীরের সময়, দোয়া করার শুরুতে, মধ্যভাগে এবং শেষ দিকে, দোয়া কুনুতের পর, লাব্বায়েকের পর, মিলন এবং বিচ্ছেদের সময়, অজু করার সময়, কানে আওয়াজ করার সময়, কোন জিনিস ভুলিয়া যাইবার সময়, ওয়াজ এবং জ্ঞান চর্চার সময়, হাদীছ পড়ার শুরু এবং শেষে। ফতুয়া চাওয়া এবং লেখার সময়, গ্রন্থাকারের জন্য, পড়ার সময়, পড়াইবার সময়, খতীবের জন্য বিয়ের প্রস্তাবের সময়, নিজের বিয়ের জন্য ও অপরের বিয়ের জন্য। বই পুস্তকের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে এবং হুজুর-পাকের পবিত্র নাম লওয়া শুনা এবং লেখার সময়। এবং সাতটি সময়ে দরূদ শরীফ পড়া মাকরূহ, স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময়, পেশাব পায়খানার সময়, বস্তু বিক্রীর প্রচারের সময়, ঠোকর খাওয়ার সময়, আশ্চর্য হইবার সময়, জানোয়ার জবেহ করিবার সময় হাঁছির সময়,। এইরূপ কোরান তেলাও-য়াতের মাঝখানে হুজুরের নাম আসিলে সেখানেও দরূদ পড়িবে না।

ইয়া রাবে্ব ছল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবীজীর উপর দরূদ শরীফ না পড়া সম্পর্কে সতর্ক বাণী

(১) عن كعب بن عجرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضروا المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال امين ثم ارتقى الثانية فقال امين ثم ارتقى الثالثة فقال امين فلما نزل قلنا يا رسول الله قد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه فقال ان جبريل عرض لى فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت امين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت امين فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابويه الكبر عنده او احدهما فلم يد خلاه الجنة قلت امين - (حاكم و بخارى)

অর্থ : হজরত কায়াব বিন উজরা (রাঃ) বলেন, একদিন প্রিয় নবী আমাদিগকে এরশাদ করিলেন, তোমরা মিম্বরের নিকটবর্তী হও। আমরা সকলেই মিম্বরের কাছে পৌছিলাম হুজুর যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখিলেন বলিয়া উঠিলেন আমীন। যখন দ্বিতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। আবার যখন তৃতীয় সিড়িতে পা রাখিলেন বলিলেন আমীন। খোতবা শেষ করিয়া হুজুর যখন নীচে অবতরণ করিলেন তখন আমরা আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমরা আজ আপনার জবানে এমন কিছু, শুনিলাম যাহা ইতিপুর্বে আমরা আর কখনও শুনি নাই। হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, আমার নিকট হজরত জিব্রাঈল তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে আরোহণ করি তখন জিব্রাইল বলিলেন—যে ব্যক্তি রমযান মাস পাইল অথচ তাহার গুণাহ মাফ হইল না যে ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন অর্থাৎ হে খোদা তুমি কবুল কর। অতঃপর আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন জিব্রাঈল বলিলেন যাহার নিকট আপনার মোবারক নাম জিকির করা হয় আর সে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিল না সে

ধ্বংস হইয়া যাক। উত্তরে আমি বলিলাম আমীন। তারপর আমি যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি জিব্রাঈল বলিলেন, যে ব্যক্তির সম্মুখে তাহার পিতা মাতা উভয় অথবা তন্মধ্যে একজন বার্ধ্যক্যে পৌছিল অথচ তাহারা তাহাকে বেহেশতে পৌছাইতে পারিল না সেও ধ্বংস হইয়া যাক। শুনিয়া আমি বলিলাম আমীন।

এই হাদীছে হজরত জিব্রাঈল তিনটা বদ দোয়া দিয়াছেন। হুজুরও তাহার উপর আমীন বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হজরত জিব্রাইলের মত শ্রেষ্ঠ এবং বুজুর্গ ফেরেশতার বদদোয়া তদুপরি উহার উপর হুজুরে পাকের আমীন বলা উহাকে কতই না গুরুতর বদদোয়ায় পরিণত করিয়াছে। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা আমাদিগকে ঐ তিন বস্তু হইতে বাঁচিবার তওফীক দান করুন! এবং ঐ গুরুতর অপরাধ হইতে হেফাজত করুন। নতুবা আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। দোররে মানছুর গ্রন্থে লিখিত আছে স্বয়ং জিব্রাঈল হুজুরকে আমীন বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাই হুজুর উহার উপর আমীন বলিয়াছেন। ইহাতে ঐ কয়টা জিনিসের গুরুত্ব আরও বাড়িয়া যায়। হজরত মালেক এব্‌নে হুয়াইরেছ হইতেও ঠিক এইরূপ একটি হাদীছ বর্ণিত আছে। হজরত যাবের আম্মার এবনে ইয়াছের, মাছউদ, এব্‌নে আব্বাছ, হুজরত আবু জর; হজরত বোরায়দা এবং আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হইতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। এমন কি আবদুল্লাহ এবনে হারেছের হাদীছে ধ্বংস দুইবার করিয়া আসিয়াছে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা আরও বর্ণনা করেন যে হুজুরের নাম শুনিয়া যে দরূদ পড়িল না তাহার জন্য ধ্বংস, সে বদবখত সে জান্নাতের রাস্তা ভুলিয়া জাহান্নামের পথ ধরিল। সে জালেম, সব চেয়ে বড় বখীল, আরও বলেন যে হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করেনা তাহার দ্বীন ঠিক নাই। সে প্রিয় নবীজীর মোবারক চেহারা দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিল।

ইয়া রাবেব ছলে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খাইরিল খালকে কুল্লেহিম।

(৮) عن علی رض عن النبی صلی الله علیه وسلم قال البخیل من ذکرت عنده فلم یصل علی (رواه النسائی والبخاری)

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার

সামনে আমার জিকির করা হইল ও সে আমার উপর দরূদ পড়িল না সে বখীল (কৃপণ)। (বেখারী নাছায়ী)

আল্লামা ছাখাবী এই হাদীছের মর্মানুসারে একটা বয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

من لم يصل عليه ان ذكر اسمه
فهو البخيل وزده وصف جبان

হুজুরের মোবারক যিকির করা হইলে যে ব্যক্তি তাঁহার উপর দরূদ না পড়ে সে বখীলত নিশ্চয়ই তদুপরি বড়গুণ হইল তাহার সে কাপুরুষ ও বটে।

হজরত ইমাম হাছান এবং হোছায়েন হইতেও বর্ণিত আছে, ঐ ব্যক্তি বখীল যার সামনে আমার জিকির করা হইলে সে দরূদ পড়েনা আবু হোরায়রা এবং আনাছ হইতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। অন্য হাদীছে আছে হুজুর বলেন আমি কি তোমাদিগকে ঐ ব্যক্তির সন্ধান দিব যে সমস্ত বখীল হইতে শ্রেষ্ঠতর বখীল এবং কাপুরূষ সে হইল ঐ ব্যক্তি যাহার সামনে আমার নাম লওয়া হইল অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়িল না।

আম্মাজান আয়েশা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন ঐ ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে রোজ কেয়ামতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। আম্মাজান জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর। আপনার জিয়ারত হইতে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চিত থাকিবে? হুজুর উত্তর করিলেন বখীল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন বখীল কাহাকে বলে? হুজুর এরশাদ করিলেন যে আমার নাম শ্রবণ করিয়া দরূদ পাঠ করিল না।

হজরত জাবের এবং হাছান বছরী হইতে বর্ণিত, মানুষের কৃপণতার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে তাহার সামনে আমার নাম লওয়া সত্ত্বেও সে আমার উপর দরূদ পড়িল না। হজরত আবু জর গেফারী বলেন, আমি একদা প্রিয়নবীর খেদমতে হাজির ছিলাম। হুজুর ছাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সবচেয়ে বড কৃপণ ব্যক্তি কে তাহা কি আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করিব? ছাহাবারা আরজ করিলেন নিশ্চয় করুণ। হুজুর বলেন যার সামনে আমার নাম উল্লেখ হইল অথচ সে আমার উপর দরূদ পাঠ করিল না সে-ই হইল সবচেয়ে বড় কৃপণ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩) عن قتادة مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجفاء ان اذكر عنده رجل فلا يصلي على صلى الله عليه وسلم -

হুজুরে পাক এরশাদ করেন যাহার সম্মুখে আমার জিকির করা হইল আর সে আমার উপর দরূদ পড়িল না ইহা বড় জুলুমের কথা।

বাস্তবিকই প্রিয় নবীর এতবড় এহছান এবং দান সত্ত্বেও যে তাঁহার উপর দরূদ পড়ে না সে যে জালেম ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। 'তাজকেরাতুল রশীদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত আল্লামা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রঃ) মুরদানকে সাধারণতঃ দরূদ শরীফ পড়ার ছবক বেশী করিয়া দিতেন এমন কি কম পক্ষে দৈনিক তিন শতবার দরূদ পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং বলিতেন একশতের কম ত হইতেই পারিবে না। তিনি বলিতেন হুজুরের বহুত বড় এহছান সত্ত্বেও তাঁহার উপর দরূদ না পড়া বড়ই অন্যায়ের কথা। তাঁহার নিকট নামাজের মধ্যে পঠিত দরূদ শরীফই বেশী পছন্দনীয় ছিল। তারপর ঐসব দরূদ যাহার মধ্যে ছালাত এবং ছালাম শব্দ রহিয়াছে। দরূদে তাজ লাখী ইত্যাদি তিনি না পছন্দ করিতেন।

ইয়া রাব্বে ছল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম

(৪) عن ابى هريرة رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم من الله ترة يوم القيامة فان شاء عذبهم وان شاء غفرلهم - (احمد ابوداؤد)

হুজুর এরশাদ করেন, কিছু সংখ্যক লোক যদি কোন মজলিসে বসে আর সেখানে আল্লার জিকির এবং প্রিয়নবীর উপর দরূদ পড়া না হয় সেই মজলিস কেয়ামতের দিন তাহাদের জন্য বিপদ স্বরূপ হইবে। তখন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা তাহাদিগকে শাস্তিও দিতে পারেন ক্ষমাও করিয়া দিতে পারেন।

হজরত আবু হোরায়রা এবং আবু ওমামা প্রমুখ ছাহাবী হইতেও এইভাবে বর্ণিত আছে যে কোথাও লোকজন একত্রিত হইয়া দরূদ শরীফ

না পড়িয়াই যদি মজলিস ভাঙ্গিয়া যায় তবে উহা কেয়ামতের দিন আফছোছের কারণ হইবে অথবা বিপদ স্বরূপ হইবে। আবু ছায়ীদ খুদ্রীর হাদীছে বর্ণিত আছে তাহারা বেহশ্‌তী হইলেও দরূদ না পড়ার দরূদ আক্ষেপ করিবে। হজরত জাবেরের হাদীছে আসিয়াছে জিকির করিয়া এবং দরূদ না পড়িয়া উঠিয়া গেলে তাহারা যেন মরা পচা জানোয়ারের নিকট হইতে উঠিয়া গেল।

ইয়া রাবের ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) عن فضالة بن عبيد رض قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد اذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت ايها المصلى اذا صليت فقعدت فاحمد الله بما اهله وصل على ثم ادعه قال ثم صلى رجل اخر بعد ذالك فحمد الله وصلى على النبى ص فقال النبى صلى الله عليه وسلم ايها المصلى ادع تجب (ترمذى - ابوداؤد)

হজরত ফোজালা বিন ওবায়েদ বলেন এক সময় হুজুর (ছঃ) বসা ছিলেন ইতঃমধ্যে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িল ও নামাজান্তে এই দোয়া করিল 'হে খোদা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর। শুনিয়া প্রিয়নবী বলিলেন, হে মুছল্লী বড় তাড়াতাড়ি করিয়া ফেলিয়াছ। তোমার জন্য উচিত ছিল নামাজ পড়িয়া কিছুক্ষণ বসিবে এবং আল্লাহ পাকের যথাযথ প্রশংসা করিবে এবং আমার উপর দরূদ পড়িয়া তারপর দোয়া করিবে। বর্ণনা কারী বলেন পুনরায় আর এক ব্যক্তি আসিয়া নামাজ পড়িয়া প্রথমে আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করিল তারপর নবীজীর উপর দরূদ পাঠ করিল। প্রিয়নবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে মোছল্লী! এখন তুমি দোয়া কর, কেননা তোমার দোয়া কবুল হইবে।

আল্লামা সাখাবী বলিতেন, দরূদ শরীফ দোয়ার প্রথম ভাগে মধ্য-ভাগে এবং শেষ দিকে হওয়া উচিত। ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত যে, দোয়ার শুরুতে আল্লার প্রশংসা এবং নবী ছাহেবের উপর দরূদ হওয়া চাই ঠিক দোয়ার শেষ দিকেও তদ্রূপ হওয়া চাই। আল্লামা একলীশী বলেন তুমি দোয়া করিবার সময় প্রথমে আল্লার প্রশংসা এবং দরূদ শরীফ শুরুতে

মধ্যখানে এবং শেষ ভাগে পাঠ কর এবং দরূদের ভিতর হুজুরের উচ্চ ফাজায়েলসমূহ বর্ণনা কর তবে তুমি মোস্তাজাবুদ দাওয়াত বনিয়া যাইবে অর্থাৎ তোমার দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে আর কোন পরদা থাকিবেনা।

হজরত জাবের হইতে বর্ণিত, হুজুর পাক (ছঃ) বলেন আমাকে ছওয়ারের পেয়ালার মত বানাইওনা। আল্লামা ছাখাবী উহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন যে, ছওয়ার প্রয়োজন সারিয়া পেয়ালাকে পিছনে লটকাইয়া দেয়। অর্থাৎ আমাকে তোমরা দোয়ার শেষ দিকে ফেলিয়া দিওনা। হজরত এব্‌নে মাছউদ বলেন কেহ আল্লার দরবারে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমে আল্লাহ পাকের শান মোতাবেক প্রশংসা করিবে। তারপর দরূদ পড়িয়া প্রার্থনা করিবে। ইহাতে বেশীর ভাগ আশা করা যায় সে দোয়ার মধ্যে কামিয়াব হইয়া যাইবে।

হজরত আবদুল্লা বিন ইউছ্‌রে এবং হজরত আনাছ বলেন যে কোন দোয়ার শুরুতে আল্লার তা'রীফ এবং হুজুরের উপর দরূদ না পড়া হইলে উহা বন্ধ হইয়া থাকে। হাঁ এই দুই কাজ করিয়া দোয়া করিলে উহা নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে। হজরত আলী হইতে বর্ণিত, হুজুর আরও বলেন আমার উপর দরূদ পড়া তোমাদের দোয়াকে হেফাজত করে আর উহা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কারণ হয়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আমাকে এই কথা বাতলানো হইয়াছে যে হুজুরে পাকের উপর দরূদ না পড়িলে দোয়া আছমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝুলিয়া থাকে। উপরে উঠিতে পারে না।

আবদুল্লাহ এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন তুমি যখন দোয়া কর হুজুরের উপর কিছু দরূদও উহার সহিত শামিল কর কেননা দরূদত নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে আর ইহা রহমতে খোদাওন্দীর শানের খেলাফ যে দোয়ার কিছু অংশ কবুল হইবে আর বাকী অংশ কবুল হইবে না।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এবং যে কোন দোয়ার মাঝখানে পর্দা থাকে। তবে দোয়ার মধ্যে দরূদ শরীফ পড়া হইলে সেই পর্দা কাটিয়া সোজা কবুলিয়াতের দরজায় পৌছিয়া যায়। আর দরূদ না হইলে উহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

এবনে আতা বলেন দোয়ার জন্য কতকগুলি আরকান আছে, কতকগুলি পালক আছে, আবার কতকগুলি আছবাব ও সময় আছে যদি রোকনসমূহ ঠিক হয় তবে উহা শক্তিশালী হয়। আর যদি পালকসমূহ ঠিক হয় তবে উহা আকাশের উপর উড়িয়া যায় আর যদি আছবারের মোতাবেক হয়

তবে উহা কামিয়াব হইয়া যায়।

দোয়ার আরকান হইল, হুজুরে কলব, কান্না, বিনয়, খুশু এবং আল্লার সহিত কলবের সম্পর্ক, উহার পালক হইল সততা, উহার সময় হইল শেষ রাত্রি আর উহার আছবাব হইল নবীয়ে করীমের উপর দরূদ পড়া।

ছালাতুল হাজত

হজরত আবদুল্লাহ বিন্ আবি আওফা (রঃ) বলেন একদা হুজুরে পাক (ছঃ) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন—যেই ব্যক্তির কোন হাজত আসিয়া উপস্থিত হয় চাই উহা আল্লাহ পাকের দরবারে হউক বা কোন মানুষের নিকটে হউক তখন তাহার উচিত সে যেন ভাল করিয়া অজু করে এবং দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করে ও নবীয়ে করীমের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তারপর যেন এই দোয়া পাঠ করে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً
هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই যিনি বহুত বড় ধৈর্যশীল এবং দাতা, তিনি প্রত্যেক দোষ হইতে পবিত্র। তিনি আরশে আজীমের প্রভু। সমস্ত প্রশংসা ঐ খোদার জন্য যিনি সমগ্র মাখলুকের প্রভু। হে খোদা! আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করিতেছি ঐসব বস্তুর জন্য যাহা তোমার রহমতকে ওয়াজেব করিরা দেয়। আর এমন সব আমল চাই যাহা তোমার মাগফেরাতকে ওয়াজেব করিয়া দেয়। এবং প্রার্থনা করি প্রত্যেক নেকীর অংশের জন্য এবং প্রত্যেক গুনাহ হইতে হেফাজত চাই। আমার জন্য এমন কোন গুনাহ রাখিবেন না যাহা আপনি ক্ষমা না করিবেন এবং এমন কোন চিন্তা ফিকির রাখিবেন না যাহা আপনি দূর না করিয়া দিবেন।

আর আপনার মর্জি মোতাবেক আমার কোন হাজত আপনি পুরা না করিয়া ছাড়িবেন না। ইয়া আরহামুর রাহেমীন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্‌কে কুল্লেহিম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবিধ প্রসঙ্গ

(১) প্রথম পরিচ্ছেদে দরূদ শরীফ পড়ার নির্দেশ সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে। নির্দেশ অর্থ হুকুম আর হুকুম শব্দ শরীয়তের বিধান মোতাবেক ওয়াজেব রূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্য ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল কমপক্ষে জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ। কিন্তু তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে হুজুরের নাম আসা মাত্রই যে দরূদ পড়ে না সে কৃপণ, জালেম, বদবখত। তাহার উপর জিব্রাঈলের এবং স্বয়ং হুজুরের বদদোয়া ইত্যাদি। এই সব বর্ণনানুসারে কোন কোন আলেমের মতে যখনই প্রিয়নবীর নাম আসিবে তখনই দরূদ পড়া ওয়াজেব। হাফেজ এব্‌নে হাজার ফত্‌হুল বারী গ্রন্থে এবিষযে দশটি মতামত উল্লেখ করিয়াছেন। আওজাজুল মাছালেক গ্রন্থে লিখিত আছে প্রত্যেক মুছলমানের উপর জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ফরজ। হানাফী মজহাব মতে ইমাম তাহাবী বলেন হুজুরের নাম বলা বা শুনা মাত্রই দরূদ পড়া ওয়াজেব আর ইমাম কারাখীর মতে জীবনে একবার পড়াই ফরজ আর প্রত্যেক বার পড়া মোস্তাহাব।

(২) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর নামের পূর্বে ছাইয়্যেদেনা শব্দ বাড়াইয়া বলা মোস্তাহাব। যেহেতু হুজুর বাস্তব ক্ষেত্রেও সর্দার কাজেই সর্দার বলিতে কোন অসুবিধা নাই। আবার কেহ কেহ আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীছের উপর বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া বলে যে ছাইয়্যেদেনা বলা ঠিক নহে। উক্ত হাদীছে আছে জনৈক বিদেশী প্রতিনিধিদল নবীজীর দরবারে আসিয়া বলিয়াছিল আন্‌তা ছাইয়্যেদুনা অর্থাৎ আপনি আমাদের সর্দার। হুজুর উত্তর করেন আসল সর্দার হইল আল্লাহ পাক। হুজুরের কথা বাস্তবিক পক্ষেও সত্য কেননা প্রকৃত সর্দারত আল্লাহ পাকই বটে। তাই

বলিয়া হুজুরকে সর্দার বলা না জায়েজ বুঝায় না। মেশকাত শরীফে স্বয়ং হুজুর ফরমাইতেছেন আনা ছাইয়্যেদুন্নাছে ইয়াওমাল কেয়ামতে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আমি সমগ্র মানব জাতির সর্দার হইব। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে আমি কেয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার। ইহাতে কোন গর্ব নাই। এইসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় হুজুরকে ছাইয়্যেদ বলা চলে, তবে আবু দাউদ শরীফে যে বলা হইয়াছে ছাইয়্যেদ হইলেন আল্লাহ পাক। তার অর্থ হইল প্রকৃত এবং হাকিকী ছাইয়্যেদ আল্লাহ পাক। যেমন প্রিয়নবী এরশাদ করেন মিছকীন ঐ ব্যক্তি নয় যে লোকের দুয়ারে এক দুই লোকমার জন্য ফিরে বরং মিছকীন ঐ ব্যক্তি যার সামর্থও নাই অথচ লোকের কাছেও ভিক্ষা চায় না।" তাই বলিয়া যে দুয়ারে দুয়ারে ফিরে তাকে কি লোকে মিছকীন বলে না? নিশ্চয় বলে। অন্যত্র হুজুর এরশাদ করিয়াছেন পলোয়ান ঐ ব্যক্তি নয় যে অপরকে পরাজিত করিল বরং ঐ ব্যক্তি যে রোগের সময় নফ্ছকে দমন করিল। হুজুর আরও বলেন যার কোন সন্তান নাই সে-ই নিঃসন্তান নহে বরং যার কোন ছোট ছেলে মেয়ে মারা যায় নাই সে ই নিঃসন্তান। এই দুই হাদীছেও যে মানুষকে আছাড় দিতে পারে লোকে তাহাকেও পলোয়ান বলে আর যার কোন আওলাদ নাই তাকেও লোকে নিঃসন্তান বলে। কাজেই বুঝা গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং হাকীকী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজেই হুজুরকেও ছাইয়্যেদ বলিতে কোন অসুবিধা নাই যদিও প্রকৃত ছাইয়্যেদ আল্লাহ পাক। আসলে হুজুর যেখানে বলিয়াছিলেন আল্লাহ পাকই সর্দার সেখানে ঐ লোকেরা হুজুরের অতি মাত্রায় প্রশংসা করিয়াছিল তাই হুজুর বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন সর্দার ত আমি নই বরং সর্দার আল্লাহ তায়ালা। হজরত এব্নে মাছউদের হাদীছে পরিষ্কার আসিয়াছে, আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা ছাইয়্যেদিল মোরছালীন। তদুপরি কোরানে পাকে হজরত ইয়াহ্-ইয়ার শানে বলা হইয়াছে "ছাইয়্যেদাঁও হাছুরা।" বোখারী শরীফে হজরত ওমরের উক্তি বর্ণিত আছে। "আবু বকর ছাইয়্যেদুনা আ'তাকা ছাইয়্যেদানা" অর্থাৎ আবু বকর আমাদের সর্দার তিনি আমাদের সর্দার বেলালকে আজাদ করিয়া দিয়াছেন।

বোখারী শরীফে হজরত ছায়াদের শানে হুজুর বলিয়াছেন, 'কূমূ- ইলা ছাইয়্যেদেকুম' অর্থাৎ তোমাদের সর্দারের জন্য তোমরা দাঁড়াইয়া যাও। এইসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে হুজুর (ছঃ)-কে ছাইয়্যেদ বলার

মধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা নাই।

(৩) এইভাবে বিভিন্ন হাদীছ এবং কোরানের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হুজুরের নামে মাওলা শব্দও ব্যবহার করা চলে। হাঁ যেখানে আল্লাহকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে মাওলা শব্দের অর্থ হইবে রব অর্থাৎ প্রতিপালক। আর যেখানে হুজুরকে মাওলা বলা হইয়াছে সেখানে অর্থ হইবে সাহায্যকারী। আল্লামা ছাখাবী কওলে বাদীয় মধ্যে ও আল্লামা কোছতলানী মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার মধ্যে হুজুরের নামসমূহের মধ্যে মাওলা শব্দকেও একটি নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই হুজুরের নামের পূর্বে মাওলা শব্দ ব্যবহার করিতেও কোন অসুবিধা নাই।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪) যদি কোথাও লেখার মধ্যে হুজুরের নাম আসিয়া পড়ে তবে নাম মোবারকের সহিত দরূদ শরীফও লিখিতে হইবে যদিও হাদীছ লেখার ব্যাপারে মোহাদ্দেছীনগণ কঠোর নীতিমালা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ ওস্তাদের নিকট হইতে যাহা শুনিবে তাহাই লিখিতে হইবে এমনকি ভুল শুনিয়া থাকিলে সেই ভুলও নির্ভুলভাবে লিখিতে হইবে হাঁ কোন শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে হইলে উহাকে আলাদাভাবে লিখিতে হইবে। এইসব কড়াকড়ি সত্ত্বেও মোহাদ্দেছীনগণের সর্বসম্মত রায় হইল ওস্তাদের মুখে দরূদ শরীফ শুনিতে পায় বা না পায় যে কোন ছুরতে উহাকে লিখিতেই হইবে। ইমাম নববী এবং আল্লাম ছুয়ুতী লিখিয়াছেন হুজুরের মোবারক নাম লিখিবার সময় জবান এবং আঙ্গুল উভয়টাকে একত্রিত করিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে আসল কিতাবের অনুসরণ করা কোন জরুরী নয়।

আল্লামা ছাখাবী বলেন তুমি হুজুরের মোবারক নাম লইবার সময় যেমন দরূদ শরীফ পড়িয়া থাক তদ্রূপ হুজুরের নাম লিখিবার সময়ও আপন আঙ্গুলী দ্বারা দরূদ শরীফ লিখ, কেননা হাদীছ লিখকদের ইহাতেই বহুত বড় কামিয়াবী। ওলামাগণ বারংবার হুজুরের নাম আসিলে বারংবার পুরা দরূদ শরীফ লেখাকে মোস্তাহাব বলিয়াছেন, মূর্খ এবং অলসদের মত দরূদের উপর সংকেত চিহ্ন লিখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত নবীয়ে পাক এরশাদ করেন যে ব্যক্তি কোন কিতাবের মধ্যে আমার নামের সহিত দরূদ শরীফ লেখে যতদিন ঐ কিতাবে আমার নাম থাকে ততদিন ফেরেশতা তাহার উপর দরূদ

পাঠাইতে থাকে। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর এরশাদ বয়ান করিতেছেন যে, যে আমার তরফ হইতে কোন এলেমের কথা লেখে এবং তাহার সহিত দরূদ শরীফও লেখে যতদিন পর্যন্ত সেই কিতাব পড়া যাইবে ততদিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

আল্লামা ছাখাবী বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন কেয়ামতের দিন যাহারা হাদীছ শরীফ লিখিতেন ঐসব ওলামা হাজির হইবেন এমতাবস্থায় যে তাহাদের হাতে দোয়াত থাকিবে যদ্দারা তাহারা হাদীছ লিখিতেন। আল্লাহ পাক হজরত জিব্রাঈলকে বলিবেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে তাহারা কে এবং কি চায়; তাহারা আরজ করিবে যে আমরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করিতাম, এরশাদ হইবে যাও তোমরা বেহেশতে প্রবেশ কর যেহেতু তোমরা আমার প্রিয় নবীর উপর বেশী করিয়া দরূদ পাঠাইতে। আল্লামা নববি এবং আল্লামা ছাখাবি বলেন বারংবার হুজুরের নাম লিখিতে বারংবার দরূদ শরিফও লিখিবে ইহাতে অলসতা করা ঠিক নহে। কেননা উহার মধ্যে অনেক উপকারিতা নিহিত আছে। আর যাহারা উহা করে না তাহারা অনেক লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যায়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন—

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এই আয়াত দ্বারা মোহাদ্দেছীনকে বুঝায় কেননা তাহারা বেশী বেশী করিয়া প্রিয়নবীর উপর দরূদ পাঠ করিতেন।

ছাহেবে এত্‌হাফ বলেন তালেবে এলেমদিগকে তাড়াতাড়ি পড়ার সময় দরূদ শরীফ ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে কেননা এই ব্যাপারে আমরা অনেক মোবারক স্বপ্ন দেখিয়াছি। হজরত ছুফিয়ান এব্‌নে উয়াইনা বলেন আমার একজন বন্ধু ছিল। সে মারা যাওয়ার পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে, সে বলিল আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন্ আমলের বরকতে? সে বলিল আমি নবীয়ে করীমের সাথে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম লিখিতাম। এই জন্য আমি মাগফিরাত লাভ করিয়াছি। আবুল হাছান মায়মুনী বলেন, আমি আপন ওস্তাদ আবু আলাকে স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে তাঁহার আঙ্গুলীর উপর কি যেন স্বর্ণ অথবা

জাফরান রং এ লিখিত রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি জিনিস? তিনি বলিলেন আমি হাদীছে পাকের উপর ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম লিখিতাম।

হাছান এব্‌নে মোহাম্মদ বলেন আমি ইমাম আহমদ এব্‌নে হাম্বলকে খাবে দেখিতে পাই। তিনি আমাকে বলেন কিতাবের মধ্যে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর উপর দরূদ শরীফ লেখার যে কত গুরুত্ব আমার সামনে ভাসিতেছে, আফছোছ তুমি যদি তাহা দেখিতে পাইতে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১) হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিবে ছালাত এবং ছালাম উভয়টা লিখিবে অর্থাৎ ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পুরা লিখিবে।

(২)জনৈক ব্যক্তি হাদীছ শরীফ লিখিত। সে কৃপণতা করিয়া প্রিয় নবীর মোবারক নামের সাথে দরূদ শরীফ লিখিত না, তাহার ডান হাত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া যায়।

(৩) এব্‌নে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন জনৈক ব্যক্তি শুধু ছল্লাল্লাহু আলাইহে লিখিত অ ছাল্লাম শব্দ লিখিত না। ইহাতে প্রিয়নবী তাহাকে স্বপ্নে এরশাদ করিলেন তুমি নিজেকে চল্লিশটি নেকী হইতে কেন বঞ্চিত করিতেছ? (অছাল্লাম লিখিতে চারটি আরবী অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরে দশ নেকী করিয়া মোট চল্লিশটি নেকী হয়।)

(৪) দরূদ শরীফ পড়নেওয়ালার উচিত সে যেন শরীর এবং কাপড়কে পরিস্কার রাখে।

(৫) প্রিয়নবীর নামের পূর্বে ছায়্যেদেনা বাড়াইয়া বলিতে হইবে কেননা উহা বলা মোস্তাহাব।

দরূদ শরীফ সম্পর্কে হজরত থানবী কয়েকটি মাছআলা লিখিয়াছেন -

(১) জীবনে একবার দরূদ শরীফ পড়া ফরজ।

(২) একই মজলিসে কয়েকবার হুজুরের নাম আসিলে ইমাম তাহাবীর মতে প্রত্যেক বার দরূদ পড়া ওয়াজেব আর ফতুয়া হইল একবার পড়া ওয়াজেব এবং বারবার পড়া মোস্তাহাব।

(৩) নামাজের মধ্যে শেষ বৈঠকের পর ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে

দরূদ পড়া মাকরূহ।

(৫) খোত্বা পড়ার সময় খতীব যখন হুজুরের নাম উল্লেখ করেন অথবা দরূদ পড়ার আয়াত পাঠ করেন তখন ঠোঁট না নাড়িয়া দিলে দিলে ছল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম পড়িবে।

( ) অজু ব্যতীত দরূদ শরীফ পড়া জায়েজ। হাঁ। অজুর সহিত পড়া বহুত ভাল।

(৬) নবী এবং ফেরেশতা ব্যতীত ভিন্নভাবে অন্য কাহারও নামের উপর দরূদ পড়িবে না। তবে একত্রে পড়ায় কোন অসুবিধা নাই। যেমন এই রকম বলা ঠিক নহে আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা আ-লে মোহাম্মদ, বরং এই ভাবে বলিবে—আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিওঁ অ আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।

(৭) দোরে মোখ্তার গ্রন্থে লিখিত আছে—কোন ব্যবসার আছবাব খুলিবার সময় যেখানে দরূদ শরীফ মকছুদ না হয় শুধু দুনিয়ার উদ্দেশ্য সাধন মকছুদ হয় দরূদ শরীফ পড়া নিষেধ।

(৮) দোরে মোখতার গ্রন্থে বর্ণিত আছে দরূদ শরীফ পড়ার সময় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নাড়াচাড়া করা বা চিৎকার করিয়া পড়া মূর্খতা। ইহাতে বুঝা যায় যে কোন কোন স্থানে নামাজের পর যে প্রথা অনুসারে চিৎকার দিয়া দিয়া দরূদ পড়া হয় উহা ত্যাগ করা উচিত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দরূদ শরীফ সম্পর্কীয় কতিপয় ঘটনা

দরূদ শরীফের বিষয় আল্লাহ পাকের হুকুম এবং নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর পবিত্র বাণী সমূহের পর কেচ্ছা কাহিনীর উল্লেখ তেমন কোন গুরুত্ব রাখেনা। কিন্তু মানুষের স্বভাব হইল বুজুর্গানের ঘটনাবলীতে অধিক উৎসাহিত হয়। তাই পূর্বেকার বুজুর্গেরা দরূদ ছম্পর্কীয় অনেক কেচ্ছা কাহিনীও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। হজরত থানবী (রঃ) জাদুছ ছায়ীদ

গ্রন্থে পুরা একটা পরিচ্ছেদে শুধু কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করেন। আমি ঐ সমস্ত কাহিনী হুবহু বর্ণনা করিয়া উহার উপর আরও কয়েকটি কেচ্ছা বর্ণনা করিতেছি।

(১) মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে তাফছীরে কোশায়রী হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কেয়ামতের দিবস কোন একজন মোমেনের নেকীর পাল্লা হালকা হইয়া যাইবে তখন নবীয়ে করীম (ছঃ) আঙ্গুলের মাথা বরাবর এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া নেক আমলের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যদদ্বারা নেকীর পাল্লা ঝুঁকিয়া পড়িবে, সেই মোমেন বলিয়া উঠিবে আমার মাতাপিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে হুজুর? আপনার ছুরত এবং আখলাক কতই না উত্তম। হুজুর (ছঃ) উত্তর করিবেন আমি তোমার নবী। আর ইহা হইল তোমার পড়া দরূদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।

(২) বিখ্যাত বুজুর্গ তাবেয়ী খলীফা হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ সিরিয়া হইতে মদীনা শরীফ পর্যন্ত শুধুমাত্র হুজুরের রওজায় তাঁহার তরফ হইতে ছালাম পাঠ করিবার জন্য বিশেষ দুত পাঠাইতেন।

(৩) রওজাতুল আহ্বার গ্রন্থে ইমাম ইছমাইল এব্নে ইব্রাহীম মোজানী হইতে যিনি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) এর বিখ্যাত শাগরেদ ছিলেন বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি ইমাম শাফেয়ী (রাঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন আমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে তাহাকে ইজ্জত ও সম্মানের সহিত যেন বেহেশতে প্রবেশ করিয়া দেওয়া হয়। এবং এইসব আমার একটা দরূদের বরকতে হাছিল হইয়াছে। যাহা আমি সর্বদা পাঠ করিতাম। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সেটা কিরূপ দরূদ শরীফ? তিনি বলিলেন উহা এই যে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ . (حصن)

"আলাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজ জাকেরুনা অ-কুল্লামা গাফালা আন জিকরিহিল গাফেলুনা।"

(৪) মানাহেজুল হাছানাত গ্রন্থে এব্‌নে ফাকেহানীর ফজরে মুনীর কিতাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে যে, জনৈক বুজুর্গ বলেন, কোন এক সময় একটি জাহাজ ডুবিয়া যাইতেছিল। আমি সে জাহাজে ছিলাম, হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া পড়ে, ঐ মুহূর্তে আমি রাছূলুল্লাহ (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাই। হুজুর আমাকে নিম্নলিখিত দরূদ শরীফটি দিয়া বলিলেন জাহাজের আরোহীদিগকে ইহা এক হাজার বার পড়িতে বল। আমরা উহা তিনশত বার পড়ার সাথে সাথেই জাহাজ বিপদ হইতে বাঁচিয়া গেল। উক্ত দরূদ শরীফ এই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

কেহ কেহ পরে "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর" পড়ারও উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর কাওযারীরী বর্ণনা করেন; আমার একজন প্রতিবেশী লেখার কাজ করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই! আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? সে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, আমার অভ্যাস ছিল যখনই হুজুরের নাম মোবারক লিখিতাম তখনই নামের সহিত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামও লিখিতাম। আল্লাহ পাক উহাকে পছন্দ করিয়া আমাকে এমন জিনিস দান করিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই এবং কোন কর্ণও শ্রবণ করে নাই বা কাহারও অন্তরে উহার কল্পনাও হয় নাই।

(গোলশানে জান্নাত)

(৬) দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের গ্রন্থকার কোন এক সময় ছফরা- বস্থায় পানির দারুণ অভাবের সম্মুখীন হন। এবং বালতি রশী না থাকায় খুব পেরেশান হইয়া পড়েন। একটা মেয়ে তাঁহার এই দুরাবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কুয়ার মধ্যে থুথু ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে পানি কুয়ার মুখ পর্যন্ত ফুলিয়া উঠিল তিনি আশ্চর্য্য হইয়া কিসে উহা সম্ভব হইল জিজ্ঞাসা করিলে মেয়েটি বলিল ইহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতে সম্ভব হইয়াছে। তারপরই তিনি বিখ্যাত ' দালায়েলুল খায়রাত' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।

(৭) শায়েখ জরদাক (রঃ) লিখিয়াছেন 'দালায়েলুল খায়রাত কিতাবের গ্রন্থকারের কবর হইতে মেশ্ক এবং আম্বরের খুশবু আসে। এবং উহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই হইয়াছে।

(৮) আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তাহার অভ্যাস ছিল প্রতি দিন সকাল বেলায় লেখা আরম্ভ করিবার শুরুতেই একটি সাদা খাঁতায় একবার দরূদ শরীফ লিখিয়া রাখিত তারপর লেখার কাজ শুরু করিত। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আল্লার ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিতে থাকে হায়। সেখানে আমার কি উপায় হইবে। ইত্যবসরে একজন মাজযুব সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল বাবা তুমি কেন ঘাবড়াইতেছ? তোমার সে সাদা খাতাটা যেখানে দরূদ শরীফ লেখা হইত উহা সেই দরবারে পেশ করা হইয়াছে।

(৯) মাওলানা ফয়জুল হাছান ছাহারানপুরী ছাহেবের জামাতা স্বয়ং আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, যেখানে হজরত মাওলানা মরহুম এন্তেকাল করেন সেখান হইতে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত আতরের সুগন্ধি আসিতে থাকে, এই ঘটনা যখন মাওলানা কাছেম (রঃ)-এর খেদমতে উল্লেখ করা হয় তখন তিনি বলেন যে উহা একমাত্র দরূদ শরীফের বরকতেই হাছেল হইয়াছে। কেননা মাওলানা মরহুম প্রতি জুমার রাত্রে জাগ্রত থাকিয়া শুধু দরূদ শরীফের আমল করিতেন।

(১০) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআ (রঃ) জনৈক বুজুর্গকে স্বপ্নে দেখিতে পান যে তিনি ফেরেশতাদের সহিত আছমানে নামাজ পড়িতেছেন। এই ফজিলত কিসে হাছেল হইল উহার কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি। আর যখনই নবীয়ে

পাকের নাম মোবারক আসিত তখনই আমি দরূদ শরীফ লিখিতাম। অতএব কারণে আমার এই মর্যাদা হাছেল হইয়াছে। (কেহ কেহ বলেন আবু জোরআ নিজে স্বপ্ন দেখেন নাই বরং তাঁহাকে অন্য কোন বুজুর্গ স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন)।

(১১) জনৈক ব্যক্তি ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে তাঁহার এন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখেন এবং তাঁহার মাগফেরাতের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন আমি প্রতি জুমার রাত্রে এই পাঁচটি দরূদ শরীফ পাঠ করিতাম।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِىْ اَنْ تُصَلّٰى عَلَيْهِ -

এই দরূদ শরীফকে দরূদে খামছা বলা হয়।

(১২) শায়েখ এব্‌নে হাজার মক্কী (রঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি অন্য একজন বুজুর্গ ব্যক্তিকে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন এবং বেহেশ্‌তে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ফেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরূদের হিসাব লইয়া দেখিয়াছেন যে গুনাহ হইতে দরূদের সংখ্যা বেশী দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে আল্লাহ পাক বলেন, বেশ তাহার আর কোন হিসাবের প্রয়োজন নাই, তাহাকে বেহেশতে লইয়া যাও।

(১৩) শায়েখ এব্‌নে হাজার মক্কী লিখিয়াছেন, জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির অভ্যাস ছিল প্রতি রাত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক দরূদ পাঠ করিয়া নিদ্রা যাইতেন। একদা রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে রাছূলুল্লাহ (ছঃ) তাহার ঘরে তাশরীফ আনিয়াছেন যদ্বারা সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

হুজুরে পাক তাহাকে বলেন যেই মুখে তুমি দরূদ পড়িতে উহা পেশ কর আমি উহাতে চুম্বন করিব। লোকটি লজ্জায় মুখমণ্ডল পেশ করিল। হুজুর তাহার গালে চুম্বন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইল সমস্ত ঘরে মেশ্‌কের সুগন্ধে ভর্তি হইয়া আছে।

(৪) শায়েখ আবদুল হক মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) মাদারেজুন্নবুওত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যখন হজরত হাওয়া (আঃ) পয়দা হন তখন আদম (আঃ) তাঁহার দিকে হাত বাড়াইতে লাগিলেন। ফেরেশতাগণ বলিলেন তোমাদের বিয়ে হওয়া এবং মোহর আদায় করা পর্যন্ত ছবর কর। জিজ্ঞাসা করা হইল বিয়ের মোহর কি জিনিস? ফেরেশতারা বলিলেন মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উপর তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করা, অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে বিশবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।

উল্লেখিত কেচ্ছা সমূহ জাদুছ ছায়ীদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উহার উপর আরও কতিপয় কেচ্ছা বর্দ্ধিত করা গেল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দা-য়েমান আবাদা,
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৫) আল্লামা ছাখাবী লিখিয়াছেন, রশীদ আত্তার বর্ণনা করিয়াছেন যে আমাদের মিসরে একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন যাহার নাম আবু ছায়ীদ খাইয়াত ছিল। তিনি নির্জনে থাকিতেন ও লোকজনের সহিত মেলামেশা করিতেন না। কিছুদিন পর তিনি এব্‌নে শরীফের মজলিসে খুব বেশী আশা যাওয়া শুরু করেন। লোকজন উহাতে আশ্চার্য হইয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাই হুজুর আমাকে এরশাদ করেন যে, তুমি এব্‌নে রশীকের মজলিসে বেশী বেশী যাইতে থাক কেননা সে আপন মজলিসে আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিয়া থাকে।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৬) আবুল আববাছ আহমদ এব্‌নে মনছুরের এন্তেকালের পর জনৈক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইল যে, তিনি সিরাজ নগরের জামে মসজিদে মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার শরীরে একজোড়া মহামূল্যবান কাপড় রহিয়াছে ও মণিমুক্তায় ভরপুর একটা টুপি রহিয়াছে। স্বপ্নদ্রষ্টা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আল্লাহ পাক, আমাকে ক্ষমা

করিয়া দিয়াছেন এবং আমাকে বহু সম্মান দেখাইয়া আমার মাথায় নূরের তাজ পরাইয়াছেন। এবং এই সব একমাত্র নবীয়ে করীম (ছঃ)-এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়ার বরকতে হাছেল হইয়াছে।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৭) জনৈক বুজুর্গ ছুফী বর্ণনা করিতেছেন যে, মেছতাহ নামীয় একজন যুবক ছিল। যে কোন প্রকার পাপ কাজ করিতে সে ভয় করিত না। মৃত্যুর পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সে বলিল আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কি আমলের বরকতে তুমি মাফ পাইয়াছ? সে উত্তর করিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের খেদমতে বসিয়া হাদীছ নকল করিতেছিলাম। ওস্তাদ সাহেব দরূদ শরীফ পাঠ করিলেন আমিও তাঁহার সহিত অনেক জোরে দরূদ শরীফ পড়িলাম, আমার আওয়াজ শুনিয়া মজলিসের সকলেই দরূদ শরীফ পাঠ করিল। আল্লাহ পাক সেই মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে এইরূপ অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার একজন প্রতিবেশী ছিল বড় পাপী। আমি তাহাকে তওবা করিবার জন্য তাকীদ করিতাম। সে কিছুতেই আমার কথা শুনিত না। সে যখন মারা গেল, আমি তাহাকে বেহেশতের মধ্যে দেখিতে পাই। জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি এই মর্যাদায় কি করিয়া পৌঁছিয়াছ? সে বলিল, আমি একজন মোহাদ্দেছের দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর জোরে জোরে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তাহার জন্য বেহেশত ওয়াজেব। তখন আমি জোরে দরূদ পড়িতে লাগিলাম এবং আমার সহিত উপস্থিত সকলেই দরূদ পড়িয়া উঠিল। আল্লাহ পাক ঐ মজলিসের সকলকেই ক্ষমা করিয়া দেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৮) আবুল হাছান বাগদাদী দারমী বলেন যে তিনি আবু আবদুল্লাহ বিন হামেদকে তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েকবার স্বপ্নে দেখিতে পান। এবং জিজ্ঞাসা করেন যে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার উপর

অনেক দয়া করিয়াছেন। আবুল হাছান বলেন আমাকে এমন একটা আমল বাতলাইয়া দিন যদ্বারা আমি সোজা বেহেশতে চলিয়া যাইতে পারি। তিনি বলেন এক হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। যার মধ্যে প্রত্যেক রাকাতে এক হাজার বার কুলহুয়াল্লাহ পড়িবে। তিনি বলেন ইহাত বড় কঠিন ব্যাপার। তখন বলেন যে, তবে প্রতি রাত্রে এক হাজার বার দরূদ শরীফ পড়িতে থাক। দারমী বলেন তারপর হইতে উহার উপর আমি আমল করিতে থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৯) জনৈক ব্যক্তি আবু হাফছ কাগজী (রঃ)-কে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে? তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন ও আমাকে বেহেশতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। স বলিল হুজুর উহা কি করিয়া সম্ভব হইল? তিনি বলিলেন ফেরেশতাগণ আমার গুনাহ এবং আমার দরূদ শরীফকে ওজন করিয়া দেখিয়াছেন যে আমার দরূদের পাল্লা ভারী হইয়া গিয়াছে। তখন আমার মাওলা বলিলেন হে ফেরেশতাগণ বেশ বেশ! আর কোন হিসাব লইবে না। তাহাকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দাও।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২০) আল্লামা ছাখাবী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে বর্ণনা করেন যে বনী ইছরাঈলের মধ্যে একজন বহুত বড় পাপী ছিল, যখন সে মারা যায় লোকে তাহাকে কোথাও ফেলিয়া দেয়। আল্লাহ পাক হজরত মুছা (আঃ)-কে অহীর মারফত জানাইয়া দেন যে, তাহাকে গোছল দিয়া তাহার উপর জানাজা নামাজ পড় কেননা আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছি। হজরত মুছা (আঃ) আরজ করিলেন হে পরওয়ারদেগার! উহা কেমন করিয়া হইল? আল্লাহ পাক বলিলেন এই লোকটি কোন একদিন তৌরীত কিতাব খুলিয়াছিল এবং সেখানে মোহাম্মদ (ছঃ)-এর নাম দেখিয়া তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা বুঝায় না যে শুধুমাত্র একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিলেই যাবতীয় ছগীরা কবীরা গুনাহ এবং বান্দার হক সমূহ মাফ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এই সব কেচ্ছার মধ্যে অতিরঞ্জিত বা মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। হঁা ব্যাপার হইল এই যে ইহা মেহেরবান পরওয়ার-দেগারের কবুলিয়তের ব্যাপার। তিনি যদি কাহারও সামান্য এতটুকু এবাদতও পছন্দ করিয়া ক্ষমা করিয়া দেন তবে তাঁহার একমাত্র মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্ণিত আছে—

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذالك لمن يشاء ـ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁহার সহিত শেরেক করাকে ক্ষমা করিবেন না। (অর্থাৎ মোশরেক এবং কাফেরদিগকে ক্ষমা করিবেন না) উহা ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। যেমন কোন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাজার হাজার টাকা দেনা আছে। এমতাবস্থায় করজদার ব্যক্তির কোন কাজে সন্তুষ্ট হইয়া যদি মহাজন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য সমস্ত কর্জ মাফ করিয়া দেন অথবা বিনা কোন কারণেই মাফ করিয়া দেয় তবে কাহার সাধ্য আছে যে কিছু বলিতে পারে? এই ভাবে মেহেরবান খোদাও যদি শুধুমাত্র আপন দয়া ও বখশিশের দ্বারা কাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেন তবে উহা অসম্ভব কিসের?

এই সব কেচ্ছা কাহিনীর দ্বারা এই কথা প্রতিয়মান হয় যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দরূদ শরীফের বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং খুব বেশী বেশী উহার আমল করা উচিত। কেননা কোন সময়ের বা কিরূপ মহব্বতের সহিত পড়িলে একটি মাত্র পড়াও যদি মনিবের পছন্দ হইয়া বসে তবে সব বেড়া পার।

بس هے اپنا ایک نالہ بهی اگر پهنچے وهاں
گرچہ کرتے هیں بهت سے نالہ و فریاد هم

অর্থাৎ—আমাদের শত সহস্র কান্নাকাটির মধ্যে যদি একটি মাত্র কান্নাও তাঁহার দরবারে পেঁাছিয়া যায় তবুও মকছুদ হাছেলের জন্য যথেষ্ট।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২১) জনৈক বুজুর্গ স্বপ্নযোগে একটি ভয়ানক বদছুরত জিনিস দেখিতে পাইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আবার কি বালা মছিবত? সে বলিল আমি তোমার বদ আমল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা তোমার থেকে বাঁচিবার উপায় কি? সে বলিল হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করা।

আমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে দিবারাত্রি বদ আমলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে না। অথচ সেই বদ আমলের তুফান হইতে বাঁচিবার কত সুন্দর সহজ ব্যবস্থা হইল হুজুরে পাকের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা। চলা ফেরায় উঠা বসায় যত বেশী পড়া যায় ক্রুটি করা কিছুতেই উচিত নহে। কেননা উহা হইল যেন এক ছীরে আ'জম বা অমৃত সুধা।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২২) শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে আমার একজন প্রতিবেশীর মৃত্যুর পর তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছ? লোকটি বলিল শিবলী! বহুত বড় বিপদের সম্মুখীন আমি হইয়াছি এবং মনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তরে আমি ধাঁধাঁয় পড়িয়া যাই। মনে মনে চিন্তা করি খোদা একি বিপদ। আমি মুসলমান হইয়া মরি নাই? হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনিতে পাইলাম এই মছিবত তোমার বেহুদা মুখ চালনার প্রতিফল। যখন ঐ দুই ফেরেশতা আমাকে শাস্তি দিতে উদ্দত হইল তখন সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ সুন্দর একযুবক শাস্তিদাতা ফেরেশতাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শরীর হইতে খোশবু আসিতেছিল। সে আমাকে ফেরেশতাদের উত্তর শিখাইয়া দিল। আমি উত্তর বলিয়া দিলাম। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম খোদা আপনার উপর রহম করুন আপনি কে আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন আমি একব্যক্তি। তোমার বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়ার দরুণ আল্লাহ পাক আমাকে পয়দা করিয়া নির্দেশ দিয়াছেন আমি যেন যে কোন বিপদে তোমাকে সাহায্য করিতে থাকি।

নেক আমল সমূহ সুন্দর ছুরতে এবং বদ আমল সমূহ বদছুরতে আখেরাতে আত্ম প্রকাশ করিবে। ফাজায়েলে ছাদাকাত দ্বিতীয় খণ্ডে মৃত-ব্যক্তির অবস্থার বর্ণনায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মুর্দাকে যখন কবরে রাখা হয়

তখন নামাজ তাহার ডান দিকে, রোজা তাহার বাম দিকে এবং কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লার জিকির তাহার মাথার দিকে দাঁড়াইয়া যায় এবং যেই দিক হইতেই আজাব আসিতে থাকে তাহারা ফিরাইতে থাকে। এই ভাবে বদ আমল বদছুরতে আসিয়া হাজির হয়। যেমন জাকাতের মাল আদায় না করিলে কোরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে উহা বিরাট সাঁপ হইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিবে। হে খোদা! তুমি আমাদিগকে হেফাজত কর।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৩) হজরত আবদুর রহমান এবনে ছামুরা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয়-নবী (ছঃ) ঘর হইতে বাহিরে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ করিলেন আমি অদ্য রাত্রে একটা আশ্চার্য দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি। জনৈক ব্যক্তিকে দেখিলাম পুল ছেরাতের উপর দিয়া কখনও পাঁ। হেঁচ্ড়াইয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া যাইতেছে আবার কখনও কখনও একেবারে আট্কিয়া যাইতেছে। এমতা-বস্থায় তাহার নিকট আমার উপর দরূদ শরীফ পড়া পেঁীছিয়া গেল এবং সে তাহাকে সোজা দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর লোকটি সহজেই পুল ছেরাত পার হইয়া গেল। (তিবরানী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৪) হজরত ছুফিয়ান এব্নে উয়াইনা (রঃ) হযরত খলফ হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমার এক বন্ধু আমাদের সহিত হাদীছ অধ্যায়ন করিত। তাহার এন্তেকালের পর আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই যে সে সবুজ রং এর পোশাক পরিহিত অবস্থায় দৌড়িয়া ফিরিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমিত আমাদের সহিত হাদীছ পাঠ করিতে। এই সম্মান তুমি কি করিয়া লাভ করিলে? সে বলিল আমি তোমাদের সহিত হাদীছ শিক্ষা করিতাম সত্য; কিন্তু যখন হুজুরের নাম মোবারক আসিত আমি তখন উহার নীচে ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম লিখিয়া রাখিতাম। উহার বদৌলতে আল্লাহ পাক আমাকে এই সম্মান দান করিয়াছেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৫) আবু ছোলায়মান মোহাম্মাদ বিন হোছায়নিল হারানী বলেন আমাদের ফজল নামীয় একজন প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি সব সময় নামাযে রোজায় মশগুল থাকিতেন। তিনি বলেন যে, আমি হাদীছ লিখিতাম কিন্তু তাহার সহিত দরূদ শরীফ লিখিতাম না। আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) কে দেখিতে পাই যে হুজুর আমাকে এরশাদ করিতেছেন, যখন তুমি আমার নাম লও বা লিখ তখন দরূদ কেন পড়না। তারপর হইতে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে দরূদ পড়িতে থাকি। অতঃপর কিছুদিন পর আবার হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। এবার হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমার দরূদ আমার নিকট পৌছিতেছে। যখনই আমার নাম লইবে তখন ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম বলিও।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৬) আবু ছোলায়মান হারানী আর একটি আপন কেচ্ছা বর্ণনা করিতেছেন যে, আমি খাবে হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি। হুজুর আমাকে এরশাদ করেন আবু ছোলায়মান! তুমি যখন আমার নাম লও তখন দরূদ পড় সত্য কিন্তু অ-ছাল্লাম অর্থাৎ ছালাম শব্দ বল না। অথচ উহাতে চারটি অক্ষর আছে প্রতি অক্ষরে দশটি করিয়া নেকী মোট চল্লিশটি নেকী তুমি ছাড়িয়া দিতেছ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৭) ইব্রাহীম নাছাফী বলেন আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে খাবে দেখিতে পাই। মনে হইল যেন হুজুর আমার উপর সামান্য অভিমানের সাথে নারাজ। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া হুজুরের কদমবুচি করিয়া আরজ করিলাম হুজুর! আমি হাদীছের খেদমতগারদের মধ্যে একজন আহ্লে ছুন্নত, মুছাফের। হুজুর মৃদু হাসিয়া এরশাদ করিলেন যখন তুমি আমার উপর দরূদ পড় তখন ছালাম কেন পড়না। তারপর হইতে আমি ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লাম পুরা লিখিতে থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(২৮) আবু ছোয়মান বলেন আমার পিতার এন্তেকালের পর আমি

তাহাকে খাবে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আববাজান, আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম কোন্ আমলের বরকতে? তিনি বলিলেন আমি প্রত্যেক হাদীছের সাথে প্রিয়নবীজীর উপর দরূদ শরীফ লিখিতাম।

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লিহিম।

(২৯) জা'ফর এব্নে আবদুল্লাহ বলেন আমি বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু জোরআকে খাবে দেখিতে পাই যে, তিনি আছমানের ফেরেশতাগণের ইমামতি করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এতবড় মর্যাদা আপনি কোন্ আমলের বরকতে লাভ করিয়াছেন? তিনি বলেন আমি আমার এই হাতে দশ লক্ষ হাদীছ লিখিয়াছি এবং যখনই হুজুরের মোবারক নাম আসিত তখনই আমি হুজুরের উপর দরূদ ছালাম লিখিতাম। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ পাক তাহার উপর দশটি রহমত বর্ষণ করেন। এই হিসাব মতে আল্লার তরফ হইতে আমার এক কোটি রহমত হইয়া গিয়াছে। আর আল্লার তরফ হইতে একটি রহমতই যথেষ্ট।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩০) জনৈক বুজুর্গ হজরত ইমাম শাফেয়ী রহমতুল্লাহ আলাইহে কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার জন্য জান্নাতকে এমন ভাবে সাজানো হইয়াছে যেমন দুলাইনকে সাজানো হয় এবং আমার উপর এত নাজ নেয়ামত বর্ষিত হইয়াছে যেমন দুলাইনের উপর বর্ষিত হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি এই মর্যাদায় কিভাবে পৌঁছিয়াছেন। আমার নিকট এক ব্যক্তি বলিয়াছে 'কিতাবুল বেছালায়' আপনি দরূদ লিখিয়াছেন উহার বরকতে নাকি আপনি এই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর সেই দরূদটা কি? আমাকে বাতলাইয়া দেওয়া হইল যে উহা এই—

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ

مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ছাল্লাল্লাহু আলা মোহাম্মাদিন আদাদা মা-জাকারাহুজ জাকেরুনা অ-আদাদা মা গাফালা আন্ জিক্রিহিল গাফেলুনা।'

আমি ভোর বেলায় জাগ্রত হইয়া কিতাবুল বেছালা খুলিয়া সেই দরূদ শরীফকে ঠিক ঐ ভাবেই দেখিতে পাই।

ইমাম মোজানীর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে আমি ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-কে খাবে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহ পাক আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক আমার কিতাবুল বেছালায় লিখিত একটা দরূদের বরকতে মাফ করিয়া দিয়াছেন। উহা এই যে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ইমাম বয়হকী আবুল হাছান শাফেয়ীর নিকট নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করিতেছেন যে আমি খাবে হুজুর (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করি যে হুজুর! ইমাম শাফেয়ী কিতাবুল বেছালার মধ্যে যে দরূদ শরীফ লিখিয়াছেন আপনি উহার কি প্রতিদান দিয়াছেন? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার তরফ হইতে উহার প্রতিদান এই যে তাহাকে হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে না।

এব্নে বানান এছবেহানী বলেন আমি হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! মোহাম্মদ এবনে ইদ্রিছ শাফেয়ী তিনি নাকি আপনার চাচার আওলাদ অর্থাৎ হাশেমী বংশের লোক আপনি তাহাকে বিশেষ কোন সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন কি? হুজুর এরশাদ করেন আমি আল্লার দরবারে এই দোয়া করিয়াছি যেন কেয়ামতের দিন তাহার কোন হিসাব না লওয়া হয়। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছূলাল্লাহ্! কোন্ আমলের বরকতে তাহার এতটুকু একরাম করা হইয়াছে। হুজুর বলেন আমার উপর সে এমন শব্দ দ্বারা দরূদ পাঠ করিত যেই শব্দ দ্বারা আর কেহ পাঠ করে নাই। আমি আরজ করিলাম

হুজুর! উহা কি? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন —

اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون -

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩১) আবুল কাশেম মাওয়াজী বলেন আমি এবং আমার পিতা রাত্রি বেলায় হাদীছের মোকাবেলা করিতাম। স্বপ্নে দেখানো হইয়াছিল যে যেখানে হাদীছের চর্চা হইত সেখানে একটা নূরের খুটি আছমান পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে। উহা কি জিনিস জিজ্ঞাসা করার পর বাতলান হইয়াছিল যে, উহা সেই দরূদ শরীফ যাহা হাদীছ চর্চার সময় পড়া হইত।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ ছাল্লামা অ শাররাফা অ কাররামা

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩২) আবু এছহাক নহশল বলেন আমি হাদীছের কিতাব লিখিতাম এবং হুজুরের পবিত্র নামের সহিত লিখিতাম —

قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما আমি খাবে হুজুরে পাক (ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হুজুর আমার কিতাব দেখিতেছেন এবং দেখিয়া এরশাদ করিলেন যে, এটা বেশ ভাল মনে হয়। (অর্থাৎ তাছলীমা শব্দ বৰ্দ্ধিত করার দরুনই ঐরূপ বলিয়াছেন) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) কওলে বাদী গ্রন্থে এইরূপ অনেক খাবের উল্লেখ করিয়াছেন যে মৃত্যুর পর যখন মৃত ব্যক্তিকে সুন্দর ছুরতে দেখা গিয়াছে, তাহার এই সম্মানের কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে ইহা হুজুরে পাকের নামের সহিত দরূদ লেখার কারণে হাছিল হইয়াছে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৩) হাছান বিন মুছা আল্ হাজরামী যিনি এবনে উজ্জাইনা নামে খ্যাত ছিলেন তিনি বলেন যে আমি হাদীছ শরীফ নকল করিতাম কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে অনেক সময় দরূদ শরীফ লিখিতে ভুল হইয়া যাইত।

একদিন আমার স্বপ্নযোগে হুজুরের জিয়ারত নছীব হয়। হুজুর (ছঃ) আমাকে এরশাদ করেন তুমি যখন হাদীছ লিখ তখন দরূদ কেন লিখ না, যেমন আবু আমর এবং তাবারী লিখিয়া থাকে। তারপর ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমি ঐ সময় হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এখন হইতে যখনই হাদীছ লিখিব তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-ছাল্লাম নিশ্চয় লিখিতে থাকিব।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৪) আবু আলী হাছান বিন আলী আত্তার বলেন, আমাকে মোহাদ্দেছ আবু তাহের হাদীছের কতকগুলি পাতা লিখিয়া দেন। আমি সেখানে দেখিতে পাই যে যেখানেই-হুজুরের নাম মোবারক রহিয়াছে সেখানেই নামের পর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিত রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এইরূপ কেন লিখিতেছ? তিনি বলিলেন আমি ছোট বেলায় যখন হাদীছ লিখিতাম তখন হুজুরের নামের পর দরূদ শরীফ লিখিতাম না। একদিন আমি স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহাকে ছালাম আরজ করিলাম। হুজুর (ছঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। আমি সেদিকে গিয়া আবার ছালাম করিলাম। হুজুর এবারও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ফেলেন। আমি তৃতীয়বার চেহারা মোবারকের দিকে হাজির হইয়া বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি কেন মুখ ফিরাইয়া লইতেছেন হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি আমার উপর কেন দরূদ পাঠাওনা। তারপর হইতে আমি যখনই হুজুরের নাম লিখি তখনই ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামা তাছলীমান কাছীরান কাছীরান কাছীরা লিখিয়া থাকি।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৫) আবু হাফছ ছমরকন্দী (রঃ) আপন কিতাব রওনাকুল মাজালেছে লিখিতেছেন। বল্খ দেশে একজন বিখ্যাত ধনাঢ্য সওদাগর ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি দুই ছেলের মধ্যে সামান্য ভাবে বণ্টন হইয়া যায়। ত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর তিনটা পশম মোবারকও ছিল। দুই ভাই একটা করিয়া নিয়া গেল, তৃতীয় পশম মোবারকের

ব্যাপারে বড় ভাই বলিল উহাকে কাটিয়া সমান ভাগে ভাগ করা হউক। ছোট ভাই বলিল কছম খোদার হুজুরে পাকের পশম মোবারক কাটা যাইতে পারে না। বড় ভাই বলিল আচ্ছা আমাকে সমস্ত ধন সম্পদ দিয়া তুমি ঐ তিনটা পশম মোবারক নিয়া যাও। ছোট ভাই আনন্দ চিত্তে উহা কবুল করিল। সে ঐগুলিকে সব সময় পকেটে রাখিত এবং বারংবার দেখিত ও দরূদ শরীফ পাঠ করিত। কিছুদিনের মধ্যে বড় ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া গেল আর ছোট ভাই বহুত বড় সম্পদশালী হইয়া গেল। ছোট ভাইয়ের মৃত্যুর পর কোন এক বুজুর্গ হুজুরে পাকের স্বপ্নে জিয়ারত লাভ করিল। হুজুর এরশাদ করিলেন, যেই ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দেয় সে যেন ঐ ব্যক্তির কবরের পার্শ্বে গিয়া আল্লার দরবারে প্রার্থনা করে। (বাদী)

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে বড় ভাই যখন ফকীর হইয়া গেল তখন একদিন স্বপ্নে হুজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করিয়া হুজুরের খেদমতে নিজের অভাবের বিষয় অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন ওরে হতভাগা। তুমি আমার পশমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছ। আর তোমার ভাই উহা গ্রহণ করিয়াছে। সে যখনই উহা দেখে আমার উপর দরূদ পড়ে। কাজেই আল্লাহ পাক তাহাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সুখী করিয়াছেন। যখন সে নিদ্রা হইতে জাগিল আসিয়া ছোট ভাইয়ের খাদেমদের মধ্যে শামিল হইয়া গেল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খাল্কে কুল্লেহিম।

(৩৬) জনৈক মহিলা হজরত হাছান বছরী (রঃ) এর নিকট আসিয়া আরজ করিল হুজুর আমার মেয়ে মারা গিয়াছে। আমাকে এমন একটি তদবীর শিখাইয়া দিন যদদ্বারা আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। তিনি বলেন এশার নামাজ পড়িয়া চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে এবং প্রত্যেক রাকাতে আলহামদু শরীফের পর ছূরা আল্‌হা-কুমুত্তাকা ছুর পড়িবে। তারপর নিদ্রা আসা পর্যন্ত দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

মেয়েলোকটি এই তদবীর করিল ও স্বপ্নে আপন মেয়েকে দেখিল যে সে কঠিন আজাবে গ্রেপ্তার আছে, তাহার হাত পা আগুনের শিকলে আবদ্ধ। সকাল বেলায় মেয়েলোকটি হজরত হাছান বছরীর খেদমতে গিয়া

ঘটনা বর্ণনা করিল। তিনি বলিলেন কিছু ছদকা করিয়া দাও। হয়তঃ আল্লাহ পাক উহার উছিলায় মেয়েকে মাফ করিয়া দিবেন। পরের দিন স্বয়ং হজরত হাছান বছরী খাবে দেখিলেন যে বেহেশ্‌তের একটি বাগানে বহুত উঁচু একটি তখ্‌ত রহিয়াছে। সেই তখ্‌তের উপর এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বসা রহিয়াছে যাহার মাথার উপর নূরের তাজ রহিয়াছে। মেয়েটি বলিল হুজুর আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন? তিনি বলিলেন না চিনিতে পারি নাই। মেয়েটি বলিল হুজুর আমি ঐ মেয়ে যাহার মাতাকে আপনি এশার পর দরূদ শরীফ পড়িবার হুকুম দিয়াছিলেন। হজরত হাছান বলিলেন তোমার মা-ত তোমাকে ইহার বিপরীত অবস্থায় দেখিয়াছে। মেয়েটি বলিল আমার অবস্থা পূর্বে ঐরূপই ছিল যেইরূপ আমার মা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি এই মর্যাদায় কি করিয়া পৌঁছিলে? সে বলিল আমরা সত্তর হাজার লোক ঐ ভীষণ আজাবে গ্রেপ্তার ছিলাম। একজন আল্লার নেক বান্দা আমাদের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় একবার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া আমাদের উপর উহার ছওয়াব বখ্‌শিশ করিয়া দেয়. তাঁহার দরূদ আল্লার নিকট এত বেশী মকবুল হইল যে তিনি উহার উছিলায় আমাদের সকলকেই আজাব হইতে নাজাত দিয়া দিলেন। তাঁহার বরকতে আমি এই মরতবায় পৌঁছিয়াছি। (বাদী)

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে এই ভাবে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে জনৈক মেয়েলোকের ছেলে বহুত বড় পাপী ছিল। মা ছেলেকে খুব নছীহত করিত কিন্তু ছেলে কিছুতেই মানিত না। অবশেষে ছেলে মারা গেল। ছেলে বিনা তওবায় মারা যাওয়াতে তাহার জন্য মা এবার অধিক পেরেশান হইয়া গেল। মেয়েলোকটি একদিন ছেলেকে স্বপ্নে দেখিতে পাইল যে সে আজাবে গ্রেপ্তার আছে। মা আরও পেরেশান হইয়া গেল, কিছুদিন পর মা আবার ছেলেকে খাবে দেখিতে পাইল যে সে খুব আনন্দে এবং খুশীতে আছে। মা অবাক হইয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। ছেলে বলিল, মা! আমাদের এই কবরস্তানের নিকট দিয়া একজন বহুত বড় পাপী যাইতেছিল। কবরসমূহ দেখিয়া হঠাৎ তাহার খুব অনুতাপ হইল এবং নিজের অবস্থার উপর খুব কান্নাকাটি করিল ও সরল অন্তকরণে তওবা করিল এবং কিছু কোরান শরীফ আর বিশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া কবরবাসীর উপর ছওয়াব বখ্‌শিশ করিয়া দিল। উহা হইতে যতটুকু আমার ভাগে পড়িয়াছে তাহার উছিলায় আমি এই অবস্থায় পৌঁছিয়াছি। হে আমার মা! হুজুরের উপর দরূদ পাঠ করা অন্তরের নূর। গোনাহের

ক্ কারা। জীবিত এবং মৃত সকলের জন্যই উহা রহমত স্বরূপ।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৭) তৌরিত কিতাবের বিখ্যাত আলেম হজরত কায়াবে আহবার লন, আল্লাহ পাক মুছা আলাইহিচ্ছালামের নিকট অহী পাঠাইলেন , হে মুছা; যদি দুনিয়াতে এমন লোক না থাকিত যাহারা আমার াগান করে তবে আকাশ হইতে এক ফোটা পানিও বর্ষিত হইত না এবং কটা ঘাসও জমিনে জন্মিত না। তারপর আরও অনেক জিনিসের উল্লেখ রিয়া এরশাদ করেন, হে মুছা! তুমি যদি চাও যে আমি তোমার নিকট ়ার চেয়ে বেশী বেশী নিকটবর্তী হই যতটুকু নিকটবর্তী রহিয়াছে ামার জবান হইতে কথা এবং তোমার দিলের মধ্যে উহার কল্পনা, ামার শরীর হইতে উহার রুহ। তোমার চক্ষু হইতে উহার দৃষ্টি শক্তি। রত মুছা (আঃ) বলেন, হে খোদা! উহা কিশের দ্বারা সম্ভব আপনি শ্চয় আমাকে উহা বাত্‌লাইয়া দিন। এরশাদ হইল মোহাম্মদ (ছঃ) র উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পাঠ কর। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩৮) মোহাম্মদ বিন ছায়ীদ বিন মোতাররেফ যিনি একজন বিখ্যাত র্গ ছিলেন তিনি বলেন আমি যখন রাত্রি বেলায় শুইতে যাইতাম তখন কটা নির্দিষ্ট সংখ্যায় দরূদ শরীফ পড়িয়া শুইতাম। একরাত্রে আমি ামার আমল পূর্ণ করিয়া বালাখানার মধ্যে শুইয়া যাওয়ার পর আমি প্নে দেখিলাম বালাখানার দরওয়াজা দিয়া হুজুরে আকরাম (ছঃ) তাশরীফ ানিতেছেন। হুজুরের শুভাগমনে সমস্ত বালাখানা নূরের জ্যোতিতে লমল করিয়া উঠিল, হুজুর আমার দিকে তাশরীফ আনিয়া এরশাদ রমাইলেন যেই মুখে তুমি আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িতেছ সই মুখ হাজির কর আমি তাহাতে চুম্বন করিব। আমি লজ্জিত হইয়া গলাম কি করিয়া হুজুরের মুখ মোবারকের দিকে আমার মুখ পেশ করি। াই লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লই। হুজুর আমার চেহারায় চুম্বন রিলেন। শঙ্কিত অবস্থায় আমার চোখ খুলিয়া গেল। আমার পেরে- ানীতে আমার স্ত্রীরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা উভয়ে দেখিতে পাইলাম

সমস্ত বালাখানা মেশকের খুশবুতে ভর্তি হইয়া গিয়াছে এমন কি আমার চেহারা হইতে মেশ্‌ক আম্বরের সুগন্ধি আটদিন পর্যন্ত ছড়াইতেছিল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৩১) মোহাম্মদ বিন মালেক বলেন, আমি কারী আবু বকর এবনে মোজাহেদের নিকট কিছু অধ্যয়ন করার জন্য বাগদাদ শরীফ গমন করি যখন কেরাত পড়া হইতেছিল তখন আমরা কয়েকজন তাহার দরবারে হাজির হই। ইত্যবসরে আমি দেখিতে পাইলাম যে একজন বুজুর্গ বড় মিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মাথায় অনেক পুরাতন একটা পাগড়ী পরনে পুরাতন একটা জামা ও একখানা চাদর ছিল। কারী আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, নিজের জায়গায় বসাইলেন এবং তাঁহার পরিবার পরিজন কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বড় মিয়া বলিলেন গতরাত্রে আমাদের ঘরে একটা ছেলে সন্তান পয়দা হইয়াছে। বাড়ী হইতে কিছু ঘি এবং মধু নিবার হুকুম হইয়াছে। শায়েখ আবু বকর বলেন তাঁহার এই দুরবস্থার উপর আমার বড় দুঃখ হইল। এবং এই চিন্তা ফিকির অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া গেল। আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হুজুরে পাক (ছঃ) আমাকে বলিতেছেন, চিন্তা ফিকিরের কোন কারণ নাই তুমি উজির আলী বিন ঈছার নিকট যাও এবং তাহার নিকট গিয়া আমার ছালাম বল এবং তাহার নিকট এই আলামত বর্ণনা কর যে তুমি প্রত্যেক রাত্রে এক হাজার বার দরূদ পড়া ব্যতীত নিদ্রা যাওনা এবং এই জুমার রাত্রে সাতশত বার পড়ার পর তোমাকে ডাকিবার জন্য বাদশার লোক আসিয়াছিল, তুমি আসিয়া বাকী তিনশত আদায় করিয়াছ, এই আলামত বর্ণনা করার পর তাহার নিকট বলিবা যে সে যেন অমুক নবজাত শিশুর পিতাকে একশত আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) দিয়া দেয় যদ্বারা সে আপন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র খরিদ করিতে পারে।

এই স্বপ্ন দেখার পর কারী আবু বকর উঠিলেন এবং সেই শিশুর পিতা বড় মিয়াকে সঙ্গে করিয়া উজীরের নিকট পৌঁছিলেন। কারী সাহেব উজীরকে বলিলেন, এই বড় মিয়াকে নবীয়ে করীম (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। উজীর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নিজের জায়গায় বসাইলেন ও তাঁহার নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। শায়েখ আবু বকর বিস্তারিত ঘটনা উজীরকে জানাইলেন যদ্বারা আতিশয় আনন্দিত হইলেন ও আপন

গোলামকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন দশ হাজার দীনারের একটা তোড়া নিয়া আসে। সেখান হইতে একশত দীনার সেই শিশুর পিতার হাতে দিয়া দিলেন তারপর একশত দীনার শায়েখ আবু বকরকে দিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি লইতে অস্বীকার করিলেন। উজীর বলিলেন, হুজুর এই এক হাজার বার দরূদ শরীফ ওয়ালা ঘটনা আমার একটা গুপ্ত রহস্য যাহা আমার আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতনা। তারপর তিনি আরও একশত দীনার বাহির করিয়া বলিলেন ইহা ঐ সুসংবাদের পরিবর্তে যে হুজুর আমার দরূদের বিষয় অবগত আছেন। তারপর অন্য একশত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল ইহা আপনি যে কষ্ট করিয়া এই পর্যন্ত আসিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে দেওয়া হইল। এইভাবে একশত করিয়া এক হাজার আশরাফী বাহির করিল। কিন্তু কারী সাহেব বলিলেন আমরা একশত আশরাফীর অধিক গ্রহণ করিব না কেননা হুজুরে পাক (ছঃ) ঐ পরিমাণ গ্রহণ করিবার জন্যই নির্দেশ দিয়াছেন। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪০) আবদুর রহমান এব্‌নে আবদুর রহমান (রঃ) বলেন, একবার গোছলখানায় পড়িয়া গিয়া আমার হাতে খুব ব্যাথা পাই এবং হাত ফুলিয়া যায়। আমি পেরেশান অবস্থায় রাত্রি যাপন করি। নিদ্রিতাবস্থায় আমি হুজুরে পাক (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম। আরজ করিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! হুজুর এরশাদ করিলেন তোমার ব্যাথায় আমি পেরেশান। আমার চোখ খুলিল পর দেখিলাম হাতে ব্যথা এবং ফুলা কোনটাই আর নাই।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪১) আল্লামা ছাখাবী (রঃ) বলেন শায়েখ আহমদ বিন রাছ্‌লানের জনৈক বিশ্বস্ত শাগরেদ আমার নিকট বর্ণনা করেন তিনি স্বপ্নযোগে হুজুরে পাকের জিয়ারত লাভ করেন। হুজুরের খেদমতে নাকি আমার লিখিত "কওলে বাদী ফিছ্‌ছালাতে আলাল হাবীবিশ শাফী" এই গ্রন্থ পেশ করা হয়। এবং হুজুর (ছঃ) উহাকে কবুলও করেন। উহাতে শুধুমাত্র দরূদেরই বর্ণনা রহিয়াছে।

এই স্বপ্ন শুনিয়া আমি যারপর নাই আনন্দিত হই এবং আল্লাহ ও

রাছুল উহাকে কবুল করিবেন বলিয়া আশা রাখি এবং ইহকাল ও পরকালে বেশী বেশী ছওয়াবের আশা পোষণ করি ; সুতরাং হে পাঠক পাঠিকা ভাই বোনেরা আপনারাও আমার প্রিয় নবীকে তাঁহার যথার্থ গুণাবলীর সহিত স্মরণ করুন। এবং জানে প্রাণে হুজুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করুন। কেননা আপনাদের দরূদ প্রিয় নবীর কবর শরীফ পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে। এবং হুজুরের খেদমতে আপনাদের নামও পৌঁছিয়া থাকে। (বাদী)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَاَتْبَاعِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ -

ইয়া রাবেব ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪২) আবুবকর এব্‌নে মোহাম্মদ হইতে আল্লামা ছাখাবী বর্ণনা করেন আমি হজরত আবু বকর এব্‌নে মোজাহেদ (রঃ) এর নিকট ছিলাম। ইত্যবসরে শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রঃ) সেখানে তাশরীফ আনেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবুবকর এব্‌নে মোজাহেদ দাঁড়াইয়া গেলেন তাঁহার সহিত মোয়ানাকা করিলেন ও তাঁহার কপালে চুম্বন করিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জনাব। আপনি ও বাগদাদের অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম মনে করেন যে ইনি একজন পাগল। তিনি বলিলেন আমি তো ঐ কাজ করিয়াছি যাহা করিতে হুজুরে পাক (ছঃ) কে আমি দেখিয়াছি তারপর তিনি আপন স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, খাবে আমার নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ হয়। তখন হুজুরের দরবারে ইনি হাজির হন। হুজুর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করেন এবং আমার নাম জিজ্ঞাসা করার পর প্রিয় নবী এরশাদ করেন। এই ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর لقد جاءكم رسول "লাকাদ জা-আকুম রাছুলুন" শেষ পর্যন্ত পড়িয়া আমার উপর দরূদ পড়িয়া থাকেন। অন্য রেওয়ায়েতে আসিয়াছে তিনি ঐ আয়াত পড়ার পর আমার উপর তিনবার ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু, ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদু, ছাল্লাল্লাহু

আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু পড়িয়া থাকেন।

এই স্বপ্ন দেখার পর হজরত শিবলী যখন আমার নিকট আসেন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনি নামাজের পর কি দরূদ পড়িয়া থাকেন তিনি আমাকে এই দরূদের কথাই বলেন।

অন্যত্র আছে আবুল কাছেম খাফ্‌ফাফ (রঃ) বলেন, একবার হজরত শিবলী আবু বকর এব্‌নে মুজাহেদের মসজিদে গিয়াছিলেন। আবু বকর তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। আবুবকরের ছাত্রগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর আপনার দরবারে উজীরে আজম আসিলেও তাঁহার সম্মানার্থে আপনি দণ্ডায়মান হন না অথচ শিবলীর জন্য আপনি দাঁড়াইয়া গেলেন, তিনি বলিলেন আমি এমন ব্যক্তির জন্য কেন দাঁড়াইবনা যাহার জন্য স্বয়ং হুজুরে পাক (ছঃ) দাঁড়াইয়া থাকেন। তারপর ওস্তাদজী নিজের স্বপ্নের হালত বর্ণনা করেন এবং বলেন যে আমি রাত্রিবেলায় হুজুরে পাক (ছঃ)-কে দেখিতে পাই যে হুজুর এরশাদ করিতেছেন আগামীকাল তোমার নিকট একজন বেহেস্তীলোক আসিবে। সে আসিলে তুমি তাহার সম্মান করিবে। আবু বকর বলেন ঐ ঘটনার দুই একদিন পর আমি আবার প্রিয় নবীকে স্বপ্ন দেখিতে পাই যে, হুজুর এরশাদ করিতেছেন আবু বকর। আল্লাহ পাক তোমার ঐভাবে ইজ্জত করুন যেইভাবে নাকি তুমি একজন জান্নাতীর ইজ্জত করিয়াছ। আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ। কোন্ কারণে আপনার দরবারে শিবলীর এত ইজ্জত। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন এই ব্যক্তি দীর্ঘ আশী বৎসর যাবত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর 'লাকাদ জা আকুম রাছুলুন্' এই আয়াত পড়িয়া থাকে। (বাদী)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা।
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৩) এহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী (রঃ) আবদুল ওয়াহেদ বিন জায়েদ বছরী হইতে বর্ণনা করেন যে, আমি হজ্ব করিতে যাইতেছিলাম। আমার একজন ছফরের সাথী ছিলেন যিনি সবসময় উঠা বসায় চলা ফেরায় দরূদ শরীফ পাঠ করিতেন। আমি তাহাকে এত অধিক দরূদ শরীফ কেন পড়িতেছে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন আমি যখন প্রথম বার হজ্ব করিতে যাই তখন আমার পিতাও আমার সহিত ছিলেন। ফিরিবার পথে আমরা এক মঞ্জিলে শুইয়া পড়িলাম। আমি স্বপ্নে দেখিতে

পাই যে এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন উঠ তোমার পিতা মারা গিয়াছে এবং তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া গিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখি যে সত্য সত্যই আমার পিতার এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার চেহারা কাল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আমি এত বেশী চিন্তিত হইয়া পড়িলাম যে চিন্তায় আমি অস্থির হইয়া গেলাম। আমি দ্বিতীয়বার আবার স্বপ্নে দেখিলাম যে আমার পিতার মাথার নিকট চারজন বিশ্রী হাবশী লোক নিযুক্ত আছে। তাহাদের হাতে লৌহের ডাণ্ডা রহিয়াছে। ইত্যবসরে অন্য একজন অপূর্ব সুন্দর চেহারাওয়ালা জনৈক বুজুর্গ সবুজ জোড়া পরিহিত অবস্থায় তাশরীফ আনিলেন ও ঐ হাবশীদিগকে হটাইয়া দিলেন এবং আমার পিতার চেহারায় হাত ফিরাইয়া এরশাদ করিলেন উঠ আল্লাহ পাক তোমার পিতার চেহারা রওশন করিয়া দিয়াছেন। আমি বলিলাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনি কে? তিনি বলিলেন আমার নাম মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম, তারপর হইতে আমি দরূদ শরীফ আর কখনও ত্যাগ করি নাই।

নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা আবু হামেদ কাজবীনী বর্ণনা করেন যে জনৈক পিতা পুত্র একত্রে ছফর করিতেছিল। পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া যায় এবং তাহার মাথা শূকরের মাথার মত হইয়া যায়। ছেলে কান্নাকাটি করিয়া অস্থির হইয়া আল্লার দরবারে দোয়া করিতে থাকে। হঠাৎ তাহার নিদ্রা আসিয়া যায়, এবং সে স্বপ্নে দেখিতে পায় যে, কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিতেছে তোমার পিতা সুদ খাইত তাই সে বদ ছুরত হইয়া গিয়াছে কিন্তু হুজুর (ছঃ) তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন কেননা সে হুজুরের নাম শুনা মাত্রই তাঁহার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিত, ইহাতে আল্লাহ পাক তাহার ছুরত ভাল করিয়া দিয়াছেন।

রওজুল ফায়েক গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হজরত ছুফিয়ান ছুরী (রঃ) বলেন যে, আমি তওয়াফ করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে সে প্রতি কদমে কদমে কোন প্রকার দোয়া না পড়িয়া শুধু দরূদ শরীফ পড়িতেছে, আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম আমি ছুফিয়ান ছুরী। সে বলিল আপনি যদি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতেন তবে আমার রহস্যের কথা বর্ণনা করিতাম না। তারপর লোকটি বলিতে লাগিল আমি এবং

আমার পিতা হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল হইয়া গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়া তাহার চেহারা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। ঐ সময়ে আমার নিদ্রা আসিয়া যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব সুন্দর লোক যাহার মত এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিষ্কার পোশাকও আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাঁহার চেয়ে অধিক খুশবু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই, তিনি খুব দ্রুত কদমে আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া উহাতে আপন হাত ফিরাইয়া দেন, যাহাতে পিতার চেহারা সাদা হইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাঁহার আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উছিলায় এই পর দেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মদ এব্‌নে আবদুল্লাহ যাহার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পাপী ছিল কিন্তু আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিত। বিপদের সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি।

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم
يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
شفع نبيك في ذلي ومسكنتي
واستر فانك ذو فضل وذو كرم
واغفر ذنوبي وسامحني بها كرما
تفضلا منك يا ذا الفضل والنعم
ان لم تغثني بعفو منك يا املي
واخجلتي واحيائي منك واندمي
يا رب صل على الهادي البشير ومن
له الشفاعة في العاصي اخي الندم
يا رب صل على المختار من مضر

ازكى الخلائق من عرب ومن عجم
يا رب صل على خير الانام ومن
ساد القبائل في الانساب والشيم
على عليه الذي اعطاه منزلة
علياء اذ كان حقا افضل الامم
صلى عليه الذي اعلاه مرتبة
ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم
صلى عليه صلوة لا انقطاع لها
مولاه ثم على صحب وذي رحم

অর্থ : - ( ) হে পাক জাত যিনি নিবীড় অন্ধকারের মধ্যে পেরেশান হালের ডাকে সাড়া দিয়া থাকেন, হে পাক জাত যিনি অসুস্থ ও রুগীর রোগ আরোগ্যকারী।

(২) আপনি আমার দুর্বলতার মধ্যে হুজুরের সুপারিশ কবুল করিয়া লউন এবং আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দিন। নিশ্চয় আপনি অতিশয় দয়াবান।

(৩) হে এহ্‌ছান ও নেয়ামত ওয়ালা, স্বীয় দয়া ও মেহেরবানীর দ্বারা আপনি আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিন!

(৪) হে আমার আশা ভরসার স্থল আপনি যদি নিজ ক্ষমা গুণে আমার সাহায্য না করেন তবে আমি কতই না লজ্জিত হইব।

(৫) হে আমার প্রতিপালক! যিনি বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদ বহনকারী এবং হাদী এবং লজ্জিত ও পাপীদের জন্য যিনি সুপারিশ করিবেন তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন।

(৬) হে রব! রহমত বর্ষণ করুণ ঐ ব্যক্তির উপর যিনি মোজার গোত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যিনি আরব ও আজম অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

(৭) হে পরওয়ারদেগার! যিনি সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বংশ ও আখলাখ হিসাবে সারা বিশ্বের সেরা। তানার উপর দরূদ পাঠান।

(৮) যেই জাতে পাক হুজুরকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদায় পৌঁছাইয়াছেন তিনিই হুজুরের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন, কেননা তিনি উহার উপযুক্ত ও সমস্ত সৃষ্টির সেরা।

(৯) ঐ খোদা তাঁহার উপর দরূদ পাঠাইতেছেন যিনি তাঁহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছেন আবার তাঁহাকে আপন বন্ধু রূপে বরণ করার জন্য

নির্বাচন করিয়াছেন।

(১৩) তাঁহার মনিব তাঁহার উপর এবং তাঁহার ছাহাবা ও আত্মীয় স্বজনদের উপর দরূদ পাঠাইতেছেন।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৪) নোজহাতুল মাজালেজ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক ব্যক্তি একজন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ ব্যক্তির নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃত্যুর যাতনা আপনি কিরূপ ভোগ করিতেছেন। তিনি বলিলেন কিছুই অনুভব করিতেছিনা কেননা আমি ওলামাদের নিকট শুনিয়াছি, যে বেশী বেশী করিয়া দরূদ পড়িবে সে মৃত্যুর যাতনা হইতে হেফাজতে থাকিবে।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৫) নোজাহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে লিখিত আছে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তির পেশাব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তিনি স্বপ্নযোগে আরেফবিল্লাহ হজরত শায়েখ শেহাবুদ্দিন এব্নে রাছলানকে দেখিতে পান, লোকটি তাঁহার নিকট স্বীয় রোগ এবং কষ্টের বিষয় অভিযোগ করিলেন, তিনি বলিলেন তুমি পরীক্ষিত সুধা হইতে কেন গাফেল থাকিতেছ? এই দরূদ পড়িতে থাক—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
فِى الْاَرْوَاحِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُلُوْبِ
وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى
قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ-

নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবার পর সেই বুজুর্গ এই দরূদ অধিক পরিমাণ পড়িলেন। ফলে তাহার রোগ দুর হইয়া গেল।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১৬) হাফেজ আবু নাঈম হজরত ছুফিয়ান ছুরী হইতে বর্ণনা করেন যে আমি এক সময় কোথাও বাহিরে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে একজন যুবক যখনই কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে-

"অ াল্লাহুমা ছাল্লেআলা মোহাম্মাদিন অ আলা আ-লে মোহাম্মাদিন।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দ্বারা করিতেছ, না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ। যুবক বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম ছুফিয়ান ছুরী, সে বলিল ইরাকওয়ালা ছুফিয়ান? আমি বলিলাম হাঁ। যুবক বলিল আপনার আল্লার মারফত হাছেল আছে কি? বলিলাম হাঁ আছে। সে বলিল কিভাবে আছে, আমি বলিলাম রাত্র হইতে দিন বাহির করে, দিন হইতে রাত্র, মায়ের পেটে বাচ্চার ছুরত দান করে। সে বলিল আপনি কিছুই চিনেন নাই। আমি বলিলাম তা হইলে তুমি কিভাবে আল্লার মারফত হাছিল করিলে, যুবক বলিল কোন কাজের জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করি কিন্তু তবুও উহা ত্যাগ করিতে হয়। আর কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি কিন্তু উহা করিতে পারিনা ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম যে নিশ্চয় একজন আছেন। যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন। আমি বলিলাম তোমার এই দরূদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হজ্বে গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমার মা মারা যান তাহার মুখ কালো হইয়া যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়। মনে হইল তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন। তাই আমি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হেজাজের দিক হইতে একটা মেঘ খণ্ড আসিল আর সেখান হইতে একজন লোক জাহের হইল। তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা তাহার মুখ রওশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম আপনি কে যাঁহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম। আমি আরজ করিলাম হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুজুর বলিলেন যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে "আল্লাহুমা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিঁও আ-লা আলে মোহাম্মাদিন।

(নোজহাত)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৮) এহ্ইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন এন্তেকাল করেন তখন হজরত ওমর (রাঃ) ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা বলিতেছিলেন ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক একটি খেজুরের খুঁটি আপনার জন্য ক্রন্দন করিয়াছিল, মিম্বার তৈরীর পূর্বে যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া আপনি খোত্বা পাঠ

করিতেন। মিম্বার তৈরীর পর উহাকে ত্যাগ করিয়া মিম্বারে দাঁড়াইয়া যখন আপনি খোত্‌বা পাঠ করেন তখন সে আপনার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করিতে থাকে। অতঃপর আপন হাত মোবারকের স্পর্শে উহার ক্রন্দন থামিয়া যায়। ইয়া রাছূলাল্লাহ! সেই খুঁটির চেয়ে আপনার উম্মত ক্রন্দনের অধিক বেশী উপযোগী। কেননা তাহারা আপনার দয়ার বেশী বেশী মুখাপেক্ষী।

ইয়া রাছূলাল্লাহ। আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার উচ্চ মর্যাদা আল্লার দরবারে এত বেশী যে আপনার তাবেদারীকে আল্লাহ পাক কোরানে মজীদে নিজের তাবে'দারী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কোরানে মজীদে এরশাদ হইতেছে—

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে রাছূলের তাবেদারী করিল সে খোদার তাবেদার করিল।"

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কোরবান হউক আপনার ফজীলত আল্লার দরবারে এত উচ্চে যে আপনার নিকট হইতে হিসাব নেওয়ার পূর্বেই ক্ষমার ঘোষণা রহিয়াছে—

عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ

"আল্লাহ পাক আপনাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন, আপনি সেই মোনাফেকদিগকে যাইবার অনুমতি কেন দিলেন।"

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আপনার শান আল্লার দরবারে এত উঁচু যে আপনি যদিও শেষ নবী হিসাবে আগমন করিয়াছেন কিন্তু নবীদের নিকট হইতে যখন অঙ্গীকার লওয়া হইয়াছিল তখন আপনার নামই প্রথম উল্লেখ করা হয়।

اِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আল্লার দরবারে আপনার ফজীলতের এই শান যে কাফেরগণ জাহান্নামের মধ্যে পড়িয়াও আপনার তাবেদারীর আকাংখায় আফছোছ করিতে থাকিবে।

يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

"আফ্‌ছোছ! আমরা যদি আল্লাহ ও রাছূলের তাবেদারী করিতাম'। ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, যদি মুছা (আঃ) কে এই মোজেজা দান করিয়া থাকেন যে পাথর হইতে নহর জারী করিয়াছেন তবে ইহা উহার চেয়ে আশ্চর্য্য নয় যে, আল্লাহ পাক আপনার আঙ্গুল হইতে পানি জারি করিয়াছেন।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ছোলায়মান (আঃ) কে হাওয়া সকাল বেলায় একমাসের এবং বিকাল বেলায় একমাসের পথ অতিক্রম করাইয়া থাকেন তবে উহা ইহার চেয়ে আশ্চার্যের নয় যে আপনার বোরাক রাত্রি বেলায় সপ্ত আকাশ ছফর করাইয়া ভোর বেলায় আপনাকে মক্কাশরীফ পৌছাইয়া দিয়াছেন "ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছূলাহ"।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক যদি হযরত ঈছা (আঃ) কে আল্লাহ পাক এই মোজেজা দান করিয়া থাকেন যে তিনি মুর্দাকে জিন্দা করিতে পারিতেন তবে ইহা উহার চেয়ে অধিক আশ্চর্য্য নয় যে, একটি বকরী যখন টুকরা টুকরা হইয়া ভুনা হইয়া গিয়াছিল তখন উহা আপনাকে অনুরোধ জানাইল যে হুজুর আমাকে খাইবেন না যেহেতু আমার মধ্যে বিষ মিলান আছে।

ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, হযরত নুহ (আঃ) আপন জাতির জন্য এই বলিয়া বদ দোয়া করেন যে "হে খোদা! জমীনের উপর একজন কাফেরকেও জিন্দা রাখিবেন না" আর আপনি যদি আমাদের জন্য বদ দো'য়া করিতেন তবে আমরা একজনও জীবিত থাকিতাম না অথচ কাফেরগণ আপনার পিঠ মোবারককে পদ দলিত করিয়াছে যখন আপনি সেজদা অবস্থায় ছিলেন আপনার পিঠের উপর উটের আঁতুড়ি উঠাইয়া দিয়াছিল এবং অহুদের যুদ্ধে আপনার চেহারা মোবারককে রক্তে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিল আপনার দান্দান মোবারক শহীদ করিয়া দিয়াছিল অথচ তখন আপনি বদ দোয়ার পরিবর্তে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,

আল্লাহুম্মাগফির লেকাওমী ফাইন্নাহুম লা-ইয়ালামুনা 'হে খোদা আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করিয়া দিন যেহেতু তাহারা আমাকে চিনে না।" ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক,

শুধু মাত্র তেইশ বৎসরের নবুওতের জামানায় আপনার উপর কত লক্ষ লোক ঈমান আনয়ন করিয়াছে এমন কি শুধু বিদায় হজ্জের তারিখেই আরাফাতের ময়দানে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার লোক ছিল যাহারা হাজির ছিলেন। তাহাদের সংখ্যা আল্লাহপাকই জানেন। আর হযরত নূহ (আঃ) দীর্ঘ এক হাজার বৎসর পরিশ্রম করার পরও মাত্র স্বল্প সংখ্যক অর্থাৎ বিরাশী কি তিরাশী জন লোক তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল।

ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি যদি আপনার সম মর্যাদার লোকের সহিত উঠাবসা করিতেন তবে আমাদের সহিত কখনও উঠাবসা করিতেন না আর আপনি যদি আপনার সম পর্য্যায়ের মেয়েদিগকেই বিবাহ করিতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার বিবাহ হইত না আর আপনি যদি আপন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সহিত খানা খাইতেন তবে আমাদের কাহারও সহিত আপনার খানা খাওয়া হইত না নিশ্চয় আপনি আমাদের সহিত বসিয়াছেন, আমাদের মেয়েদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, আমাদিগকে নিজের সহিত খানা খাওয়াইয়াছেন, পশমের কাপড় পরিয়াছেন গাধার উপর ছওয়ার হইয়াছেন এবং নিজের পিছনে অন্যকে বসাইয়াছেন এবং খাওয়ার পর আপন আঙ্গুলীসমূহকে চাটিয়া খাইয়াছেন, এই সব আপনি একমাত্র বিনয় এবং নম্রতার খাতিরে করিয়াছেন। (ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্)

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৬৮) নোজহাতুল বাছাতীন গ্রন্থে হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, এক সময় ছফরের হালতে আমার খুব পিপাসা হইয়াছিল। এমন কি পিপাসায় কাতর হইয়া আমি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাই। কোন এক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ছড়াইয়া দিল, আমি চোখ খুলিয়া দেখিলাম। সে আমাকে পানি পান করাইয়া বলিল আমার সহিত চল। আমি তাহার সহিত সামান্য পথ চলিলাম পরই যুবক বলিল তুমি কি দেখিতেছ? আমি বলিলাম ইহাত মদীনায়ে মোনাওয়ারা। তিনি বলিলেন যাও হজরত রাছুলে খোদা (ছঃ) এর খেদমতে আমার ছালাম পৌছাইয়া বলিও যে আপনার ভাই খিজির আপনার খেদমতে ছালাম বলিতেছে। শায়েখ আবুল খায়ের আকতা (রঃ) বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়া পাঁচদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ পাঁচদিন পর্য্যন্ত

আমি তেমন কোন মনের খোরাক পাইতেছিলাম না, অন্যত্র আছে পাঁচদিন যাবত আমি কিছুই খাইতে পাই নাই। তাই আমি কবর শরীফের নিকট গিয়া হুজুরে পাক (ছঃ) এবং হজরত আবু বকর ও হজরত ওমরকে ছালাম আরজ করিয়া বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ আজ আমি আপনার মেহ্মান। তারপর সেখান হইতে একটু সরিয়া মিম্বরের পিছনে আমি শুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে আমি হুজুরকে দেখিতে পাইলাম যে হুজুরের ডানদিকে হজরত ছিদ্দীকে আকবর বামদিকে ওমরে ফারুক ও সামনে হজরত আলী (রাঃ)। হজরত আলী (রাঃ) আমাকে নাড়া দিয়া বলিলেন উঠ হুজুরে পাক তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিলাম ও প্রিয় নবীর দুই চোখের মাঝখানে চুম্বন করিলাম। হুজুর আমাকে একটা রুটি দান করিলেন আমি উহার অর্ধেক খাইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখি বাকী অর্ধেক আমার হাতে রহিয়াছে।

ফাজায়েলে হজ্ব কিতাবেও এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। শায়খুল মাশায়েখ হজরত শাহ অলিউল্লাহ্ মোহাদ্দেছে দেহলবী (রঃ) "হেরজে ছামানী ফী মোবাশ্ শেরা-তিন নবীয়িল আমীন" নামক পুস্তিকায় খাব অথবা মোকাশাফা নিজের অথবা নিজের পিতার হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত সম্পর্কে লিখিয়াছেন। সেখানে তিনি এই ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন যে একদিন আমার খুব বেশী ক্ষুধা পাইয়াছিল। জানা নাই যে কয়দিনের ভুখা ছিলাম, আমি আল্লার দরবারে দোয়া করিলাম তখন দেখিলাম যে, নবীয়ে করীম (ছঃ) এর রুহ মোবারক আছমান হইতে অবতরণ করিলেন। হুজুরের সহিত একটা রুটি ছিল। মনে হইল যেন সেই রুটি হুজুরকে আমাকে দেওয়ার জন্য নির্দেশ হইয়াছে। অন্য এক স্থানে বর্ণনা করিতেছেন যে একদিন রাত্রি বেলায় আমার কিছুই খাবার জুটে নাই। আমার বন্ধুবর্গ হইতে জনৈক বন্ধু এক পেয়ালা দুধ পেশ করিলেন। আমি উহা পান করিয়া শুইয়া পড়িলাম স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত নছীব হইল হুজুর এরশাদ করিলেন দুধ তোমার জন্য আমিই পাঠাইয়াছিলাম। অর্থাৎ সেই লোকটার অন্তরে দুধ দেওয়ার খেয়াল আমার তরফ হইতে হইয়াছিল।

হজরত শাহ ছাহেব আরও বলেন যে, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নাকি একবার অসুস্থ হইয়া পড়েন, স্বপ্নে হুজুরের জিয়ারত লাভ হয়। হুজুর এরশাদ করেন বেটা শরীর কেমন আছে, তাঁহাকে হুজুর (ছঃ) আরোগ্য লাভের সুসংবাদ দান করেন এবং আপন

দাড়ি মোবারক হইতে দুইটা পশম মোবারক দান করেন, তখনই আমি সুস্থ হইয়া যাই এবং জাগ্রত হইয়া ঐ দুইটি পশম মোবারক আমার হাতের মধ্যে দেখিতে পাই, হজরত শাহ ছাহেব বলেন ঐ দুই পশম হইতে আব্বাজান একটা আমাকে দান করেন।

শাহ ছাহেব অন্যত্র বয়ান করেন যে, আব্বাজান বলেন ছাত্র বয়সে একবার আমার খেয়াল হইয়াছিল যে, "ছওমে বেছাল" অর্থাৎ রোজার পর রোজা রাখি, কিন্তু ইহাতে ওলামাদের মতভেদের কারণে কিছুটা সন্দিহান হইয়া পড়ি যে, উহা করিব কি না করিব। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে হুজুরে পাক (ছঃ) আমাকে একটা রুটি দান করিলেন। হুজুরের সাথে হজরত আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ) ছিলেন। হযরত ছিদ্দীকে আকবর বলিলেন "আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন্" অর্থাৎ হাদিয়ার মধ্যে উপস্থিত সকলেরই হক রহিয়াছে। আমি যেই তাঁহার সম্মুখে রাখিলাম, তিনি উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন। তারপর ওমর ফারুক বলিলেন 'আল হাদায়া মোশতারকাতুন্'। আমি রুটি তাঁহার সামনে রাখিলে তিনিও উহা হইতে একটা টুকরা ভাঙ্গিয়া লইলেন, অতঃপর হযরত ওসমান বলিলেন 'আল্ হাদায়া মোশতারাকাতুন আমি বলিলাম এইভাবে হাদিয়া বন্টন হইতে থাকিলে আমি ফকীরের জন্য আর কি বাকী থাকিবে, 'হেরজে ছামীন' গ্রন্থে কিচ্ছা এই পর্যন্তই খতম। শাহ ছাহেবের অন্য কিতাব আনফাছুল আরেফীনে' লিখিত আছে তিনি বলেন আমি ঘুম হইতে জাগিয়া এই বিষয় চিন্তা করিলাম যে শায়খাইনকে ত রুটি দিলাম কিন্তু হজরত ওসমানকে কেন বাধা দিলাম। আমার দেমাগে এই কথা আসিল যে আমার নকশেবন্দী তরীকার নেছবত হজরত আবু বকর পর্য্যন্ত মিলিত হয় আর আমার বংশের নেছবত হজরত ওমর পর্য্যন্ত পৌছে। কিন্তু হজরত ওসমানের সহিত আমার মারফত এবং খান্দান কোনটারই সম্পর্ক নাই। এইজন্য সেখানে বাধা দিবার সাহস হয়।

শাহ ছাহেব হেরজে ছামীন গ্রন্থে আর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে আব্বাজান এরশাদ করেন, আমি একবার রমজান মাসে ছফর করিতেছিলাম ভীষণ গরমের দিন ছিল বিধায় আমার খুব কষ্ট হইতেছিল। ঐ অবস্থায় আমার নিদ্রা আসিয়া যায়। আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করি, হুজুর আমাকে অপূর্ব খাবার দান করিলেন যার মধ্যে চাউল ঘি

মিষ্টি এবং জাফরান যথেষ্ট ছিল। আমি উহা পেট ভরিয়া খাইলাম তারপর হুজুর আমাকে পানিও দিলেন; আমি উহা তৃপ্তি সহকারে পান করিলাম ইহাতে আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হইয়া গেল, আমার যখন চোখ খুলিল তখন হাত হইতে জাফরানের খুশবু আসিতেছিল।

এই সব ঘটনায় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আহ্‌লে ছুন্নত অল জমাতের আকীদা মোতাবেক আওলিয়াদের কেরামত হক বলিয়া আমার বিশ্বাস করি। পবিত্র কালামে পাকে বর্ণিত আছে "হযরত মরিয়মের নিকট মেহ্‌রাবের মধ্যে যখন হযরত জাকারিয়া যাইতেন তখন তাঁহার নিকট রিজিক পাইতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন মরিয়ম এই সব কোথা হইতে আসিল? তিনি বলিতেন ইহা আমার প্রভুর তরফ হইতে আসিয়াছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা অনুপোযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রিজিক দান করেন।

দোররে মানছুরে বর্ণিত আছে অসময়ে তাঁহার নিকট থলিয়া ভরা অঙ্গুর থাকিত এবং গরমের দিনে শীতকালীন ফল এবং শীতকালে গমরকালীন ফল পাওয়া যাইত।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(৪৯) নোজহাতুল মাজালেছ গ্রন্থে একটি আজব কেচ্ছা বর্ণিত আছে যে; রাত এবং দিনের মধ্যে আপোসে এই নিয়া ঝগড়া হইল যে আমাদের মধ্যে কে ভাল; দিন বলিল আমি শ্রেষ্ঠ কেননা আমার মধ্যে তিনটি ফরজ আদায় করা হয় আর তোমার মধ্যে দুইটি ফরজ আর আমার মধ্যে জুমার দিন দোয়া কবুলিয়তের একটি বিশেষ সময় রহিয়াছে যাহাতে বান্দা যাহা চায় তাহাই পায়। এবং আমার মধ্যে রমজান মোবারকের রোজা রহিয়াছে। তোমার মধ্যে মানুষ নিদ্রিত এবং গাফেল থাকে আর আমার মধ্যে জাগ্রত এবং হুশিয়ার থাকে। আমার মধ্যে হরকত আছে আর হরকতের মধ্যেই বরকত। আমার মধ্যে সূর্য উদিত হয় যদদ্বারা সমগ্র দুনিয়া আলোকিত হইয়া যায়।

রাত বলিল তুমি যদি নিজের সূর্যের উপর গর্ব করিয়া থাক তবে আমার সূর্য হইল আল্লাহ ওয়ালাদের কলব, তাহাজ্জুদ পড়নেওয়ালা এবং আল্লার হেকমতের মধ্যে চিন্তা ফিকিরকারীদের অন্তর। তুমি সেই প্রেমিকদের শরাব পর্য্যন্ত কি করিয়া পৌঁছিতে পার যাহা নির্জনে আমার সহিত হইয়া

থাকে। মহান মে'রাজের মোকাবেলা তুমি কি করিয়া করিতে পার। আল্লাহ পাক হুজুর (ছঃ) কে ফরমাইতেছেন—

"আপনি রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ুন যাহা আপনাকে অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে"।

হে দিন। তুমি ইহার কি উত্তর দিতে পার? আমার মধ্যে শবে কদর রহিয়াছে। একমাত্র আল্লাহই জানেন যে উহাতে কত বেশী বেশী নেয়ামত দান করা হয়। প্রতিদিন শেষ রাত্রে আল্লাহ পাক বান্দাদিগকে ডাকিয়া বলেন কে আছে আমার নিকট প্রার্থনাকারী আমি তাহার প্রার্থনা কবুল করিব এবং কে আছ তওবাকারী আমি তাহার তওবা কবুল করিব। তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন 'ইয়া আইউহাল মোজ্জাম্মেলো কুমিল্লাইলা।' তুমি কি জাননা যে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ছোবহানাল্লাজী আছরা……

অর্থাৎ 'পাক পবিত্র ঐ খোদা যিনি রাত্রি বেলায় আপন বান্দাকে মসজিদে হারাম হইতে মসজিদে আকছায় নিয়া গেলেন' হুজুরের যাবতীয় মোজেজার মধ্যে মে'রাজের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। কাজী এয়াজ বলেন হুজুরের ফাজায়েলের মধ্যে মেরাজের কারামত হইল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা উহা বহু ফাজায়েলের সমষ্টি আল্লাহ পাকের সহিত কথোপকথন ও জিয়ারত, আম্বিয়ায়ে কেরামের ইমামত, ছিদরাতুল মোনতাহায় গমন, আল্লাহ পাকের বড় বড় নিদর্শন সমূহের পরিদর্শন। হুজুরের উচ্চ মর্যাদাসমূহের ঘটনাবলী 'কাছীদায়ে বোরদার' লিখক সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিয়াছেন এবং উহাকে হজরত থানবী (রঃ) নশরুত্তির গ্রন্থে তরজমা সহ উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হইতে এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে—

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَيْلًا اِلٰى حَرَمٍ

كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِىْ دَاجٍ مِّنَ الظُّلَمِ

وَبِتَّ تَرْقٰى اِلٰى اَنْ نِلْتَ مَنْزِلَةً

مِنْ قَابَ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرَكْ وَلَمْ تُرَمِ

وقدمتك جميع الانبياء بها

والرسل تقديم مخدوم على خدم

وانت تخترق السبع الطباق بهم

في موكب كنت فيه صاحب العلم

حتى اذا لم تدع شأوا لمستبق

من الدنو ولا مرقى لمستنم

خفضت كل مقام بالاضافة اذ

نوديت بالرفع مثل المفرد العلم

كيما تفوز بوصل اى مستتر

عن العيون وسر اى مكتتم

يا رب صل وسلم دائما ابدا

على حبيبك خير الخلق كلهم

অর্থ : (১) আপনি মক্কা শরীফের হারাম হইতে মসজিদে আকছার হারাম পর্য্যন্ত রাত্রি বেলায় ছফর করিয়াছেন, (অথচ দুই হারামের দূরত্ব চল্লিশ দিনের রাস্তা) যেমন পূর্ণ চন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া দীপ্তির সহিত চলে।

(২) আপনি উন্নতির এমন চরম শিখরে পৌঁছিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন যেখান পর্য্যন্ত না কেহ পৌঁছিবার ইচ্ছা করিয়াছে।

(৩) বায়তুল মোকাদ্দাছে আপনাকে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ইমাম

বানাইয়াছেন যেমন মাখদুম খাদেমগণের ইমাম হইয়া থাকে।

(৪) আপনি সাত তবক আকাশ ভেদ করিয়া যাইতেছিলেন ফেরেশতাদের এমন এক বাহিনীর সহিত যাহাদের ঝাণ্ডাবাহী সর্দার আপনি নিজেই ছিলেন।

(৫) আপনি মর্যাদার উচ্চ স্তরে ক্রমাগত যাইতেছিলেন এমন কি তখন নৈকট্য ও উচ্চ সীমার আর সীমা বাকী রহিল না।

(৬) উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছার অদ্বিতীয় ভাবে যখন আপনাকে আহ্বান করা হইল তখন আপনি যে কোন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মাখলুককে নীচু করিয়া দিলেন।

(৭) আপনাকে এই জন্যই ডাকা হইয়াছিল তবে যেন আপনি পর্দার অন্তরালে রহস্যাবৃত থাকিয়া মিলনের দ্বারা সৌভাগ্যবান হইতে পারেন।

ونختم الكلام على وقعة الاسراء
بالصلوة على سيد اهل الاصطفا
وآله واصحابه اهل الاجتباء
ما دامت الارض والسماء

মে'রাজের ঘটনার উপর বক্তব্য আমরা এখানেই শেষ করিলাম ঐ জাতের উপর দরূদ পাঠ করিয়া যিনি সমস্ত নেক বান্দাদের সর্দার এবং যত দিন আছমান ও জমীন কায়েম থাকিবে তত দিন তাঁহার নির্বাচিত আ'ল ও আছহাবের উপর ছালাম দরূদ বর্ষিত হউক।

ইয়া রাব্বে ছাল্লে অ-ছাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা হাবীবেকা খায়রিল খালকে কুল্লেহিম।

(১০) এই ফাজায়েলের কিতাব সমূহ লিখিবার জমানায় এই অধম স্বয়ং অথবা কোন কোন সময় অন্য বন্ধুদের কিছু কিছু স্বপ্ন এবং সুসংবাদ হাছেল হইয়াছে, এই ফাজায়েলে দরূদ বই লিখিবার সময় এক রাত্রে আমাকে স্বপ্নের মধ্যে আদেশ করা হইল যে এই বইয়ের মধ্যে অবশ্যই 'কাছীদা অর্থাৎ প্রশংসা সম্বলিত কবিতা লিখিও। কিন্তু কোন্ কাছীদা লিখিব তাহা বলা হয় নাই। তবে এই অধমের দেমাগে স্বপ্নের মধ্যে অথবা দুই স্বপ্নের মধ্য ভাগে জাগ্রত অবস্থায় এ ধারণা আসিল যে ইশারা ঐ কাছীদার দিকে যাহা হযরত মাওলানা জামী (রাঃ) ইউছুফ জোলায়খা নামক গ্রন্থের শুরুতে লিখিয়াছিলেন। এই অধমের বয়স যখন দশ এগার

বৎসর তখন গঙ্গুহ নামক গ্রামে আমার পিতার নিকট ঐ কিতাব খানি পড়িয়াছিলাম, তখন আব্বাজান হজরত আলী সম্পর্কে মুখে মুখে আমাকে কেচ্ছা শুনাইয়াছিলেন। সেই কেচ্ছার কারণেই স্বপ্নের পর আমার খেয়াল তাঁহার কাছীদার দিকে ঝুঁকিয়া যায়। কেচ্ছা হইল এই যে—

হযরত জামী এই কাছীদা লেখার পর একবার হজ্বে রওয়ানা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মদীনায়ে মোনাওয়ারা পেঁীছিয়া হুজুরের দরবারে এই কাছীদা পাঠ করিবে। হজ্জ আদায় করার পর তিনি যখন মদীনা শরীফ জিয়ারতের এরাদা করিলেন তখন মক্কা শরীফের আমীর হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুজুর তাঁহাকে এরশাদ করিতেছেন যে, জামীকে মদীনায় আসিতে নিশেধ কর। মক্কার আমীর তাহাকে নিষেধ করিয়া দিল কিন্তু তাঁহার মধ্যে শওক ও মহব্বতের জয্‌বা এত প্রবল ছিল যে তিনি গোপনে মদীনা রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমীরে মক্কা দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখিলেন যে হুজুর এরশাদ করিতেছেন সে আসিতেছে তাহাকে আসিতে দিওনা। আমীরে মক্কা তাঁহার পিছনে লোকজন দৌড়াইল এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিল ও জোর পূর্বক তাঁহাকে জেলখানায় বন্দী করিয়া দিল। ইহার পর আমীরে মক্কা তৃতীয়বার হুজুরকে স্বপ্নে দেখিল। হুজুর এরশাদ করিতেছেন জামী কোন অপরাধী নয় সে কিছু কবিতা লিখিয়াছে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ঐগুলি আমার রওজার পাশে আসিয়া পাঠ করিবে। যদি সে ইহা করে তবে কবর হইতে মোছাফাহার জন্য আমার হাত বাহির হইবে যদ্দারা ফেত্‌না হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহার পর আমীর তাহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া বহুত ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই কেচ্ছা আমার শুনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্তমানে আমার দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা আর অসুস্থতার জন্য কোন কিতাব দেখিয়া হাওয়ালা দিবার সামর্থ নাই। হাঁ পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কোন কিতাবে এই ঘটনা পাইয়া থাকেন তবে আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে নিশ্চয় জানাইবেন আর আমার মৃত্যুর পর হইলে কিতাবের টিকায় লিখিয়া দিবেন।

এই কিচছার কারণেই এই অধমের খেয়াল সেই কাছীদার দিক যাইতেছে। এই ঘটনা কিছুটা অসম্ভবও নয়। কেননা অন্য একটি ঘটনা মশহুর রহিয়াছে যে বিখ্যাত ছুফী হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রঃ) ...

৫৫৫ হিজরীতে হুজুরে পাকের জিয়ারতের জন্য হাজির হন কবর শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া দুইটা বয়াত পড়িয়াছিলেন তখন কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে যাহাকে তিনি চুম্বন করেন ফাজায়েলে হজ্বে এই ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত আছে। রওজায়ে পাক হইতে ছালামের উত্তর আসার আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে।

কোন কোন বন্ধুবর্গের অভিমত আমার খাবের তা'বীর হইল "কাছীদায়ে বোরদাহ্।" তাই সেখান হইতেও কিছুটা অংশ লিখিত হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে উহার অর্থ হইল দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদা সমূহের মধ্য হইতে কোন এক কাছীদা। এইজন্য মাওলানা জামীর কাছীদার পর হযরত কাছেম নানাতবীর কাছীদার কিছুটা অংশও লিপিবদ্ধ করিয়া এই কিতাবকে সমাপ্ত করি। وما توفيقى الا بالله

মাওলানা জামীর কাছীদা ফারছি ভাষায় লিখিত, এবং আমাদের মাদ্রাসার নাজেম মাওলানা আছআদ উল্লাহ ছাহেবের ফারছি ভাষায় বিশেষ দক্ষতা ছাড়াও কবিতা লেখার মধ্যেও তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি রহিয়াছে। তদুপরি তিনি হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এর খলীফাও বটে, যদদ্বারা এশ্কে নববীর জয্বায়ও তিনি ভরপুর। আমি মাওলানার নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলাম যেন সেই কাছীদার তিনি উর্দুতে তরজমা করিয়া দেন। তিনি উহা কবুল করেন! তাই কাছীদার পরে উহার তরজমাও করিয়া দেওয়া হইল। তারপর কাছীদায়ে কাছেমী হইতে কিছু লিখিত হইল।

মাছনবীয়ে ওলানা জামী (রঃ)

ز مهجوری برآمد جان عالم - ترحم یا نبی الله ترحم

نه آخر رحمة للعالمینی - ز محرومان چرا غافل نشینی

ز خاک ای لاله سیراب برخیز -

چو نرگس خواب چند از خواب برخیز

برون آور سر از برد یمانی - که روی تست صبح زندگانی

شب اندوه ما را روز گردان - ز رویت روز ما فیروز گردان

به تن در پوش عنبر بوی جامه - بسر بربند کافوری عمامه

فرود آویز از سر گیسوان را
فگن سایه بپا سرو روان را
ادیم طائفی نعلین پا کن
شراک از رشتهٔ جانهای ما کن
جهانی دیده کرده فرش ره اند
چو فرش اقبال پا بوسش تو خواهند
ز حجره پای در صحن حرم نه
بفرق خاک ره بوسان قدم نه
بده دستی ز پا افتادگان را
بکن دلداری دلدادگان را
اگرچه غرق دریای گناهیم
فتاده خشک لب بر خاک راهیم
تو ابر رحمتی آن به که گاهی
کنی بر حال لب خشکان نگاهی
خوشا کز گرد ره سویت رسیدیم
بدیده گرد از کویت کشیدیم
بمسجد سجدهٔ شکرانه کردیم
چراغت را ز جان پروانه کردیم
بگرد روضه‌ات گشتیم گستاخ
دلم چون پنجره سوراخ سوراخ
زدیم از اشک بر چشم بی خواب
حریم آستان روضه‌ات آب
گهی رفتیم زان ساحت غباری
گهی چیدیم زو خاشاک و خاری
از آن نور سواد دیده دادیم

وزین پر ریش دل مرهم نهادیم
بسوئے مغفرت ره بر گرفتیم
ز چهره پایه اش در زر گرفتیم
ز محرابت بسجده کام جستیم
قدم گاهت بخون دیده شستیم
بپائے هر ستون قد راست کردیم
مقام راستان درخواست کردیم
ز داغ آرزویت با دل خوش
زدیم از دل بهر قندیل آتش
کنون گرتن نه خاک آن حریم ست
بحمد الله که جان آن جا مقیم ست
بخود درمانده ام از نفس خود رائے
ببین درماندهٔ چندین ببخشائے
اگر نبود چو لطفت دست یارے
ز دست ما نیاید هیچ کارے
قضا می افگند از راه مارا
خدا را از خدا در خواه مارا
که بخشد از یقین اول حیاتے
دهد آنگه بکار دین ثباتے
چو هول روز رستا خیز خیزد
بآتش آبروئے ما نریزد
کند با این همه گمراهی ما - ترا اذن شفاعت خواهی ما
چو چوگان سر فگنده اوری روئے
بمیدان شفاعت امتی گوئے

بحسن اهتمامت کار جامی . طفیل دیگراں یابد تمامی

অনুবাদ

(১) ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আপনার বিচেছদে সমস্ত সৃষ্ট জগতের প্রতিটি ধুলিকণা মর্মাহত, হে আল্লার পেয়ারা নবী! মেহেরবাণী পূর্বক আপনি একটু দয়া ও রহমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২) আপনি নিঃসন্দেহে সারা বিশ্ব ভূবনের জন্য রহমত স্বরূপ কাজেই আমাদের মত দুর্ভাগা হইতে আপনি কি করিয়া গাফেল থাকিতে পারেন।

(৩) হে অপূর্ব সুন্দর লালা ফুল! আপন সৌন্দর্য্য ও সৌরভের দ্বারা সারা জাহানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন, এবং ঘুমন্ত নারগিছ ফুলের মত জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্ববাসীকে উদ্ভাসিত করুন।

(৪) আপন চেহারা মোবারককে ইয়ামনী চাদরের পর্দা হইতে বাহির করিয়া দিন কেননা আপনার নুরানী চেহারা নবজীবনের প্রাতঃকাল স্বরূপ

(৫) আমাদের চিন্তাযুক্ত রাত্রি সমূহকে আপনি দিন বানাইয়া দিন এবং আপনার বিশ্ব সুন্দর চেহারার ঝলকে আমাদের দিনকে কামিয়াব করিয়া দিন।

(৬) পুত পবিত্র শরীর মোবারকে অভ্যাস মোতাবেক আম্বর যুক্ত পোশাক পরিধান করুন এবং শির মোবারকে কর্পূরসম শুভ্র পাগড়ী বাঁধুন।

(৭) মেশ্কে আম্বরের খুশ্বু বিচছুরিত চুলের ঝুপ্টিকে শির মোবারকে লটকাইয়া দিন, যেন উহার ছায়া আপনার বরকত ওয়ালা পায়ে পতিত হয়।

(৮) তায়েফের বিখ্যাত চামড়ার দ্বারা তৈরী পাদুকা পরিধান করুন এবং আমাদের জানের রাশিদ্বারা উহার ফিতা তৈরী করুন।

(৯) সমগ্র বিশ্ব ভুবন আপন চক্ষু ও দিলকে আপনার পথের বিছানা বানাইয়া রাখিয়াছে, এবং পরশের মত আপনার কদমবুচির গৌরব হাছেল করিতে চায়।

(১০) সবুজ গুম্বজের হুজরা শরীফ হইতে মসজিদের বারান্দায় তাশ-রীফ আনুন, আপনার পথের ধূলা চুম্বনকারীদের মাথার উপর কদম রাখুন।

(১১) দুর্বল ও অসহায়দের সাহায্য করুন আর খাঁটি প্রেমিকদের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

(১২) যদিও আমরা আপাদ মস্তক গোনাহের সাগরে ডুবিয়া আছি তবু আপনার মোবারক রাস্তায় পিপাসিত অবস্থায় শুষ্ক ঠোঁটে পড়িয়া আছি।

(১৩) আপনি রহমতের বাদল স্বরূপ, কাজেই পিপাসিত ও তৃষ্ণাতুর-

দের প্রতি মেহেরবাণীর দৃষ্টি করা আপনার সঞ্চয়।

(১৪) আমাদের জন্য কতই না উত্তম হইত যদি আমরা ধুলায় ধুসরিত হইয়া আপনার খেদমতে পৌছিতাম, এবং আপনার গলির মাটি দ্বারা চোখে সুরমা লাগাইতাম।

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم
خاک در رسول کا سرمہ لگائیں ہم

(১৫) মসজিদে নববীতে দুই রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করিতাম রওজায়ে পাকের জ্বলন্ত প্রদীপের জন্য নিজের ব্যথিত অন্তরকে পতঙ্গ বানাইতাম।

(১৬) রওজায়ে আতহার ও গুম্বজে খাজরাত (সবুজ গুম্বজের চারিপাশে এইভাবে পাগলের মত চক্কর দিতাম যেন অন্তর আপনার প্রেম ও মহব্বতের জখমে টুক্‌রা টক্‌রা হইয়া যাইত।

(১৭) আপনার পবিত্র রওজার আস্তানায় বিনিদ্র চক্ষুর মেঘ হইতে অশ্রুবারী বর্ষণ করিতাম।

(১৮) কখনও মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দান করিয়া ধুলাবালি পরিষ্কার করিবার গৌরব অর্জন করিতাম। আবার কখনও সেখানের আবর্জনা দূর করার সৌভাগ্য অর্জন করিতাম।

(১৯) যদিও ধুলিবালি চক্ষুর জন্য ক্ষতিকর তবুও উহা দ্বারা আমি চক্ষুর পুতুলের জন্য জ্যোঃতির উপায় করিতাম আর যদি আবর্জনা দ্বারা জখমের ক্ষতি হয় তবু উহা দ্বারা আমি দিলের জখমের জন্য পট্টি বাঁধিতাম।

(২০) আপনার মিম্বারের নিকট যাইতাম এবং উহার পায়ার তলে আপনার প্রেমিক সুলভ হলদে রং এর চেহারাকে ঘষিয়া সোনালী বানাইতাম

(২১) আপনার মোছল্লা এবং মেহরাব শরীফে নামাজ পড়িয়া পড়িয়া মনের আরজু পূর্ণ করিতাম ও প্রকৃত উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইতাম এবং মোছল্লার যেই পবিত্র স্থান আপনার কদম মোবারক স্পর্শ করিত উহাকে আবেগের রক্তিম অশ্রু দ্বারা ধুইয়া ফেলিতাম।

(২২) আপনার মসজিদের প্রতিটি খুটির সামনে আদবের সহিত দণ্ডায়মান হইতাম এবং ছিদ্দীকীনদের মর্য্যাদায় পৌছিবার জন্য প্রার্থনা করিতাম।

(২৩) আপনার হৃদয় গ্রাহী আবেগ সমূহের জখম এবং প্রাণস্পর্শী আকাংখা সমূহের ক্ষতসমূহের দ্বারা অতীব আনন্দের সহিত প্রতিটি ফানুসকে

আলোকিত করিতাম।

(২৪) বর্তমানে যদিও আমার নশ্বর দেহ সেই সমুজ্জ্বল পবিত্র হারাম ও হুজুরের আরামগাহে নাই তবুও আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর আমার রুহ সেখানেই রহিয়াছে।

(২৫) আমি আপন অহঙ্কারী নফ্ছে আম্মারার ধোঁকায় ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এমন অসহায় ও দুর্বলের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

(২৬) যদি আপনার করুণার দৃষ্টি আমার সাহায্যকারী না হয় তবে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেকার ও অবশ হইয়া পড়িবে। কাজেই আমার দ্বারা আর কোন কাজ সম্পাদন হইবে না।

(২৭) আমাদের বদ বখ্তি আমাদিগকে সরল পথ ও আল্লার রাস্তা হইতে বিপথগামী করিতেছে। আল্লারওয়াস্তে আমাদের জন্য খোদাওন্দ পাকের দরবারে প্রার্থনা করুন।

(২৮) আপনি এই দোয়া করুন আল্লাহ পাক যেন প্রথমতঃ আমাদিগকে পাকা পোক্ত একীন এবং দৃঢ় বিশ্বাসের আজীমুশ শান জীবন দান করেন এবং অতঃপর শরীয়তের আহকামের উপর মজবুত রাখেন।

(২৯) যখন কেয়ামতের ভীষণ দৃশ্য আমাদের সামনে উপস্থিত হইবে তখন রোজহাশরের মালিক রহমানুর রাহীম যেন আমাদিগকে দোজখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের ইজ্জত রক্ষা করেন।

(৩০) এবং আমাদের গোম্রাহী সত্ত্বেও যেন আপনাকে আমাদের জন্য শাফায়াত করিবার অনুমতি দান করেন। কেননা তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কেহ সুপারিশ করিতে পারিবেনা।

(৩১) আমাদের পাপের দরুন অবনত মস্তকে নক্ছী বলিয়া নয় বরং ইয়া রাব্বে উম্মতী বলিয়া হাশর ময়দানে তাশরীফ আনিবেন।

(৩২) আপনার সুব্যবস্থার ফলে এবং অন্যান্য নেক বন্দাদের উছিলায় গরীব জামীর যাবতীয় কাজ যেন সমাধা হইয়া যায়।

شنیدم که در روز امید و بیم
بدان را به نیکان ببخشد کریم

"আমি শুনিয়াছি যে আশা ও ভয়ের সেই মহাসংকটের দিনে মেহেরবান খোদা নেক বান্দাদের উছিলায় গোনাহ্গারদিগকে মাফ করিয়া দিবেন"

আলহাম্দু লিল্লাহ হজরত জামী (রঃ) এর কাছীদার অনুবাদ এখানেই

শেষ হইয়া গেল। ইহার পর হজরত কাছেম নানাতবী (রঃ) এর কাছীদার কিয়দাংশ যাহা এশ্‌ক ও মহব্বতে নবীর দ্বারা ভরপুর উহা লেখা যাইতেছে

نہ ہووے نغمہ سرا کس طرح سے بلبل زار
کہ آئی ہے نئے سر سے چمن چمن میں بہار
ہر ایک کو حسب لیاقت بہار دیتی ہے
کسی کو برگ کسی کو گل اور کسی کو بار
خوشی سے مرغ چمن ناچ ناچ گاتے ہیں
کف ورق بجاتے ہیں تالیاں اشجار
بجھائی ہے دل آتش کی بھی طپش یارب
کرم میں ایک و دشمن سے بھی نہیں انکار
یہ قدر خاک ہوں باغ باغ وہ عاشق
کبھی رہے تھا سدا جن کے دل کے بیچ غبار
یہ سبزہ زار کا رتبہ ہے شجرۂ موسیٰ
بنا ہے خاص تجلی کا مطلع انوار
اسی لئے چمنستان میں رنگ مہندی نے
کیا ظہور و قہاتے سبزہ میں ناچار
پہنچ سکے شجر طور کو کہاں طوبیٰ
مقام یار کو کب پہنچے مسکن اغیار
زمین و چرخ میں ہو کیوں نہ فرق چرخ و زمین
یہ سب کا بار اٹھائے وہ سب کے سر پر بار
کرے ہے ذرۂ کوئے محمدی سے خجل
فلک کے شمس و قمر کو زمیں لیل و نہار
فلک پہ عیسیٰ و ادریس ہیں تو خیر سہی
زمیں پہ جلوہ نما ہے محمد مختار
فلک پہ سب سہی پر ہے نہ ثانی احمد
زمیں پہ کچھ نہ ہو پر ہے محمدی سرکار
ثنا کر اسکی فقط قاسم اور سبھو کو چھوڑ

کہاں کا سبزہ کہاں کا چمن کہاں کی بہار
الہی کس سے بیان ہو سکے ثنا اسکی
کہ جس پہ ایسا تری ذات خاص کا ہو پیار
جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو
نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار
کہاں وہ رتبہ کہاں عقل نارسا اپنی
کہاں وہ نور خدا اور کہاں یہ دیدۂ زار
چراغ عقل ہے گل اسکے نور کے آگے
زباں کا منہ نہیں جو مدح میں کرے گفتار
جہاں کہ جلتے ہوں پر عقل کل کے بھی پھر دھا
لگی ہے جاں جو پہنچیں وہاں مرے افکار
مگر کرے مری روح القدس مددگاری
تو اسکی مدح میں میں بھی کروں رقم اشعار
جو جبرائیل مدد پر ہو فکر کی میرے
تو آگے بڑھکے کہوں اے جہاں کے سردار
تو فخر کون و مکاں زبدۂ زمین و زمان
امیر لشکر پیغمبران شہ ابرار
تو بوئے گل ہے اگر مثل گل ہیں اور نبی
تو نور شمس گر اور انبیا ہیں شمس و نہار
حیات جاں ہے تو ہیں اگر وہ جان جہان
تو نور دیدہ ہے گر ہیں وہ دیدۂ بیدار
طفیل آپ کے ہے کائنات کی ہستی
بجا ہے کہئے اگر تم کو مبدء الآثار
جلوہ میں تیرے سب آئے عدم سے تا بوجود
قیامت اپکی تھی دیکھئے تو اک رفتار
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں

ترے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار
پہنچ سکا ترے رتبے تلک نہ کوئی نبی
ہوئے ہیں معجزہ والے بھی اس جگہ ناچار
جو انبیاء ہیں وہ آگے تری نبوت کے
کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار
دکھاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابوالبشر کے خدا
اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار
خدا کے طالب دیدار حضرت موسیٰ
تمہارا لیجئے خدا آپ طالب دیدار

এই কিতাব যেমন প্রথমেই লেখা হইয়াছে, রমজানের পঁচিশ তারিখ শুরু করা হইয়াছিল। কিন্তু মোবারক মাসের বিভিন্ন ব্যস্ততার দরুন ঐ সময় বিছমিল্লাহ এবং কয়েক লাইন ব্যতীত আর লিখিবার সুযোগ হয় নাই। তারপরেও মেহমানদের ভিড় এবং মাদ্রাসায় সালের প্রথম দিকের বিভিন্ন ঝামেলার জন্য খুব কমই পাওয়া যাইত। তবুও কমবেশী লেখার কাজ চলিতেছিল। হঠাৎ গত জুমার দিন আমার প্রিয়তম মোহতারাম মাওলানা আল্‌হাজ্ব মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেবের যিনি তাবলীগী জমাতের আমীর ছিলেন এন্তেকাল করিয়া যান। তাঁহার এন্তেকালে এই ধারণা জন্মিল যে যদি এই অধমও এইভাবে বসিয়া বসিয়া চলিয়া যাই তবে এই পর্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে উহাও ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাই যতটুকু লেখা হইয়াছে উহার উপরই ইতি টানিয়া অদ্য ছয়ই জিলহজ্ব জুমার দিন সকাল বেলা এই রেছালাকে সমাপ্ত করিতেছি। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবাণীর দ্বারা স্বীয় মাহবুবের তোফায়েলে ইহার মধ্যে যাহা কিছু ভুল ত্রুটি হইয়াছে উহাকে ক্ষমা করিয়া দিন।

মোঃ জাকারিয়া উফিয়া আনহু কান্দলবী

মুকীমে মাদ্রাসায়ে মাজাহেরুল উলুম ছাহারানপুর

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

ফাজায়েলে হজ্ব

বা

হজ্বের ফজীলত

মূল লিখক :

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা হাফেজ

মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী সাহেব

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا

(শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহেব বলিতেছেন)

বাদ হামদ ও নাত', এই অধমের হাতের লেখা তাবলীগী নেছাবের ইতিপূর্বে আরও কয়েকটা কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে, আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীতে বন্ধু বান্ধবদের চিঠিপত্রের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সেই কিতাবগুলি দ্বারা লোকজন এত বেশী উপকৃত হইয়াছেন যে উহা শুনিলে বাস্তবিকই অবাক হইতে হয়। অথচ আমার অযোগ্যতা ও বেআমল হওয়ার দরুন অতটুকু উপকারে আসিবে বলিয়া ধারণাও ছিল না। কেননা যে নিজে আমল করেনা তাহার কথায় এবং লেখায় লোকের আমলও বহুত কমই হইয়া থাকে। তবে চাচাজান হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ)-এর রুহানী ফয়েজের বরকতেই এত বেশী উপকার হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। চাচা-জানের এন্তেকালের পর আজ প্রায় চার বৎসর অন্য কোন কিতাব লেখার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম, অথচ তিনি জীবনের শেষ দিনগুলোতে আমাকে দুইটা বই লেখার জন্য খুব বেশী বেশী তাকীদ করিতেন। প্রথমতঃ তেজারত এবং হালাল উপার্জন সম্পর্কে একটা বই, দ্বিতীয়তঃ আল্লার রাস্তায় খরচ করা সম্পর্কে আর একটা বই। প্রথম বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত নকশা খুব তাড়াতাড়ি লিখিয়া চাচাজানের খেদমতে পেশ করি, কিন্তু খুব বেশী অসুস্থ থাকার দরুন তিনি উহা দেখিয়া যাইবার সুযোগও পান নাই। দ্বিতীয় বইটা লিখিবার এত বেশী তাকীদ ছিল যে, একদিন নামাজ একেবারে তৈয়ার ছিল, অন্য এক ব্যক্তি ইমাম ছিল, তাকবীরও হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময় তিনি কাতার হইতে মুখ বাহির করিয়া এরশাদ করিলেন যে, দেখ ঐ বইটা লিখিতে যেন ভুল না হয়। তবুও কিন্তু নিজের অযোগ্যতা এবং দুনিয়ার বিভিন্ন ঝামেলার দরুন বই দুইখানি লেখা সম্ভব হয় নাই।

আমার চাচাত ভাই প্রিয়তম মাওলানা ইউছুফ চাচাজানের মতই তাঁহার ঈমানী আন্দোলনের যথোপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর যাবত হেজাজের পবিত্র ভূমিতে ঐ আন্দোলনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয় চিন্তা করিতেছিলনে। স্বয়ং চাচাজানও ঐ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখিয়া দুইবার হেজাজ তাশরীফ নিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আরবরাই ঐ মহাপুরুষদের বংশধর যাহারা সারা দুনিয়ায় ইছলাম বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্তমানেও যদি তাঁহারা পূর্ব পুরুষদের পথ অবলম্বন করিয়া আবার ময়দানে অবতীর্ণ হন তবে এখনও তাঁহারা আবার সারা বিশ্বে ইছলামকে চম্কাইতে সক্ষম হইবেন। তদুপরি হাজার হাজার লোক প্রতি বৎসর হজ্ব করিবার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন, তাহারা হজ্বের ফাজায়েল, বরকত এবং আদবসমূহ সম্পর্কে অজানা হওয়ার দরুন যেই দ্বীনি জজ্বা এবং বরকত নিয়া ফিরিয়া আসিবার ছিলেন উহা না নিয়া প্রায় খালী হাতেই ফিরিয়া আসেন।

এইসব কারণে প্রাণাধিক ইউছুফ আজ দুই বৎসর যাবত আমাকে বারংবার তাকীদ করিতেছেন যেন হজ্ব এবং জেয়ারত সম্পর্কিত হাদীছ সংগ্রহ করিয়া উম্মতের সামনে একটা কিতাব পেশ করি। ইহাতে হাদীছের বরকতে হজ্বের শান মোতাবেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়া লোকে হজ্ব গমন করিবে ও যেই জজ্বা নিয়া ফেরত আসা উচিত ইহা নিয়াই তাহরা ফেরত আসিবে। তদুপরি নিজেরা যেই প্রবল আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়া গমন করিবে সেখানকার অধিবাসীদের অন্তরেও সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রিয় মাওলানার তরফ হইতে দুই বৎসর যাবত শুধু তাকীদ হইতেছে, আর আমার তরফ থেকে শুধু ওয়াদার চেয়ে আগে অগ্রসর হইবার কোন সুযোগ হইতেছিলনা।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক যদি কোন কাজ কাহারও দ্বারা করাইবার ইচ্ছা করেন তবে, উহার জন্য গায়েব হইতে আছবাবেরও ব্যবস্থা হইয়া যায়। চাচাজানের এন্তেকালের পর হইতে প্রতি বৎসর রমজানের মোবারক মাস নিজামুদ্দীনেই কাটাইবার সৌভাগ্য হইয়া থাকে। ২৯ শে শা'বান সেখানে পৌছি এবং শাওয়াল সেখান থেকে ফেরত আসা হয়। কিন্তু এই

বৎসর কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ ঈদের পরেও অনেকদিন নিজামুদ্দীনে থাকিতে হয় যদ্দারা প্রিয় মাওলানার তা'মীদ করার আরও বেশী সুযোগ হইয়া যায়। ওদিকে ঈদের পরদিন হইতে মাহ্‌বুবের দেশে যাওয়ার হিড়িক শুরু হওয়ায় অন্তরে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়, যাহা প্রতি বৎসরই শাওয়াল মাস হইতে জিলহজ্ব মাসের অর্ধেক পর্যন্ত হইয়া থাকে। এবং হজ্বের দিন যতই ঘনাইয়া আসে ততই আবেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকে এই ভাবিয়া যে ভাগ্যবান প্রেমিকগণ না জানি এখন কি করিতেছে? এই জনাই আল্লার উপর ভরসা করিয়া আজ ২রা শাওয়াল ৯৬ হিজরী বুধবার দিনে এই কিতাব শুরু করিতেছি এবং দশটি পরিচ্ছেদে ও একটি পরিশিষ্টে কয়েকটি হাদীছের তরজমা এবং কিছু বিভিন্ন বিষয়াদি পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করিতেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্বের উৎসাহ

হজ্বের ফাজায়েল এবং আহকাম সম্পর্কে কোরানে পাকে অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে অগনিত, তন্মধ্যে নমুনা স্বরূপ এই কিতাবে বর্ণনা করা যাইতেছে।

আমি নিজের প্রত্যেকটি বইকে সংক্ষেপ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকি; কেননা দ্বীনের বই পুস্তক পড়িবার জন্য না পাঠকদের নিকট সময় বেশী থাকে না বই বড় হইয়া দাম বাড়িয়া গেলে খরিদদারদের নিকট অতিরিক্ত পয়সা থাকে। হাঁ ছিনেমা দেখার জন্য, বিয়ে-শাদীতে খরচ করার জন্য গরীব হইতে গরীবের নিকটও পয়সার কোন অভাব হয় না, ইহা আল্লার শান'। এইজন্য সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করিতেছি, তারপর কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা যাইবে।

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ

ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ . الاية

"মানুষের নিকট হজ্ব ফরজ হওয়া সম্পর্কে ঘোষণা করিয়া দাও। যেন তাহারা ঐ ঘোষণাপত্র পাইয়া তোমার নিকট আসিয়া একত্রিত হয়। তন্মধ্যে কেহ পদব্রজে আসিবে আবার কেহ বা উটকে দুর্বল করিয়া দূর দুরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিবে, এইজন্য যে তাহারা তথায় নিজেদের ফায়দা দেখিতে পাইবে।

বায়তুল্লাহ শরীফ কে প্রথম নির্মান করেন ?

ফায়েদাঃ বায়তুল্লাহ শরীফকে প্রথমে আদম আল্লাইহিচ্ছালাম বানাইয়াছেন, না ফেরেশতারা বানাইয়াছেন ইহাতে মতভেদ আছে। এমন কি কেহ কেহ বলে যে, জমিন সৃষ্টির প্রথম ধাপ ঐস্থান হইতেই শুরু হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথমে পানির একটা বুদবুদের মত ছিল। উহা হইতেই সারা দুনিয়ার মাটি বিস্তার লাভ করে। হজরত নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐস্থানকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়, অতঃপর হজরত ইব্রাহীম (আঃ এর পুত্র ইছমাইলের সাহায্যে বায়তুল্লাহ নূতন পত্তন করেন। কোরানে পাকেও বর্ণিত আছে, "ইব্রাহীম এবং ইছমাইল একত্রে মিলিয়া কাবা গৃহের ভিত্তি রাখেন।" অন্য আয়াতে আছে "আমি ইব্রাহীমকে সেই ঘরের চিহ্ন বাতলাইয়া দেই, তিনি আল্লার হুকুমে এ ঘর নূতন করিয়া গড়েন।"

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন আল্লাহ পাক আদম (আঃ) কে জান্নাত হইতে জমীনে ফেলিয়া দেন তখন তাঁহার ঘরেও অবতীর্ণ করেন। এবং বলেন হে আদম! আমি তোমার সহিত আমার ঘরকেও অবতীর্ণ করিতেছি। তুমি এই ঘরের তওয়াফ ঐভাবে করিবা যেইভাবে আমার আরশের তওয়াফ করা হয়। এবং উহার দিকে ফিরিয়া ঐভাবে নামাজ পড়া যাইবে যেইভাবে আমার আরশের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়া হয়। তারপর নূহ (আঃ) এর তুফানের সময় ঐ ঘরকে উঠাইয়া নেওয়া হয়। অতঃপর সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সেইস্থানের তওয়াফ করিতে কোন ঘর ছিল না। তারপর ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ স্থান দেখাইয়া দেন ও ঘর নির্মানের নির্দেশ দেন। (তারগীবে মোনযেরী)

হাদীছের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ কাজ হজরত ইব্রাহীম শেষ করেন তখন আল্লার দরবারে আরজ করিলেন, হে খোদা! তোমার ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হইয়াছে। আল্লাহ পাকের তরফ হইতে হুকুম হইল হজ্ব পালনের জন্য তুমি সারা বিশ্ববাসীকে ঘোষণা করিয়া দাও। ইব্রাহীম (আঃ) বলিলেন ইয়া আল্লাহ! আমার আওয়াজ

কিভাবে পৌঁছিবে? আল্লাহ পাক বলিলেন, আওয়াজ পৌঁছান আমার জিম্মায়। হজরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘোষণা করিয়া দিলেন আর ইহা আছমান ও জমীনের যাবতীয় মাখলুক শুনিয়াছিল। ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যেহেতু বেতার যন্ত্রের মারফত মুহূর্তের মধ্যে দেশ হইতে দেশান্তরে শব্দ পৌঁছিয়া যায়। আর সেই মহান সৃষ্টিকর্তা বেতার আবিষ্কারকেরেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সারা বিশ্বভুবনে আওয়াজ পৌঁছাইতে পারেন না?

অন্য হাদীছে আসিয়াছে সেই ঘোষণা পত্রকে প্রত্যেক ব্যক্তিই শুনিয়াছে এবং লাব্বায়েক বলিয়াছে। যাহার অর্থ হইল আমি হাজির আছি। হাজীগণ এহ্‌রাম বাঁধার পর সেই লাব্বায়েকই বলিয়া থাকেন। যাহার তকদীরে আল্লাহ পাক হজ্বের সৌভাগ্য লিখিয়াছেন তিনিই সেই আওয়াজের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন ও লাব্বায়েক বলিয়াছেন। অন্য হাদীছে আছে।

যেই ব্যক্তি উক্ত আহ্বানে সাড়া দিয়া লাব্বায়েক বলিয়াছে, চাই সে পয়দা হইয়া থাকুক বা রুহের জগতে থাকুক, সে নিশ্চয় হজ্ব করিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি একবার লাব্বায়েক বলিয়াছে তাহার এক হজ্ব নছীব হইয়াছে আর যেই ব্যক্তি দুইবার বলিয়াছে তাহার দুই হজ্ব নছীব হইয়াছে এইভাবে যে যতবার লাব্বায়েক বলিয়াছে তাহার তত হজ্ব নছীব হইয়াছে। কতবড় সৌভাগ্যশালী ঐসব রুহ যাহারা তখন ধড়াধড় লাব্বায়েক বলিয়াছিল তাহারা আজ হজ্বের পর হজ্ব করিতেছে বা করিবে।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللهُ

"নির্দিষ্ট জানা কয়েকটি মাসেই হজ্ব হইয়া থাকে, অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম তারিখ হইতে জিলহজ্বের দশ তারিখ পর্যন্ত। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি নিজের উপর হজ্বকে ফরজ করিয়া লয় অর্থাৎ এহরাম বাঁধে তাহার জন্য ফাহেশা বা অশোভন উক্তি অথবা হুকুম অমান্য করা বা ঝগড়া ফাছাদ কিছুই জায়েজ নহে এবং তোমরা যাহা কিছু পুণ্য কাজ করিবে আল্লাহ পাক

উহা খুব ভালভাবে জানেন। তদনুরূপ তাহাকে আল্লাহ পাক প্রতিদান অথবা শাস্তিদান করিবেন। এইজন্য ঐ মোবারক সময়ে যাহারা পুণ্যের কাজ করিবে তাহাদিগকে অনেক বেশী দান করিবেন।

ফায়দা ঃ ফাহেশা কথা দুই প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যাহা আগেও নাজায়েজ ছিল, হজ্বের হালতে উহা আরও বেশী মারাত্মক অপরাধ হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয় যাহা প্রথমে জায়েজ ছিল যেমন আপন স্ত্রীর সহিত কিছু বিপর্দা লাগামহীন কথা বলা, হজ্বের সময় উহাও না জায়েজ হইয়া যায়। এইভাবে হুকুম অমান্য করাও দুই প্রকার, প্রথমতঃ যাহা পূর্বেও নাজায়েজ ছিল। যেমন যে কোন প্রকারের গুণাহের কাজ, হজ্বের হালতে উহা আরও বেশী অপরাধমূলক হইয়া যায়; আর দ্বিতীয় ঐসব কাজ যাহা ইতিপূর্বে জায়েজ ও বৈধ ছিল। কিন্তু এহরাম বাঁধিলে ঐসব অবৈধ হইয়া যায়। যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করা এহরাম অবস্থায় নাজায়েজ। ঝগড়া ফাছাদ সব সময়ই অন্যায় এখন উহা আরও অধিক অন্যায়ে পরিণত হয়। হুকুম অমান্য করার মধ্যে যদিও ঝগড়া ফাছাদও শামিল আছে তবুও অধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উহাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কেননা কাফেলা ওয়ালাদের মধ্যে আপোসে ঝগড়া ফাছাদ হইয়াই যায়।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজিকার দিনে তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে আমি পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পুরা করিয়া দিলাম এবং চিরকালের জন্য ইছলামকেই তোমাদের দ্বীন হিসাবে পছন্দ করিলাম অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র উহাই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ফায়দা ঃ হজ্বের ফজীলতের মধ্যে ইহাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে উহার মধ্যে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার সুসংবাদ ওয়ালা আয়াত হজ্বের মৌসুমেই অবতীর্ণ হইয়াছে। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন হজ্ব ইছলামের বুনিয়াদী রোকন, ইছলামের ভিত্তি এবং পূর্ণতা উহার উপর সমাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু আল্-ইয়াওমা আক্‌মালতু ওয়ালা আয়াত উহাতেই অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে ইহুদীদের জনৈক পণ্ডিত আসিয়া হজরত ওমরের নিকট বলিল- তোমাদের কোরানে এমন একটি আয়াত নাজেল হইয়াছে

উহা যদি আমাদের উপর নাজেল হইত তবে আমরা ঐদিনকে ঈদের দিন হিসাবে পালন করিতাম, হজরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কোন্ আয়াত? সে বলিল আল্ ইয়াওমা আক্‌মালতু লাকুম দ্বীনাকুম। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন আমি জানি এই আয়াত কবে এবং কোথায় নাজেল হইয়াছে, আল্লার শোকর, সেই দিনে আমাদের দুই ঈদ একত্রিত ছিল। জুমার দিন এবং আরাফাতের দিন। হজরত ওমর বলেন উহা জুমার দিন সন্ধ্যা বেলায় আছরের পর অবতীর্ণ হয়। যখন হুজুর আরাফাতের ময়দানে উট্‌নীর উপর ছওয়ার ছিলেন। এই আয়াতে যাহা শুনান হইয়াছে উহা বাস্তবিকই একটি বিরাট সুসংবাদ।

হাদীছে বর্ণিত আছে এই আয়াতের পর হালাল হারাম বিষয়ক আর কোন নূতন হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। মানুষের যখন হজ্বের মধ্যে এই খেয়াল আসিবে যে ইহা দ্বারা দ্বীন পূর্ণ হইবে তখন কতটুকু আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়া ঐ ফরজ আদায় করিতে থাকিবে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় হুজুর উট্‌নীর উপর ছওয়ার ছিলেন। বিরাট বোঝা চাপানোর দরুন উট্‌নী বসিয়া গিয়াছিল। কেননা অহী অবতরণের সময় হুজুরের ওজন অনেক বাড়িয়া যাইত। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন, অহী আসার সময় হুজুর উটের উপর থাকিলে উট নিজের ঘাড়কে বিছাইয়া দিত। এবং যতক্ষণ অহী অবতরণ শেষ না হইত উট নড়াচড়া করিতে পারিত না। অন্যত্র হুজুর বলেন, অহী অবতরণের সময় আমার মনে হইত যেন আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।

হজরত জায়েদ বিন ছাবেত বলেন যখন

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন আমি হুজুরের নিকট বসা ছিলাম, দেখিলাম, হুজুর যেন বেহুশ হইয়া গিয়াছেন। তখন হুজুরের রাণ মোবারক আমার রাণের উপর রাখিলাম, উহার ওজনে মনে হইল যেন আমার রাণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

আল্লাহ পাকের আয়াতের ইহাই ছিল আজমত এবং গুরুত্ব! অথচ আমরা উহাকে এমন তুচ্ছভাবে পড়িয়া যাই যেমন সাধারণ বই পুস্তক পড়িয়া থাকি। এই পর্যন্ত কয়েকটি আয়াতের উল্লেখ ছিল। সামনে কতকগুলি হাদীছ বর্ণনা করা যাইতেছে।

(১) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه . متفق عليه

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি শুধু আল্লার রেজামন্দীর জন্য হজ্ব করে উহাতে কোন ফাহেশা কথা কাজ না অবাধ্যাচরণমূলক কাজ করে না সে হজ্ব হইতে এমনভাবে নিষ্পাপ প্রত্যাবর্তন করে যেমন সে আজ মায়ের গর্ভ হইতে জন্ম নিল।

ফায়েদা ঃ বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে একেবারেই বেগুনাহ মা'ছুম থাকে, সব রকম দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত থাকে। হজ্বের প্রতিক্রিয়া তদ্রূপ যদি সেই হজ্ব শুধু আল্লার জন্যই করা হয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন এইসব হাদীছের অর্থ হইল ছগীরা গুণাহসমূহ মাফ হইয়া যায়। অবশ্য কোন কোন ওলামা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে হজ্বের দ্বারা ছগীরা কবীরা উভয় প্রকার গুণাহ মাফ হইয়া যায়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ একমাত্র আল্লার জন্যই হজ্ব করিতে হইবে। অর্থাৎ উহাতে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য রিয়া, সুনাম ইত্যাদি শামিল হইতে পারিবে না। অনেক লোক সুনাম এবং ইজ্জত লাভের জন্য হজ্ব করিয়া থাকে. তাহারা এতবড় কষ্ট ক্লেশ এবং খরচপত্রকে অনর্থক ধ্বংস করিয়া দিল। যদিও জিম্মা হইতে ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি শুধু আল্লার সন্তুষ্টির জন্য হইত তবে ফরজ আদায়ের সাথে কত বড় ছওয়াবেরও অধিকারী হইত। আফছোছ! এতবড় দৌলত কয়েকজন লোকের নিকট ইজ্জত হাসেল করার নিয়তে ধ্বংস করিয়া দেওয়া কতই না দুর্ভাগ্যের কথা। হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়া-মতের পূর্বে আমার উম্মতের ধনী লোকেরা শুধু ছফর এবং পর্যটনের ইচ্ছায় হজ্ব করিবে। যেমন তাহারা বিলাশ ভ্রমণের জন্য লণ্ডন এবং প্যারিস না গিয়া হেজাজ ভূমিতে গেল এবং আমার উম্মতের মধ্যবিত্ত লোকেরা ব্যবসা উপলক্ষে হজ্ব করিবে। যেমন তেজারতের মাল কিছু এদিক হইতে নিল ওদিক হইতে আনিল। আলেমগণ লোক দেখানো এবং সুনাম অর্জনের জন্য হজ্ব করিবে। যেমন অমুক মাওলানা পাঁচ হজ্ব করিয়াছে, দশ হজ্ব করিয়াছে এবং গরীবেরা ভিক্ষা করিবার নিয়তে হজ্বে গমন করিবে।

(কানজুল ওম্মাল)

ওলামাগণ বলিয়াছেন যাহারা টাকা পয়সা লইয়া বদলী হজ্ব করে এই উদ্দেশ্যে যে ইহাতে দুনিয়ার কিছু উপকারও হইবে তাহারাও ব্যবসায়ী হাজীর মধ্যে শামিল। যেন সে হজ্বের সাথে সাথে তেজারতও করিল অন্য হাদীছে আসিয়াছে রাজা বাদশাহগণ বিলাশ ভ্রমণের নিয়তে, ধনীরা ব্যবসার নিয়তে, ফকীরগণ ভিক্ষার নিয়তে এবং ওলামাগণ সুনাম অর্জনের নিয়তে হজ্ব করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে হযরত ওমর ছাফা মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে একদিন ছিলেন, ইত্যবসরে একদল লোক আসিয়া উট্ হইতে অবতরণ করিয়া প্রথমে বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করিল। তারপর ছাফা মারওয়ায় দৌড়িল, হযরত ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা, কোথা হইতে আসিলে? এবং কি জন্য আসিলে? তাহারা বলিল, আমরা ইরাকের অধিবাসী, হজ্বের জন্য আগমন করিয়াছি। হজরত ওমর বলিলেন, তোমাদের ব্যবসা বা টাকা পয়সার লেনদেন সম্পর্কীয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ত নাই? তাহারা বলিল না হুজুর, শুধু হজ্বই আমাদের উদ্দেশ্য। হজরত ওমর বলিলেন, তোমরা এখন নূতন করিয়া চলিতে পার যেহেতু তোমাদের পিছনের যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া গিয়াছে। হাদীছে বর্ণিত দ্বিতীয় জিনিস হইল ফাহেশা কথা না হওয়া। এই কথা আগে উল্লেখিত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা একটি ব্যাপক শব্দ। যে কোন প্রকারের বেহুদা কাজকর্ম ইহাতে দাখেল। এমন কি বিবির সহিত সহবাসের কথা বলাও শামেল। এমন কি ঐসব গোপনীয় কথা হাত বা চোখের ইশারায় বলাও শামেল। কারণ উহার দ্বারা কামভাব উদিত হয়।

তৃতীয় জিনিস হইল ফাছেকী বা হুকুম অমান্য করা। উহাও কোরানে উল্লেখ আছে এবং উহা একটি ব্যাপক শব্দ যাহা যে কোন প্রকার নাফরমানীকে শামেল করে। উহার আওতায় ঝগড়া করাও আসিয়া যায়। কেননা উহাও নাফরমানী। হুজুরে পাক (দঃ) বলেন হজ্বের খুবী হইল নরম কথা এবং লোকজনকে খানা খাওয়ান। এইজন্য প্রত্যেকেরই উচিত সাথীদের সহিত নরম ব্যবহার করা, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, বারংবার কাহারও প্রতি এইকাজ কেন করিলে, ঐকাজ কেন হইল না, এইসব প্রশ্নাবলী না করা, বেদুঈনদের সহিত কলহ বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। ওলামাগণ লিখিয়াছেন সৎ চরিত্র উহাকে বলা হয় না যে কাহাকেও কষ্ট না দিবে। বরং উহাকে বলা হয় যে অন্যে কষ্ট দিলে উহা সহ্য করিবে। ছফরের আভিধানিক অর্থ হইল প্রবাস করা। ছফরকে ছফর এইজন্য

বলা হয় যে, উহাতে মানব চরিত্রের আসল রূপ প্রকাশ পায়। এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি অমুক লোককে চিন ? সে বলিল হুঁ। চিনি। হজরত ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন সফর করিয়াছ ? সে বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহা হইলে তুমি তাহাকে চিন নাই। অন্য হাদীছে আছে, হজরত ওমরের সামনে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিল। ওমর বলিলেন তুমি কি তাহার সহিত কোন ছফর করিয়াছ বা কোন মোয়ামেলা করিয়াছ ? লোকটি বলিল, না। ওমর (রাঃ) বলিলেন, তবে তুমি তাহার কি করিয়া প্রশংসা করিলে ?

বাস্তবিকই দেখিতে মানুষ সবাইত বেশ ভাল। কিন্তু মানুষের আসল চেহারা ধরা পড়ে ছফর ও মোয়ামেলার দ্বারা। কাজেই আল্লাহ পাক হজ্বের সহিত ঝগড়া বিবাদকে উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص الحج المبرور وليس له جزاء الا الجنة - متفق عليه -

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, নেকীওয়ালা হজ্বের বদলা জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ফায়েদা ঃ নেকীওয়ালা হজ্বের অর্থ হইল যেই হজ্বে কোন গুণাহের কাজ না হয়। এইজন্যই অনেকেই উহার অর্থ মাকবুল হজ্বের দ্বারা করিয়াছেন। যেহেতু যেই হজ্বে যাবতীয় আদব ও শর্ত পালিত হয়, কোন পাপ কার্য হয় না, খোদা চাহেত সেই হজ্ব মাকবুলই হইয়া থাকে। হাদীছে বর্ণিত আছে হজ্বের নেকী হইল নরম কথা, লোকজনকে খানা খাওয়ান এবং বেশী বেশী করিয়া ছালাম দেওয়া।

(৩) عن عائشة رض ان رسول الله ص قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء - مسلم ومشكوة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ পাক আরাফাতের দিনের মত অন্য কোনদিন এত অধিক লোককে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত দেন না। আল্লাহ পাক সেইদিন দুনিয়ার নিকটবর্তী হন এবং ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন যে, দেখ ইহারা কি চায়।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ পাক নিকটবর্তী হন অথবা প্রথম আছমানে আসেন,

অথচ আল্লাহ পাক সব সময় নিকটেই আছেন। এইসব প্রশ্নের উত্তর হইল যে, উহার অর্থ স্বয়ং আল্লাহ পাকই জানেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহার অর্থ হইল আল্লাহর খাছ রহমত নিকটবর্তী হয়।

একটি হাদীছে আছে আরাফাতের দিন আল্লাহপাক প্রথম আছমানে অবতরণ করিয়া ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে দেখ আমার বান্দারা আমার নিকট কি অবস্থায় আসিয়াছে। মাথার চুল তাহাদের এলোমেলো, শরীরে এবং কাপড়ে ছফরের দরুণ ধূলাবালি পড়িয়া আছে। লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলিয়া চিৎকার দিতেছে। দূরদূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। আমি তোমাদিগকে সাক্ষী করিতেছি যে আমার বান্দাদের যাবতীয় গুণাহ্ মাফ করিয়া দিলাম! ফেরেশতারা বলেন, ইয়া আল্লাহ্! অমুক ব্যক্তিত পাপী বলিয়া পরিচিত এবং অমুক পুরুষ এবং অমুক স্ত্রী লোকের কথাই বলা যায় না। তাহাদের কি অবস্থা? পরওয়ারদেগার বলেন আমি তাহাদের সকলের গুণাহ্ই মাফ করিয়া দিলাম। হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন সেদিনকার মত অধিক সংখ্যক লোককে অন্য কোনদিন জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় না।

অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহপাক বলেন, এলোমেলো চুল নিয়া বান্দারা আমার দরবারে শুধু আমার রহমতের প্রত্যাশী হইয়া হাজির হইয়াছে। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের পাপরাশী যদি জমীনের ধূলিকণার পরিমাণও হয় এবং সারা দুনিয়ার বৃক্ষের সমানও হয় তবুও আমি উহা মাফ করিয়া দিলাম। তোমরা নিষ্পাপ অবস্থায় আপন আপন ঘরে ফিরিয়া যাও।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত আছে আল্লাহপাক ফখর করিয়া ফেরেশতাগণকে বলেন দেখ, আমি বান্দাদের নিকট আমার পয়গাম্বর পাঠাইয়াছি, ইহারা তাহাদের উপর ঈমাণ আনিয়াছে। আমি তাহাদের নিকট কিতাব পাঠাইয়াছি ইহারা তাহার উপর ঈমাণ আনিয়াছে। তোমরা সাক্ষী থাক আমি তাহাদের সমুদয় গোণাহ মাফ করিয়া দিলাম। (কানজ)

এইরূপ অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে বিধায় কোন কোন আলেম বলেন, হজ্বের সাহায্যে শুধু ছগীরা নয় বরং কবীরা গোণাহও মাফ হইয়া যায়। আল্লার নাফরমানীর নাম গোণাহ। যদি মেহেরবাণী করিয়া কোন ব্যক্তি বা জামাতের সমগ্র গোণাহই মাফ করিয়া দেন তবে কাহার সাধ্য আছে যে উহাতে ট শব্দ করে।

কাজী এয়াজের শেফা গ্রন্থে একটি কেচ্ছা বর্ণিত আছে, একদা ছা'তুন খওলানীর নিকট একটি জামাত আসিয়া কেচ্ছা শুনাইল যে, হুজুর! ফাতেমা গোত্রের লোকেরা জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া আগুনে জ্বালাইতে ইচ্ছা করে। সারা রাত তাহাকে আগুনে জ্বালাইতেছিল কিন্তু আগুনে তাহার পশমও পোড়া গেল না। হজরত ছা'তুন বলেন সম্ভবতঃ লোকটা তিনবার হজ্ব করিয়াছিল, তাহারা বলিল জী-হাঁ। সে তিন হজ্ব করিয়াছে। ছা'তুন বলেন আমি হাদীছে পাইয়াছি, যেই ব্যক্তি এক হজ্ব করিল সে আপন ফরজ আদায় করিল আর যেই ব্যক্তি দুই হজ্ব করিল সে আল্লাহকে কর্জ দিল আর যেই ব্যক্তি তিন হজ্ব করিল আল্লাহ তায়ালা তাহার চামড়াকে আগুনের জন্য হারাম করিয়া দেন।

(৪) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رئى الشيطان هو فيه اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ منه فى يوم عرفة وما ذاك الا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما روى يوم بدر، مشكوة

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বদর যুদ্ধের দিনের কথা ভিন্ন, তাছাড়া আরাফাতের দিন ব্যতীত শয়তান এত বেশী অপদস্থ, এত বেশী ধিকৃত, এত বেশী রাগান্বিত এবং এত বেশী নিকৃষ্ট আর কোনদিন হয় না। কেননা সেইদিন আল্লার রহমত অত্যধিক পরিমাণ নাজিল হওয়া এবং বান্দার বিরাট বিরাট গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা সে দেখিতে পায়।

ফায়েদা ঃ শয়তান এত বেশী ব্যথিত মনক্ষুণ্ন এবং রাগান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, যেহেতু সে অনেক বেশী পরিশ্রম ও কষ্টসাধ্য করিয়া বান্দাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছিল অথচ আজ রহমতের একটি ঝাঁপটা আসিয়া মুহূর্তের মধ্যে সব পরিষ্কার হইয়া যায়। ইহা বাস্তবিক তাহার জন্য চরম দুঃখজনক ব্যাপার।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, শয়তান তাহার সবচেয়ে দুষ্ট বাহিনীকে হাজীদের যাত্রাপথে মোতায়েন করিয়া দেয়, এইজন্য যে তাহারা যেন হাজীদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়া দেয়। (কানজ)

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) জনৈক কাশফওয়ালা ছুফীর ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, সেই ছুফী সাহেব আরাফাতের দিন শয়তানকে দেখিতে পাইলেন যে সে অতিশয় দুর্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার চেহারা হরিদ্রা হইয়া গিয়াছে,

চক্ষু হইতে অনবরত পানি পড়িতেছে। দুর্বলতায় কোমর ঝুঁকিয়া গিয়াছে। ছুফী সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন কাঁদিতেছ? সে বলিল আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, হাজী লোকেরা পার্থিব কোন তেজারত ইত্যাদি উদ্দেশ্য ছাড়া তাহার দরবারে হাজির হইয়াছে, আমার ভয় হইতেছে যে ইহারা নৈরাশ হইয়া ফিরিবে না। এই জন্যই কাঁদিতেছি। বুজুর্গ বলিলেন আচ্ছা তুমি এত দুর্বল হইয়া গেলে কেন? সে বলিল ঘোড়ার পদধ্বনীতে আমি দুর্বল হইয়া গিয়াছি। যেই ঘোড়া হজ্ব ওমরা এবং জেহাদের জন্য দৌড়ায়। আফছোছ! এই সব ছওয়ারী যদি খেল তামাশা এবং হারাম কাজে নিয়োজিত হইত তবে আমার কাছে কতইনা ভাল লাগিত। বুজুর্গ আবার বলিলেন তোমার রং এত হরিদ্রা হইয়া গেল কেন?

সে বলিল মানুষ একে অন্যকে নেক কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দান করে এবং ঐ কাজে আপোসে সাহায্য সহযোগিতা করে। আফছোছ তাহাদের এই সাহায্য সহযোগিতা যদি পাপ কার্যের জন্য হইত তবে আমার জন্য কতইনা খুশীর কারণ হইত। ছুফী ছাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোমর কেন ঝুঁকিয়া গেল? সে বলিল মানুষ আল্লার দরবারে দোয়া করে যে, ইয়া আল্লাহ! খাতেমা বিল খায়ের কর। যেই ব্যক্তি সর্বদা মওতের সময় ঈমাণ লইয়া যাইবার ফিকিরে থাকিবে সে নিজের নেক আমলের উপর কি করিয়া অহংকার করিবে?

( ) عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي ﷺ فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو قال اردت اشترط قال ما تشترط ماذا قال ان يغفر لي قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله رواه ابن خزيمة - ومسلم وغيره -

"এবনে শামাছা বলেন, আমরা হজরত আমর এবনুল আছের নিকট গেলাম তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় ছিলেন। তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঁদিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহার ইছলাম গ্রহণের ঘটনা শুনাইলেন। তিনি বলেন আল্লাহ পাক যখন আমার অন্তরে ইছলাম গ্রহনের জযবা

পয়দা করিলেন তখন আমি প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইলাম। আমি বলিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনি হাত বাড়াইয়া দিন আমি বয়আত করিব। হুজুর হাত বাড়াইলেন তখন আমি আপন হাত টানিয়া লইলাম, হুজুর বলিলেন আমর তোমার কি হইল? আমি বলিলাম হুজুর আমার কিছু শর্ত আছে, সেটা এই যে আল্লাহ পাক যেন আমার পিছনের যাবতীয় গুনাহ মাফ করিয়া দেন। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন আমর তুমি কি জাননা যে কুফরী অবস্থাকৃত যাবতীয় পাপ ইছলাম ধ্বংস করিয়া দেয়। আর হিজরত উহার পূর্বে কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং হজ্ব উহার পুর্বে কৃত যাবতীয় অন্যায় আচরণ নির্মূল করিয়া দেয়।"

ফায়েদাঃ ছগীরা গুনাহ মাফ হইবে, না কবীরা গুনাহ সে কথা পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, একটা হইল কাহারও হক্ব, আর অন্যটা হইল উহার গুনাহ। হজ্ব ইত্যাদির দ্বারা গোনাহ মাফ হইবে। হক্ব মাফ হইবে না। যেমন কাহারও মাল চুরি করিল। ইহাতে এক কথা হইল চুরির মাল, অন্য কথা হইল চুরির গোনাহ। গোনাহ মাফ হইবার এই অর্থ নয় যে মাল ফেরত দিতে হইবে না। তবে মালত ফেরত দিতেই হইবে, অবশ্য চুরি করার গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে নবী করীম (ছঃ) হজ্বের দিন সন্ধ্যা বেলায় আরাফাতের ময়দানে উম্মতের মাগফেরাতের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া কান্নাকাটি করেন, আল্লার রহমত জোশ মারিয়া উঠিল এবং ঘোষণা হইল যে আমি তোমার দোয়া কবুল করিলাম এবং বান্দার যাবতীয় গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম, তবে একে অন্যের উপর জুলুম করিলে উহার প্রতি-শোধ লওয়া হইবে। দয়ার নবী পুনরায় দরখাস্ত করিলেন এবং বারংবার করিতে থাকেন এবং বলেন যে হে পরওয়ারদেগার! তোমার কুদরত আছে মাজলুমকে জুলুমের প্রতিদান তোমার তরফ হইতে আদায় করিয়া জালেমকে ক্ষমা করিয়া দিতে পার। মোজদালাফায় অবস্থান কালে ভোর বেলায় আল্লাহ পাক এই দোয়াও কবুল করিলেন। সেই সময় হুজুর (ছঃ) হাসিয়া উঠিলেন। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুরের অভ্যাসের খেলাফ কান্নার ভিতর হাসির রহস্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। হুজুর বলিলেন আমার আখেরী দরখাস্ত আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন আর শয়তান এই ঘোষণা জানিতে পারিয়া হায় হায় করিয়া চিৎকার দিয়া

কাঁদিতে লাগিল এবং মাথায় শুধু মাটি ঢালিতে লাগিল। (তারগীব)

(৬) عن سهل ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبى الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ههنا وههنا ـ رواه الترمذى وابن ماجة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন-হাজী যখন লাব্বায়েক বলিতে থাকে তখন তাহার ডানে বামের যাবতীয় পাথর, বৃক্ষ এবং ধূলি-বালি লাব্বায়েক বলিতে থাকে। এমন কি জমীনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইহা বলিতে থাকে।

বিভিন্ন রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত, লাব্বায়েক বলা হজ্বের একটি চিহ্ন।

হাদীছে বর্ণিত আছে মুছা আলাইহিচ্ছালাম যখন লাব্বায়েক বলিতেন তখন আল্লাহ পাক বলিতেন লাব্বায়েক হে মুছা !

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, মিনার মসজিদে আমি হুজুরের খেদমতে বসা ছিলাম। ইত্যবসরে একজন আনছারী ও একজন ছাকাফী হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া ছালাম করিয়া আরজ করিল হুজুর আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম হুজুর বলিলেন ইচ্ছা করিলে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার। আর তা না হয় বিনা প্রশ্নেই আমি তোমাদের উত্তর দিতে পারি। তাহারা বলিল হুজুর আপনিই বলিয়া দিন, হুজুর ফরমাইলেন তোমরা হজ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ যে, হজ্বের জন্য ঘর হইতে বাহির হইলে কি ছওয়াব পাওয়া যায় ? এবং তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ পড়ার ছওয়াব কি, ছাফা মারওয়ার দৌড়াইলে কি লাভ হয় ? আরাফাতে গেলে, শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কি লাভ হয় ? আরাফাতে গেলে শয়তানকে পাথরের কণা মারিলে কোরবানী করিলে এবং তাওয়াফে জেয়ারত করিলে কি ছওয়াব পাওয়া যায় ? তাহারা বলিল যেই খোদা আপনাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন সেই খোদার কছম করিয়া বলিতেছি এই কয়েকটি প্রশ্নই আমাদের মনে ছিল। হুজুর ফরমাইলেন, হজ্বের এরাদা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলে ছওয়ারীর প্রতি কদম উঠা নামায় তোমাদের আমলনামায় এক একটি নেকী লেখা যাইবে। এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তাওয়াফের পরের দুই রাকাত নামাজে একজন আরবী গোলাম আজাদের ছওয়াব পাওয়া যাইবে। ছাফা মারওয়ায় দৌড়াইলে সত্তরটি গোলাম আজাদ

করার ছওয়াব পাওয়া যায়। আরাফাতের ময়দানের মানুষ যখন একত্রিত হয় তখন আল্লাহ পাক যখন আছমানে আসিয়া ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া বলেন যে আমার বান্দারা দূর-দুরান্ত হইতে এলোমেলো চুল নিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার রহমতের ভিখারী। হে বান্দাগণ! তোমাদের গোনাহ যদি জমিনের ধুলিকণা বরবারও হয় অথবা সমুদ্রের ফেনা বরাবরও হয় তবুও উহা আমি মাফ করিয়া দিলাম। এমন কি যাহাদের জন্য তোমরা সুপারিশ করিবে তাহাদেরকেও ক্ষমা করিয়া দিলাম। প্রিয় বান্দারা আমার! ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া তোমরা নিজ নিজ বাড়ী চলিয়া যাও।

তারপর নবীয়ে করীম (ছঃ) বলেন, শয়তানকে পাথর মারার ছাওয়াব এই যে, প্রত্যেক পাথর টুক্‌রায় তাহাকে ধ্বংস করার উপযোগী এক একটা পাপ মাফ হইয়া যায়। আর কোরবানীর বদলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য পুঁজি জমা রহিল। এহরাম খোলার সময় মাথার চুল কাটার মধ্যে প্রত্যেক চুলের বদলে একটা করিয়া নেকী, একটা করিয়া গোনাহ মাফ। সর্বশেষে যখন তাওয়াফে জেয়ারাত করা হয় তখন বান্দার আমলনামায় কোন গোনাহই থাকে না। বরং একজন ফেরেশতা তাহার কাঁধে হাত বুলাইয়া বলিতে থাকে তুমি এখন হইতে নূতন করিয়া আমল করিতে থাক যেহেতু তোমার পিছনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করা হইয়াছে। (তারগীব)

কিন্তু এইসব তখনই আশা করা যায় যখন হজ্ব নেকীওয়ালা হজ্ব অর্থাৎ মাকবুল হজ্ব হয় যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে হজ্ব বলা যাইতে পারে। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হজ্বের জন্য যে ডাক দিয়াছিলেন উহারই জওয়াবস্বরূপ লাব্বায়েক বলা হয়। বাদশাহের দরবারের ডাক পড়িলে যেমন আশা ও ভয়ের সংমিশ্রণে হাজির হইতে হয়। তদ্রূপ হাজীদের এই ভয় ভীতি থাকিতে হইবে যে হয়ত আমার উপস্থিতি কবুলই হয় নাই।

হজরত মোতারেরফ বিন আবদুল্লাহ আরাফাতের ময়দানে এই দোয়া করিতেছিলেন যে, ইয়া আল্লাহ! বকর মোজানী (রঃ) বলেন জনৈক বুজুর্গ আরাফাতের ময়দানে হাজী ছাহেবানকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আমার মনে হয় আমি যদি না থাকিতাম তবে এই সমস্ত লোকের মাগফেরাত হইয়া যাইত।

হজরত আলী জয়নুল আবেদীন যখন হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধেন তখন তাহার চেহারা হরিদ্রা বর্ণ হইয়া যায়। এবং শরীরে ক[illegible] [illegible]

যায় এবং লাববায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিল আপনি এহরাম বাঁধিয়া লাববায়েক কেন বলিলেন না? তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে যে উহার উত্তরে লা লাববায়েক না বলা হয় অর্থাৎ তোমার উপস্থিতি গ্রাহ্য নয়। তারপর তিনি অনেক কষ্ট করিয়া লাববায়েক বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেহুশ হইয়া উটের পিঠ হইতে পড়িয়া গেলেন। তারপর যখনই তিনি লাববায়েক বলিতেন তাঁহার ঐ একই রূপ অবস্থা হইত। সমস্ত হজ্ব তাঁহার ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল।

আহমদ বলেন, আমি আবু ছোলোয়মানের সাথে হজ্বে গিয়াছিলাম। তিনি যখন এহরাম বাঁধিতে লাগিলেন লাববায়েক বলিলেন না। আমি এক মাইল পথ অতিক্রম করিলাম হঠাৎ তিনি বেহুশ হইয়া গেলেন। যখন হুশ হইল তখন আমাকে বলিলেন, আহমদ! আল্লাহ পাক হজরত মুসা (আঃ)-এর নিকট এই বলিয়া অহী পাঠাইয়াছিলেন যে জালেম অত্যাচারীদিগকে বলিয়া দাও তাহারা যেন আমাকে জিকির কম করিয়া করে। কেননা যখন মানুষ আল্লাহ পাকের জিকির করে তখন কোরানের আয়াত অনুসারে আল্লাহও বান্দার জিকির করেন তবে কথা হইল এই যে আল্লাহ পাক জালেমকে লা'নতের সহিত স্মরণ করেন। তারপর আবু ছোলায়মান বলিলেন—আহমদ আমাকে বলা হইয়াছে যে, যেই ব্যক্তি না-জায়েজ কামের সহিত হজ্ব করে এবং লাব্বায়েক বলে তখন আল্লাহ পাক বলেন লা লাব্বায়েক অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি অন্যায় কাজ না ছাড়িয়া দিবে ততক্ষণ তোমার লাব্বায়েক না মঞ্জুর।

তিরমিজী শরীফে হজরত শাদ্দাদ বিন আউছ হইতে বর্ণিত আছে যে, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি নিজ নফ্ছের হিসাব লইতে থাকে আর পরকালের জন্য আমল করিতে থাকে! আর দুর্বল এবং বেওকুপ ঐ ব্যক্তি যে আপন নফ্ছকে খায়েশের সহিত লাগাইয়া রাখে এবং নিজের আকাংখা পূর্ণ হইবার আশায় থাকে। (নোজহাতুল মাজালেছ)

কিন্তু ঐসব সত্ত্বেও আল্লার মেহেরবানীর প্রত্যাশী হওয়া উচিত। কেননা তাঁহার বখ্শিশ এবং দয়া আমাদের গোনাহ হইতে অনেক বেশী বড়। হুজুরে আকরাম (ছঃ) এই ভাবে দোয়া করিতেন—

اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي -

"আয় খোদা! তোমার ক্ষমা আমার পাপরাশী হইতে অনেক প্রশস্ত। এবং আমার নেক আমলের চেয়ে তোমার রহমত অধিক আশা ভরসার স্থল।

হারাম শরীফে চাচা ভাতিজার কেচ্ছা

জনৈক বুজুর্গ সত্তর বৎসর পর্যন্ত মক্কা শরীফে থাকিয়া হজ্ব এবং ওমরা করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন লাব্বায়েক বলিতেন উত্তরে লা লাব্বায়েক শব্দ আসিত। একবার একজন যুবক তাঁহার সহিত এহ্‌রাম বাঁধিল এবং বুজুর্গের লাব্বায়েকের উত্তরে যখন লা লাব্বায়েক আসিল তখন এই যুবকও তাহা শুনিতে পাইল। তখন সে বলিল চাচাজান আপনার জওয়াবেত লা লাব্বায়েক আসিতেছে। বুজুর্গ বলিলেন, বেটা তুমিও শুনিয়া ফেলিয়াছ? যুবক বলিল জী হাঁ আমিও শুনিয়াছি। ইহার উপর তিনি খুব কাঁদিলেন এবং বলিতে লাগিলেন বেটা আমিত এই উত্তর সত্তর বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। যুবক বলিল তবে চাচা মিছামিছি কেন আপনি কষ্ট উঠাইতেছেন। চাচা বলিলেন বেটা এই দরওয়াজা ব্যতীত আর কোন দরওয়াজা আছে যেখানে আমি যাইব? আর তিনি ব্যতীত আমার কে আছে যাহার নিকট ধর্ণা দিব? বাবা, আমার কাজ হইল চেষ্টা করিয়া যাওয়া, তিনি কবুল করুন বা নাই করুন। আর গোলামের জন্য কিছুতেই সঙ্গত হইবে না যে, সে এই সাধারণ ব্যাপারের মনিবের দরকার ছাড়িয়া যাইবে। এই বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এমন কি কান্নায় তাঁহার বুক ভাসিয়া গেল। অতঃপর বুজুর্গ আবার লাব্বায়েক বলিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যুবক শুনিতে পাইল যে ঐদিন হইতে আওয়াজ আসিল লাব্বায়েক ইয়া আবদী অর্থাৎ আমি হাজির আছি হে আমার বান্দা! এবং যাহারা আমার সহিত নেক ধারনা রাখে, তাহাদের সহিত আমি এই রূপ ব্যবহারই করিয়া থাকি। আর যাহারা আমার উপর আশা রাখিয়াও আপন খাহেশাতের উপর চলে আমার দরবারে তাহাদের কোন স্থান নাই। যুবক যখন এইসব উত্তর শুনিল, বলিতে লাগিল চাচাজান আপনিও কি এইসব উত্তর শুনিয়াছেন? শায়েখ বলিলেন, আমিও শুনিয়াছি বলিয়াই চিৎকার সহকারে হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

আবু আবদুল্লাহ জালা বলেন, আমি জুল হোলায়ফায় একজন যুবককে দেখিলাম যে, সে এহ্‌রাম বাঁধিবার এরাদা করিয়া বারংবার এই কথাই বলিতেছিল, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার ভয় হইতেছে যে আমি লাব্বায়েক বলিলাম আর তুমি লা-লাব্বায়েক বলিবে। কয়েকবার সে এই

কথা বলিতেছিল। অবশেষে এত জোরে সে একবার লাব্বায়েকা আল্লাহুম্মা বলিয়া উঠিল যে উহাতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

(মোছামেরাত)

আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন যে আমি আরাফাতের রাত্রে মিনার মসজিদে একটু শুইয়াছিলাম। স্বপ্নে আমি দেখিতে পাইলাম সবুজ পোশাক পরিহিত দুইজন ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতরণ করিল এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হজ্বে আগমণ করিয়াছে? সে বলিল আমারত জানা নাই। তারপর প্রশ্নকারী নিজেই বলিয়া দিল এই বৎসর সর্বমোট ছয় লক্ষ লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি কি জান তন্মধ্যে কতজনের হজ্ব কবুল হইয়াছে? অপর জন বলিল আমারত জানা নাই। এবারও প্রশ্নকারী নিজেই উত্তর দিল ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এই বলিয়া তাহারা আকাশের দিকে চলিয়া গেল। এবনে মোয়াফফেক বলিতেছেন যে আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া খুব ঘাবড়াইয়া গেলাম। চিন্তা ফিকিরে আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। যেহেতু ছয় লক্ষের মধ্যে ছয়জন। আমার মত নগণ্যের ত ইহার মধ্যে পাত্তাই থাকিতে পারে না। আরাফাত হইতে ফিরিয়া মোজদালাফায় জনসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ভাবিলাম হায়রে ছয় লক্ষের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এইসব দুশ্চিন্তায় আমার ঘুম আসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই দুই ফেরেশতাকে আবার দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রথম দিনের মত একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিল ও উত্তর দিল। অবশেষে একজন বলিল ভাই তোমার জানা আছে যে আল্লাহ পাক কি ফায়ছালা করিয়াছেন? দ্বিতীয়জন বলিল আমারত জানা নাই প্রথম জন বলিল এই ফায়ছালা হইয়াছে যে ছয়জনের উছিলায় ছয় লক্ষের হজ্ব কবুল করা হইয়াছে। এবনে মোয়াফফেক বলেন ঘুম ভাঙ্গার পর আমার আর খুশীর অন্ত রহিল না।

সেই বুজুর্গের আর একটি কেচ্ছা তিনি বলেন একবার আমি হজ্ব করিতে যাই। হজ্ব করিয়া আমি ভাবিলাম এমন লোকও ত আছে যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই। তাই আমি দোয়া করিলাম, খোদা পাক! যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হজ্ব দান করিয়া দিলাম। রওজুর রিয়াহীনে লিখিত আছে তিনি বলেন যে আমি পঞ্চাশটা হজ্ব করি। সমস্তের ছওয়াব হুজুরে পাক, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আমার মাতা

তাকে বখ্শিশ করিয়া দিলাম। মাত্র একটি হজ্ব রহিয়া গেল। আমি আরাফাতের ময়দানে লোকজনের কান্নাকাটি দেখিয়া দোয়া করিলাম, হে খোদা! যাহার হজ্ব কবুল হয় নাই তাহাকে আমার হজ্ব দান করিয়া দিলাম। মোজদালাফায় স্বপ্নে আমি আল্লাহ পাকের জেয়ারত লাভ করি। তিনি বলেন যে, হে আলী! তুমি আমার চেয়ে বড় ছখী হইতে চাও? অথচ আমী নিজে দাতা, ছাখাওয়াত আমি পয়দা করিয়াছি এবং সমস্ত দাতাদের চেয়ে আমিই বড় দাতা। আমি যাহার হজ্ব কবুল হইয়াছে তাহার উছিলায় যাহাদের হজ্ব কবুল হয় নাই ঐ সমস্ত লোকদের হজ্ব কবুল করিলাম। অন্তত্র আছে আমি সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। বরং তাহারা বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশী যাহাদের জন্য সুপারিশ করে সবাইকে মাফ করিয়া দিলাম। এইসব ঘটনাবলী হইতে আশা রাখা উচিত যে আল্লাহ শুধু আপন মেহের বাণীর দ্বারা আমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ঐ ব্যক্তি বহু বড় পাপী যে আরাফাতের ময়দানে গিয়াও মনে করে যে আমার গোনাহ মাফ হয় নাই।

(৭) عن ابى موسى رضه عن النبى ص قال الحاج يشفع فى اربع مائة اهل بيت او قال من اهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه - ترغيب

'হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন চারিশত পরিবারের হজ্ব হাজীদের সুপারিশ কবুল করা হয়। অথবা ইহা বলিয়াছেন যে আপন পরিবারের চারিশত লোকের বিষয় তাহাদের সুপারিশ কবুল করা হয়। এবং হাজী সাহেবান যেদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেদিনকার মত নিষ্পাপ হইয়া যায়।

ফায়েদা: চারিশত লোকের ব্যাপারে অর্থ হইল এত লোকের মাগফেরাতের বিষয়ত আল্লাহ পাকের ওয়াদা। তবে উহার চেয়ে বেশীর ব্যাপারেও কোন বাধা নাই। অন্যান্য রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় হাজী যাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করিবে তাহা কবুল হইয়া থাকে।

বিখ্যাতবুজুর্গ হজরত ফোজায়েল বিন এয়াজ একবার আরাফাতের ময়দানে বলিতে লাগিলেন যে, তোমাদের কি খেয়াল এই বিরাট জনসমুদ্র যদি কোন দাতার দরবারে গিয়া একটা বখ্শিশ প্রার্থনা করে তবে কি দাতা উহা অস্বীকার করিতে পারিবে? লোকে বলিল কখনই না। তিনি বলিলেন, খোদার কছম আল্লার নিকট এই সমস্ত লোককে ক্ষমা

করিয়া দেওয়া দাতার বখ্‌শিশ দেওয়া হইতেও সহজ। আল্লার মেহেরবাণীর নিকট ইহা কিছুই নহে।

(৮) عن ابن عمر رضـ قال رسول الله صـ اذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له - احمد . مشكوة

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন কোন হাজীর সাক্ষাত হইলে তাহাকে ছালাম কর এবং তাহার সহিত মোছাফাহা কর। এবং বাড়ী প্রবেশের আগেই তাহাকে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল। কেননা তখন পর্যন্ত সে গোনাহ্‌ হইতে পাক ছাফ থাকে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মোজাহেদ এবং হাজী আল্লার প্রতিনিধি তাহারা যাহাই চায় তাহাই পায়, যেই দোয়া করে সেই দোয়াই কবুল হয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর বলেন হে খোদা! তুমি হাজীদিগকেও ক্ষমা কর এবং যাহাদের জন্য তাহারা ক্ষমা চায় তাহাদিগকেও মাফ কর। অন্যত্র আছে হুজুর ইহা তিনবার বলিয়াছেন।

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হাজী ছাহেব নিজেও ক্ষম প্রাপ্ত হন এবং বিশে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত যাহার জন্য মাফ চাহেন তিনিও মাফ পান। পূর্বেকার লোকেরা হাজীদিগকে অনেক দুর গিয়া বিদায় দিয়া আসিতেন ও অনেক দুর হইতে আগাইয়া আনিতেন। এবং তাহাদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিতেন।

(৯) عن بريدة رضـ قال قال رسول الله صـ النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبع مائة ضعف .

হুজুর (ছঃ) বলেন হজ্বের মধ্যে খরচ করা জেহাদের মধ্যে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাত শত টাকার ছওয়াব।

একবার হুজুর আম্মাজান আয়েশাকে বলেন তোমার ওমরার ছওয়াব তোমার খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ যতবেশী খরচ করিবে ততবেশী ছওয়াব পাইবে।

একটি হাদীছে আছে হজ্বে এক দেরহাম খরচ করা চারকোটি দেরহাম খরচের সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকা খরচ করিলে চারকোটি টাকা খরচ করার ছওয়াব পাওয়া যায়। এতবড় সুসংবাদের পরও যদি মুছলমান হজ্বে গিয়া কৃপণতা করে তবে উহার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? মাশায়েখগণ হজ্বের মধ্যে কম খরচ করিতে বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়াছেন।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, এছরাফ বা অতিরিক্ত করার অর্থ হইল খানা-পিনায় অতিমাত্রায় বিলাসিতা করা। কিন্তু আরবের লোকদের উপর খরচ করাকে কোন অবস্থাতেই এছরাফ বলা হয় না। মাশায়েখগণ লিখিয়াছেন খানাপিনার সামগ্রী কিনিতে সেখানের ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার নিয়ত থাকিলে উহাও গরীবের সাহায্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমার মোর্শেদ হজরত মাওলানা খলিল আহমদ মরহুমের সহিত দুইবার সেই পবিত্র ভূমিতে যাওয়ার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমি হজরতকে সেখানে দেখিয়াছি। যে কেহ তাহাকে কিছু হাদিয়া দিতেন তিনি বলিতেন এখানের লোকই হাদিয়া পাইবার বেশী যোগ্য। তবুও যদি তাহাকে কিছু দেওয়া হইত তবে আমাকে বলিতেন এই পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিছু কিনিয়া আন কেননা এখানের ব্যবসায়ীদেরও সাহায্য করা উচিত।

হজরত ওমর বলেন যাহার ছফরের পাথেয় উত্তম তিনিই মহৎ ব্যক্তি পাথের উত্তম হওয়ার অর্থ হইল সে নিজেও ভাল এবং খরচ করার ব্যাপারেও কুণ্ঠাবোধ করে না। হজরত ওমর আরও বলেন, ঐ হাজী সবচেয়ে উত্তম যাহার নিয়তের মধ্যে এখলাছ আছে। উদার দিলে খরচ করে এবং আল্লার উপর পূর্ণ একীন রাখে।

একটি দুর্বল হাদীছে বর্ণিত আছে যে ব্যক্তি আল্লার মনোনীত জায়গায় খরচ করিতে কৃপণতা করে সে আল্লার অসন্তুষ্টির জায়গায় তারচেয়ে অনেক বেশী গুণে খরচ করিতে বাধ্য। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে ফরজ হজ্বকে পিছাইয়া দেয়, হাজী সাহেবান হজ্ব হইতে ফিরিয়া আশা পর্যন্ত তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় না। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করিতে ইতস্ততঃ করে, তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হয়। (তারগীব, তিবরাণী)

(১০) عن جابر رض رفعه ما امعر حاج قط قيل لجابر ما الامعار قال ما افتقر. ترغيب

"হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন হাজী কখনও ফকীর হইতে পারে না।"

অন্য হাদীছে আছে বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করিলে মানুষ আর গরীব থাকে না। অন্যত্র আছে বেশী বেশী করিয়া হজ্ব ও ওমরা করা অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করে এবং অভাবকে দূর করে।

অন্য হাদীছে আছে, হজ্ব কর ধনী হইয়া যাইবে, ছফর কর স্বাস্থ্যবান হইবে।

ইহা পরিক্ষিত যে আবহাওয়ার পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যায়।

একটি হাদীছে আছে ক্রমাগত হজ্ব ও ওমরা করা অভাব এবং গোনাহকে এইভাবে দূর করে যেমন আগুনের ভাট্টি লোহার ময়লাকে দূর করে।

(১১) عن عائشة رض قالت استاذنت النبى ﷺ فى الجهاد فقال جهادكن الحج - متفق عليه - مشكوة

"আম্মাজান আয়েশা বলেন—আমি হুজুরের নিকট জেহাদের জন্য অনুমতি চাহিলে হুজুর বলেন তোমাদের জেহাদ হজ্ব করা।"

একদিন আম্মা আয়েশা হুজুরকে বলেন, হুজুর! মেয়েলোকের জন্যও কি জেহাদ আছে? হুজুর বলিলেন হ্যাঁ আছে তবে সেখানে কোন লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্ব ও ওমরা।

অন্য হাদীছে আছে, তিনি হুজুরকে বলেন, হুজুর! সবচেয়ে ভাল আমল হইল জেহাদ। কাজেই আমরা মেয়েলোকদেরও জেহাদ করা উচিৎ হুজুর বলেন তোমাদের জন্য উত্তম জেহাদ হইল, হজ্বে মাবরুর। অন্য হাদীছে আছে হুজুরে পাক (ছঃ) হজ্বের সময় মেয়েলোকদিগকে বলেন। এই হজ্ব আদায় করার পর তোমরা আপন আপন ঘরের বাহির হইবে না।

এই হাদীছ শুনার পর হযরত জয়নব এবং হজরত ছওদা (রাঃ) আর কখনও হজ্ব করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন হুজুরের এই এরশাদের পর আমরা কি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারি? কিন্তু অন্যান্য বিবি ছাহেবান প্রথম হাদীছের উপর আমল করিয়া পরেও হজ্ব করিতে থাকেন।

হুজুরের উপর বর্ণিত উভয় এরশাদই নিজ নিজ স্থানে ঠিক। আসল কথা হইল মেয়েদের মাছাআলা হইল বড় নাজুক। তাহাদের ছফরে অনেক শর্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ মোহরেম সঙ্গে থাকিলে অতিরিক্ত হজ্ব ও ওমরা করা যায়। কিন্তু আপনজন না থাকিলে একাকী বা অন্যের সহিত ছফর করা কঠোরভাবে নিষেধ।

একটি হাদীছে আছে যেই জায়গায় অপর মেয়েলোক এবং অপর পুরুষ থাকিবে সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান আসিয়া থাকে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে না মোহরেম মেয়েলোক হইতে কঠোরভাবে বাঁচিয়া থাক। কেহ প্রশ্ন করিল হুজুর! যদি দেবর হয়? হুজুর বলেন দেবর ত মৃত্যুর সমতুল্য।

মৃত্যুর অর্থ হইল সবসময় ভাবী দেবরের কাছে কিনারে থাকার দরুন ধ্বংসের আছবাব বেশী পয়দা হয়।

(২) عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صـ عـم اراد الحج فليتعجل -

হুজুর (ছঃ) বলেন কেহ হজ্ব করিতে এরাদা করিলে উহা তাড়াতাড়ি আদায় করা উচিত।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে ফরজ হজ্ব তাড়াতাড়ি আদায় কর। কেননা কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। হুজুর আরও বলেন, বিয়ে করা হইতে হজ্ব করা অগ্রগণ্য। অন্যত্র আছে তাড়াতাড়ি হজ্ব কাজ সম্পাদন কর। কেননা রোগও আসিতে পারে, ছওয়ারীও না থাকিতে পারে অন্য কোন বিপদও আসিয়া যাইতে পারে। এইজন্য ওলামাদের একটি বিরাট অংশ এইমত পোষণ করেন যে কাহারও হজ্ব ফরজ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আদায় করা ওয়াজেব। দেরী করিলে গোনাহ গার হইবে।

একটি হাদীছে আছে, ফরজ হজ্ব আদায় কর উহা বিশবার জেহাদ করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অন্য হাদীছে আছে হজ্ব করা জেহাদ এবং ওমরা করা অতিরিক্ত নফল।

(৩) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صـ عـم خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب اجر الغازى الى يوم القيامة - ترغيب

"হুজুর এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্বে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে হজ্বের ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে ব্যক্তি ওমরার জন্য বাহির হইয়া এন্তেকাল করে কেয়ামত পর্যন্ত সে ওমরার ছওয়াব পাইতে থাকিবে আর যে জেহাদের জন্য বাহির হইয়া রাস্তায় মারা যায় কেয়ামত পর্যন্ত সে জেহাদের ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে হজ্ব এবং ওমরার জন্য বাহির হইয়া মারা যায়। কেয়ামতের দিন হিসাব কিতাবের জন্য তাহাকে কোন আদালতে হাজিরা দিতে হইবে না বরং বলা হইবে যে তুমি বেহেশ্‌তে চলিয়া যাও।

আরও আসিয়াছে, যে ব্যক্তি মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে বা আসার পথে মারা যাইবে তাহার কোন হিসাব নিকাস নাই। অন্যত্র আছে যে ফিরিয়া আসিবার সময় মারা গেল সে ছওয়াব এবং গনিমত লইয়া ফিরিল অর্থাৎ ছওয়াব ছাড়াও খরচের টাকার বদলে সে এখানেও অবস্থাবান হইবে।

একটি হাদীছে আছে মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে ভাল সময় হইল হজ্ব করিয়া অথবা রমজানের রোজা রাখিয়া মরা" কেননা এই দুই অবস্থায় মানুষ গোনাহ হইতে একেবারেই পাকছাপ হইয়া যায়। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে এহরাম অবস্থায় মারা যায় সে কেয়ামতের দিন লাব্বায়েক বলিয়া উঠিবে।

(৪) عن ابن عباس رض قال ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله فى الحج ادركت ابى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم وذالك فى حجة الوداع - مشكوة

"জনৈক মহিলা ছাহাবী হুজুরের দরবারে আরজ করিল হুজুর আমার বাবার উপর হজ্ব ফরজ। কিন্তু তিনি এতবুড়ো যে ছওয়ারীতে উঠিতে পারেন না। তাঁহার তরফ হইতে আমি কি হজ্ব করিব? হুজুর বলেন, হাঁ তাঁহার তরফ হইতে তুমি হজ্বে বদল আদায় কর। (মেশকাত)

অন্য হাদীছে আছে জনৈক ছাহাবী নবীজীর খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর! আমার ভগ্নি হজ্বের মানত করিয়া মারা যায়। এখন আমাকে কি করিতে হইবে? হুজুর বলেন, তোমার বোনের উপর যদি কাহারও কর্জ থাকিত তখন তুমি কি আদায় করিতে? সে বলিল জী হাঁ। আদায় করিতাম হুজুর বলেন ইহা আল্লাহ পাকের কর্জ উহাকেও আদায় কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে এক ব্যক্তি হুজুরের দরবারে আসিয়া তাহার পিতার কথা বলিল হুজুর আমার পিতা এত বেশী বৃদ্ধ যে সে হজ্ব ও ওমরা করিতে পারে না, কেননা ছফর করিতেও অক্ষম। হুজুর বলেন তোমার বাপের উপর যদি কোন কর্জ থাকিত তুমি আদায় করিলে কি উহা আদায় হইত না? আল্লাহ পাকত সবচেয়ে বড় দয়ালু। তিনি কেন তাঁহার কর্জ কবুল করিবেন না। পিতার তরফ হইতে বদলী হজ্ব কর।

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি আপন পিতামাতার তরফ হইতে

হজ্ব করিল সে জাহান্নামের অগ্নি হইতে নাজাত পাইল, এবং তাহার পিতা-মাতার জন্য হজ্বের পুরা ছওয়াব লেখা যাইবে। হুজুর আরও বলেন কোন নিকট আত্মীয়দের জন্য উহার চেয়ে ভাল সম্পর্ক আর কিছুই হইতে পারেনা সে আত্মীয়ের তরফ হইতে হজ্ব করিয়া তাহার কবরে পৌঁছাইয়া দেয়।

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর আমার পিতামাতা যখন জীবিত ছিলেন তখন আমি ছিলাম তাহাদের খেদমতকারী। এখন মৃত্যুর পরও তাহাদের সহিত কিভাবে সদ্ভাব রাখিতে পারি? হুজুর বলেন যখন নিজের জন্য নামাজ পড়িবে তাহাদের জন্য ও পড়িবে আর যখন নিজের জন্য রোজা রাখিবে তখন তাহাদের জন্যও রাখিবে। অর্থাৎ নামাজ ও রোজার ছওয়াব তাহাদের রুহ্‌তে পৌঁছাইবে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর, আমরা আপন মুর্দাদের জন্য ছদ্‌কা করি তাহাদের তরফ হইতে হজ্ব করি ও তাহাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করি। এইসব কি তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে? হুজুর বলেন ইহাতে তাহারা এমন খুশী হয় যেমন তোমাদের নিকট কেহ বরতনে ভর্তি করিয়া হাদিয়া পাঠাইলে খুশী হও।

অন্যের তরফ হইতে হজ্ব করা দুই প্রকার। প্রথমতঃ কাহারও তরফ হইতে নফল হজ্ব করা উহার জন্য কোন শর্ত নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহার তরফ হইতে হজ্ব করিবে তাহার উপর হজ্ব ফরজ হওয়া চাই। উহাকে হজ্বে বদল বলে। তাহার জন্য অনেক শর্ত আছে। ঐ সময় মত ওলামাদের নিকট জানিয়া লইবে।

(১৫) ان الله ليدخل فى الحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك -

"হুজুর এরশাদ করেন, বদলী হজ্বের দরুন আল্লাহ পাক তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। ১নং—মুর্দা, যাহার তরফ হইতে হজ্ব করা হয়। ২নং—যে বদলী হজ্ব করে। ৩নং—ওয়ারিশ, যে হজ্ব করাইল।

একটি রেওয়াতে আছে, যাহার তরফ হইতে হজ্ব করা হয় তাহার এবং হাজীর সমান সমান পুণ্য হইয়া থাকে।

এব্‌নে মোয়াফ্‌কেফ বলেন, আমি হুজুর (ছ):-এর তরফ হইতে কয়েকটি হজ্ব করিয়াছি। একবার হুজুরকে স্বপ্নে দেখিলাম হুজুর বলিলেন—

তুমি আমার পক্ষ হইতে হজ্ব করিয়াছ? আমি বলিলাম, জী-হুজুর। হুজুর পাক আবার বলিলেন তুমি কি আমার পক্ষ হইতে লাব্বায়েক বলিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হুজুর। বলিয়াছি। হুজুর বলিলেন, আমি উহার প্রতিদান দিব। কেয়ামতের দিবস আমি ঐ সময় তোমার হাত ধরিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাইয়া দিব যখন অন্যান্য লোক হিসাব-কিতাবে লিপ্ত থাকিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে বদলী হজ্বের মধ্যে চার ব্যক্তি হজ্বের ছওয়াব পায়। ১নং—যে অছিয়ত করে। ২নং যে অছিয়তনামা লেখে। ৩নং—যে টাকা দেয়। ৪নং যে হজ্ব করে। কিন্তু একটি কথা খুব গুরুত্ব সহকারে স্মরণ রাখিবে উহা এই যে, বদলী হজ্বের মধ্যে নিয়তকে খালেছ রাখিবে। উদ্দেশ্য শুধু হজ্ব, জেয়ারত এবং অন্যের সাহায্য হইতে হইবে। দুনিয়ার কোন ফায়েদা যেন উদ্দেশ্য না হয়। যদি এমন হয় তবে যাহারা হজ্ব করাইবে তাহারা তপুরা ছওয়াব পাইয়া যাইবে। আর যে হজ্ব করিবে তাহার ছওয়াব বরবাদ হইবে।

ইমাম গাজ্জালী বলেন যে ব্যক্তি অতিরিক্ত টাকা লইয়া বদলী হজ্ব করিবে সে ধর্মীয় আমলের দ্বারা দুনিয়ার উপার্জন করিল। এইজন্য উহাকে যেন ব্যবসা না বানান হয়। কেননা আল্লাহতায়ালা দ্বীনের উছিলায় দুনিয়া ত দান করেন, কিন্তু দুনিয়ার বদলে দ্বীন দান করেন না। অর্থাৎ তাহার উদ্দেশ্য হইল দুনিয়ার লাকড়ি জমা করা, উহার সাথে ছওয়াবও মিলিবে তা হইতে পারে না। (এতহাফ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্ব না করার শাস্তি

ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির মধ্যে হজ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। উহার দ্বারাই ইসলামের পূর্ণতা লাভ হয়। উহা না করিলে যত বড় মছিবতই আসুক না কেন উহা স্বাভাবিক। আল্লাহ পাক বলেন—

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ۔ (سورة آل عمران)

"আল্লার সন্তুষ্টির জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব ফরজ করা হইয়াছে ঐসব লোকের উপর যাহারা যাতায়াতের সামর্থ্য রাখে। এবং যাহারা অস্বীকার করিবে। (জানিয়া রাখিবে যে তাহাদের অস্বীকারে আল্লার কোন ক্ষতি নাই) যেহেতু তিনি সারা বিশ্ব ভূবনের কাহারো মুখাপেক্ষী নন।"

ওলামাগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতের দ্বারাই হজ্ব ফরজ সাব্যস্ত হইয়াছে। এই আয়াতে কয়েকটি তা'কীদ করা হইয়াছে (যাহাআলেমগণ বুঝিবেন) যদ্দ্বারা হজ্বের গুরুত্ব অপরসীম বাড়িয়া গিয়াছে।

হযরত ইব্‌নে ওমর (রা:) বলেন যার শারীরিক সুস্থতা আছে এবং আর্থিক সামর্থ্যও আছে, অথচ সে তো হজ্ব না করিয়াই মারা যায় কিয়মতের দিন তাহার কপালে 'কাফের' শব্দ লেখা থাকিবে। তারপর তিনি আয়াতে পাক وَمَنْ كَفَرَ পাঠ করেন। (দোর্‌রে মানছুর)

হযরত ছায়ীদ বিন জোবায়ের, ইব্রাহীম নখয়ীম, মুজাহেদ' তাউছ প্রমুখ তাবেয়ীনগণ বলেন যাহার বিষয় আমার জানা হয় যে, সে হজ্বের উপযুক্ত হইয়া হজ্ব না করিয়াই মারা গিয়াছে। আমি তাহার জানাজায় শরীক হইব না। অবশ্য চারি ইমামের নিকট অস্বীকার না করিলে সে কাফের হয় না। তবুও যেইসব ধমক আসিয়াছে উহা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়।

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

(سورة بقرة)

"এবং তোমরা আল্লার রাস্তায় দান করিতে থাক এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন এই আয়াতে ঐসব লোকের জন্য সাবধান বাণী আসিয়াছে যাহারা ফরজ কাজে খরচ করে না। আর হজ্বের মত ফরজ কাজে আল্লার প্রদত্ত মাল খরচ না করিলে নিজের হাতেই নিজেকে ধ্বংস করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১) عن علي رض قال قال رسول الله صـ من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وذالك ان الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ـ

'হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তির নিকট ছওয়ারী এবং পথ খরচ বাবত এই পরিমাণ সম্বল রহিয়াছে যদ্বারা সে বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাইতে পারে, কিন্তু তবুও সে গেল না। সে ইহুদী হইয়া মরুক বা নাছারা হইয়া মরুক তাহাতে কিছু আসে যায় না।" এই কথার প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) কোরানে পাকের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। (তিরমিজি)

ولله على الناس حج البيت الاية

ইমাম গাজ্জালী বলেন কতবড় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যাহা ছাড়িয়া দিলে ইহুদী এবং নাছারাদের মধ্যে গণ্য হইয়া গেল।

(২) عن ابى امامة رض قال قال رسول الله صلعم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا ـ مشكوة

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন; যে ব্যক্তির জন্য হজ্বে যাওয়ার ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন ওজর না থাকে যেমন অত্যাচারী বাদশাহ্ বাধা দিতেছেনা অথবা কঠিন বিমারী নয় যদ্বারা হজ্বে যাইতে অপারগ, এমতাবস্থায় যদি সে হজ্ব না করিয়া মারা যায় তবে সে ইহুদী হইয়া মরুক বা খৃষ্টান হইয়া মরুক সেটা তার ইচ্ছা।

অন্য হাদীছে হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হজ্বের শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি কেহ হজ্ব না করে তবে কছম খাইয়া বলিয়া দাও যে সে হয় ইহুদী হইয়া মরিবে না হয় খৃষ্টান হইয়া মরিবে। হযরত ওমর আরো বলেন আমার মন চায় সারা দেশে এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেই; যেই ব্যক্তি সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করিল না তাহাদের উপর যেন কাফেরদের মত জিজিয়া কর বসান হয়। কেননা সে মুছলমান নয়, মুছলমান নয়।

(৩) من كان له مال يبلغه حج بيت ربه او تجب عليه فيه الزكوة فلم يفعل سال الرجعة عند الموت ـ كنز

হযরত ইব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল থাকে যে সে হজ্ব করিতে পারে কিন্তু হজ্ব করে না। অথবা এই পরিমান মাল আছে যে তাহার উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজেব কিন্তু সে জাকাত দেয় না সে ব্যক্তি মৃত্যুকালে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করিবে।'

ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রার্থনা করার প্রমাণ কোরানে পাকে রহিয়াছে।

حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۙ الاية

"এমনকি তন্মধ্যে যখন কাহারও মৃত্যু আসিয়া পড়ে তখন সে বলে, হে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে দুনিয়ার আবার পাঠাইয়া দাও যাতে করে আমি আমার ত্যাজ্য সম্পত্তি তোমার রাহে খরচ করিয়া নেকী অর্জন করিয়া আসিতে পারি। আল্লাহ পাক বলেন, কখনও এমন হইবে না। ইহাত তাহার একটা মুখের কথা মাত্র। তারপর তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত আলমে বরজখ অর্থাৎ কবরে থাকিতে হইবে।

আম্মাজান আয়েশা বলেন, পাপীদের জন্য কবরে ধ্বংস অনিবার্য্য। কেননা কালসাপ তাহার মাথার দিক হইতে এবং পায়ের দিক হইতে দংশন করিতে থাকিবে এমন কি দুইদিক হইতে মধ্যখানে আসিয়া দুই দিকের দংশন কারী একত্র হইয়া যাইবে। ইহাই হইল কবরের আজাব, যেই দিকে আয়াতে পাকে ইশারা রহিয়াছে।

হজরত ইব্‌নে আব্বাছ বলেন যাহার নিকট হজ্বে যাইবার সম্বল আছে অথচ সে হজ্বে গেল না আর যাহার নিকট মাল আছে অথচ সে উহার জাকাত আদায় করিল না সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার জন্য দরখাস্ত করিবে। কেহ আরজ করিল দুনিয়াতে ফিরিয়া আসিবার আকাংখ্যা ত কাফেরগণ করিবে, মুছলমানগণ নহে। হযরত এব্‌নে আব্বাছ বলেন আমি তোমাদিগকে কোরানের আর একটি আয়াত শুনাইতেছি যেখানে মুছলমানদের উল্লেখ রহিয়াছে। আল্লাহ পাক বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُكُمْ الاية

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের আওলাদ ফরজন্দ যেন তোমাদিগকে আল্লার জিকির হইতে গাফেল না রাখে এবং যাহারা এই রকম করিবে তাহারা নিশ্চয় ধ্বংস প্রাপ্ত। এবং আমি যাহা কিছু মাল দান করিয়াছি তন্মধ্য হইতে মৃত্যু আসিয়া পড়ার পূর্বেই তোমরা আল্লার রাহে খরচ কর। যেহেতু তখন সে আফছোছ করিয়া বলিবে হে খোদা! আমাকে সামান্য কিছু দিনের জন্য সময় দিয়া দাও যাহাতে আমি ছদকা খয়রাত করিয়া নেককারদের মধ্যে গণ্য হইয়া আসিতে পারি। এখন কিন্তু তোমাদের ঐসব অসম্ভব আশা নিস্ফল, কেননা যাহার মৃত্যু

আসিয়া যাইবে এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে সময় দেওয়া হইবে না। আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কাজের খবর রাখেন।"

হজরত এব্‌নে আব্বাছ বলেন এই আয়াতে ঐসব ঈমানদারদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা মাল থাকা সত্তেও জাকাত দেয় নাই এবং হজ্ব আদায় করে নাই তাহারাই আবার মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে আসিবার দরখাস্ত করিবে।

(৪) عن ابى سعيد ن الخدرى رض ان رسول الله ص قال يقول الله عز وجل ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خمسة اعوام لا يفد الى المحروم

হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন যাহাকে আমি স্বাস্থ্য দান করিয়াছি এবং রুজীর মধ্যে প্রশস্ততা দান করিয়াছি এইভাবে তাহার উপর পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় তবুও সে আমার দরবারে অর্থাৎ হজ্ব করিতে আসিল না সে নিশ্চয় অপরাধী।

অন্য হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে সামর্থ্য থাকিলে জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ। এখানে বুঝা যায় যে শক্তি সামর্থ্য থাকিলে প্রতি পাঁচ বৎসরে একবার হজ্ব করা জরুরী। যদিও ওলামাদের মতে ইহার উপর আমল জরুরী নয় তবুও অন্য কোন ধর্মীয় মাজবুরী না থাকিলে অথবা গরীব গোরাবার আধিক্য না থাকিলে সামর্থ্য থাকিলে নফল হজ্ব করা উত্তম।

(৫) روى عن ابى جعفر محمد بن على عن ابيه عن جده قال قال رسول الله ص ما من عبد ولا امة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضى الله الا انفق اضعافها فيما يسخط الله وما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا الا راى المحلقين قبل ان تقضى تلك الحاجة يعنى حجة الاسلام وما من عبد يدع المشى فى حاجة اخيه المسلم قضيت او لم تقض الا ابتلى بمعونة من ياثم عليه ويوجر فيه - ترغيب

হুজুর (সঃ) হইতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি পুরুষ হউক বা মেয়েলোক (হউক) আল্লার সন্তুষ্টির স্থানে খরচ না করে সে আল্লার নারাজীর স্থানে খরচ করিতে বাধ্য। যে ব্যক্তি কোন পার্থিব কারণে হজ্ব করিতে দেরী করিয়া ফেলিল,

হাজীগণ হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে তাহার সেই পার্থিব প্রয়োজন সারিবে না। আর যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের সাহায্যে পা উঠায় না; তাহাকে কোন গোনাহের কাজে সাহায্য করিতে হইবে যেখানে কোন ছওয়াব নাই। (তারগীব)

মোহাদ্দেছীনের কানুন অনুসারে এই হাদীছে কিছুটা দুর্বলতা আছে, তবে ফাজায়েলে আ'মলের মধ্যে এইরূপ দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করা করা যায়। তদুপরি অভিজ্ঞতাও দেখা যায় যাহারা নেক কাজে খরচ করা হইতে বাঁচিয়া চলে তাহারা অথবা মামলা মোকদ্দমায় ঘুষ ইত্যাদি এমন কি অনেক সময় নাচ গান সিনেমা থিয়েটার ইত্যাদিতেও লিপ্ত হইয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়। হাঁ এইসব ধমক ঐসব লোকের জন্য যাহারা শক্তি থাকা সত্ত্বেও ফরয হজ্ব আদায় করে না। অপর দিকে গরীবী অবস্থায় অথবা যদি মাথার উপর কাহারও হক থাকে সেই ছুরতে নফল হজ্বের চেয়ে লোকের হক আদায় করা শ্রেষ্ঠ! কোন কোন লোক আপন পরিবার পরিজনকে অভাবে ফেলিয়া হজ্বে চলিয়া যায় ইহাদের শানে হাদীছে আসিয়াছে যে মানুষের পাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে যাহাদের অন্নসংস্থান তাহার মাথার উপর তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

হজ্বের ছফরে কষ্টের উপর ধৈর্য্যাবলম্বনের বর্ণনা

ছফর যেই প্রকারেরই হউক না কেন উহাতে কষ্ট নিশ্চয় আছে। এই জন্যই শরীয়তে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চার রাকাত ফরজ নামাজকে দুই রাকাত করা হইয়াছে। হাদীছে বর্ণিত আছে 'ছফর আগুনের একটা টুকরা।' কাজেই কষ্ট ত সেখানে থাকিবেই, বিশেষ করিয়া হজ্বের ছফর ত প্রেম ও ভালবাসার ছফর। প্রেমিকদের মতই উহা সম্পাদন করিতে হইবে। কেহ তাহাকে অন্যায় বলিবে, গালি দিবে পাথর মারিবে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে সে উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিবে না বরং মাহবুবের ফিকিরে পাগলের মত মনে সন্তুষ্টই থাকিবে। এবং আনন্দ চিত্তে যে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যাইবে। তবে যদ্বারা দ্বীন এবং স্বাস্থ্যের

উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে উহা সহ্য করার কোন অর্থ নাই।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন এই ছফরে মানুষ যাহা খরচ করিবে আনন্দ চিত্তে করিবে এবং জান মালের যাহা নোকছান হইবে উহাকে সন্তুষ্ট চিত্তে বরদাশ্‌ত করিবে। কেননা ইহাই হইল হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত। হজ্বের রাস্তায় মছিবত জেহাদে খরচ করার সমতুল্য। অর্থাৎ এক টাকায় সাতশত টাকার ছওয়াব পাওয়া যায়। হজ্বের কষ্ট করা জেহাদে কষ্ট করার সমতুল্য। আল্লার দরবারে উহার জন্য বহুত বড় প্রতিদানের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

হুজুর (ছঃ) হযরত আয়েশাকে বলেন। তোমার ওম্‌রায় পরিশ্রম মোতাবেক ছওয়াব পাইবে। এইজন্য যে, এই ছফরে কষ্ট যত বেশী পাইবে ছওয়াবও তত বেশী হইবে। তবে ইহা করিয়া বা অনর্থক কষ্ট উঠাইলে কোন ফায়দা নাই। যেমন হাদীছে আছে এক অন্ধ ব্যক্তিকে রশিতে বাঁধিয়া অন্য ব্যক্তি তওয়াফ করাইতেছিল। ইহা দেখিয়া হুজুর রশি কাটিয়া দিলেন এবং হাত ধরিয়া তওয়াফ করাইতে বলিলেন। এইভাবে হুজুর আর একদিন বলিলেন দুই ব্যক্তি আপোসে বন্ধনাবস্থায় চলিতেছে, হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন পর তাহারা বলিল আমরা এইরূপ অবস্থায় মক্কা পর্যন্ত পৌছিবার মানত করিয়াছি। হুজুর বলেন এই রশিকে ছিড়িয়া ফেল নেক কাজে মানত করিতে হয়, ইহা শয়তানী কাজ। (শর্‌হে বোখারী) তবে এই রাস্তায় পদব্রজে চলা অবশ্য প্রশংসনীয়, যতটুকু সহ্য হয় ততটুকু বরদাশ্‌ত করিবে। কোরান পাকে পায়দল চলাকে ছওয়ারীতে চলার পূর্বে বয়ান করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় পায়দল ছফর করা উত্তম। ওলামাগণ লিখিয়াছেন যাহারা পায়দল চলার অভ্যস্ত হজ্ব ফরজ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদের জন্য ছওয়ারী খরচা থাকা কোন জরুরী নয়। পায়দল হজ্ব করার ফজীলত হুজুরের হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়।

(১) عن ابن عباس مرفوعا من حج الى مكة ماشيا حتى رجع كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال كل حسنة بمائة الف حسنة - عيني

"হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি হজ্বের ছফর পায়দল

করিবে এবং পায়দলে ফিরিয়াও আসিবে তাহার আমল নামায় হারাম শরীফের সাত শত নেকী লেখা যাইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হারাম শরীফের নেকীর অর্থ কি হুজুর! হুজুর বলেন প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য।

এই হিসাবে সাত শত নেকী সাত কোটি নেকীর বরাবর হইয়া যায়। এইভাবে পুরা রাস্তার ছওয়াবের অনুমান করা যায়, হযরত এবনে আব্বাছ এনতেকালের সময় সন্তানদিগকে অছিয়ত করিয়া যান যে তোমরা হজ্ব পদব্রজে করিবে, অতঃপর এই হাদীছ শুনান। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন হারাম শরীফে এক রাকাত নামাজ এক লক্ষ রাকাত নামাজের সমতুল্য।

হযরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন, হারাম শরীফে একটি রোজা এক লক্ষ রোজার বরাবর এবং এক দেরহাম ছদকা এক লক্ষ দেরহামের বরাবর ছওয়াব, এইভাবে প্রত্যেক নেকী হারামের বাহিরের এক লাখ নেকীর বরাবর।

এখানে লক্ষণীয় যে যেই ভাবে হারামে প্রত্যেক নেকী এক লাখ নেকীর সমান তদ্রূপ প্রত্যেক গোনাহ্ ও ঐ পরিমাণ বাড়িয়া যায়। এই কারণে সেখানে গোনাহ করা বড় মারাত্মক এবনে আব্বাছ বলেন হারামের বাহিরে রাকিয়াতে আমি সত্তরটা পাপ করিব ইহা হারামে একটি পাপ করার চেয়ে ভাল।

(২) عن عائشة مرفوعا ان الملائكة لتصافح ركبان الحجاج وتعتنق المشاة . بيهقى

হুজুর (ছঃ) বলেন ফেরেশতাগণ ছওয়ারীতে আগন্তুক হাজীদের সহিত মোছাফাহা করে আর পায়দল হাজীদের সহিত মোয়ানাকা করে অর্থ গলায় গলায় মিশে।

হযরত ইবনে আব্বাছ অসুস্থাবস্থায় শুধু ফরমাইতেন যে আমি বেশী অনুতাপ আর কোন জিনিসের জন্য করি না যত বেশী করিয়া থাকি এইজন্য যে আমি একটা পায়দল হজ্ব করিতে পারিলাম না। কেননা আল্লাহ পাক উহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। মোজাহেদ বলেন হজরত ইছমাইল এবং ইব্রাহীম (আঃ) পায়দল হজ্ব করিয়াছেন।

একটি রেওয়ায়েতে আছে হযরত আদম (আঃ) হিন্দুস্থান হইতে পায়দলে এক হাজার হজ্ব করিয়াছেন। অন্যত্র আছে চল্লিশ হজ্ব করিয়াছেন।

এব্‌নে আব্বাছ বলেন আম্বিয়ায়ে কেরামের পায়দল হজ্ব করার অভ্যাস ছিল। মোল্লা আলী কারী বলেন উত্তম হইল হারামের সীমায় প্রবেশ করিয়া পায়দল চলিবে। ইমাম গাজ্জালী বলেন, শক্তি থাকিলে পায়দল চলাই উত্তম, কেননা এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) মৃত্যুকালে ছেলেদিগকে পায়দল হজ্ব করার অছিয়ত করেন এবং বলেন যে ইহাতে প্রত্যেক কদমে একশত নেক লেখা হয় এবং প্রত্যেক নেকী এক লক্ষ নেকীর বরাবর।

পায়দল চলার জন্য রাস্তা নিরাপদ হওয়া জরুরী। কমপক্ষে মক্কা শরীফ হইতে আরাফাত পর্যন্ত যুবক এবং যাহারা শক্তি রাখে তাহাদের জন্য পায়দল চলা উচিত। কেননা উহাতে ছওয়াব ব্যতীত বিভিন্ন মোস্তাহাব-গুলো পূর্ণভাবে আদায় করা যায়। যাহা ছওয়ারীতে গেলে আদায় করা সম্ভব হয় না। এই ছফর খুব লম্বাও নয়। আট তারিখ রওয়ানা হইয়া মিনা পর্যন্ত মাত্র তিন মাইল আর নয় তারিখ ভোর হইতে আরাফাত পর্যন্ত মাত্র পাঁচ মাইল, ইহা শক্তিমানদের জন্য তেমন কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। অথচ প্রতি কদমে সাত কোটি নেকী লেখা হয়। একটি রেওয়ায়েতে আছে মিনা হইতে আরাফাত পর্যন্ত পায়দল চলিলে হারাম শরীফের এক লক্ষ নেকী পাইবে।

আলী ইব্‌নে শোয়ায়েব নিশাপুর হইতে পায়দল চলিয়া ষাট হজ্ব করেন। মুগীরা বিন হাকীম মক্কা শরীফ হইতে পায়দল চলিয়া পঞ্চাশ হজ্বের উপর করেন। আবুল আব্বাছ পায়দলে আশী হজ্ব করেন, আবদুল্লাহ মাগরেবী পায়দলে সাতানব্বই হজ্ব আদায় করেন।

কাজী এয়াজ সেফা গ্রন্থে লিখিয়াছেন জনৈক বুজুর্গ সারাটি ছফর পায়দল অতিক্রম করার পর থেকে কষ্টের কথা উঠাইলে তিনি বলেন যেই গোলাম মনিব হইতে পলাইয়া যায় সে আবার মনিবের দরবারে ছওয়ার হইয়া কি করিয়া আসিতে পারে? আমার শক্তি থাকিলে মাথা নীচের দিকে দিয়া আসিতাম। এই ছফরের ইহা একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। মূল কথা এই ছফরের কষ্ট-পরিশ্রম হাসি মুখে স্বীকার করিবে। কোন প্রকার সেকায়েত, অভিযোগ, কটুকথা, অশোভন উক্তি হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলিবে। সাথীদের কাজে আপত্তি না করিয়া নম্র ব্যবহার করিবে। সৎচরিত্রের অর্থ এই নয় যে কাহাকেও কষ্ট দিবে না বরং কেহ

কষ্ট দিলে উহা সহ্য করাকে প্রকৃত সৎচরিত্র বলা হয়। কেহ কেহ পায়দলের চেয়ে ছওয়ারীতে হজ্ব করাকে উত্তম বলিয়াছেন। কেননা পায়দল চলিতে চলিতে অনেক সময় মেজাজ কড়া ও রুক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং পায়দল চলিলে যাহাদের আখ্‌লাক খারাপ হইয়া যায় তাহারা ছওয়ারীতে ছফর করিবে। ভক্তি শ্রদ্ধা আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়া ছফর করিবে মাহ্‌বুবের শহরে যাইতে দুঃখ-কষ্ট, রৌদ্র বৃষ্টি, শান্তি অশান্তি কোন কিছুরই পরওয়া করিবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজ্বের হাকীকত

প্রকৃতপক্ষে হজ্ব দুইটা দৃশ্যের নমুনা স্বরূপ। এবং প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ঐ দুই দৃশ্যই গোপন রাহিয়াছে। যদিও আল্লাহ পাকের প্রত্যেক হুকুমের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হেকমত এমন রহিয়াছে যেখান পর্যন্ত সাধারণতঃ মানুষের ধ্যান ধারণাও পৌঁছেনা। তবুও কোন কোন হেকমত এত প্রকাশ্য যে তাহা যে কোন লোকের দেমাগে সহজেই আসিয়া যায়। এইভাবে হজ্বের মধ্যেও এমন সব হেকমত রহিয়াছে যাহা আমাদের বোধগম্যের বাহিরে। তবুও দুইটি হাকীকত হজ্বের প্রত্যেক ক্রিয়া কলাপে এমন রহিয়াছে যাহা প্রত্যেকের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। ১নং হজ্ব একটি পরিপূর্ণ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ের নমুনা। ২ নং এশ্‌ক ও মহব্বত প্রকাশ করিবার এবং রুহকে প্রকৃত প্রেম ও ভালবাসা রঞ্জিত করিবার নমুনা।

প্রথম নিদর্শন হইল মউত এবং মউতের পরবর্তী সময়ের নিদর্শন। কেননা মানুষ যখন ঘর হইতে বাহির হয় তখন সমস্ত আত্মীয় স্বজন, ঘর বাড়ী, বন্ধু বান্ধব, সবাইকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে যেমন পরকালের ছফরে রওয়ানা হইল। দৈনন্দিন যেইসব বস্তুর সহিত অন্তর লাগিয়া থাকিত যেমন ক্ষেত খামার, দোকান পাটাব বন্ধুবান্ধবের মজলিস সব কিছুই ঐ সময় ছুটিয়া যায়। যেমন মৃত্যুর সময় এইসব বিদায় হইয়া যায়। রওয়ানা হইবার সময় বিশেষ ভাবে চিন্তার বিষয় এই যে যেমন আজ কিছু সময়ের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইতেছে তদ্রূপ অতিসত্বর এমন সময় আসিবে যখন চিরকালের জন্য এইসব বস্তু ছুটিয়া যাইবে। অতঃপর যানবাহনে আরোহণ করা ঠিক জানাজায় ছওয়ার হওয়ার কথাই তাজা করিয়া দেয়। গাড়ীতে বসার পর উহা যেমন প্রতিটি কদমে দেশ এবং বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে নিতে

থাকে, তদ্রূপ জানাজা বহনকারীরও প্রতি কদমে সমস্ত বন্ধু বান্ধব এবং যাবতীয় মাল ছামান হইতে দূরে লইয়া যায়। কিছু লোক নিশ্চয় জানাজা নামাজ পর্যন্ত থাকে আবার কিছু লোক কবর পর্যন্ত আর কিছু লোক দাফন পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। এই সমস্ত দৃশ্য হাজীদের সহিতও দেখা যায়। অর্থাৎ কিছু লোক ফী আমানিল্লাহ বলিয়া ঘর হইতে মোছাফাহা করিয়া বিদায় হয় আর কিছু লোক ষ্টেশন পর্যন্ত এবং কিছু সংখ্যক লোক জাহাজ পর্যন্ত সঙ্গে যায়। জাহাজে এবং কবরে শুধু ঐসব সাথী থাকে যাহারা বদ আখলাক, খিটখিটে, হটকারী, কলহপ্রিয়, ইহারা ছফরের প্রতি মঞ্জিলে শান্তির পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার পর সব-কিছুই ঠিক পরকালের ছফরেও দেখা যায়। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দুই বন্ধু নেক আমল যাহা কবরে যাবতীয় সুখশান্তির ব্যবস্থার কারণ আর বদআমল যাহা যাবতীয় অশান্তি এবং আজাবের মূল। নেক আমল অতীব সুন্দর পুরুষের বেশে কবরে আসিয়া দাঁড়াইবে আর বদ আমল বদ ছুরত ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধময় মূর্তিতে আসিয়া হাজির হইবে। মৃত্যুর পর যতসব শান্তি ও আরাম পৌঁছিবে তাহা নেক আমলের বদৌলতে যেমন হজ্বের ছফরে যতসব সুখ শান্তির ব্যবস্থা ঐ সমস্ত টাকা পয়সা ও সাজ সরঞ্জামের বরকতে যাহা ছফরের পূর্বেই তৈয়ার করা হইয়াছিল। হাঁ কোন ভাগ্যবান লোকের জন্য কোন আপন জন যদি কিছু পড়িয়া বা ছদকা খয়রাত করিয়া পৌঁছাইয়া দেয় তবে মৃত্যুর পরেও প্রয়োজনের সময় ইহা খুব বেশী কাজে আসে। তদ্রূপ হাজী ছাহেবানদের কাছেও যদি কোন আপনজন ডাকযোগ বা হুণ্ডি মারফত কিছু টাকা পয়সা পাঠায় তবে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। তারপর ছফরের হালতে ডাকাতের ভয়, বিভিন্ন বিপদের আশংকা, রুক্ষ মেজাজ, সরকারী বেসরকারী লোকের ব্যবহার, ভিসা পাসপোর্ট ইত্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষা, এইসব ব্যবহার কবরকে স্মরণ করিয়া দেয়। যেমন মনকীর নকীরের প্রশ্ন, ঈমানের পরীক্ষা, সাপ বিচ্ছু পোকা মাকড়ের দংশন ইত্যাদি। হাঁ অনেক ধনী লোক এমন আছে যাহাদের পাসপোর্ট ইত্যাদি সামান্য পরীক্ষার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পবিত্র হেজাজ ভূমিতে চলিয়া যায়। এইভাবে যাহারা অধিক পরিমাণ নেক আমল লইয়া যাইবে তাহারা কবরে যাবতীয় বিপদ আপদ হইতে মুক্ত হইয়া দুলাইনের মত এক আরাম আয়াশে সময় কাটাইবে যে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল সময় তাহাদের নিকট মনে হইবে যেন কয়েক ঘণ্টায় এবং কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবে। যেমন নূতন

হুলাইন প্রথম রাত্রে নরম নরম মখমলের বিছানায় আরাম করে তদ্রূপ ইহারাও কবরে শুইয়া পড়িবে। তারপর এহরামের সাদা দুই টুকরা সময় লাব্বায়েক বলা কেয়ামতের দিন আহ্বান কারীর ডাকে সাড়া দেওয়ারই সমতুল্য আল্লাহ পাক বলেন "তুমি দেখিতে পাইবে প্রত্যেক লোকই নতজানু হইয়া আছে এবং প্রত্যেককে আপন আমলনামার দিকে ডাকা হইবে।" মক্কা শরীফ প্রবেশ করা যেমন ঐ জাহানে প্রবেশ করা যেখানে শুধু আল্লার রহমতেরই আশা করা যায়। কেননা উহা হইল দারুল আমান, অর্থাৎ শান্তির ঘর কিন্তু আপন বদ আমলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সব সময় ভীত এবং সন্ত্রস্ত থাকিবে যে শান্তির ঘরে আসিয়াও যে আমার ভাগ্যে শান্তি না আছে নাকি। বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করা কেয়ামতের দিন এই ঘরের মালিকের দীদারকে স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং আল্লার দীদার যতবড় আদব এবং আজমতের সহিত লাভ করিবে তাঁহার ঘরকেও ততবড় আদব এবং আজমতের সহিত দেখিতে থাকিবে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ আরশের চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া ফেরেশতা-দের কথা স্মরণ করিয়া দেয়, কা'বা শরীফের গেলাফ এবং মোলতাজমকে জড়াইয়া কান্নাকাটি করা ঐ অপরাধীর সমতুল্য যে নাকি বহুত বড় মনিবের সহিত মারাত্মক বেআদবী করিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে ও তাহার ঘর এবং চৌকাঠে মাথা ঠোক্‌রাইয়া ঠোক্‌রাইয়া কান্নাকাটি করে। ছাফা মারওয়ার দৌড় কেয়ামতের মাঠে এদিক ওদিক ছুটাছুটির কথা মনে করাইয়া দেয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন "মানুষ কবর হইতে এমনভাবে বাহির হইবে যেমন বিক্ষিপ্ত টিড্ডি পঙ্গপালের দল।"

ছাফা মারওয়ার দৌড়ের দৃশ্য এই বান্দার খেয়াল মত কেয়ামতের সেই ভয়ানক দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় যখন দিশেহারা হইয়া আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট এই ভাবিয়া ধর্ণা দিবে যে, তাহারা আল্লার মাহবুব এবং মাকবুল বান্দা, কাজেই তাঁহাদের সুপারিশে আমাদের মছিবতের কিছুটা লাঘব হইবে। এই খেয়ালে সর্বপ্রথম আদম (আঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবে যে আপনি আমাদের পিতা, আল্লাহ্ পাক আপনাকে আপন হাতে পয়দা করিয়াছেন। সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়াছেন ফেরে-শতাদের দ্বারা ছেজদা করাইয়া আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আপনি আমাদের জন্য এই মহাসংকটের সময় সুপারিশ করুন। বাবা আদম উত্তর করিবেন, নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি

উহার চিন্তায় আজ আমি অস্থির আছি, কাজেই তোমরা নুহ (আঃ) এর নিকট যাও। লোকজন দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট গিয়া সুপারিশ করিতে বলিবেন। তিনি বলিবেন, আমি তুফানের দিন অন্যায় ভাবে পুত্র কেনানের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলাম কাজেই তোমরা ইব্রাহীম (আঃ) এর নিকট যাও। তিনিও ওজর করিয়া হজরত মুছা (আঃ) এর কথা বলিবেন। তিনি হজরত ঈছা (আঃ) এর কথা বলিবেন। অবশেষে সমস্ত লোক পরামর্শ করিয়া প্রিয় নবী দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ) এর নিকট গিয়া আরজ করিবেন এবং সেই মহা সংকট ও মছিবতের দিন হুজুরে পাক (ছঃ) আল্লাহ পাকের শাহেনশাহী দরবারে সুপারিশ করিবেন। এইসব হইল বিরাট কাহিনী। উদ্দেশ্য হইল এদিক ওদিক হয়রান পেরেশান হইয়া ছাফা মারওয়ার মত একদিন ফিরিতে হইবে।

তারপর আরাফাতের ময়দান ত হাশরের ময়দানের পুরা পুরা নক্‌শা সামনে আনিয়া দেয়। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে প্রস্তরময় এক মরু প্রান্তরে আশা এবং ভয়ের এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। অধম বান্দার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আরাফাতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় এই যে, ময়দান সে ওয়াদা এবং অঙ্গীকারকে স্মরণ করাইয়া দেয় যেদিন আল্লাহ পাক আলমে রুহের মধ্যে রোজে আজলের দিন যে একমাত্র প্রতিপালক এই কথার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন আমি কি তোমাদের প্রভু নই? সকলে এক বাক্যে বলিয়াছিলেন নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রভু। মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে এই ওয়াদা আরাফাতের ময়দানেই লওয়া হইয়াছিল। আজ সেই ওয়াদার কথাই মনে করিয়া দেয় যে আমরা উহার কতটুকু পালন করিয়াছি বা কতটুকু পালন করি নাই।

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন মোজদালাফা এবং মিনায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে ব্যস্ত হইয়া আপন আপন আমীর এবং মোয়াল্লেমগণের পিছনে চলা, রং বেরং এর বিভিন্ন জাতীয় নারী পুরুষ, বিভিন্ন জাতীয় মানুষ এবং ভাষায় সংমিশ্রণে ও শোরগোলে এক অভাবনীয় ও অপরূপ দৃশ্যের অবতারণা হয় যদ্দারা কঠিন হাশরের দিনে মানবগোষ্ঠির আপন আপন নবী ও নেতাগণের পিছনে হয়রান এবং পেরেশানীর সহিত দৌড়া-দৌড়ির দৃশ্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মূল কথা হজ্বের নক্‌শা ঠিক যেন কেয়ামতের পূর্ণ নক্‌শা পেশ করিয়া দেয়।

হজ্বের দ্বিতীয় দৃশ্য হইল এশ্‌ক ও মহব্বতের চরম নিদর্শন প্রকাশ করিবার অপরূপ দৃশ্য।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দুই প্রকারের সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রথমতঃ বিনয় এবং বন্দেগীর সম্পর্ক। উহার প্রকাশ হইল নামাজ। এই জন্যই নম্রতা এবং ভদ্রতার সহিত পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিয়া বাদশাহী আদবের সহিত কানে হাত রাখিয়া আল্লাহতালার মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দরবারে দণ্ডায়মান হইতে হয়। তারপর মাথা নত করিয়া ও অবশেষে মাটিতে কপাল রগড়াইয়া আপন গোলামী ও বন্দেগীর নিদর্শন দেখাইতে হয়। তার মধ্যে কোনরূপ তাড়াহুড়া করা আঙ্গুল মটকানো এদিক ওদিক দৃষ্টি করা, বিনা প্রয়োজনে কাশি দওয়া ইত্যাদি আশোভনীয় কাজ মাকরূহ, এবং কোনরূপ কথাবার্তা বলা, অজু ভঙ্গ হওয়া, হাসি-ঠাট্টা করা এমন কি ছেজদার মধ্যে দুই পা একত্রে উঠাইয়া ফেলা ইত্যাদি নামাজকে নষ্ট করিয়া দেয়। যেহেতু এইসব কাজ বাদশাহী আদব কায়দার খেলাফ।

আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার দ্বিতীয় সম্পর্ক হইল প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক। যেহেতু তিনি হইলেন মুরুব্বী, পরমদাতা দয়ালু সৌন্দর্য এবং বুজুর্গীর মত গুণাবলী সব কিছুই তাঁহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। পক্ষান্তরে বান্দার মধ্যে স্বভাবজাত হিসাবে ছোটবেলা হইতেই এশ্‌ক এবং মহব্বত বিদ্যমান থাকে। কবির ভাষায়—

'বুকে হাত রাখিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে। মনে হয় যেন বহু পূর্ব হইতেই কাহারও প্রেমের জ্বালায় মরিতেছে।'

"শিশুকালেই প্রেমের নিদর্শন পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়। তাইত আশেক মাশুকের মত খেল তামাশা শুধু চোখের ইশারায় করিয়া থাকে।"

"মাহবুবের স্মরণে যেই চক্ষুতে পানি থাকে না অন্ধ থাকাই সে চক্ষুর শ্রেয়ঃ। যেই অন্তরে বিরহ বেদনা নাই উহা দগ্ধ হইয়া যাওয়াই উত্তম।"

"তোমার বিরহ বেদনায় বাঁচিয়া থাকা মানুষের সাধ্যের বাহিরে, তাই ত হাজার শোকর যে এই জীবনের স্থায়ীত্ব নাই।"

"মাশুকে হাকীকী আল্লাহ পাক অনাদিকাল হইতেই চক্ষুর এক ইশারায় এই বিশ্ব ভূবনের বাজারে প্রেম ও ভালবাসাকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছেন।"

ঐ ভালবাসার চরম নিদর্শন। পাওয়া যায় হজ্বের ছফরে। কেননা শুরু হইতেই বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ী, ধন-সম্পদ সবকিছুর

মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া মাহবুবের গলিতে বাহির হইয়া যাওয়া এবং তাঁহারই তালাশে বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং সমুদ্রে পাড়ি দিয়া পাগলের মত ঘুরাফিরা করাই প্রেমিকের কাজ।

কবির ভাষায়—

ما و مجنوں ہم سبق بودیم در دیوان عشق
او بصحرا رفت و ما در کوچہا رسوا شدیم

"আমাদের এবং মজনুর একই অবস্থা এশ্‌কের ময়দানে, সে মরুভূমিতে চক্কর দেয় আর আমরা চক্কর দিতে থাকি অলিতে গলিতে।"

মাহবুব চায় তার প্রেমিকগণ যেন পাগল বেশে তাঁহাকে পাইবার আশায় দারুণ আগ্রহ উদ্দীপনায় তাঁহারই দরবারে ভিড় জমায়। তাহার জন্য হজ্বের ছফরকে বানাইয়াছেন একটা বাহানা স্বরূপ। আর এইরূপ পাগলের মত বাহির হইতে কিছু না কিছু দুঃখ-কষ্ট, এবং মছিবতে সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। হজ্বের এই মোবারক ছফরই হইল এশ্‌কের এবং মহব্বতের ছফর। কাজেই দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা পেরেশানী, ভয়-ভীতি সব কিছুই হয় এক আনন্দের খোরাক।

الفت میں برابر ہے جفا ہو کہ وفا ہو
ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو

"অন্তরে স্বাদ থাকিলে জিনিসের মধ্যেই লজ্জত অনুভব হয়। জুলুম অথবা ন্যায় বিচার ভালবাসার ধর্মে সবই সমান।

"এহ্‌রাম বাঁধা হইল প্রকৃত প্রেমিক হওয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন। না মাথায় টুপী, না শরীরে জামা, না সুন্দর পোশাক, না সুগন্ধি, বরং ফকীর বেশে পাগলের ছুরতে সদা চঞ্চল ও উদাসীন অন্তরে, সিলাই বিহীন গামছার মত সাদা চাদরে সে কি এক অপরূপ দৃশ্য। তাই ওলামাগণের মতে ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ই এহ্‌রাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া উত্তম। তবে এহ্‌রাম বাঁধার পর অনেক জায়েজ কাজও নাজায়েজ হইয়া যায় এবং ঐ প্রকার পোশাক অনেক নাজুক লোক বরদাশ্‌ত করিতেও অক্ষম তাই আল্লার রহমত শুরু হইতেই এহ্‌রাম না বাঁধার অনুমতি দিয়াছে। তবে মাহবুবের গলির নিকটবর্তী হইলে ঐ অবস্থায় এলোমেলো চুল লইয়া পাগলের মত পোশাক পরিধান করিয়া ময়লা যুক্ত কাপড় লইয়া তাঁহার দরবারে হাজির হইতেই হইবে। হুজুর পাক (ছঃ) বলেন—পেরে-

শান, চুল-দাড়ি এবং ময়লা যুক্ত কাপড়ই হইল হাজীদের পরিচয়। এই ছুরতের উপরই আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করিয়া থাকেন যে, দেখ আমার বান্দারা ধূলায় ধুসরিত ও এলোমেলো চুল-দাড়ি লইয়া আমার দরবারে হাজির হইয়াছে। এইভাবে মাঠ ঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদ নদী, সাগর মহাসাগর, বন-জঙ্গল এবং জনমানব শূণ্য মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কান্না কাটি করিতে করিতে পাগলের মত লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক লা শরীকা লাকা লাব্বায়েক "আমি হাজির আছি, আমি হাজির আছি, ইয়া আল্লাহ! আমি হাজির আছি, তোমার কোন শরীক নাই, আমি হাজির আছি এই আওয়াজে চীৎকার দিতে দিতে, রোনাজারী করিতে করিতে পৌঁছে। একটি হাদীছে আছে, হজ্বের অর্থই হইল খুব চীৎকার দেওয়া এবং কোরবানীর পশুর রক্ত প্রবাহিত করা। অন্য হাদীছে আছে হুজুর এরশাদ করেন হজরত জিব্রাঈল আমাকে বলিয়াছেন, আপনার সাথীদিগকে বলুন তাহারা যেন লাব্বায়েক জোর করিয়া বলে।" প্রেমিকদের ধর্মই হইল জোর করিয়া কান্নাকাটি করা। এইভাবে উদাস এবং পেরেশান অন্তরে ক্রন্দনরত অবস্থায় অবশেষে মাহবুবের শহরে পৌঁছিয়া যায় এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে। যেন বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সশরীরে জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করিল।

আমি আমার মোর্শেদ হজরত মাওলানা খলিল আহমদ ছাহেবকে বয়াত পাঠ করিতে খুব কমই শুনিয়াছি। কিন্তু তিনি যখন হজ্বে যান এবং হারাম শরীফে পদার্পণ করেন তখন বড়ই আশ্চর্য্য সুরে তিনি এই বয়াত পড়িতেছিলেন।

کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتِ گل
نسیمِ صبح تیری مہربانی

"কোথায় আমরা এবং কোথায় এই ফুলের সৌরভ, এইসব ভোরের হাওয়ার মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বিচ্ছেদের অনলে দগ্ধ একটি অন্তর যখন প্রিয়তমের ঘরে পৌঁছে তখন তাহার সে কি অবস্থা হয় তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কবির ভাষায়—

'মা' শুকের দর্শন আশেক কেমন করিয়া সহ্য করিতে পারে? তুর পাহাড়ে হজরত মুছাও সহ্য করিতে পারেন নাই।'

"হে দিল, আজ মিলনের রাত্রি, কাজেই যতটুকু সম্ভব মজা উড়াইয়া লও। যেহেতু কাল এই সুযোগ হইতে তুমি বঞ্চিত হইয়া যাইবে।'

তারপর প্রেমিক হাজীগণ যেইসব ক্রিয়া কলাপ করে সেইসব যে কোন আইন কানুনের গণ্ডির বাহিরে। কখনও মাহবুবের ঘরের চারিদিকে চক্কর দিতে থাকে, কখনও দেওয়াল দরওয়াজা এবং চৌকাঠকে চুমা দিতে থাকে। আবার কখনও চোখে মুখে কপালে ঘরের ইটপাথর বা কাপড়ের আঁচল মলিতে থাকে।

তাওয়াফ হাজরে আছওয়াদকে চুমা দিয়া শুরু করিতে হয়। হাদীছে পাকে উহাকে আল্লাহ পাকের হাতের সহিত তা'বীর করা হইয়াছে। উহাকে চুম্বন করা ঠিক যেন আল্লাহ পাকের হাতকে চুম্বন করা। দেওয়াল চৌকাঠ ইত্যাদিকে চুম্বন করা, কদমবুচি করা প্রেমিকদের স্বভাব ধর্ম। কবি বলেন—

وما حب الديار شغفن قلبي
ولكن حب من سكن الديار
امر على الديار ديار ليلى
اقبل ذا الجدار وذا الجدارا

"আমি যখন লায়লার শহরে যাই তখন কখনও এই দেওয়ালে আবার কখনও ঐ দেওয়ালে চুমা দিতে থাকি।'

হুজুরে পাক (ছঃ) হাজরে আছওয়াদে চুম্বন দিতে গিয়া দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁট মোবারক রাখিয়া কাঁদিতে থাকেন। ওদিকে হজরত ওমরও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিলেন। হুজুর এরশাদ করেন এইখানেই চোখের পানি বহাইতে হয়।

কা'বা গৃহের দেওয়ালের একটি বিশেষ অংশের নাম মোলতাজম। উহা বড়ই পবিত্র এবং বরকতের স্থান। উহা দোয়া কবুলের স্থান। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম ঐ স্থানকে জড়াইয়া ধরিতেন, আপন আপন চেহারাকে সেখানে মলিতেন।

তারপর ছাফা মারওয়ার দৌড় হইল পাগলামীর এক অত্যাশ্চর্য্য ও চরম নিদর্শন। উলঙ্গ মাথায় পায়জামা এবং কোর্তা বিহীন অর্দ্ধ উলঙ্গ শরীরে এদিক হইতে ওদিকে, ওদিক হইতে এদিকে দৌড়াদৌড়ির এক আজব দৃশ্য। তদুপরি ভোর বেলায় মক্কা শরীফ, রাত্রি বেলায় মিনা বাজার, পরের ভোরে আরাফাতের মরু প্রান্তর। সন্ধ্যা বেলায় মোজদালাফায় ভাগিয়া আসা। সকাল বেলায় আবার মিনায়। দুপুর বেলায় আবার

মক্কা শরীফে আগমন, সন্ধ্যা বেলায় পুনরায় মিনা বাজারে প্রস্থান, সে কি এক অপূর্ব ও আজব তামাশার দৃশ্য।

یہ صدا آئی مجھکو پھرتے حسن و عشق کی
ہم بھکاری بھیک کے در در رہیں رلتا پڑا
ایک جا رہتے نہیں عاشق بدنام کہیں
دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں

দুর্ণাম প্রেমিক একটি স্থানে অবস্থান করেনা। কোথাও দিনে; কোথাও রাত্রে, কোথাও ভোরে আবার কোথাও সন্ধ্যায়।

মিনায় শয়তানকে পাথর মারা প্রেম বাজারের পাগলামীর শেষ দৃশ্য। অর্থাৎ প্রেমিকের পাগলামী যখন চরমে পৌঁছে তখন সে আপন প্রেমিকাকে লাভ করিবার পথে যে কেহ প্রতিবন্ধক ও বাধা হইয়া দাঁড়ায় তাহাকেই সে এলোপাথাড়ি পাথর মারিতে থাকে।

সর্বশেষ লগ্নে কোরবানী করা যাহা প্রকৃতপক্ষে আপন জানের কোরবানী ছিল, আল্লাহ পাক অশেষ মেহেরবানীর উছিলায় উহাকে পশু কোরবানীর দ্বারা বদলাইয়া দিয়াছেন। এবং ইহাই হইল এশ্‌ক ও মহব্বতের শেষ মন্‌জিল। কবি বলেন—

موت ہی سے کچھ علاج درد فرقت ہو تو ہو
غسل میت ہی ہمارا غسل صحت ہو تو ہو

"মৃত্যুর দ্বারা যদি বিচ্ছেদের চিকিৎসা হয় তবে তাহাই হউক। আর মুর্দার গোছল যদি আমার স্বাস্থ্যের গোছল হয় তবে তাহাই হউক।"

موت ہی ہے علاج عاشق کا
اس سے اچھی نہیں دوا کوئی

"মৃত্যুই হইল আশেকের জন্য শেষ চিকিৎসা।
উহার চেয়ে উৎকৃষ্ট ঔষধ আর কিছুই নাই।"

হজ্বের যেই দৃশ্য এশ্‌ক ও মহব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে উহার প্রতি সামান্য কিছুটা আলোকপাত করা গেল মাত্র। যাহার অন্তরে সামান্য কতটুকু ব্যথার বেদন লাগিয়াছে, পাগলামীর সামান্য কতটুকু অংশ যাহার ভাগ্যে জুটিয়াছে সে যখন আপন ব্যাথাতুর অন্তর নিয়া মাহবুবের দেশে গমন করিবে তখন সে এইসব ইশারায় বর্ণিত ভাব সমূহকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবে। বিস্তারিত বর্ণনার জন্য বিরাট দপ্তরও যথেষ্ট নয়

তদুপরি মনের যে ভাবপূর্ণ জয্‌বা উহা কাজেও প্রকাশ করা যায় না।

درد دل دور سے ہم تم کو سنائیں کیونکر
خاک میں ڈھونڈتے ہیں آہوں کی صدائیں کیونکر
کاغذ تمام کلک تمام اور ہم تمام
پر داستان شوق ابھی نا تمام ہے

হজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক হেকমত

উল্লেখিত দুইটি হেকমত ব্যতীত হজ্বের মধ্যে বরং আল্লাহ পাকের যে কোন হুকুমের মধ্যে হাজার হাজার হেকমত গোপন থাকে যেখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি পৌঁছিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যতই চিন্তা ফিকির করিবে ততই রহস্যাবলী উদ্‌ঘাটিত হইবে। হজ্বের মধ্যে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন ধরনের হেকমত আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি দেওয়া গেল :

(১) যে কোন রাজা-বাদশা আপন প্রজাদের বিভিন্ন তবকার লোকদিগকে কমপক্ষে বাৎসরিক একবার একই স্থানে সমবেত করার একটা প্রবল আকাংখা দেখা যায়। হজ্বের মধ্যে সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

(২) মুছলমানদের উন্নতির ও তরক্কীর জন্য বিভিন্ন দেশের ইছলামী চিন্তাবিদগণ যদি সমষ্টিগতভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করিতে চায় তবে হজ্বের মৌসুমই উহা করিবার জন্য উৎকৃষ্ট সময়।

(৩) ইছলামী মুলুকসমূহের মধ্যে আপোসে একতা ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্য হজ্বের চেয়ে উৎকৃষ্ট সময় আর নাই।

(৪) যাহারা ভাষাবিদ বিভিন্ন ভাষভাষীদের মধ্যে সমঝোতা ও পর্যালোচনা করিতে ইচ্ছুক, তাহারা একমাত্র হজ্বের সময়ই আরবী; পার্সী, উর্দু, তুর্কী, হিন্দী, চীনী, পশতু ইংরেজী ভাষাভাষীদের অপূর্ব সমাবেশ দেখিতে পাইবেন।

(৫) সৈনিক জীবন যাহা ইছলামী জীবন ব্যবস্থার বিশেষত্ব, হজ্বের ছফরেই উহা পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। লেবাছে পোশাকে চাল চলন ইত্যাদিতে উহা প্রকাশ পায়।

(৬) যাহারা পুঁজিবাদের বিরোধী এবং ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাইয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী তাহাদের যাবতীয় পরিকল্পনা এবং স্কীম সারা বিশ্বের যে কোন অঞ্চলে চরমভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র

ইছলামের বুনিয়াদী উছুল, নামাজ, রোজা, হজ্ব এবং জাকাত। সেই সাম্যবাদ তথা সমাজবাদের আসল উদ্দেশ্যকে নেহায়েত সার্থককতার সহিত প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছে।

(৭) সারা বিশ্ব রাজনীতিতে উঁচু নীচু ভেদাভেদজনিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হজ্ব একটি সার্থক এবং চাক্ষুষ আমল যেহেতু আমীর-গরীব, বাদশাহ-ফকীর, হিন্দী আরবী, তুর্কী চীনী ইত্যাদি মানবজাতি একই অবস্থায়, একই বেশভূষায়, একই আমলে, বেশ কিছু সময়ের জন্য একত্রে জীবন যাপন করে।

(৮) জাতীয় সপ্তাহ পালন করিবার জন্য মানুষ কত ব্যবস্থা কত শত প্রচার এবং খরচপত্র করে। কিন্তু মুছলমানদের জন্য জিলহজ্বের প্রথম পনের দিন জাতীয় সপ্তাহ পালনের চেয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠ, যারজন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থাপনা বা প্রোপাগাণ্ডার প্রয়োজনও করে না।

(৯) সারা বিশ্ব মুছলিমের ভ্রাতৃত্ব সৌহার্দ, ভালবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা কায়েম করায় জন্য হজ্বই হইল একমাত্র সুবর্ণ সুযোগ।

(১০) যাহারা ইছলামের প্রচার ও তাবলীগ করার উৎসাহী তাহারা হজ্বের সময় খুব গুরুত্ব সহকারে অগ্রসর হইবে। স্থানীয় লোকদের উচিত বহিরাগতদের প্রকৃত গুরুত্ব মেহমানদারী হইল তাহাদের মধ্যে দ্বীনী জয্বা এবং উৎসাহ পয়দা করা এবং তাহাদের ধর্মীয় দুর্বলতাকে দুর করা, আর বহিরাগতদের উচিৎ তাহারা যেন স্থানীয় লোকদের প্রকৃত সাহায্য উহাকেই মনে করে যদ্বারা দ্বীনের তরক্কী হয়! এইভাবে সারা বিশ্বে নূতনভাবে দ্বীন চম্‌কিয়া উঠিতে পারে।

(১১) ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে প্রয়োজনের তাকীদের পারস্পরিক সহ অবস্থান ও সহযোগিতার এক অপূর্ব সুযোগ একমাত্র হজ্বের ছফরেই হইয়া থাকে। পারস্পরিক সহযোগিতার ধাপ ছাড়িয়া উহা ক্রমান্বয়ে ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

(১২) মুছলমানদের এজ্‌তেমা এবং সম্মেলন যখন সম্মিলিতভাবে দোয়া এবং কান্নাকাটির রূপ ধারণ করে তখন আল্লার রহমতকে আকর্ষণ করিবার জন্য উহা সবচেয়ে বেশী সহায়ক হয়। আরাফাতের ময়দান উহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

(১৩) পুরানো ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহের হেফাজত এবং দর্শন বিশেষ করিয়া আম্বিয়ায়ে কেরামগণের স্মৃতিসমূহ স্বচক্ষে দর্শনের জন্য হজ্বের ছফরই হইল অপূর্ব ব্যবস্থা।

(১৪) সামাজিক জীবন ব্যবস্থা হিসাবে সারা বিশ্বের খোঁজ খবর নিবার জন্য হজ্বের চেয়ে উপযুক্ত সময় আর নাই। যেহেতু যে কোন দেশের শিল্প কলা, আবিষ্কার উৎপন্ন দ্রব্যের এক অভাবনীয় সমাবেশ একমাত্র হজ্বের মৌসুমের হইয়া থাকে।

(১৫) ধর্মীয় এলেম ও হেকমত শিখিবার এবং জানিবার অতবড় সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কেননা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের আলেম, জ্ঞানী, গুণীদের হজ্বের ছফরেই হইয়া থাকে অপূর্ব সমাবেশ।

(১৬) সারা জাহানের অলী আবদাল গাওছ কুতুবের এক বিরাট অংশ প্রতি বৎসর হজ্বে আগমন করিয়া থাকেন। তাহাদের ফয়েজ ও বরকত হইতে ফায়েদা হাছিল করিবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়।

(১৭) আল্লাহ পাকের মা'ছুম ফেরেশ্‌তা যাহারা সবসময় আরশের চতুর্দিকে তওয়াফ করিতে থাকে বয়তুল্লার তওয়াফকারীদের সহিত তাহাদের মিল হইয়া যায়, আর হাদীছে বর্ণিত আছে, যার যাহার সহিত মিল হইবে তাকে তাহার মধ্যেই গণ্য করা হইবে। কাজেই যেন ফেরেশ্‌তা-গণ এক মুহূর্তের জন্য আল্লার নাফরমানী করেনা, তাই তাদের মধ্যে গণ্য হওয়া সহজ সৌভাগ্যের কথা নয়।

(১৮) পূর্ববর্তী উম্মতগণ বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ করাকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিত, উহার পরিবর্তে এই উম্মতকে আল্লাহ্ পাক হজ্বের ছফর দান করিয়াছেন। যেখানে যাবতীয় সাজ-সজ্জা এবং বিবির সহিত সহবাস তদুপরের কথা উহার আলোচনাও বর্জন করিতে হয়? কি চমৎকার প্রতিদান।

(১৯) সারা বিশ্বে প্রতি ধর্ম নির্বিশেষ আবহমান কাল হইতে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে বাৎসরিক মেলার ব্যবস্থা থাকে। উহার জন্য সারা বৎসর আয়োজন চলিতে থাকে। পবিত্র ইছলাম ধর্ম উহার পরিবর্তে হজ্বের ছফর দান করিয়াছে যেখানে নাচগান খেল তামাশার সামগ্রীর পরিবর্তে তওহীদ এবং এশ্‌কে এলাহীর খেল তামাশা হইয়া থাকে।

(২০) হজ্ব ঐ পবিত্র ভূমি সমূহের জেয়ারতের ব্যবস্থা যেখানে লক্ষ লক্ষ আশেকীনে এলাহী মাথা ঠুকিয়া আপন জান কোরবান করিয়া দিয়াছেন।

(২১) হজ্ব একদিকে নিজের চরিত্র গঠনের অপূর্ব সুযোগ, অন্যদিকে আবহাওয়ার পরিবর্তনে সুস্থতার সহায়ক। হাদীছে বর্ণিত আছে 'ছফর কর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে।'

(২২) হজ্ব ঐ এবাদতের স্মৃতিকে জীবিত রাখিবার ব্যবস্থা যাহা বাবা আদম হইতে যে কোন ধর্মবিশ্বাসীদের অন্তরে চিরকালই মর্যাদাবান।

(২৩) ইছলামের প্রাথমিক যুগে মুছলমানগণ খুবই দুর্বল এবং হিন-অবস্থায় থাকিয়া অপরিসীম দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল এবং ছবর ও ধৈর্যের চরম নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছিল এবং পরবর্তী যুগে মক্কা বিজয়ের পর কিভাবে তাহারা উদারতার সহিত শক্রদেরকে ক্ষমা করিয়া উন্নত আখলাকের সাহায্যে বিশ্ব বিজয়ীর যশ অর্জন করিয়া দুনিয়ার কোণে কোণে ইছলামের আলো পৌছাইয়াছিল। হজ্বের ছফরে সেই মহামানবদের কেন্দ্রস্থল মহানগরী মক্কা এবং মদীনার জেয়ারতে পুরানো স্মৃতিকে স্মরণ করিয়া ধন্য হইতে পারে।

(২৪) নবীয়ে করীম (ছঃ) এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরী। দীর্ঘ তিপ্পান্ন বৎসর তিনি বহু ঘাত প্রতিঘাত এবং অনুকুল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সেখানে কাটাইয়াছেন। আবার মাদীনা হইল তাঁহার হিজরতের কেন্দ্রস্থল, সেখানে তাহার মাজার অবস্থিত। ইছলামের অধিকাংশ হুকুম আহকাম সেখানে অবতীর্ণ হয়। হজ্বের ছফরে ঐ দুই শহরের জিয়ারতে হুজুরের জমানার প্রত্যেকটি ঘটনাকেই জাগাইয়া তোলে।

(২৫) ইছলামের কেন্দ্রভূমির শক্তি বৃদ্ধি এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদের সাহায্য সহযোগিতার স্পৃহা হজ্বের ছফরে অন্তরে জাগরুক হয় এবং ফিরিয়া আসার পরও দীর্ঘদিন যাবত উহা অন্তরে থাকিয়া যায়।

নমুনাস্বরূপ সংক্ষেপে কয়েকটি হেকমতের দিকে ইশারা করা গেল। চিন্তা ফিকির করিলে আরও অনেক রহস্য উৎঘাটিত হইবে। তবে হজ্বের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লার সহিত সম্পর্ক বাড়ানো এবং দুনিয়ার মহব্বত দিল হইতে সারাইয়া দুনিয়ার প্রতি ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হওয়া। পরিশেষে একটি কেস্ছা বর্না করিয়া এই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটাইতেছি।

কেচ্ছা ঃ শায়খুল মাশায়েখ হজরত শিবলী (রঃ)-এর জনৈক মুরীদ হজ্ব করিয়া যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

তুমি হজ্বের জন্য পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলে? মুরীদ বলিল জী হ্যাঁ আমি পাকাপোক্ত এরাদা করিয়াছিলাম।

তিনি বলিলেন, তার সঙ্গে কি তুমি জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত হজ্বের শানের খেলাফ যাবতীয় কর্মকলাপ ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়াছ? আমি বলিলাম, না; আমি ত এইরূপ সংকল্প করিনাই। তিনি বলিলেন

তবে ত তুমি হজ্বের জন্য প্রতিজ্ঞাই কর নাই।

তারপর হজরত শায়েখ বলিলেন, তুমি কি এহ্‌রামের সময় শরীরের যাবতীয় কাপড় খুলিয়া ফেলিয়াছিলে? আমি বলিলাম জীহ্যাঁ খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে বিসর্জন দিয়াছিলে? আমি বলিলাম, কই দেই নাই ত; তিনি বলিলেন, তবে তুমি কাপড়ই বা কি খুলিয়াছিলে?

তিনি বলিলেন, তুমি কি পাক-ছাফ হইয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় পাক ছাফ হইয়াছিলাম। তিনি বলেন যাবতীয় অন্যায় ও গর্হিত কাজ হইতে পবিত্র হইয়াছিলে বলিয়া মনে হইয়াছিল? আমি বলিলাম এমনটা ত হয় নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি পবিত্রতাই বা কি হাছেল করিয়াছ?

হজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি লাব্বায়েক পড়িয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম জী-হ্যাঁ লাব্বায়েক পড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন আল্লাহ পাকের তরফ হইতে লাব্বায়েকের কোন উত্তর পাইয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম, আমি ত কোন উত্তর পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কি লাব্বায়েক বলিয়াছ?

হজরত শিবলী (রঃ) আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি হারাম শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ প্রবেশ করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, সেই সময় কি তুমি যাবতীয় হারাম কাজ চিরকালের জন্য না করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এইরূপ ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি হারামেই প্রবেশ কর নাই।

হজরত শায়েখ পুনরায় বলিলেন, তুমি কি মক্কা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তবে কি তুমি অন্য জগতের জিয়ারত লাভ করিয়াছ? আমি বলিলাম কোথায় আমি ত কোন জগতের সন্ধান পাই নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মক্কার জিয়ারতই কর নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ অনুভব করিয়াছ? আমি বলিলাম, কই না-ত সেইরূপ কোন অনুভব ত হয় নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি কা'বা শরীফের জিয়ারত করিয়াছ? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন তথায় এমন জিনিস তোমার নজরে আসিয়াছে যার জন্য তুমি ছফর করিয়াছ? আমি বলিলাম আমার ত কিছুই নজরে আসে নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি কা'বা শরীফকে দেখিতেই পাও নাই।

তিনি আবার বলিলেন, তুমি কি তাওয়াফের মধ্যে রমল করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হঁ্যা করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেই ভাগিবার সময় তুমি কি দুনিয়া হইতে ভাগিতেছ বলিয়া কিছু অনুভব হইল। বলিলাম না, হুজুর। কিছুই ত হইল না। তিনি বলিলেন তবে তুমি রমলও কর নাই। পুনরায় তিনি বলিলেন তুমি কি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিয়া চুম্বন করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হঁ্যা করিয়াছিলাম। তিনি ভয়ে জড়সড় হইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তোমার সর্বনাশ হউক" তুমি কি জান যেই ব্যক্তি হাজরে আছওয়াদে হাত রাখিল সে যেন আল্লাহতায়ালার সহিত মোছাফাহা করিল। আর যে আল্লাহর সহিত মোছাফাহা করিল সে যাবতীয় ভয়ভীতি হইতে মুক্তি পাইয়া গেল। আচ্ছা মুক্তির কোন চিহ্ন কি তোমার নিজের মধ্যে অনুভব করিয়াছ? আমি আরজ করিলাম আমার উপর ত মুক্তির কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। তিনি বলিলেন তবে ত তুমি হাজরে আছওয়াদে হাতই রাখ নাই।

অতঃপর তিনি ফরমাইলেন—তুমি কি মোকামে ইব্রাহীমে দাঁড়াইয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হঁা। পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন তুমি কি তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিরাট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মর্যাদার হক আদায় করিয়াছিলে? আমি বলিলাম কিছুইত করি নাই। তিনি বলিলেন তবেত তুমি মোকামে ইব্রাহীমে কোন নামাজই পড় নাই।

অতঃপর হজরত শায়েখ বলিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়ায় দৌড়ের জন্য ছাফা পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি আরজ করিলাম হঁা উঠিয়াছি। তিনি বলিলেন তখন কি করিয়াছিলে? আমি বলিলাম সাতবার তাকবীর বলিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন তোমার তাকবীরের সহিত কি ফেরেশতাগণও তাকবীর বলিয়াছিল এবং তাকবীরের হাকীকত কিছু অনুভব হইয়াছিল কি? আমি আরজ করিলাম কিছুই হয় নাই। তিনি

বলিলেন তবে তুমি তাকবীরই ত বল নাই।

তিনি আবার বলিলেন ছাফা পাহাড় হইতে নীচে অবতরণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ করিয়াছি। শায়েখ বলিলেন সেই সময় যাবতীয় রোগ দূর হইয়া তোমার মধ্যে কি পবিত্রতা আসিয়াছিল? আমি বলিলাম, না,। তিনি বলিলেন তবে ত তোমার ছাফা পাহাড়ে উঠা নামা কিছুই হয় নাই।

হজরত শায়েখ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িয়াছিলে? আমি বলিলাম জী হাঁ দৌড়িয়াছিলাম। তিনি বলিলেন সেই সময় কি আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় মাখলুক হইতে ভাগিয়া আল্লাহর নিকট পৌছিলে? আমি বলিলাম কই পৌছি নাই ত। হজরত বলিলেন তবে তোমার দৌড়ই হয় নাই। অতঃপর বলিলেন তুমি কি মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়াছিলে? আমি বলিলাম উঠিয়াছিলাম। শায়েখ বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর কোনছকীনা অবতীর্ণ হইয়াছিল? আমি বলিলাম কই না ত। তিনি বলিলেন তবে তুমি মারওয়া পাহাড়েই উঠ নাই।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি মিনা গিয়াছিলে? আমি বলিলাম হাঁ গিয়াছি। শায়েখ বলিলেন—সেখানে কি গোনাহের সহিত নয় এমন জবরদস্ত আশা পোষণ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম এমন আশা ত করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মিনাতেই যাও নাই।

অতঃপর শায়েখ বলিলেন তুমি কি মসজিদে খায়েফে প্রবেশ করিয়াছিলে? আমি বলিলাম নিশ্চয় করিয়াছি। তিনি বলিলেন সেখানে কি তোমার উপর আল্লাহর ভয় এত বেশী সঞ্চার হইয়াছিল যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও হয় নাই। আমি বলিলাম এমনটাত হয় নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি মসজিদে খায়েফেই প্রবেশ কর নাই।

অতঃপর শায়েখ শিবলী বলেন তুমি কি আরাফাতের ময়দানে হাজির হইয়াছ? আমি বলিলাম জী হুজুর হাজির হইয়াছি। তিনি বলিলেন আচ্ছা সেখানে গিয়া তুমি কি এই জিনিসকে চিনিতে পারিয়াছ—যে দুনিয়াতে কেন আসিয়াছ এবং কি করিতেছ আর কোথায় যাইতেছ। আরজ করিলাম না চিনি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি আরাফাতেই যাও নাই। তিনি আবার বলিলেন তুমি কি মোজদালাফায় গিয়াছিলে? বলিলাম গিয়াছি হুজুর বলিলেন সেখানে গিয়া আল্লাহর জিকির এমন ভাবে করিয়াছিলে যে, মন হইতে তখন অন্য সব কিছুর ধ্যান ধারণা মুছিয়া

গিয়াছে? আরজ করিলাম এই রকম জিকির ত হয় নাই। বলিলেন তবে তুমি মোজদালাফায় কি গিয়াছ? আবার জিজ্ঞাসা করিলেন মিনায় গিয়া কি কোরবানী করিয়াছিলে? বলিলাম জ্বী হাঁ। করিয়াছি। বলিলেন সেই সময় কি আপন নফ্‌ছকে কোরবানী দিয়াছিলে? বলিলাম না হুজুর করি নাই ত। এরশাদ করিলেন তবে তুমি কোরবানীই ত কর নাই। আবার বলিলেন শয়তানকে পাথর মারিয়াছিলে? বলিলাম, মারিয়াছি। বলিলেন প্রত্যেক পাথর টুকরার সহিত নিজের পুরানো মুর্খতা দূর হইয়া নূতন কোন এলেমের সন্ধান পাইয়াছ কি? আমি বলিলাম কই পাই নাই-ত। বলিলেন আচ্ছা তাওয়াফে জিয়ারত করিয়াছ কি? বলিলাম করিয়াছি। তিনি বলিলেন আল্লাহর তরফ হইতে তোমার কোন ইজ্জত সম্মান করা হইয়াছিল কি? কেননা হাদীছে বর্ণিত আছে, হজ্ব এবং ওমরা করিলে যেন আল্লাহর সহিত জিয়ারত হয় আর যে আল্লাহর সহিত জিয়ারত করে তাহার সম্মান ও একরাম করা হয়। বলিলাম আমি ত কিছুই অনুভব করি নাই। তিনি বলিলেন তবে তুমি তাওয়াফে জিয়ারতই কর নাই। পুনরায় বলিলেন তুমি এহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছিলে? আমি বলিলাম হইয়াছি। বলিলেন তখন কি আজীবন হালাল উপার্জন করিবার সংকল্প করিয়াছিলে? আরজ করিলাম, না। তিনি বলিলেন তবে তুমি হালাল হও নাই। পুনরায় বলিলেন, তাওয়াফুল বেদা (বিদায়ী তাওয়াফ) করিয়াছিলে? আরজ করিলাম জ্বী হুজুর করিয়াছি। তিনি ফরমাইলেন, তখন কি নিজের শরীর এবং মন সব কিছুকে পুরাপুরি বিদায় দিয়াছিলে? আমি বলিলাম না এমন ত করি নাই। তিনি বলিলেন, তবে তুমি তাওয়াফে বেদাই কর নাই।

তারপর হজরত শায়েখ শিব্‌লী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহে মুরীদকে বলেন, যাও বাবা আবার হজ্ব করিয়া আস এবং আমি যেই ভাবে বিস্তারিত তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম ঠিক সেই ভাবে তুমি হজ্ব করিয়া আস।

এত বড় লম্বা কেচ্ছা এই জন্য বর্ণনা করা গেল যে ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে আহলে দিল এবং মারেফতওয়ালারা কিভাবে হজ্ব করিতেন। আল্লাহ্ পাক আপন লুৎফ ও মেহেরবানীর দ্বারা এই ভাবে হজ্ব করিবার সৌভাগ্য এই অধমকে দান করুন। আমীন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাজ্বের আদব সমুহ

হজ্বের ছফর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারা জীবনে একবারই মাত্র হইয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট অর্থও ব্যয় করিতে হয়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত সার্বজনীন ছহীশুদ্ধ কিতাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া এবং উহা বার বার পাঠ করিয়া প্রস্তুতি নেওয়া। ইহাতে সামান্য অবহেলার দরুন জীবনের এই একবার মাত্র করণীয় ফরজও নষ্ট হইবে না আর মোটা অংকের টাকারও অপচয় হইবে না। এই মোবারক ছফরের যাবতীয় আদব লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই এখানে সংক্ষেপে কিছুটা অতীব প্রয়োজনীও আদবের উল্লেখ করা গেল।

আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন—

"এবং যখন তোমরা হজ্বে এরাদা করিবে তখন যাবতীয় খরচপত্র সঙ্গে লইয়া লও। কেননা সবচেয়ে বড় পরহেজগারী হইল ভিক্ষা করা হইতে নিজেকে রক্ষা করা।

এই আয়াত শরীফে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজ খরচ পত্রের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। তাহা হইলে হজ্বে যাইবার যাবতীয় খরচ সঙ্গে লইতে হইবে। কেননা শুধু তাওয়াক্কুল করিয়া রওয়ানা হওয়া সকলের কাজ নহে। হাদীছে বর্ণিত আছে, কোন কোন লোক আল্লার উপর ভরসা করিয়া হজ্বে রওয়ানা হইত অথচ সেখানে গিয়া ভিক্ষা করিত, তাহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

হাদীছে বর্ণিত আছে কোন কোন লোক পথের সামগ্রী ব্যতীতই হজ্বে রওয়ানা হইত এবং বলিত যে, আমরা হজ্বে যাইতেছি আল্লাহ পাক কি আমাদিগকে খাওয়াইবেন না? তাহার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, যাবতীয় খরচ পত্র লইয়া হজ্বে যাইবে বরং উৎকৃষ্ট পাথেয় হইল জন সম্মুখে আপন চেহারাকে বে-ইজ্জত না করা। অর্থাৎ ভিক্ষা না করা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তাওয়াক্কুল অনেক উঁচু পর্য্যায়ের গুণ তবে মনে রাখিবে উহা কোন মুখে দাবী করার বস্তু নহে। বরং যাহার অন্তর আপন পকেটের পয়সার চেয়ে আল্লার ভাণ্ডারের উপর অধিক আস্থাশীল

তাহার জন্যই তাওয়াক্কুল করা শোভা পায়। আর যে এই পর্য্যায়ে পৌছিতে পারে নাই তাহার জন্য শোভা পায় না। এখানে দুইটি ঘটনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবুকের যুদ্ধে হুজুরে পাক (ছ:) যখন চাঁদা দেওয়ার জন্য ছাহাবীদিগকে উৎসাহ দিলেন তখন হজরত আবু বকর ছিদ্দীক তাঁহার সর্বস্ব আনিয়া হুজুরের পদতলে রাখিলেন এবং হুজুর ইহা কবুল করিলেন। অপর এক ব্যক্তি ডিমের মত একটা স্বর্ণের টুকরা আনিয়া খেদমতে পেশ করিয়া আরজ করিল, ইহা দান করা হইল। আমার নিকট ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই। হুজুর সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অপরদিক হইতে সামনে গিয়া আবার আরজ করিল। এইভাবে হুজুর মুখ ফিরাইতে থাকেন আর বারংবার লোকটিও আরজ করিতে থাকে অবশেষে চতুর্থবার হুজুর উহা হাতে লইয়া এতজোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, লোকটার গায়ে লাগে নাই নচেৎ সে জখম হইয়া যাইত। অতঃপর হুজুর এরশাদ করেন যে, কোন কোন লোক প্রথমেই সবকিছু ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের নিকট ভিক্ষার হাত বাড়াইয়া দেয়।

(১) عن ابی هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله فى الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور وغير مأزور واذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك زور وغير مبرور - (طبرانى)

"হুজুরে পাক (ছ:) এরশাদ করেন যখন হাজী হালাল মাল লইয়া হজ্ব করিতে বাহির হয় এবং ছওয়ারীতে পা রাখিয়া লাব্বায়েক বলে তখন আকাশ হইতে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, হে ভাগ্যবান। তোমার লাব্বায়েক কবুল হইয়াছে তোমার খরচও হালাল তোমার ছওয়ারীও হালাল এবং তোমার উপর কোন বিপদও নাই। আর মানুষ যখন হারাম মাল নিয়া হজ্বে রওয়ানা হয় ও গাড়ী ঘোড়ায় ছওয়ার হইয়া লাব্বায়েক বলে তখন আছমান হইতে ফেরেশ্তা বলে তোমার লাব্বায়েক কবুল হয় নাই যেহেতু তোমার পাথেয় হারাম তোমার ছওয়ারী হারাম তোমার হজ্ব কবুল হয় নাই বরং গোনাহের কারণ।"

অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, যে হারাম উপার্জন নিয়া হজ্বে যায় হজ্বকে লেপ্টাইয়া তাহার মুখে নিক্ষেপ করা হয়। অন্যত্র আছে তুমি

বিপদের সুসংবাদ লইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন কর। হাদীছে আসিয়াছে হযরত মুছা (আঃ) যখন হজ্ব করিতে যান। ছাফা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়িবার সময় আকাশ হইতে শব্দ শুনিতে পান লাব্বায়েকা আবদী, আনা মায়াকা। অর্থাৎ হে আমার বান্দা তোমার লাব্বায়েক কবুল, আমি তোমার সাথে আছি। হজরত জয়নুল আবেদীন যখন এহ্রাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক বলিতেছিলেন তখন তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যায় চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায় এবং লাব্বায়েক বলিতে পারিলেন না। কেহ তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে লাব্বায়েক বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি লা লাব্বায়েক উত্তর আসে তখন আমার কি উপায় হইবে ?

ফকীহগণ লিখিয়াছেন মালের মধ্যে ত্রুটি হইলে ফরজ হজ্ব আদায় হইয়া যাইবে কিন্তু উহা কবুল হইবে না এবং হারাম উপার্জনের পাপ ভিন্নভাবে তাহার মাথার উপর থাকিবে। এই ব্যাপারে আমরা বড়ই অলসতা করিয়া থাকি এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের বলে অন্যের হক বা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া লই। এবং অনেক সময় এমন অহঙ্কারেও করিয়া থাকি যে কার শক্তি আছে আমার নিকট হক চাহিতে পারে অথবা কোন অভিযোগ করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিবে কাল কেয়ামতের দিন কাহারও কোন জাড়ি জুড়ি বা শক্তিমত্তার বড়াই চলিবে না। এক দানেক অর্থাৎ মাত্র দুই পয়সা পরিমাণ হকের জন্য সাত শত কবুল হওয়া নামাজ হকদারকে আদায় করিয়া দিতে হইবে। অথচ এতগুলি মাকবুল নামাজ হয়তঃ আমাদের কাহারও আমলনামায় জমাও আছে কিনা সন্দেহ। হুজুরে পাক (ছঃ) একবার বলেন তোমরা কি জান যে গরীব কে ? ছাহাবারা বলিলেন, হুজুর যাহার নিকট টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদ নাই আমরা তাহাকেই ত গরীব বলিয়া থাকি। দয়ার নবী বলেন, না; গরীব ত ঐ ব্যক্তি যে প্রচুর পরিমাণ নামাজ, রোজা, ছদকা, খয়রাত ইত্যাদি নিয়া কেয়ামতের দিন হাজির হইবে। কিন্তু দুনিয়াতে কাহাকেও গালি দিয়াছিল, কাহাকেও অপবাদ দিয়াছিল, কাহারও মাল অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়াছিল, আর কাহাকেও মারিয়াছিল, কেয়ামতের দিন ইহারা সকলেই তাহার নেকীসমূহ বন্টন করিয়া লইয়া যাইবে। নেকী শেষ হইবার পর হকদারদের পাপসমূহ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হুজুর অন্যত্র বলেন একের উপর অন্যের হক থাকিলেই চাই উহা মানইজ্জত নষ্ট করার ব্যাপারে হউক বা অন্য কোন ব্যাপারে হউক সে যেন দুনিয়াতেই মাফ করাইয়া লয়। ঐদিন আসার পূর্বে যেদিন লোকের হাতে কোন টাকা পয়সা থাকিবে না, যদি কোন নেক আমল থাকে তবে উহা দ্বারা জুলুমের প্রতিদান আদায় করিয়া দেওয়া হইবে। আর নেক আমল না থাকিলে মাজলুমের গোনাহ জালেমের মাথায় চাপিয়া দেওয়া হইবে। অন্য হাদীছে আছে—যে ব্যক্তি অন্যের অর্ধহাত জমিও অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সেই জমি সাত তবক নীচের জমীন পর্যন্ত তাহার গলায় লটকাইয়া দেওয়া হইবে।

একদিন হুজুরে আকরাম (ছঃ) সূর্যগ্রহণের নামাজ পড়িতেছিলেন তখন হুজুরের সামনে বেহেশত ও দোজখের হাল প্রকাশ হইয়া যায়। হুজুর জাহান্নামের মধ্যে দেখিলেন একটি মেয়েলোককে আজাব দেওয়া হইতেছে। শুধু এই জন্য যে সে একটি বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং উহার খাবারের ব্যাপারে সে ত্রুটি করিয়াছিল। অর্থাৎ তাহাকে খোরাকীও দেয় নাই আর স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া খাইবার জন্য ছাড়িয়াও দেয় নাই। (মেশকাত)

একটি হাদীছে হুজুরে পাক এরশাদ করেন সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ঐ ব্যক্তি যে অপরের দুনিয়া বানাইবার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ কেহ কাহারও উপর জুলুম করিল, আর আপনি বন্ধুত্বের খাতিরে জালেমের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ইহাতে জালেমের এখানে কিছু উপকার হইল সত্য কিন্তু জানিবেন আপনার আখেরাত বরবাদ হইয়া গেল। কাজেই মৃত্যুর পূর্বেই এইরকম গর্হিত কাজ হইতে বাঁচিবার ফিকির করুন। বিশেষতঃ হজ্বের ছফরে যাইবার সময় এইসব বস্তু হইতে পবিত্র হইয়া লউন। কেননা লম্বা ছফর, ফিরিয়া নাও আসিতে পারেন।

(২) عن ابن عباس رض قال كان فلان ردف رسول الله ص يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له رسول الله ص يا ابن اخى ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفرله - (رواه احمد)

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, আরাফাতের দিন একটা যুবক ছেলে হুজুরের সাথে ছওয়ার ছিলেন। তাহার দৃষ্টি মেয়েদের উপর পড়িয়া গেল এবং তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র আজ এমন একটি দিন যেই ব্যক্তি এই দিনে আপন চোখ, কান এবং

জবানের হেফাজত করিতে পারিবে তাহার ক্ষমা অনিবার্য। হুজুর আরও এরশাদ করেন, কোন বেগানা স্ত্রীলোকের উপর কাহারও দৃষ্টি পড়িয়া গেলে যদি সঙ্গে সঙ্গে নজর ফিরাইয়া লয় তবে আল্লাহ্ পাক তাহাকে এমন এবাদতের সৌভাগ্য দান করিবেন যাহার স্বাদ সে অন্তরে অনুভব করিবে। অন্য হাদীছে আছে কোন ব্যক্তি যদি বেগানা মেয়েলোকের সহিত একাকী কোন ঘরে থাকে তখন সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি শয়তান উপস্থিত হয়। (মেশকাত)

হজ্বের ছফরে মেয়েরা না-মহরম পুরুষদের সহিত প্রায়ই ছফর করিয়া থাকে এবং অনেক সময় মহরমের সহিত হইলেও একাকী ঘরে থাকিতে হয়। কাজেই খুব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যেন ঐরূপ সুযোগই না আসে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল হুজুর অমুক যুদ্ধে যাইবার জন্য আমার নাম লেখা হইয়াছে এবং আমার স্ত্রী হজ্বে যাইতেছে। হুজুর এরশাদ করেন 'যাও তোমার স্ত্রীর সহিত হজ্ব করিয়া আস।" এখানে যেহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকেও বিবির সহিত হজ্ব করার জন্য পিছাইয়া দেওয়া হয়।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মেয়েলোক ঘর হইতে বাহির হওয়া মাত্রই একটা শয়তান তাহার সহিত লাগিয়া যায়। তাহাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য এবং অন্য লোককে তাহার দিকে খাহেশের নজরে দেখিবার জন্য সে সবসময় তাক লাগিয়া থাকে। অতএব ছফরে মহরম সঙ্গে থাকা নেহায়েত জরুরী।

হুজুর আকরাম (ছঃ) নির্জন স্থানে অন্য মেয়েলোকের কাছে যাইতে নিষেধ করেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল যদি দেবর হয় অর্থাৎ স্বামীর ভাই। হুজুর বলেন দেবরত মৃত্যুর সমতুল্য, অত্যধিক আনাগোনার দরুন সেখানে ত বিপদের আশংকা বেশী। হাদীছে কান চোখ ইত্যাদিকে হেফাজত করার নির্দেশ আসিয়াছে। উহার অর্থ শুধু না-মোহরমকে দেখা বা তার আওয়াজ শুনা নয় বরং গীবত ছোগলখুরী গান-বাজনা ইত্যাদি দেখা বা শুনাও উহার মধ্যে শামিল।

(৫) عن ابن عمر قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج قال الشعث التفل فقام اخر فقال يا رسول الله اى الحج افضل قال العج والثج - مشكوٰة)

জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে হাজীদের কি শান হওয়া

উচিত ? হুজুর বলেন ময়লা যুক্ত কাপড় এবং পেরেশান চুল হইবে। আবার কেহ জিজ্ঞাসা করিল উত্তম হজ্বের আলামত কি ? হুজুর বলেন যেই হজ্বে বেশী বেশী লাব্বায়েক বলা হয় বেশী বেশী কোরবানী করা হয়।

এই হাদীছে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হাজীর শান হইল এলোমেলো চুল হওয়া এবং ময়লাযুক্ত কাপড় হওয়া। জাহেরী চাকচিক্যের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কেননা প্রেমিকের এসব জিনিসের প্রয়োজনই বা কি ?

এক সময় জিলহজ্বের আট কি নয় তারিখ। হজরত মাওলানা ছৈয়দ হোছায়েন আহমদ মদনী (রঃ) আমার এখানে তাশরীফ আনিয়াছিলেন। আমি হজরতের সামনে আতরের শিশি পেশ করিলাম। তিনি কিছুটা আতর লইয়া এবং ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন আজ প্রেমিকগণকে আতর ব্যবহার হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে এশকের আগুনে যাহাদের অন্তর দগ্ধ তাহারা মক্কা শরীফ হইতে অনেক দূরে থাকিলেও কল্পনায় লজ্জত অনুভব করিতে থাকে। আমি আমার বাবাজানকে দেখিয়াছি জিলহজ্বের প্রথমদিকে তাঁহার জবান হইতে প্রায়ই লাব্বায়েক শব্দ বাহির হইয়া যাইত।

হাদীছের দ্বিতীয় বিষয় হইল লাব্বায়েক জোরে জোরে বলা। হজরত জিব্রাঈল প্রিয় নবীকে আল্লাহ পাকের এরশাদ শুনাইলেন যে, আপনি আপনার সাথীদেরকে বলুন তাহারা যেন জোরে লাব্বায়েক বলে। কেননা উহা হজ্বের চিহ্ন।

তৃতীয় বিষয় হইল বেশী বেশী করিয়া কোরবানী করা। অবশ্য নেছাবের মালিক না হইলে কোরবানী করা ওয়াজেব নহে, নফল মাত্র। কিন্তু হজ্বের সময় উহার মর্যাদা অনেক বাড়িয়া যায়। স্বয়ং নবীয়ে করীম (ছঃ) হজ্বের মধ্যে একশত উট কোরবানী করেন এবং বলেন এই কোরবানী হজরত ইব্রাহীমের ছুন্নত। কোরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী লেখা হয়। জবেহ করার সময় প্রথম রক্ত ফোটাতেই কোরবানী করনেওয়ালার যাবতীয় গুনাহ মাফ হইয়া যায়। কেয়ামতের দিন জানোয়ারের যাবতীয় গোস্ত রক্তসহ পেশ করা হইবে এবং সত্তরগুণ বেশী ওজন করিয়া মিজানের পাল্লায় রাখা হইবে। হুজুর (ছঃ) নিজের ও উম্মতের তরফ হইতে কোরবানী করেন। তাই উম্মতেরও উচিত যেন হুজুরের তরফ হইতে কোরবানী করেন। হজরত আলী সব সময়

হুজুরের পক্ষ হইতে একটা করিয়া ছাগল কোরবানী করিতেন এবং বলিতেন যে হুজুর আমাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন, কাজেই সব সময় ইহা আমি করিতে থাকিব। বাস্তবিকই কোরবানী একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় বস্তু। আল্লার প্রিয় নবী ইব্রাহীম (আঃ) বৃদ্ধ বয়সে বড়ই আরজু করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। সেই আদরের দুলাল ইছমাইল যখন সবেমাত্র চলাফেরার উপযুক্ত হইলেন তাঁহাকে কোরবানী করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিলেন। বাপ-বেটা এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হইলেন। এবং পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাসও করিলেন বটে। ছেলের অনুমতি পাইয়া তিনি তীক্ষ্ণ ছুরি পুত্রের গলায় বসাইয়া দিলেন। ওদিক হইতে আকাশ বাতাস স্তম্ভিত করিয়া ঘোষণা করা হইল "কাদ ছাদ্দাকতার রুইয়া "হে বন্ধু ইব্রাহীম। স্বপ্নকে তুমি সত্য পরিণত করাইয়া দেখা লে।" অবশেষে জানোয়ার কোরবানী দ্বারা আশেক মা'শুকের নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিবৎসর সেই তারিখে সেই নাটকের অভিনয়কে তাজা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। তাই আজও প্রেমিকগণ প্রকৃতপক্ষে পশু জবেহ্ করিবার সময় নিজের নফছ্, বরং আওলাদ ফরজন্দকে খোদার রাহে কোরবানী করিতেছেন মনে করিতে হইবে।

হজ্বের সংক্ষিপ্ত আদব সমূহ

শরীয়তের যাবতীয় হুকুমের সাথে সাথে কতকগুলি আদাবও নিদৃষ্ট রহিয়াছে। নামাজ হউক, বা রোজা হউক বা হজ্ব হউক, প্রত্যেকটার মধ্যে আদব সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) তাফছীরে আজীজীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

من تهاون بالاداب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة ـ

"যেই ব্যক্তি আদবের মধ্যে অলসতা করে সে ছুন্নত ছাড়িয়া দেওয়ার মছিবতে পতিত হয় আর যে ব্যক্তি ছুন্নতে অলসতা করে সে ফরজ ছাড়িয়া দিবার বিপদে গ্রেপ্তার হয়। আর যে ফরজে অলসতা করে সে আল্লাহর মারফত হইতে বঞ্চিত হয়।

এই জন্যই কোন কোন বিষয়ে অলসতা করিলে শরীয়তে কুফুরের সীমা

পর্যন্ত পেঁছে বলিয়া উল্লেখ আছে। অতএব শরীয়তের যে কোন ছোট ছোট আদব মোস্তাহাবের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হইবে। ওজর বশতঃ না করিতে পারিলে ভিন্ন কথা। কিন্তু উহার মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্তরে থাকিবে। অবহেলা করিয়া অথবা ক্ষুদ্র মনে করিয়া কখনও উহা ত্যাগ করিবে না। ওলামায়ে কেরাম শরীয়তের আহকামের আদব এবং মোস্তাহাব সমুহ নেহায়েত গুরুত্ব সহকারে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত করিয়াছেন। এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে হজ্বের কতগুলি আদাব নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) আল্লাহ পাক যদি কোন ভাগ্যবানকে হজ্বের তওফীক দান করেন, চাই ফরজ হজ্ব হউক অথবা নফল হজ্বের আছবাব পয়দা করিয়া হউক, তাহার উচিত সে যেন খুব শীঘ্র আপন কর্তব্যকে সম্পাদন করিয়া লয়। কারণ হজ্বের ব্যাপারে শয়তান এমন সব অবাস্তব ওজর আপত্তি উপস্থিত করে যদ্দারা মানুষ স্বভাবতই উহাকে টালবাহানা করিয়া পিছাইতে থাকে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক শয়তানের প্রতিজ্ঞা নকল করিতেছে।

قال فبما اغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم ومن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين -

"শয়তান বলিল হে খোদা! যাহার কারণে আপনি আমাকে গোমরাহ করিয়াছেন, আমি কছম খাইয়া বলিতেছি আমি তাদের সোজা পথের মাঝখানে বসিয়া যাইব তারপর আমি তাদের চতুর্দিক হইতে অর্থাৎ ডান দিক হইতে বাম দিক হইতে সামনের দিক হইতে এবং পিছনের দিক হইতে আক্রমণ চালাইব। আপনি তাহাদেরকে অনুগত পাইবেন না।'

সোজা পথ অর্থ দ্বীনের যে কোন রাস্তা হইতে পারে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন উহা দ্বারা বিশেষ করিয়া হজ্বের রাস্তাকে বুঝান হইয়াছে। অর্থাৎ কমবখ্‌ত ইবলিছ মানুষের উপর ছওয়ার হইয়া হজ্ব হইতে ফিরাইবার জন্য বিভিন্ন ওজর আপত্তি সামনে দাঁড় করায়। কেননা সে জানে হজ্বের দ্বারা তাহার যাবতীয় পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে কান্নাকাটি সারা জীবনের গোনাহকে ধুইয়া ফেলে। কাজেই হজ্ব হইতে ফিরাইবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এখন বুঝিতে হইবে যেই সমস্ত বাধা বিপত্তি ওজর আপত্তি সামনে আসিয়া হাজির

হয় ঐ সব শয়তানের চক্রান্ত ছাড়া অন্য কিছু নয়।

(২) ছফরের পুর্বে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হজ্ব করিব কি না করিব এইজন্য এস্তেখারা নয়, কেননা ফরজ কাজে কোন এস্তেখারার প্রয়োজন নাই। বরং কখন কোন পথে বা কোন জাহাজে এইসব বিষয়ে এস্তেখারা করিয়া লইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলেন হুজুর আমাদিগকে কোরআনের ছুরার মতই এস্তেখারা শিক্ষা দিতেন অর্থাৎ দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া এস্তেখারার দোয়া পড়িয়া শুইবে।

(৩) হজ্বের মাছায়েল সমুহ জানিবার চেষ্টা করিবে হজ্বে যাওয়ার পুর্বে রওয়ানা হইবার পর এবং হজ্বের মধ্যে ভাগের যাবতীয় মাছায়েল ছফরের আগেই পড়িয়া লইবে। ওলামাগণও মনযোগ দিয়া পড়িয়া লইবেন। ক্লাসের সময় মাছায়েল জানা ভিন্ন কথা। সময় মত সামনে আসা ভিন্ন ব্যাপার। তবে আলেমগণের সাধারণ ভাবে দেখাই যথেষ্ট। সবচেয়ে উত্তম হইল কোন আলেমের সঙ্গে হজ্বে যাওয়া এবং সময়মত সব জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া। আমার পরামর্শ মত গঙ্গুহী (রঃ) কৃত জুবদাতুল মানাছেক মাওলানা আশেকে এলাহী কৃত জিয়াতুল হারামাইন অথবা মাওলানা ছায়ীদ আহমদ কৃত মোয়াল্লেমুল হুজ্জাজ পড়িতে পারেন। ইহা ছাড়াও যে কোন বিশ্বস্ত আলেমের কিতাব দেখিতে পারেন।

(৪) ছফরের সময় নিয়ত খালেছ আল্লার রেজামন্দী হইতে হইবে। হাজী হওয়ার আগ্রহ বা লোক দেখানো বা দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য একেবারেই বর্জন করিতে হইবে।

(৫) এক বা ততোধিক ছফরের সাথী এমনভাবে তালাশ করিবে যাহারা দ্বীনদার পরহেজগার হয়, পথিমধ্যে এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারী হয়। নেক কাজে উৎসাহ দান করে, বিপদে ছবর করিতে বলে দুর্বলতায় সৎসাহস দেয়। তবে সাথী আলেম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছফরের সাথী আত্মীয় না হইয়া অন্য লোক হওয়াই উত্তম। কেননা আপোসে কোন মন কষাকষি হইলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদের সুযোগ যেন না আসিতে পারে। তবে আত্মীয়ের উপর পুর্ণ আস্থা থাকিলে সেও ছফরের সাথী হইতে অসুবিধা নাই।

(৬) হজ্বের জন্য হালাল মাল তালাশ করিবে। সন্দেহ জনক মাল যেমন ঘুষ জুলুম ইত্যাদি মাল সহকারে যাইবে না। যাইলে অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যদিও হজ্ব মাকবুল হইবে না। হাঁ কাহারও

নিকট এইরূপ মাল থাকিলে ওলামারা তাহার জন্ত এই ছুরত লিখিয়াছেন যে সে কর্জ লইয়া হজ্ব করিবে। পরে ঐ মাল দিয়া পরিশোধ করিবে।

(৭) পিছনের জীবনের যাবতীয় গোনাহ হইতে তওবা করিয়া লইবে। কাহারও উপর জুলুম করিয়া থাকিলে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। মেলামেশার লোকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কাহারও কর্জ থাকিলে আদায় করিয়া যাইবে অথবা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। পরের আমানত থাকিলে উহা আদায় করিয়া যাইবে অথবা তাহার অনুমতি লইয়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে। বিবি বাচ্চা যাহাদের হক তাহার উপর ফিরিয়া আসা পর্যন্ত উহাদের যাবতীয় খোরপোষের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে।

(৮) হালাল মাল হইতে প্রয়োজন পরিমাণ টাকা পয়সা সঙ্গে লইবে বরং কিছু বেশী করিয়া লইবে যদ্দারা সেখানের গরীবদের সাহায্য এবং প্রয়োজন বোধে অন্য লোকেরও কিছুটা মেহমানদারী করা যায়।

( ) ছফর শুরু করিবার পূর্বে দুই রাকাত নফল পড়িয়া লইবে। প্রথম রাকাতে কুলইয়া ও দ্বিতীয় রাকাতে কুলহুয়াল্লাহু পড়িবে। উত্তম হজ্ব ঘরে দুই রাকাত পড়া ও মহল্লার মসজিদে দুই রাকাত পড়া

(০) বাহির হইবার পূর্বে এবং বাহির হইবার পরে কিছু ছদকা খয়রাত করিবে এবং সাধ্যানুসারে করিতে থাকিবে। কেননা বলা মছিবত দূর করার ব্যাপারে ছদকার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে, ছদকা আল্লাহর ক্রোধকে থামাইয়া দেয় এবং অপমৃত্যু হইতে হেফাজত করে। অন্যত্র আছে যে ব্যক্তি কাহাকেও কাপড় পরাইল, যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে কাপড় থাকিবে ততদিন পর্যন্ত দাতা আল্লার হেফাজতে থাকিবে। (মেশকাত)

(.১ ঘর হইতে বাহির হইবার সময় খাছ খাছ মছনুন দোয়া সমূহ পড়িয়া লইবে। উত্তম হইল দোয়ার কোন কিতাব খরিদ করিয়া লইবে।

(.২) রওয়ানা হইবার সময় বন্ধুবান্ধবদের সহিত মোলাকাত করিয়া বিদায় লইবে ও তাহাদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করিবে। হাদীছের মর্মানুসারে এই দোয়া তাহার ছফরে সাহায্যকারী হইবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়িবে—

استودع الله دينكم واما نتكم واخوا تيم اعما لكم -

(১০) ঘরের দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় এই দোয়া পড়িবে—

বিছমিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে, লা-হাওলা অ-লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।

এই দোয়া পড়িলে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তুমি সঠিক ভাবে মকছুদে পৌঁছিবে, পথে তুমি হেফাজতে থাকিবে এবং শয়তান হইতেও হেফাজতে থাকিবে।

(১৪) কাফেলার মধ্যে একজন জ্ঞানী-গুণী দ্বীনদার পরহেজগার ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে। কোরেশী হইলে সবচেয়ে ভাল। হুজুর এরশাদ করেন তিন ব্যক্তি একত্রে ছফর করিলে এক ব্যক্তিকে আমীর বানাইয়া লইবে।" যে আমীর হইবে সাথীদের সুখশান্তি এবং ছামান পাত্রের হেফাজত ইত্যাদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

(১৫) বৃহস্পতিবার ভোর বেলায় ছফর শুরু করিবে। কেননা হুজুর (ছঃ) ঐ সময় ছফর করাকে পছন্দ করিতেন। এবং অধিকাংশ সময় দিনের প্রথম ভাগে কাফেলাকে রওয়ানা করিতেন। ছখর নামীয় এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী ছিল। হুজুরের অভ্যাস মোতাবেক সেও আপন তেজারতের মাল সকাল বেলায় রওয়ানা করিত ইহাতে তাহার বেশ লাভ হইত।

(১৬) উটের পিঠের ছফর নিজের এখতিয়ার ভুক্ত হইলে রাত্রের কিছু অংশ এবং ফজরের কিছু অংশ চলাচলে কাটাইবে এবং দিনে মনজিল করিবে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন রাত্রে ছফর। কেননা রাত্রে জমীনকে সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া অর্থাৎ সকাল সকাল পথ শেষ হইয়া যায়।

মঞ্জিলে উঠানামা করিতে, গাড়ীতে ঘোড়ায় ছওয়ার হইতে মাছনুন দোয়া সমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়িবে।

(১৭) কোন জায়গায় অবতরণ করিলে সেখানে একাকী চলিবে না কারণ অপরিচিত স্থানে অনেক প্রকার বিপদের আশংকা থাকে। এবং রাত্রে বিশেষ করিয়া দুই একজনকে সব সময়ের জন্য পাহারায় নিযুক্ত রাখিবে। কেননা হুজুরের আদত শরীফও ঐ রকম ছিল। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন আমার বাবাজান প্রায়ই কেচছা শুনাইতেন যে দাদা মরহুম অধিকাংশ সময় আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করিয়া বলিতেন. যে আল্লাহ পাকের কতবড় এহছান যে আমাদের ঘরে সারা রাত কেহ না কেহ এবাদতে মশগুল থাকে। ছুরত এই ছিল যে বাবাজানের কিতাব দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধেক রাত্রি হইয়া যাইত তখন দাদা মরহুম তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য ঘুম হইতে উঠিতেন ও বাবাজানকে বলিতেন ইয়াহইয়া এখন শুইয়া পড়। বাধ্য হইয়া তিনি শুইয়া পড়িতেন ও দাদাজান নামাজে দাঁড়াইতেন

রাত্রির কিছুটা অংশ থাকিতে ছুন্নত হিসাবে কিছুটা আরাম করিবার জন্য জাগাইয়া নিজে কিছুটা আরাম করিতেন। তিনি ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদে মশগুল থাকিতেন। তবে আফছোছ নিজের বুজুর্গদের মোবারক অভ্যাস হইতে কিছুমাত্র অংশও গ্রহণ করিলাম না।

(১৮) ছফরের সময় উপরের দিকে উঠিতে তিনবার আল্লাহু আকবার বলা এবং নীচের দিকে নামিতে তিনবার ছোবহানাল্লাহ বলা সব চেয়ে উত্তম। ছফরে কোন ভয়ভীতির সঞ্চার হইলে—ছোব্‌হানাল মালেকিল কুদ্দুছ রাব্বিল মালায়েকাতে অররূহ পড়া উত্তম এবং পরীক্ষিত।

(১৯) কষ্ট ব্যতীত সম্ভব হইলে পায়দল হজ্ব করাই ভাল। তবে ছওয়ারীতে চলিলেও মাঝে মাঝে পায়দল চলিবে। বুজুর্গানদের অভ্যাস ছিল কোথাও আছরের জন্য অবতরণ করিলে মাগরিব পর্যন্ত সময় পায়দল চলিতেন। কারণ ইহাতে সময়ও কম গরমও থাকে না, আবার অন্ধকারও থাকে না। খাছ করিয়া মক্কা হইতে আরাফাত পর্যন্ত সম্ভব হইলে পায়দলই চলিতে থাকিবে যেহেতু এখানে প্রতিকদমে সাতশত নেকী, আর এক এক নেকী হারাম শরীফে এক লক্ষ নেকীর সমতুল্য আবার ছওয়ারীতে গেলে অনেক সময় বাধ্য হইয়া কিছু কিছু মোস্তাহাবও ছুটিয়া যায়।

(২০) ছওয়ারীর জানোয়ারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। সাধ্যের বাহিরে তাহার উপর বোঝা চাপাইবে না। আগেকার বুজুর্গগণ ছওয়ারীর পিঠে লম্বা হইয়া শোওয়া হইতেও বাঁচিয়া থাকিতেন উহাতে নাকি বোঝা ভারী হইয়া যায়।

(২১) ওলামাগণ লিখিয়াছেন, পশুপক্ষীকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ার বিষয়ও কেয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হইবে। হজরত আবু দারদা (রাঃ) এন্তেকালের সময় উটকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ কেয়ামতের দিন দরবারে এলাহীতে আমার বিরুদ্ধে ঝগড়া করিবে না। কেননা শক্তির বাহির তোমার থেকে আমি কোন কাজ নেই নাই।" হুজুরের অভ্যাস ছিল এস্তেঞ্জার সময় কোন বাগানে অথবা গাছের আড়ালে গিয়া বসিতেন। একদিন একটি বাগানে যাওয়া মাত্র একটি উট হুজুরকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, হুজুর তাহার নিকট গেলেন এবং তাহার কানের গোড়াদীর মধ্যে হাত রাখিয়া বলিলেন এই উটটি কার? জনৈক যুবক আনছারী হাজির হইয়া বলিল হুজুর ইহা আমার। হুজুর বলিলেন এই উট তোমার

বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে যে, তুমি তাহার দ্বারা কাজ বেশী লও অথচ তাহাকে খোরাকী কম দাও। (আবু দাউদ)

(২২) গাড়ী ঘোড়ার যে মালিক তার হকের প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। যতটুকু মাল যত টাকা কেরায়ার উপর নির্দৃষ্ট হইয়াছে উহার বেশী মাল লওয়া জায়েজ নাই। এইভাবে রেলগাড়ী ইত্যাদিতেও চুরি চাপটামী করিয়া ভাড়া ব্যতীত বেআইনী মাল লইয়া যাওয়া নাজায়েজ। এইসব ব্যাপারে আগেকার বুজুর্গদের ঘটনাবলী বিশ্বাস করিতেও কষ্ট হয়। বিখ্যাত মোহাদ্দেহ হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক এক সময় ছফরে যাইতেছিলেন। জনৈক ব্যক্তি আসিয়া অনুরোধ করিলেন হুজুর আমার এই চিঠিটা নিয়া যান। তিনি বলিলেন আমি উটের মালিককে আমার যাবতীয় মাল দেখাইয়া লইয়াছি। এখন মালিকের অনুমতি ব্যতীত কি করিয়া নিতে পারি? অগ্র এক মোহাদ্দেছ আলী বিন মা'বদ কেরায়ার ঘরের মাটি দ্বারা চিঠি শুকাইয়াছিলেন ইহাতে স্বপ্নযোগে তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(২৩) জাঁকজমক এবং রংচং এর পরিচ্ছেদ পূর্ণ ছফরেই বর্জন করিবে। কেননা ইহা আশেকানা ছফর, মা'শুকানা ছফর নয়। পাগল প্রেমিকের জন্য সাজ-সজ্জা শোভা পায়না। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হাজী দিগকে দেখিয়া বলিতেন মুছাফেরের সংখ্যা বাড়িতেছে আর হাজীদের সংখ্যা কমিতেছে। সাধারণ পোশাকে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া বলিলেন, হাঁ এই ব্যক্তি হাজীদের মধ্যে শামিল। (এতহাফ)

(২৪) ছফরে যাবতীয় খরচ খোলামনে সন্তুষ্টচিত্তে খরচ করিবে। এই মোবারক ছফরে সংকীর্ণ মন নিয়া কোন খরচই করিবে না। ইহার অর্থ এই নয় যে এছরাফ অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচকে এছরাফ বলা হয়। বরং অবৈধ স্থানে খরচ করাকে এছরাফ বলা হয়। মক্কা শরীফের কুলি, মজদুর, গাড়ী বা উটওয়ালা ঘরের কেরায়া ইত্যাদিতে যাহা খরচ করিবে উহাতে সেখানের অধিবাসীদের সাহায্যের নিয়ত থাকিলে কোন খরচই আর বোঝা মনে হইবে না।

(২৫) যথাসম্ভব ঘুষ দেওয়া হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবে। ভীষণ মজবুরী না হইলে ঘুষ দিবেনা কেননা ঘুষ দেওয়া হারাম এমন কি কোন কোন আলেমগণ লিখিয়াছে টেক্স দেওয়ার দরুন নফল হজ্ব ছাড়িয়া দেওয়া উত্তম। কারণ টেক্স দিলে জালেমদের সাহায্য করা হয়।

(২৬) এই ছফরে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট সহাস্য বদনে সহ্য করিবে। না

শোকরী এবং বেছবরী যেন প্রকাশ না পায়। উলামারা লিখিয়াছেন হজ্বের ছফরে শারীরিক কোন কষ্ট হইলে উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করার সমকক্ষ। কারণ মাল খরচ করা মালী ছদকা আর কষ্ট পাওয়া জানের ছদকা।

(২৭) গোনাহ হইতে বাঁচিবার জন্য খুব গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করিবে আল্লাহ পাক খাছ্ করিয়া বলিয়াছেন যে হজ্ব করিতে যাইবে সে কঠোর ভাবে ফাহেসা কথা, কাজ, অন্যায় আচরণ ঝগড়া ফাছাদ ইত্যাদি ত্যাগ করিবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ পর্যন্ত খোদার কাছে পৌঁছান যায় না যেই পর্যন্ত লজ্জত ভোগ বিলাসিতা এবং সহজ বস্তু সমুহ ত্যাগ না করিবে। আগেকার উম্মতেরা যাবতীয় ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়া বৈরাগী হইয়া যাইত। উহার বদলেই ত হজ্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, বিবির সঙ্গে সহবাস পর্যন্ত না জায়েজ করা হইয়াছে।

(২৮) খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। অনেক হাজী ছফরের পরিশ্রম এবং অলসতা বশতঃ নামাজে ত্রুটি করে। ইহা মারাত্মক গোনাহের কাজ। আলেমগণ লিখিয়াছেন রাত্রে ছফর করিয়া শেষ রাত্রে মন্‌জিল করিলে লম্বা সটান হইয়া শুইবেনা বরং উভয় কনুই খাড়া করিয়া উহার উপর টেক লাগাইয়া শুইবে, কারণ চিৎ হইয়া শুইলে ফজরের নামাজ নষ্ট হইবার আশংকা বেশী থাকে। ওদিকে নামাজের ফজীলত হজ্বের ফজীলতের চেয়েও বেশী। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হজ্বের ছফরে যদি রাস্তায় এমন কোন ব্যাপার ঘটে যে নামাজ পড়ার সময় পাওয়া যায় না তবে তাহার উপর হজ্বও আর ফরজ থাকে না। আবুল কাছেম হাকীম বলেন কোন ব্যক্তি জেহাদে যাইয়া যদি এক ওয়াক্ত নামাজ ও নষ্ট করে তবে একশত জেহাদে শরীক হইলে উহার কাফ্ফারা হইতে পারে।

আবুবকর ওররাফ (রঃ) যখন হজ্বে যাইতেছিলেন তখন একমাত্র এক মঞ্জিল পৌঁছিয়া বলিলেন আমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দাও। কেননা আমি একটি মঞ্জিলেই সাতশত কবীরা গোনাহ করিয়া ফেলিয়াছি। ওলামাগণ এই বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত যে এত বড় বজুর্গের দ্বারা এক মঞ্জিলে সাতশত কবীরা গোনাহ হওয়া কি করিয়া সম্ভব যাহা একজন সাধারণ ফাছেকের দ্বারা হওয়াটাও অস্বাভাবিক। অন্য কোন বুজুর্গ বলিয়াছেন তাঁহার জামাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ফওত হইয়া গিয়াছিল। শরহে লোবাবে হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জমাতের সহিত এক ওয়াক্ত নামাজ ছাড়িয়া দিল সে যেন সাতশত কবীরা গোনাহ করিল। সম্ভবতঃ সেই বুজুর্গ এই হাদীছ পাইয়াছেন। অবশ্য প্রচলিত মশহুর কোন কিতাবে এই হাদীছ

পাওয়া যায় না। তদুপরি শায়েখের হজ্বও সম্ভবতঃ নফল হজ্ব ছিল।

(২৯) সমস্ত ছফর বিপুল উদ্দীপনার সহিত পাগল প্রেমিকের মত কাটাইবে। মনে করিতে হইবে আমি আল্লার দরবারে যাইতেছি। যেমন কোন শাহেনশাহ, রাজাধিরাজ একটা দরবারের ব্যবস্থা করিল এবং সৌভাগ্য বশতঃ আমার নামেও দাওয়াত কার্ড আসিয়াছে।

مری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے
قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں

"কাহারও করুণার অছিলায় আমার উপস্থিতি এবং কেহ উঠাইয়াছে পরই এই কদম উঠিয়াছে।

আল্লাহ পাকের জাতের নিকট এই আশা-পোষণ করিবে যে, দুনিয়াতে যেমন তিনি নিজের ঘরের জিয়ারত দ্বারা আমাকে ভাগ্যবান করিয়াছেন তদ্রূপ আখেরাতেও আপন দীদারের দৌলত হইতে বঞ্চিত করিবেন না।

(৩০) নিজের প্রত্যেটি এবাদত মাওলার দরবারে কবুল হইয়াছে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যেমন প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে, যেই ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে গিয়া মনে করে যে আমার গোণাহ মাফ হয় নাই সে বহুত বড় পাপী। তবে নিজের দুর্বলতার দরুণ আমল কবুল হইয়াছে কিনা সেই বিষয় ভয়ও রাখিতে হইবে। এবনে আবি মালীকা বলেন আমি প্রায় ত্রিশজন ছাহাবীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছি, প্রত্যেকেই নিজে মোনাফেক কিনা এই ভয়ে কম্পিত থাকিতেন। (বোখারী)

অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেন যে আমাদের বাতেনী আমল জাহেরী আমলের মত সুন্দর নয়। কাজেই আমার মোনাফেক হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একব্যক্তি ছওয়াবের আশায় জেহাদ করে আবার একটু সুনামের আকাংখ্যাও করে। হুজুর এরশাদ করেন সে কোন ছওয়াব পাইবে না। লোকটি কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিল হুজুরও কয়েকবার উত্তর দিলেন। অতঃপর হুজুর ফরমাইলেন যেই আমল খালেছ তাঁহারই জন্য করা হয় আল্লাহ পাক শুধুমাত্র তাহাই কবুল করিয়া থাকেন।

হজরত শফী একজন তাবেয়ী ছিলেন। এক সময় মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হইয়া দেখিলেন যে এক বুজুর্গের নিকট লোকজনের বেশ ভিড় জমিয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে উনি হজরত

আবু হোরায়রা (রাঃ)। হজরত শফী তাঁহার নিকট গমন করিয়া আরজ করিলেন, হুজুর! আমি আপনার নিকট এমন একটি হাদীছ জানিতে চাই যাহা আপনি হুজুরের নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ-হাঁ আমি তোমাকে এমন একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি হুজুর (ছঃ)-এর নিকট হইতে ভাল করিয়া জানিয়াছি ও বুঝিয়াছি এই বলিয়া তিনি চীৎকার মারিয়া কাঁদিতে লাগিলেন যদ্বারা তিনি প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। ক্ষণেক পর যখন তাঁহার একটু হুশ হইল তখন বলিলেন, তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইতেছি যাহা আমি এই ঘরে হুজুরের নিকট শুনিয়াছি, তখন আমি আর হুজুর ছিলাম, অন্য কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি সজোরে চীৎকার মারিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রায় বেহুশ হইয়া গেলেন। একটু পরে তিনি যখন খানিকটা শান্ত হইলেন তখন মুখ মুছিয়া বলিতে লাগিলেন, হাঁ তোমাকে আমি একটি হাদীছ শুনাইব যাহা আমি এই ঘরে হুজুরের নিকট শুনিয়াছি তখন আমি এবং হুজুর ব্যতীত অন্য কেহ তথায় ছিল না। এই বলিয়া তিনি জোরে এক চীৎকার মারিলেন যে উপুড় হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। আমি অনেকক্ষণ যাবত তাঁহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর যখন তাঁহার হুশ হইল তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক হিসাব কিতাব লইতে শুরু করিবেন। তখন সমস্ত হাশরবাসী ভয়ে নতজানু হইয়া থাকিবে। সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তিকে ডাকা হইবে। প্রথম হাফেজে কোরান, দ্বিতীয় মোজাহেদ, তৃতীয় মালদার। সর্বপ্রথম হাফেজে কোরানকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, আমি তোমাকে এমন নেয়ামত দান করিয়াছি যাহা আমি নবীর উপর অবতীর্ণ করিয়াছি। সে আরজ করিবে নিশ্চয় উহা আপনার বহুত বড় নেয়ামত ছিল। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি উহাতে কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে আমি সকাল বিকাল উহার তেলাওয়াতে লিপ্ত ছিলাম। আল্লাহ পাক বলিবেন তুমি মিথ্যাবাদী, এই কথা শুনিয়া ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি ঐ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে বলিবে অমুক বড় বিখ্যাত ক্বারী। কাজেই তোমার সেই আশা ত পূর্ণ হইয়াছে। লোকে তোমাকে ক্বারী এবং হাফেজ বলিয়াছে। তারপর মালদার ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলা হইবে আমি তোমাকে অনেক ধন-রত্ন দিয়াছি

যাহাতে তুমি কাহারও মুখাপেক্ষী ছিলেনা, সে বলিবে নিশ্চয় আপনি আমাকে মালদার করিয়াছিলেন। এরশাদ হইবে তুমি তাহার কি হক আদায় করিয়াছ? সে বলিবে আমি আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছি, ছদকা খয়রাত করিয়াছি, বলা হইবে যে তুমি মিথ্যাবাদী এবং ফেরেশতারাও বলিয়া উঠিবে যে তুমি মিথ্যাবাদী। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করিবেন যে ঐ সব তুমি এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বলিবে অমুক বড় দাতা, সুতরাং সেটাত বলা হইয়াছে। অতঃপর মোজাহেদকে বলা হইবে যে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে হে খোদা! তুমি জেহাদের হুকুম করিয়াছ কাজেই আমি তোমার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছি ও প্রাণ বিসর্জন দিয়াছি। এরশাদ হইবে মিথ্যা বলিতেছ ফেরেশতারা বলিয়া উঠিবে লোকটি মিথ্যাবাদী মিথ্যাবাদী। এরশাদ হইবে তুমি ঐ সব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে, সেটাত বলা হইয়াছে। তারপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) হজরত আবু হোরায়রার হাটুতে হাত রাখিয়া বলিলেন এই ব্যক্তি দ্বারাই সর্বপ্রথম জাহান্নামের আগুনকে তেজ দেওয়া হইবে।

এই হাদীছ শুনিয়া হজরত শফী আমীরে মোয়াবিয়ার নিকট গিয়া পুরা হাদীছ বর্ণনা করেন। হজরত আমীরে মোয়াবিয়া (রাঃ) বলিলেন যখন ঐ তিন জনের অবস্থা এইরূপ হইবে তখন খোদা জানেন অন্যান্যদের অবস্থা কিরূপ হইবে। এই কথা বলিয়া হজরত মোয়াবিয়া এত বেশী কাঁদিলেন যে লোকে দেখিয়া মনে করিল যে এই কান্নায় তিনি মরিয়াই যাইবেন। অনেকক্ষণ পর যখন তাঁহার হুশ হইল তখন ফরমাইলেন, আল্লাহ পাক সত্য বলিয়াছেন এবং তদীয় রাছুলও সত্য বলিয়াছেন, অতঃপর হজরত আমীরে মোয়াবিয়া কোরান শরীফের এই আয়াত পাঠ করিলেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ

اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ

لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا

نوا يعملون ○

অর্থাৎ "যাহারা (নেক আমলের দ্বারা) শুধু দুনিয়া এবং উহার সুখ শান্তি চায় আমি তাহাদের আমলের পরিবর্তে দুনিয়াতেই সব কিছুর ব্যবস্থা করিয়া থাকি বরং উহাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করা হয় না। এবং পরকালে তাহাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নাই। তাহারা দুনিয়াতে যাহা কিছু করিয়াছিল বদ নিয়তের দরুন আখেরাতে ঐ সব কোন কাজেই আসিবে না।'

যখন অবস্থা এই, তখন নিজের যে কোন আমলের উপর দাবী করা যে ইহা শুধু আল্লার জন্য বড়ই কঠিন ব্যাপার হাঁ আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা যদি কবুল করেন তবে উহা তাঁহার রহমতের কাছে খুবই সহজ।

একদা হুজুরে পাক (ছঃ) জনৈক যুবক ছাহাবীকে রোগ শয্যায় দেখিতে গেলেন। তিনি মৃত্যুর সন্নিকট ছিলেন। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি অবস্থা? সে বলিল, হুজুর! আল্লার রহমতের আশা রাখি এবং আপন গোনাহের জন্য ভয় করিতেছি। হুজুর এরশাদ করেন এই অন্তিম দশায় যাহার অন্তরে এই দুইটি জিনিস আসিবে আল্লাহ পাক তাঁহাকে সেই জিনিস চায় উহা দান করিবেন এবং যেই জিনিসকে ভয় করেন উহা হইতে নাজাত দিবেন।

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন কেয়ামতের দিন যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে বাকী সব জাহান্নামী হইবে তখন আমি আল্লার রহমতের উপর ভরসা করিয়া মনে করিব যে আমিই একমাত্র সেই ব্যক্তি, যে নাজাত পাইবে। আর যদি ঘোষণা করা হয় যে একটি মাত্র লোককে দোজখে পাঠাইয়া বাকী সবাইকে জান্নাতে পাঠানো হইবে তখন আমার ভয় হইবে যে একমাত্র আমিই সেই জাহান্নামী ব্যক্তি।

হজরত আলী (রাঃ) আপন ছেলেকে এরশাদ করেন যে বাবা! আল্লাহ পাককে এমন ভাবে ভয় করিবে যদি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের নেকী নিয়াও তুমি হাজির হও তবুও হয়ত উহা কবুল হইবে না, আর এমনভাবে আশা রাখ যে যদি সমস্ত দুনিয়ার পাপ একত্রে লইয়াও গমন কর তবুও মনে

করিবে যে তিনি মাফ করিয়া দিবেন।

এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি আদাবের বর্ণনা দেওয়া হইল। ইনশা-ল্লাহ 'জিয়ারতে মদীনার বর্ণনা ও কিছু আদাব বর্ণিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মক্কা শরীফ এবং কা'বা শরীফের ফজীলত

মক্কা শরীফ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের কোরান ও হাদীছে বহু ফাজায়েলে বর্ণিত আছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ফজীলতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ـ

নিশ্চয় মানুষের এবাদতের জন্য সর্বপ্রথম যেই ঘর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে উহা মক্কা শরীফে অবস্থিত উহা বড়ই বরকতের স্থান এবং সমগ্র দুনিয়া বাসীর জন্য হেদায়েতের বস্তু।

হজরত আলী বলেন অনেক ঘর বায়তুল্লার পূর্বেও ছিল কিন্তু বায়তুল্লা হইল এবাদতের জন্য প্রথম ঘর। বিভিন্ন ছাহাবী হইতে বর্ণিত আছে সারা দুনিয়ার বুকে কা'বা শরীফের এই স্থানটুকু জল বুদবুদের মত ছিল। উহাকেই ক্রমাগত প্রশস্ত করিয়া সারা বিশ্বের ভূখণ্ডকে তৈয়ার করা হইয়াছে। যেমন আটার খামীরকে প্রশস্ত করিয়া রুটি তৈয়ার করা হয়। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহুদীদের দাবী ছিল বায়তুল মোকাদ্দাছ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট শহর। কেননা উহা বহু আম্বিয়ায়ে কেরামের আবাস স্থল ছিল। উহার প্রতিউত্তরে আল্লাহ পাক এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ـ

"মক্কা শরীফে বহু নিদর্শন রহিয়াছে তন্মধ্যে একটি হইল মাকামে ইব্রাহীম" মাকামে ইব্রাহীম একটি পাথরের নাম যাহার উপর দাঁড়াইয়া হজরত ইব্রাহীম (আ:) কা'বা শরীফ তৈয়ার করেন, সেই পাথরের উপর তাঁহার পায়ের চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছিল। সেই পাথর কা'বা শরীফের

সংলগ্ন একটি গুম্বুজে সংরক্ষিত আছে, উহাকেই মাকামে ইব্রাহীম বলা হয়। মোজাহেদ বলেন সেই পাথরে কদমের চিহ্ন হওয়াই একটি প্রকাশ্য নিদর্শন।

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ـ

'এবং যেই ব্যক্তি হারামের সীমায় প্রবেশ করিবে সে আল্লাহ্‌র হেফাজতে আসিয়া যাইবে।

হারাম শরীফ দুই কারণে হেফাজতের স্থান। প্রথমত সেখানে নামাজ এবং হজ্ব করিলে জাহান্নামের আজাব হইতে হেফাজতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ কোন ব্যক্তি হারাম শরীফের বাহিরে কাহাকেও হত্যা করিয়া হারাম শরীফে প্রবেশ করিলে তাহাকে হারামের ভিতর হত্যা করা হইবে না। তবে তাহার খানা পিনা বন্ধ করিয়া হারাম শরীফ হইতে বাহির হইবার জন্য তাহাকে বাধ্য করা হইবে। হজরত ওমর বলেন আমি যদি আমার পিতার হত্যাকারীকেও হারামের মধ্যে পাই তবুও তাহার গায়ে হাত রাখিব না। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেন আমি যদি আমার পিতা ওমরের হত্যাকারীকেও পাই তবুও তাহাকে কোন প্রকার হামলা করিব না।

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ـ

এবং সে সময়টাও উল্লেখযোগ্য যখন আমি বায়তুল্লাহকে মানুষের কেন্দ্র স্থল বানাইয়াছি এবং শান্তি ও হেফাজতের ঘর বানাইয়াছি।

কেন্দ্রস্থল বানাইবার দুইটি অর্থ হইতে পারে। প্রথমত: কেবলা বানাইয়াছি। যেহেতু সেইদিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে হয়। দ্বিতীয়তঃ হজ্বের মৌসুমে চতুর্দিক হইতে সেইদিকে লোক আগমন করে। ইহাও হইতে পারে যে "মাছাবাতান" শব্দ ছওয়াব হইতে লওয়া হইয়াছে অর্থাৎ উহা ছওয়াবের স্থান কেননা উহার একটি নেকী একলক্ষ নেকীর সমান। এবনে আব্বাছ বলেন অর্থ হইল উহা দ্বারা মনের আশা পুরা মিটেনা, একবার আসিলে বারংবার সেই দিকে আসিতে মন চায়।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ·

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ـ

"এবং ঐ সময়টুকুও স্মরণ করিবার যোগ্য যখন হজরত ইব্রাহীম বায়-

তুল্লার দেওয়াল খাড়া করিতেছিলেন এবং হজরত ইছমাইল তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। এবং পিতা-পুত্র এই প্রার্থনা করিতেছিলেন হে আমাদের প্রভু! আমাদের খেদমত তুমি কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছু শুন এবং কাহার অন্তরে কি আছে সবকিছু জান।

কা'বা শরীফ কে তৈয়ার করেন

কোরআন শরীফ দ্বারা প্রমানিত হয় যে বায়তুল্লাহ শরীফ হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ঐ ঘর হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইতে পারে যাহা বানাইবার আদেশ করেন স্বয়ং পরওয়ার দিগার। নকশা তৈরীর ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন হজরত জিব্রাইল, হজরত ইব্রাহীমের মত বড় পয়গাম্বর হইলেন উহার রাজমিস্ত্রী আর যোগালী হইলেন হজরত ইছমাইল জবিহুল্লাহ। আল্লাহ আকবর। সেই ঘর কত বড় আজমতের অধিকারী। ইব্‌নে ছায়াদ রেওয়ায়েত করেন হজরত ইব্রাহীমের বয়স ছিল একশত বৎসর আর ইছমাইলের বয়স ছিল ত্রিশ বৎসর। কা'বা শরীফ কে প্রথম এবং কে পরে তৈয়ার করেন উহার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত অনুসারে সর্বপ্রথম তৈয়ার করেন ফেরেশ্‌তাগণ এবং তাহা হইল হজরত আদম (আঃ) এর জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রথম তৈরী আল্লাহ পাকের হুকুম "কুন" শব্দ দ্বারা হয় যেখানে ফেরেশ্‌তাদেরও কোন দখল ছিল না।

(২) হজরত আদম (আঃ) তৈয়ার করেন। বর্ণিত আছে যে লবনান, তুরে সীনা, তুরে জীতা জুদী হেরা এই পাঁচটি পাহাড়ের পাথরের সমন্বয়ে হজরত আদম (আঃ) উহাকে তৈয়ার করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে ভিত্তির অংশ রাখিয়াছিলেন হজরত আদম। তার উপর আছমান হইতে বায়তুল মামুরকে রাখা হইয়াছে। অতঃপর হজরত আদমের এন্তেকালের পর অথবা নূহের তুফানের সময় উহা আকাশে উঠাইয়া নেওয়া হয়।

(৩) বলা হয় যে আদমের বেটা শীষ (আঃ) উহা তৈয়ার করেন।

(৪) হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তৈয়ার করেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। কোরানের দ্বারা প্রমাণিত। বলা হয় উক্ত ভিত্তি নয়গজ উঁচু, ত্রিশ গজ লম্বা এবং তেইশ গজ চওড়া ছিল। তখন কোন ছাদ ছিল না, ভিতরে একটি কুয়া ছিল। কা'বা শরীফের নামে মানত করা বস্তুসমূহ তথায়

নিক্ষেপ করা হইত।

(৫) আমালেকা গোত্র পঞ্চম বারে ও (৬) জোরহাম গোত্র ষষ্ঠবারে তৈয়ার করেন। তাহারা হজরত নূহের বংশধর ছিল। (৭) হুজুরের পঞ্চম পুরুষ পূর্বের দাদা কোছাই তৈয়ার করেন। (৮) হুজুরের পঁচিশ অথবা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে কোরেশগণ উহাকে নূতন করিয়া তৈয়ার করেন। ইহাতে স্বয়ং নবী করীম (দঃ) ও শরীক ছিলেন এবং হুজুর আপন কাঁধে করিয়া পাথর জোগাড় দিয়াছিলেন। এই সময়ে হাজরে আছওয়াদকে নিয়া কোরেশদের মধ্যে যুদ্ধের উপক্রম হইয়াছিল। হুজুর উহার ফয়ছালা এইভাবে করেন যে একটা চাদরের মধ্যে পাথরটা আমি রাখিতেছি তোমরা প্রত্যেক গোত্রের এক এক জন লোক উহার এক এক কিনারা ধর। এই-ভাবে দেওয়ালের পাশে নেওয়া হইলে হুজুর বলিলেন, সকলে আমাকে অনুমতি দিয়া উকিল বানাইলে পাথরটা আমি যথাস্থানে রাখিতে পারি, সকলেই অনুমতি দিল। হুজুর নিজ হাতে উপরে রাখিয়া দিলেন। এই তৈয়ারী উপলক্ষে কাফেরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ইহাতে কোন হারাম উপার্জিত পয়সা লাগাইবেনা। তাই হালাল উপার্জনের পয়সা শেষ হইয়া যাওয়াতে হাতীমের দিকে কিছুটা দেওয়াল পিছু হটাইয়া দেওয়া হয়। কাজেই কা'বার কিছুটা অংশ বাহিরে থাকিয়া যায়। দরজা ও ইব্রাহিম (আঃ) এর ভিত্তির খেলাফ কিছুটা উঁচু করিয়া দেওয়া হয় যেন সিড়ি ব্যতীত প্রত্যেকেই উঠিতে না পারে। হুজুরের বড় আরজু ছিল কা'বা শরীফকে ইব্রাহীম (আঃ) এর ভিত্তির উপর নূতন করিয়া গড়িবার, কিন্তু হুজুরের জীবনে তাহা সম্ভব হয় নাই।

(৯) চৌষট্টি হিজরীতে এজীদের সেনাবাহিনী যখন আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের উপর আক্রমণ করিয়াছিল তখন আগুনের গোলায় কা'বা শরীফের গেলাপ জ্বলিয়া যায় দেওয়ালও অনেকটা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। ঐ সময় এজীদের মৃত্যু সংবাদ আসিলে সৈন্যগণ চলিয়া যায় এবং হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের কা'বা ঘরকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (দঃ) এর ইচ্ছানু-যায়ী নূতন করিয়া গড়েন। হাতীমকে ঘরের ভিতর শামিল করেন এবং দরজা নীচু করিয়া উহার মোকাবেলা আর একটি দরজা তৈয়ার করেন যেন লোকজন এক দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া আর এক দরজা দিয়া বাহির হইতে পারে। চৌষট্টি হিজরী জমাদিউল আখেরে ঐ কাজ শুরু হইয়া পঁয়ষট্টি হিজরী রজব মাসে উহা শেষ হয়। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের ঐ খুশীতে এক জবরদস্ত দাওয়াতের এন্তেজাম করেন এবং একশত উট

জবেহ করিয়া খাওয়ান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হাঙ্গামার সময় হজরত ইছমাইলের পরিবর্তে জান্নাতের যে দুম্বা কোরবানী হইয়াছিল কা'বা শরীফে রক্ষিত সেই দুম্বার শিংটা হারাইয়া যায়। ইন্নালিল্লাহ—

(১০) হজরত আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের এন্তেকালের পর খলীফা এবনে জোবায়েরের গড়নকে ভাঙ্গিয়া পুরানো কোরেশদের মত আবার গড়িয়া দেয়। আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ বিন ইউছুফের সেই গড়নের উপর কা'বা শরীফ রহিয়াছে। খলীফা হারুনুর রশীদ এবং অন্যান্য খলীফা চাহিয়াছিল উহাকে ভাঙ্গিয়া হুজুর (ছঃ) এর মনশা মোতাবেক আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের মত আবার গড়িবে কিন্তু ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ কঠোর-ভাবে নিষেধ করেন, কেননা ইহাতে কা'বা ঘর রাজা বাদশাহগণের খেল তামাশার বস্তুতে পরিণত হইবে।

(১১) ১০২১ হিজরীতে ছোলতান আহমদ তুর্কী কা'বা ঘরের কিছুটা মেরামত করেন।

(১২) ১০৩৯ হিজরীতে ভীষণ বন্যার দরুন কা'বা ঘরের কোন কোন দেওয়াল নষ্ট হয়, ছোলতান মুরাদ সেই সময় উহার বিধ্বস্ত অংশের সংস্কার করেন। হজরত শাহ আবদুল আজিজ (রাঃ) লিখিয়াছেন, বর্তমানে হাজরে আছওয়াদের দিকের অংশ এবনে জোবায়েরের গড়া এবং বাকী অংশ ছোলতান মুরাদ কর্তৃক গড়া। ১৩২৭ হিজরী মহররম মাসে বাদশা এবনে ছউদ কা'বা শরীফের দরজা কেওয়াড় এবং চৌকাঠ নূতন করিয়া তৈয়ার করেন।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ -

"আল্লাহ পাক সম্মানিত কা'বা শরীফকে মানুষের দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বস্তু বানাইয়াছেন।"

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন মানুষ যতদিন পর্যন্ত এই ঘরের হজ্ব করিবে এবং সেইদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবে ততদিন পর্যন্ত দ্বীনের উপর কায়েম থাকিবে।

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন খুব বেশী বেশী করিয়া বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ কর। এই ঘর দুই বার ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। আবার যখন ধ্বংস হইবে তখন উহাকে উঠাইয়া নেওয়া হইবে। ইমাম গাজ্জালী হজরত আলীর বর্ণনা নকল করেন যে আল্লাহ পাক যখন দুনিয়াকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিবেন তখন সর্বপ্রথম কা'বা শরীফকে বরবাদ করা হইবে, তারপর

বাকী সব ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেয়ামতের পূর্বে কা'বা শরীফ ধ্বংস হইবে বলিয়া অনেক রেওয়ায়েত আছে। হুজুর বলেন যেই হাবশী কা'বা ঘরের এক একটা ইটকে ধ্বংস করিবে সে যেন আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। হুজুর আরও বলেন মানুষ যতদিন বায়তুল্লার হক অনুসারে তাজীম করিবে সুখ শান্তিতে থাকিবে আর যখন উহার সম্মান ছাড়িয়া দিবে ধ্বংস হইয়া যাইবে। অন্য হাদীছে আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীমকে না উঠাইয়া নেওয়া পর্যন্ত কেয়ামত কায়েম হইবে না।

একটি হাদীছে আছে ইহাও কেয়ামতের একটি আলামত যে হাবশার অধিবাসীরা কা'বা শরীফে হামলা করিবে। এত বড় লস্কর হইবে যে তাহাদের এক অংশ হাজরে আছওয়াদের নিকট থাকিবে অপর অংশ জেদ্দানগরীতে থাকিবে। বায়তুল্লার একটি একটি করিয়া পাথর তাহারা ধ্বংস করিবে।

( ) عن ابن عباس قال قال رسول الله ص ان الله فى كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين اربعون للمصلين وعشرون للناظرين - (بيهقى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, কা'বা শরীফের উপর দৈনিক আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একশত বিশটা রহমত নাজেল হয় তন্মধ্যে ষাট রহমত তওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশ রহমত নামাজীদের জন্য এবং বিশ রহমত দর্শকদের জন্য। (বয়হকী)।

ফায়দা - বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে নজর করাও এবাদত, ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব বলেন, যে ঈমান এবং একীনের সহিত বায়তুল্লার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে সে গোনাহ হইতে এমনভাবে পাক হইবে যেমন আজ মায়ের পেট হইতে জন্ম নিল। আবু ছায়েব বলেন তাহার গোনাহ এমন ভাবে ঝরিয়া যায় যেমন গাছের পাতাসমূহ ঝরিয়া যায়। এবং যেই ব্যক্তি মসজিদে বসিয়া তওয়াফ এবং নফল নামাজ না পড়িয়া শুধু বায়তুল্লাকে দেখিতে থাকিবে সে ঐ ব্যক্তি হইবে উত্তম যে বাড়ীতে বসিয়া বায়তুল্লাহকে না দেখিয়া নফল নামাজ পড়ে, হজরত আতা (রাঃ) বলেন বায়তুল্লাহকে দেখাও এবাদত, যে বায়তুল্লাহকে দেখিল সে যেন সারা রাত্রি জাগ্রত রহিল। দিন ভর রোজা রাখিল, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিল এবং আল্লার

দিকে রুজু করিল! তিনি আরও বলেন একবার বায়তুল্লাহকে দেখা এক বৎসরের নফল এবাদতের সমতুল্য ছওয়াব।

তাউছ এবং ইব্রাহীম নখঈ হইতেও ঐ ভাবে রেওয়ায়েত আসিয়াছে।

তাওয়াফ কারীদের উপর বেশী বেশী রহমত অবতীর্ণ হয় বশতঃ হারাম-শরীফে তাহিয়্যাতুল মসজিদ না পড়িয়া তওয়াফ করাই উত্তম। তবে নামাজের সময় নিকটবর্তী হইলে তওয়াফ করিবে না। ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা বেশী বেশী তওয়াফ করিবার তওফীক লাভ করিয়াছেন।

কুরজ এবনে আবরা নামীয় এক বুজুর্গ ছিলেন, দিনে সত্তরবার এবং রাত্রে সত্তরবার তিনি তওয়াফ করিতেন যাহার দুরত্ব দৈনিক তিরিশ মাইল হইত। প্রতি তওয়াফের পর দুই রাকাত নফল পড়িতেন ফলে দুই শত আশী রাকাত নফল হইত তদুপরি দৈনিক দুইবার কোরান শরীফ খতম করিতেন। এইসব বুজুর্গেরাই আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দিগীর জন্য অনেক কিছু উপার্জন করিয়া গিয়াছেন।

(২) عن ابن عباس قال قال رسول الله ص فى الحجر والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق - (ترمذى)

হুজুরে পাক (ছঃ) কছম খাইয়া এরশাদ করেন কেয়ামতের দিন হাজরে আছওয়াদের দুইটি চক্ষু হইবে যদ্দারা যে দেখিতে পাইবে এবং একটি জবান হইবে যদ্বারা সে বলিতে পারিবে, যে কোন ব্যক্তি ছহী তরীকায় তাহাকে চুম্বন করিবে তাহার জন্য সাক্ষী দিবে।

ছহী তরীকায় চুম্বন করা অর্থ ঈমান এবং একীনের সহিত চুম্বন করা। হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর ফরমাইয়াছেন কা'বা শরীফের একটি জবান এবং দুইটি ঠোঁট আছে পূর্বেকার জমানার সে আল্লার দরবারে অভিযোগ করিল যে হে খোদা! আমার জিয়ারত বহুত কম সংখ্যক লোকে করিতেছে এবং আমার দিকে লোকজন কম আসিতেছে। আল্লাহ পাক উত্তর করিলেন আমি এমন এক জাতি তৈয়ার করিতেছি যাহারা খুশু খুজুর সহিত বেশী বেশী করিয়া নামাজ পড়িবে এবং তোমার দিকে এমন ভাবে ঝুকিবে যেমন কবুতর আপন ডিমের দিকে ঝুকিতেছে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনী কেয়ামতের দিন এমন ভাবে আসিবে যে তাহাদের দুইটি করিয়া জবান ও ঠোঁট হইবে। যাহারা তাহাকে চুম্বন করিয়াছে তাহারা আল্লাহর সহিত করা অঙ্গীকারকে রক্ষা করিয়াছে বলিয়া সাক্ষী দিবে।

হজরত ওমর ফারুক এক সময় তওয়াফ করিয়া হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া বলিলেন তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছান পৌছাইবার কোন ক্ষমতাই তোমার মধ্যে নাই। আমি হুযুর (ছঃ) কে তোমায় চুম্বন করিতে না দেখিলে কখনও তোমাকে চুম্বন করিতাম না। নিকটেই দণ্ডায়মান হজরত আলী বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন। লাভ নোকছানের ক্ষমতা ইহার রহিয়াছে। হজরত ওমর বলিলেন, তাহা কেমন করিয়া? হজরত আলী উত্তর করিলেন। রোজে আজলের সময় যখন আল্লাহ পাক সমস্ত বান্দার নিকট হইতে আপন প্রতিপালক হওয়ার স্বীকারোক্তি লইয়াছিলেন তখন সে স্বীকারোক্তিকে একটি কিতাবে লিখিয়া এই পাথরের মধ্যে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য দান করিবে যে অমুক আপন অঙ্গীকার পুরা করিয়াছে এবং অমুক পুরা করে নাই। (এতহাফ) সম্ভবতঃ এখানে যে দোয়া পড়িতে হয় এই জন্য উহার শব্দ নিম্নরূপঃ

اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك

হে খোদা! তোমার উপর ঈমান লইয়া এবং তোমার কিতাবকে বিশ্বাস করিয়া এবং তোমার সহিত কৃত অঙ্গীকারকে পূর্ণ করিয়া (চুমা দিতেছি)

মানুষের আকীদা কি করিয়া মজবুত থাকে সেই বিষয় হজরত ওমর খুব চিন্তা ফিকির করিতেন, আকীদা বিনষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া যেই বৃক্ষের নীচে বয়আতে রেজওয়ান হইয়াছিল এবং পবিত্র কোরানেও সেই বিষয় আল্লাহ পাক আপন রেজামন্দির ছনদ নাজেল করিয়াছেন—

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ـ

সেই বৃক্ষকে হজরত ওমর কাটিয়া ফেলেন যেহেতু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষ সেই বৃক্ষের নীচে বরকতের জন্য আসা যাওয়া করে! এই ভাবে হজরত ওমর এখানেও চিন্তা করিলেন যে মানুষ পাথর মূর্তি পূজা হইতে সবেমাত্র বাহির হইয়াছে। এমন যেন না হয় যে, হাজরে-আছওয়াদ নামক পাথরকেও মূর্তি পূজার মত মনে করিয়া আল্লার নৈকট্য লাভের অছিলা সাব্যস্ত করিয়া লয়। তাই তিনি সাবধানতার

জন্য সেই পাথরের কোন সম্মান করেন নাই। (এতহাফ)

এইভাবে স্বয়ং কাবা শরীফের বিষয় ওমর (রাঃ) বলেন ইহাত কতকগুলি প্রস্তর নির্মিত একটি ঘর। তবে আল্লাহ পাক উহাকে আমাদের কেবলা বানাইয়াছেন যেন জীবিতাবস্থায় উহার দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়ি এবং মৃত্যুর পর উহার দিকে মুখ করিয়া শোওয়ান হয়।

অন্য হাদীছে আছে হজরত ওমর যখন হাজরে আছওয়াদের নিকট পৌঁছেন তখন বলেন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি একটি পাথর মাত্র, লাভ নোকছানের ক্ষমতা তোমার মধ্যে নাই। আমার রব ত তিনি যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হুজুর (ছঃ) কে তোমায় চুমা দিতে ও হাত লাগাইতে যদি আমি না দেখিতাম তবে কিছুতেই আমি তোমাকে চুমা দিতাম না এবং স্পর্শও করিতাম না।

মূলকথা হজরত ওমরের উদ্দেশ্য ছিল আমরা শুধু হুকুম পালন করি। নচেৎ ইট পাথরের সঙ্গে আমাদের এবাদতের কোন সম্পর্ক নাই। হজরত আলী বলেন যে ইহার মধ্যে লাভ নোকছানের ক্ষমতা আছে, তার অর্থ হইল সাক্ষী দিয়া উপকার করে যেমন আজানের শব্দ ততটুকু জায়গায় পৌঁছে, যাবতীয় বস্তু মোয়াজ্জেনের জন্য সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু সাক্ষ্য দিবে বিধায় ঐসব বস্তু উপাসনার যোগ্য হইয়া যাওয়া কোন জরুরী নয়।

(৩) عن ابن عباس رض قال قال رسول الله ص نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى ادم - (ترمذى - احمد)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন—হাজরে আছওয়াদ (কাল পাথরটি) বেহেশ্ত হইতে যখন অবতীর্ণ হয় তখন দুগ্ধ হইতেও সাদা ছিল কিন্তু মানুষের পাপরাশী উহাকে কাল করিয়া দিয়াছে।

অর্থাৎ মানুষের হাতের স্পর্শে উহা কাল হইয়া যায়। খুব চিন্তা করিবার বিষয় শুধু হাতের স্পর্শে পাথর কালো হইয়া যায় আর যেইসব দিল সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকে, না জানি ঐ সব দিলের কি অবস্থা।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে মানুষ যখন একটি গোনাহ করে তখন তাহার অন্তরে একটি দাগ পড়িয়া যায়। পরে সে তওবা করিলে উক্ত দাগ মুছিয়া যায় এবং অন্তর পরিস্কার হইয়া যায়। আর যখন দ্বিতীয় গোনাহ করে তখন দ্বিতীয় দাগ পড়িয়া যায়। এইভাবে হইতে হইতে

সমস্ত অন্তর কাল হইয়া যায়। আল্লাহ পাক বলেন খারাপ আমলের দরুন তাহাদের অন্তরে মরিচা জমা হইয়া গিয়াছে।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে হাজরে আছওয়াদ এবং মোকামে ইব্রাহীম জান্নাতের দুইটি ইয়াকুত পাথর। যদি হাজরে মোশরেকগণ উহাকে স্পর্শ না করিত তবে যে কোন রুগী উহা স্পর্শ করিত সে যত বড় মারাত্মক রুগীই হউক না কেন ভাল হইয়া যাইত।

(৪) عن ابى هريرة (رض) ان النبى ص قال وكل به سبعون ملكا يعنى الركن اليمانى فمن قال اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا والاخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وقنا عذاب النار قالوا امين - (مشكوة)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন রোকনে ইয়ামনীতে সত্তর জন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি সেখানে গিয়া বলে, হে খোদা! আমি তোমার নিকট দুনিয়া এবং আখেরাতের সুখ এবং শান্তি কামনা করিতেছি এবং ক্ষমা ও সুস্থতা চাহিতেছি, হে খোদা! তুমি আমাদিগকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর তখন ঐ ফেরেশতারা আমীন বলিতে থাকে।

রোকনে ইয়ামনী বহুত বড় বরকতের স্থান। হজরত এবনে ওমর বলেন যেইদিন হইতে আমরা হুজুরকে রোকনে ইয়ামনীতে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি, সেইদিন হইতে যে কোন অবস্থায় আমরা উহার চুম্বন ত্যাগ করি নাই। রোকনে ইয়ামনীতে চুম্বনের অর্থ হইল তওয়াফের সময় উহার উপর হাত ফিরান। অন্য হাদীছে আছে হুজুর উহাতে চুম্বন করিতেন।

হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীকে চুম্বন করার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কেহ যেন কোন কষ্ট না পায়! কেননা চুম্বন করা মোস্তাহাব আর মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

(৫) عن ابن عباس (رض) يقول سمعت النبى ص يقول الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء ما دعا الله فيه عبد الا استجابها (حصن)

এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন আমি হুজুরকে বলিতে শুনিয়াছি মোলতাজাম এমন একটি স্থান যেখানে দোয়া কবুল হয়। এমন কোন দোয়া সেখানে হয় নাই যাহা কবুল হয় নাই।

মোলতাজাম ঃ কা'বা ঘরের দরওয়াজা হইতে হাজরে আছওয়াদ

পর্যন্ত স্থানকে মোলতাজাম বলা হয় মোলতাজাম শব্দের অর্থ চাপিয়া যাওয়া বা জড়াইয়া ধরা। হজরত এবনে আববাছ (রাঃ) ঐস্থানে দাঁড়াইয়া নিজের বুক এবং চেহারাকে দেওয়ালের সহিত চাপিয়া উভয় হাতকে লম্বা করিয়া মিলাইয়া বলেন, আমি হুজুরে আকদাছ (ছঃ) কে এই ভাবে করিতে দেখিয়াছি। এই স্থানে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয় যেই হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে আমার মরহুম ওস্তাদ হইতে হুজুরে পাক (ছঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক ওস্তাদ হাদীছ বয়ান করিবার সময় আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি সেখানে দোয়া করিয়াছি এবং উহা আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই নাপাক লিখকেরও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

যে যে স্থানে দোয়া কবুল হয়

হজরত হাছান বছরী (রাঃ) একটি পত্রে মক্কা ওয়ালাদের নিকট লিখিয়াছিলেন যে মক্কা শরীফে পনেরটা স্থানে দোয়া কবুল হয়। নং তাওয়াফ করিবার সময়, ২নং মোলতাজামের মধ্যে, ৩নং মীজাবে রহমতের নিকট ৪নং কা'বা শরীফের ভিতর, ৫নং জমজম কুপের নিকট, ৬ ও ৭নং ছাফা মারওয়া পাহাড়ের উপর, ৮নং ঐ দুই পাহাড়ে দৌড়িবার সময়, ৯নং মোকামে ইব্রাহীমের কাছে, ১০নং আরাফাতের ময়দানে ১১নং মোজদালাফায়, ১২নং মিনায় ১৩নং শয়তানকে পাথর মারার তিন জায়গায় (হেছনে হাছীন) কেহ কেহ বায়তুল্লাহ শরীফে দৃষ্টি পড়িবার সময় তাওয়াফ করিবার স্থানে, হাতীম, হাজরে আছওয়াদ এবং রোকনে ইয়ামনীর মাঝখানের স্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ মোলতাজাম, রোকনে ইয়ামনী হইতে আরম্ভ করিয়া কা'বা ঘরের পশ্চিম দরওয়াজা যাহা বর্তমানে বন্ধ আছে উহাকে কবুলিয়তের স্থান বলিয়া লিখিয়াছেন।

(৬) عن انس بن مالك (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الرجل فى بيته بصلوة وصلوته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين صلوة وصلوته فى المسجد الذى يجمع بخمس مائة صلوة وصلوته فى المسجد الاقصى بخمسين الف صلوة وصلوته فى مسجدى بخمسين الف صلوة وصلوته فى المسجد الحرام بمائة الف صلوة - (مشكوة)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ আপন ঘরে নামাজ পড়িলে এক নামাজে এক নামাজের ছওয়াব পায়। মহল্লার মসজিদে পড়িলে পঁচিশ গুণ বেশী ছওয়াব পায়, জামে মসজিদে পড়িলে পাঁচ শত গুণ বেশী ছওয়াব পায়, এবং বায়তুল মোকাদ্দাছ অথবা আমার মদীনার মসজিদে পড়িলে পঞ্চাশ হাজার গুণ ছওয়াব বেশী পায়। মক্কা শরীফে নামাজ পড়িলে এক লক্ষ্য নামাজের ছওয়াব পায়।

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন মক্কা শরীফে একদিনের রোজা বাহিরের এক লক্ষ্য রোজার সমতুল্য। সেখানে এক দেরহাম খরচ করিলে এক লক্ষ্য দেরহামের সমান এবং একটি নেকী করিলে এক লক্ষ্য নেকীর সমান ছওয়াব পাওয়া যায়।

বিভিন্ন হাদীছে মসজিদে নববীর ছওয়াব মসজিদে আকছার ছওয়াবের চেয়ে অধিক আসিয়াছে। অথচ এখানে উভয় মসজিদের ছওয়াব পঞ্চাশ হাজার বলা হইয়াছে। ওলামাগণ এই হাদীছের অর্থ ইহা নিয়াছেন যে এই হাদীছে প্রত্যেক মজজিদের ছওয়াব পূর্ববর্তী মসজিদ হিসাবে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জামে মসজিদের ছওয়াব পাঁচ শত নামাজ নয় বরং মহল্লার মসজিদ হইতে পাঁচ শত গুণ বেশী। এই হিসাব মতে জামে মসজিদে (১২৫০০) বার হাজার পাঁচশত নামাজের ছওয়াব মসজিদে আকছার ছওয়াব বাষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ (৬২৫০০০০০০)। মদীনার মসজিদের ছওয়াব তিন নিল বার খর্ব পঞ্চাশ আরব (৩১২৫০০০০০০০০০০) এবং হারাম শরীফের ছওয়াব একত্রিশ শঙ্খ পঁচিশ পদ্ম (৩১২৫০০০০০০০০০০০০০০০) ছোবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ পাকের ভাণ্ডার অফুরন্ত।

যে কোন মসজিদে প্রবেশ করিলে এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া প্রবেশ করিবে। তাহা হইলে অতিরিক্ত এ'তেকাফের ছওয়াব ও পাওয়া যাইবে বিশেষ করিয়া হারাম শরীফ এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিতে উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

(৭) عن عمر (رض) قال لان أخطى سبعين خطيئة بركية أحب الى من ان اخطى خطيئة واحدة بمكة - (كنز)

হজরত ওমর (রাঃ) বলেন হারাম শরীফে একটা গোনাহ করা আমার নিকট হারামের বাহিরে সত্তরটা গুনাহ করার চেয়েও মারাত্মক।

যেমন মক্কা শরীফে ছওয়াব বেশী সেখানে পাপ করিলেও উহার বিপদ

বেশী। তাই তিনি বলেন মক্কা শরীফে একটি পাপ করার চেয়ে বাহিরে সত্তরটি পাপ করা ভাল ইমাম গাজ্জালী বলেন হারাম শরীফে গোনাহের বিষয় কঠোরভাবে নিষেধ আসিয়াছে। এইসব কারণে অনেক বুজুর্গ মক্কা শরীফে বেশী দিন থাকাকে না পছন্দ করিতেন কেননা মক্কা শরীফের আদব ও ইজ্জত রক্ষা করিয়া চলা বহুত কঠিন ব্যাপার।

ওহাব বিন আল ওয়াদ নামক এক বজুর্গ বলেন আমি একদিন হাতীমে কা'বার মধ্যে নামাজ পড়িতেছিলাম হঠাৎ কা'বা ঘরের পর্দার ভিতর হইতে আমি এই আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে হে আল্লাহ আমি প্রথমে আপনার নিকট এবং তারপর হে জিব্রাঈল আমি তোমার নিকট মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, এই সব লোক আমার চতুর্দিকে হাসি ঠাট্টা এবং বেহুদা কার্য্য কলাপে লিপ্ত থাকে। যদি তাহারা এই সব ক্রিয়া হইতে বিরত না হয় তবে আমি এমন ভাবে ফাটিয়া পড়িব যে, আমার প্রতিটা পাথর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।

একদা হজরত ওমর কোরেশদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন তোমাদের পূর্বে আমালেকা গোত্র এই ঘরের মোতাওল্লী ছিল। ঘরের সামনে ত্রুটি করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন. তারপর জোরহাম গোত্র ইহার খেদমতের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘরকে বে-ইজ্জত করার দরুন আল্লাহ পাক তাহাদিগকেও ধ্বংস করিয়া দেন। সুতরাং তোমরা ইহার সম্মানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে উহাতে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না।

মোহাম্মদ বিন মুছা বলেন জনৈক আজমী ব্যক্তি তাওয়াফ করিতেছিল। লোকটি নেকবখত দ্বীনদার ছিল। তাওয়াফ করিবার সময় জনৈকা সুন্দরী মেয়েলোকের পায়ের অলঙ্কারের শব্দ তাঁহার কানে আসিল। লোকটি সেই মেয়েলোকটার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ রোকনে ইয়ামনী হইতে একটি হাত বাহির হইয়া তাহাকে এমন জোরে এক চড় মারিল যে উহাতে তাহার চক্ষু বাহির হইয়া গেল এবং বায়তুল্লার দেওয়াল হইতে আওয়াজ আসিল যে আমার ঘর তাওয়াফ করিতেছ আর আমার গায়েরের দিকে নজর করিতেছ? থাপ্পড় সেই দৃষ্টির প্রতিদান। আর যদি বে-আদবী কর তবে আমিও অধিক প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।

(৮) عن عائشة (رض) قالت كنت احب ان ادخل البيت واصلى فيه فاخذ رسول الله صـ بيدى فادخلنى فى الحجر فقال صلى فى الحجر اذا اردت دخول البيت فانما هى قطعة من البيت فان قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فاخرجوه من البيت - (رواه ابوداؤد)

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার মনে চায় কা'বা শরীফের ভিতরে গিয়া নামাজ পড়ি। হুজুর আমার হাত ধরিয়া হাতীমের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বলিলেন কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিলে এখানে প্রবেশ কর কেননা ইহা ঘরের একটা অংশ বিশেষ। তোমার বংশধরগণ যখন কা'বা শরীফকে নতুন করিয়া গড়িতেছিল তখন অর্থের অভাবে এই অংশটাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া দেয়।

কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করা মোস্তাহাব উহাও দোয়া কবুলের বিশেষ স্থান। কোরেশগণ ঘর বানাইবার সময় দরওয়াজাকে অনেক উঁচু করিয়া দেয় যেন যে কেহ সহজে দাখেল হইতে না পারে। হুজুর (ছঃ বলিলেন আরববাসীরা যদি নও-মুছলিম না হইত তবে আমি ঘরকে নূতন ভাবে গড়িয়া হাতীমকে ঘরের ভিতর করিয়া দিতাম। দরওয়াজা নীচু করিয়া দিতাম এবং দুইটা দরওয়াজা বানাইতাম যেন এক দরওয়াজা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য দরওয়াজায় বাহির হওয়া যায়। আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের হুজুরের ইচ্ছা মোতাবেক গড়িয়াছিলেন কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউছুফ আবার আগের মত করিয়া হাতীমকে বাহির করিয়া দেন। তাহার নিয়ত যাহাই থাকুক না কেন এখন যে কোন ব্যক্তি বিনা কষ্টে বিনা ঘুষে খাছ করিয়া মেয়েলোকেরা হাতীমে নামাজ পড়িয়া ঘরের ভিতর পড়ারই সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে। হাতীমের অংশ হুজুর (ছঃ) প্রায় সাত হাত পরিমাণ ঘরের অংশ বলিয়া দেখাইয়াছেন।

একটি কথা মনে রাখিবে, ঘুষ দিয়া বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ কিছুতেই জায়েজ নাই। কাহারও প্রবেশের সৌভাগ্য হইলে প্রথমে গোছল করিয়া নেহায়েত খুশু খুজুর সহিত ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আদবের সহিত দাখিল হইবে। মুজা পরিয়া দাখেল না হওয়াই ভাল। জনৈক বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি বায়তুল্লায় দাখেল হইয়াছেন? তিনি বলেন

যেই পা ঘরের চারিদিকে চক্কর দিয়া ফিরে সেই কি ঘরে প্রবেশের যোগ্যতা রাখে? তদুপরি আমার জানা আছে এই পা কত না অন্যায়ের দিকে চলিয়াছে।

کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب
شرم تم کو مگر نہیں آتی
بہ زمین چو سجدہ کردم ز زمین ندا برآمد
کہ مرا خراب کردی بسجدۂ ریائی
بطواف کعبہ رفتم بحرم ندا دادند
کہ برون در چہ کردی کہ درون خانہ بیائی

বলিতেছে যে আমি যখন জমিনে ছেজদা করি তখন জমিন হইতে এই আওয়াজ আসিল যে রিয়ার ছেজদা দ্বারা তুমি আমাকে খারাপ করিয়া দিয়াছ। কাবা ঘরের জিয়ারতে যখন যাই তখন প্রবেশের অনুমতি পাইলাম না বরং বলিল যে বাহিরে কি কি কাজ করিয়া আসিয়াছ যদ্দারা ভিতরে প্রবেশের সাহস করিতেছ।

কা'বা শরীফে প্রবেশ করিলে অবশ্যই দুইটা জিনিস হইতে নিজেকে বাচাইবে কারণ উহা জাহেলদের একটা মনগড়া কাহিনী। প্রথমতঃ দরজার সামনে দেওয়ালের মধ্যে একটা কড়া আছে উহা ধরিলে নাকি কোরান শরীফের সেই উরওয়াতুল উছকা অর্থাৎ মজবুত কড়াকে ধরা হয়। দ্বিতীয় ভিতরে একটা লোহার খুটার মত আছে উহাকে মুর্খ লোকেরা দুনিয়ার নাভী বলিয়া এখানে আপন নাভীকে ঘষে। এই দুইটি কথা সম্পূর্ণ বাজে, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জমজম

(৯) عن جابر رض يقول سمعت رسول الله ص يقول ماء زمزم لما شرب له - (ابن ماجه)

হুজুর (ছঃ) ফরমাইতেছেন জমজমের পানি যেই নিয়তে পান করা হয় সেই নিয়ত হাছেল হয়।

অন্য হাদীছে আছে উহা পেট ভরার জন্য খাইলে পেট ভরে আর তৃষ্ণা নিবারনের জন্য খাইলে পিপাসা মিটে। উহা জিব্রাইলের খেদমত ইছমাইলের রাস্তা খেদমত অর্থ জিব্রাইলের চেষ্টায় উহা বাহির হয়।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ছুফিয়ান বিন উয়াইনার খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হুজুর জমজমের পানি যে নিয়তে খায় সেই নিয়ত পুরা হয় এই হাদীছ কি সত্য ? তিনি বলিলেন হাঁ সত্য। লোকটি বলিল আমি এই নিয়তে পান করিয়াছি যে আপনি আমাকে দুইশত হাদীছ শুনাইবেন। তিনি বলিলেন আচ্ছা বস। এই বলিয়া তিনি দুইশত হাদীছ শুনাইয়া দিলেন। হজরত ওমর জমজম পান করিতে বলেন ইয়া আল্লাহ্। আমি কেয়ামতের দিন পিপাসা নিবারণের জন্য পান করিতেছি। হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) বিদায় হজ্বের দিন জমজমের পানি খুব বেশী বেশী পান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমার দেখাদেখি সকলেই শুরু করিবে নচেৎ আমি বালতি ভরিয়া পান করিতাম। অন্যত্র আছে হুজুর উহার পানি চোখে দেন এবং মাথায় ঢালেন। হুজুর আরও বলেন আমাদের এবং মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হইল আমরা জমজমের পানি পেট ভরিয়া পান করি আর তাহারা সাধারণভাবে পান করে। হজরত আয়েশা জমজমের পানি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং বলিতেন হুজুরও উহা সঙ্গে নিয়া যাইতেন এবং রুগীদের উপর ছিট্‌কাইয়া দিতেন। তাহ্‌নীকের সময় (বাচ্চার মুখের প্রথম খাদ্য) হজরত হাছান হোছায়েনের মুখে জমজমের পানি দেওয়া হয়। মে'রাজের রাত্রে হজরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুরের ছিনা চাক করিয়া কলবকে জমজমের পানি দ্বারা ধুইয়াছিলেন। অথচ জিব্রাঈল বেহেশ্‌ত হইতে বোরাক তশ্‌তরী আরও কতকিছু আনিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে পানিও আনিতে পারিতেন। ইহা হইতে বড় ফজীলত আর কি হইতে পারে।

হজরত এবনে আব্বাছ বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) জমজমের পানি পান করিতে এই দোয়া পরিতেন।

اللهم انى اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء

অর্থাৎ হে খোদা ! আমি তোমার নিকট উপকারী এলেম, প্রশস্ত রিজিক ও যাবতীয় রোগ হইতে শেফা চাহিতেছি।

(১০) عن ابن عباس (رض) قال قال رسول الله ﷺ لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الى ولولا ان قومى اخرجونى منك ما سكنت غيرك - (ترمذى)

হুজুর (ছঃ) মক্কা শরীফকে লক্ষ্য করিয়া এরশাদ করেন, তুমি কতই না ভাল শহর এবং আমার নিকট কত প্রিয় শহর। আমার স্ববংশের লোকেরা যদি আমাকে বাহির না করিত তবে কিছুতেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র বসবাস করিতাম না।

এইসব হাদীছ অনুসারে এবং লক্ষ লক্ষ নেকীওয়ালা হাদীছ মোতাবেক বুজুর্গী হিসাবে সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শহর হইল মক্কা শরীফ, তবুও অনেক বুজুর্গান সেখানে বসবাস করাকে মাকরূহ বলিতেন। ইমাম মোহাম্মদ ও আবু ইউছুফ সেখানে থাকাকে মোস্তাহাব বলেন এবং ইহার উপর ফতুয়া। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও অনেকের মতে সেখানে থাকা মাকরূহ। কেননা যেমন সেখানে ছওয়াব বেশী তেমন পাপ করিলে বিপদের আশংকাও বেশী। বসবাস করিলে বে-আদবী বা গুনাহ হইয়া যাওয়া বা সেখানের কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া স্বাভাবিক। হাঁ আল্লাহ ওয়ালাদের জন্য স্বতন্ত্র কথা। তবে দরবেশীর মিথ্যা দাবীদার যারা, তারা হয়তঃ শর্ত সমুহ মানিয়া চলিতে পারিবে বলিয়া দাবী করিতে পারে। কিন্তু দাবী করা বড় আছান। কবি বলেন—

بهت مشکل هے بچنا بادۂ گلگوں سے خلوت میں
بهت اسان هے یاروں میں معاذ الله کهد ینا

অর্থাৎ: নির্জন স্থানে লাল রং এর শরাব হইতে সুন্দর নারী হইতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বন্ধু মহলে নাউজুবিল্লাহ বলা সহজ। মোল্লা আলী কারী বলেন ইমাম আবু হানীফা তানার জমানায় লোকদিগকে দেখিয়া মাকরূহ বলিয়াছিলেন। আর এই জমানার লোকদিগকে দেখিয়া হারাম বলিয়া ফতুয়া দিতেন।

এই মোল্লা আলী কারী ১০১৪ হিজরীতে এন্তেকাল করেন তখনকার জমানায় তিনি হারাম মন্তব্য করিয়াছেন আর আমাদের এই চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষের অবস্থা দেখিলে কি বলিতেন তা খোদাই জানেন।

মক্কা শরীফে থাকা মাকরূহ ইমাম গাজ্জালী উহার তিনটি কারণ লিখিয়াছেন। ১নং সেখানে থাকিলে মক্কা শরীফের জন্য যে একটা আগ্রহ শওক এবং অস্থিরতা তাহা হয়ত কমিয়া যাইবে। ২নং উহা হইতে বিদায়ের সময় যে একটা বিচ্ছেদের জ্বালা পোড়া এবং পুনরায় আসিবার জযবা পয়দা হয় সেটা সেখানে থাকিলে হয় না। এই জন্য কোন

কোন বুজুর্গ বলেন অনেক লোক খোরাছানে থাকিলেও তাহার সম্পর্ক বায়তুল্লার সহিত যে তাওয়াফ করিতে থাকে তাহার চেয়ে বেশী। আবার অনেক লোক ত এমনও আছে স্বয়ং বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য তাহাদের নিকট যায়। ৩নং মক্কায় থাকিয়া যদি গোনাহ হইয়া যায় তবে উহা বেশী ভয়ের কারণবশতঃ সেখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এমনি ত মক্কা শরীফের প্রতিটি স্থান এমন কি প্রতিটি ইট-পাথর এবং বালুকা পর্যন্ত বরকতওয়ালা তবে পুর্বে বর্ণিত বিশেষ স্থানসমূহ ব্যতীত বরকতের আরও কয়েকটি জায়গা রহিয়াছে। তন্মধ্যে আম্মাজান খাদীজাতুল কোবরার ঘর, যেখানে হজরত ফাতেমার জন্ম হয়। এবং ইব্রাহীম ব্যতীত হুজুরের বাকী সব আওলাদের জন্ম হয়। হিজরতের পুর্বে পর্যন্ত হুজুর সেখানে থাকেন। ওলামাগণ লিখিয়াছেন হারাম শরীফের পর সেইস্থান সবচেয়ে বেশী বুজুর্গ। তাছাড়া যেখানে স্বয়ং হুজুর জন্ম গ্রহণ করেন। তৃতীয় হজরত আবু বকরের বাড়ী যাহা স্বর্ণকারদের গলিতে অবস্থিত। উহাকে দারুল হিজরতও বলা হয়। হিজরতের পুর্বে প্রতিদিন হুজুর সেখানে গমন করিতেন। সেখানে দুইটা পাথর ছিল। একটা হুজুরকে ছালাম করিয়াছিল বশতঃ উহার নাম মোতাকালেম, দ্বিতীয় মোত্তাকী, যাহার উপর টেক্ লাগাইয়া হুজুর বসিতেন। তারপর হজরত আলীর জন্মস্থান, দারে আরকাম, যেখানে হজরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুছলমানের সংখ্যা চল্লিশ জনে পরিণত হয়। উহা ছাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। এখানেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

তারপর জাবালে ছুরের গুহা যেখানে হিজরতের সময় হুজুর এবং ছিদ্দীকে আকবর আত্মগোপন করেন। কোরান পাকে ঐ গুহার উল্লেখ আছে। হেরা পর্বতের গুহা, যেখানে হুজুর নির্জনে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং সর্বপ্রথম ছুরায়ে একরা অবতীর্ণ হয়। মসজিদুর রায়াত মসজিদুল জ্বিন, যেখানে জ্বিনদের এজতেমা হইয়াছিল। হুজুর আবদুল্লাহ বিন মাছউদকে সঙ্গে নিয়া এক জায়গায় বসাইয়া তাহাদের নিকট গিয়াছিলেন। মসজিদুস সাজরাহ্ যাহা মসজিদে জ্বিনের নিকট অবস্থিত। সেখানে একটি গাছ আছে। গাছটি হুজুরের ডাকে মাটি চিরিয়া আসিয়াছিল এবং পুনরায় আপন স্থানে চলিয়া যায়। মসজিদুল গনম যেখানে মক্কা বিজয়ের

দিন হুজুর বয়আত নিয়াছিলেন। মসজিদে আজইয়াদ, মসজিদে আবু কয়েছ, মসজিদে তুয়া, মসজিদে আয়েশা, যেখান হইতে ওমরার এহরাম বাঁধা হয়। মসজিদুল আকাবা, মিনার নিকট যেখানে হিজরতের পূর্বে আনছারগণ বয়আত করিয়াছিলেন। এই মসজিদ মক্কা হইতে মিনার দিকে যাইতে রাস্তার বাম পাশে একটু দূরে অবস্থিত। মসজিদুল জায়াব, যেখানে হুজুর মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ হইতে ফেরার পথে এহরাম বাঁধিয়াছিলেন। মসজিদুল কাবস, হযরত ইব্রাহীমের কোরবাণীর জায়গা। ইছমাইলকে এখানেই কোরবানী করা হয়। মসজিদুল খায়েক মিনার মধ্যে প্রসিদ্ধ মসজিদ, বলা হয় যে সেখানে সত্তর জন নবীর কবর আছে। গারে মোরছালাত, যেখানে ছূরায়ে মোরছালাত নাজেল হয়। জান্নাতুল মোয়াল্লা, মক্কা শরীফের কবরস্থান। সেখানে মা খাদীজার কবর রহিয়াছে।

এইসব ছাড়াও অনেক বরকতওয়ালা জায়গা আছে। আসল কথা হইল পবিত্র মক্কা ভূমিতে এমন কোন জায়গা আছে যেখানে আমার প্রিয় নবীজীর অথবা ছাহাবায়ে কেরামের কদম মোবারক পড়ে নাই ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ওমরার বয়ান

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সাথে সাথে যেমন নফল নামাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে যেন যে কোন মুহূর্তে আশেকীনগণ শাহেনশাহের দরবারে হাজীরা দিতে পারে। তদ্রূপ ফরজ হজ্ব ব্যতীত বৎসরের পাঁচ দিন ছাড়া (অর্থাৎ নয়ই জিলহজ্ব হইতে তেরই জিলহজ্ব পর্যন্ত) অন্য যে কোন দিন দরবারে হাজির হওয়ার জন্য ওমরার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা আল্লাহ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত। ইমাম আবু হানিফা এবং মালেক (রঃ) উহাকে কমপক্ষে জীবনে একবার (সামর্থ থাকিলে অথবা সেখানে পৌঁছিয়া গেলে) ছুন্নত বলিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী অথবা আহমদের নিকট ওয়াজেব। আবার কেহ কেহ উহাকে ফরজে কেফায়া বলিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন—

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

তোমরা খালেছ আল্লার জন্য হজ্ব এবং ওমরাকে পুরাপুরি ভাবে আদায় কর।

পুরাপুরির অর্থ হইল ঘর হইতে এহরাম বাঁধিয়া বাহির হওয়া।

কিন্তু ওলামাগণ লিখিয়াছেন মীকাত হইতে এহরাম বাঁধাই উত্তম। কেননা দীর্ঘদিন এহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকিলে এহরামের বিপরীত কার্যকলাপও প্রকাশ পাইয়া যায় আর ফজীলত লাভ করার চেয়ে গোনাহ হইতে বাঁচার মুল্য অনেক বেশী।

হুজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের পর মাত্র একবার হজ্ব করেন অথচ ওমরা করেন চারবার. তন্মধ্যে একটি কাফেরদের বাধা দেওয়ার দরুন পূর্ণ হয় নাই বাকী তিনটি পূর্ণ করিয়াছেন।

(১) عن عمرو بن عبسة (رض) قال قال رسول الله ص افضل الاعمال حجة مبرورة او عمرة مبرورة - (احمد)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নেকীওয়ালা হজ্ব অথবা নেকীওয়ালা ওমরা।

প্রথম পরিচ্ছেদের ২রা হাদীছে এই হাদীছের পূর্ণ অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছে আসিয়াছে ওমরা হইল ছোট হজ্ব। অর্থাৎ প্রায় হজ্বের মতই যাবতীয় ফাজায়েল এবং বরকত ইহাতে পাওয়া যায়।

হুজুর এরশাদ করেন এক ওমরা অন্য ওমরা পর্যন্ত মধ্যভাগের যাবতীয় গোনাহের জন্য কাফ্ফরা স্বরূপ।

(২) عن ابن عباس (رض) قال جاءت ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حج ابو طلحة وابنه وتركانى فقال يا ام سليم عمرة فى رمضان تعدل حجة معى - (ترغيب)

হজরত উম্মে ছোলায়েম হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিল. আমার স্বামী এবং তাহার ছেলে আমাকে একা ছাড়িয়া হজ্বে চলিয়া গিয়াছে হুজুর বলেন রমজান মাসে ওমরা করা আমার সহিত হজ্ব করার সমতুল্য।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে হুজুর যখন হজ্বে যাইতেছিলেন তখন জনৈক মহিলা আপন স্বামীকে বলিল আমাকে হুজুরের সহিত করাইয়া দাও। স্বামী বলিল আমার কাছে ত উট নাই স্ত্রী বলিল তোমার নিকট ত অমুক উট আছে। সে বলিল উহা আমি আল্লার রাস্তায় ওয়াক্ফ করিয়াছি। মেয়েলোকটি বাধ্য হইয়া রহিয়া গেল। হজ্ব হইতে ফিরিবার পর স্বামী হুজুরের নিকট পুরা ঘটনা শুনাইল। হুজুর বলিল হজ্বও ত আল্লার রাস্তা

ছিল। সে উটে করিয়া হজ্ব করিলে কোন অসুবিধা ছিল না। লোকটি বলিল আমার বিবি হুজুরের খেদমতে ছালাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে তখন কি উপায়ে হুজুরের সহিত হজ্ব করার ছওয়াব পাইতে পারে। তখন হুজুর বলেন তোমার স্ত্রীকে আমার ছালাম বলিয়া জানাইবে যে রমজান মাসে ওমরা করিলে আমার সহিত হজ্ব করার ছওয়াব পাইবে। (আবু দাউদ)

(৩) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله ص الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم - (مشكوة)

হুজুর এরশাদ করেন হজ্ব এবং ওমরা করনেওয়ালা আল্লাহ পাকের প্রতিনিধি। তাহারা দোয়া করিলে আল্লাহ পাক কবুল করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিলে গোনাহ্ মাফ করিয়া দেন।

অন্যত্র আছে তিন প্রকারের লোক আল্লাহর প্রতিনিধি। মোজাহেদ, হাজী, ওমরা করনেওয়ালা। যেইরূপ বাদশাদের দরবারে যে কোন দলের বা দেশের প্রতিনিধিদের সম্মান করা ঠিক তদ্রুপ পরওয়ারদেগারের দরবারেও ইহাদের সম্মান এবং একরাম করা হয়। অর্থাৎ তাদের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়। অন্যত্র হুজুর বলেন যাহার কুদরতি হাতে আমার জান সেই খোদার হুকুম। কোন ব্যক্তি যখন কোন উঁচু ভূমিতে লাব্বায়েক বলে তখন দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাহার সম্মুখের জমীন লাব্বায়েক ও তাকবীর বলিতে আরম্ভ করে। হুজুর আরও বলেন ইহাদের এক এক দেরহাম খরচের বদলে দশ দশ লক্ষ দেরহাম দেওয়া হয়। একটি রেওয়াতে আছে মক্কার লোক যদি জানিত তাহাদের উপর হাজীদের কতটুকু হক আছে তবে তাহারা হাজীদের আগমনে তাহাদের ছওয়ারীকে পর্যন্ত চুম্বন করিত।

(৪) عن ابن مسعود (رض) قال قال رسول الله ص تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة - (رواه الترمذى

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন পর পর হজ্ব এবং ওমরা করিতে থাক কেননা এই উভয় আমল গরীবী এবং গোনাহসমূহকে এমনভাবে দূর করিয়া দেয় যেমন আগুনের ভাট্টি লোহা এবং স্বর্ণ চাঁদীর ময়লাকে পরিষ্কার করিয়া দেয়।

পরপর অর্থ হজ্ব ওমরা একত্রে করা বা হজ্ব করিয়া ওমরা করা ওমরা করিয়া হজ্ব করা। হজ্ব ওমরা এক এহরামে একত্রে আদায় করাকে হজ্বে কেরান বলে। হানাফী মজহাবে তিন প্রকার হজ্বের মধ্যে উহাই উত্তম। কেননা হুজুর (ছঃ) হজ্ব এবং ওমরা একই এহরামে আদায় করিয়াছেন।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে হজ্ব ওমরা পরপর আদায় করিলে হায়াত বৃদ্ধি পায় ও রুজীতে বরকত হয়। ইমাম নববী লেখেন বেশী বেশী করিয়া ওমরা করা মোস্তাহাব এবং তৌফিক থাকিলে প্রতিমাসে একবার ওমরা করা চাই।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েলোকের জন্য কি জেহাদ আছে? হুজুর বলেন আছে তবে উহাতে কাটাকাটি মারামারি নাই উহা হইল হজ্ব এবং ওমরা। জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন হুজুর! শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস আমার হয় না, আমি কি করি? হুজুর বলেন তোমাকে এমন জেহাদ শিখাইতেছি যেখানে লড়াই নাই। তাহা হইল হজ্ব এবং ওমরা করা।

(৫) عن ام سلمة ان رسول الله ص قال من اهل بعمرة من بيت المقدس غفرله - (ابن ماجه)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাছ হইতে ওমরার নিয়ত করিয়া আসিয়াছে তাহার গোনাহ মাফ।

উম্মে হাকীম নামক তাবেয়ী মেয়েলোক উম্মে ছালামার নিকট এই হাদীছ শুনিয়া শুধু এহরাম বাঁধিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাছ যান সেখান হইতে এহরাম বাঁধিয়া আসিয়া ওমরা আদায় করেন।

ইহাই ছিল হাদীছের মর্য্যাদা। ছাহাবারা হাদীছ শুনিবা মাত্র নিজের শক্তি সামর্থ অনুসারে উহার উপর আমল করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জিয়ারতে মদীনা

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ফকীহ হানাফী হজরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) লিখিয়াছেন কয়েক লোক ব্যতীত সারা বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত অভিমত হইল যে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুণ্য কাজ এবং এবাদাত, তদুপরি উহা কামিয়াবীর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছাইবার

একটি আছিলা। যেই ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হুজুরের মাজার মোবারকে আসিল না সে নিজের নফছের উপর বড় জুলুম করিল। চার মজহাবের ওলামায়ে কেরাম এই বিষয়ে একমত যে হুজুরের কবর জিয়ারতের এরাদা করা মোস্তাহাব, কেহ কেহ উহাকে ওয়াজেবও লিখিয়াছেন। হজরত এবনে ওমর হইতে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি হজ্ব সম্পাদন করিয়া আমার কবর জিয়ারত করিল সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার সহিত মোলাকাত করিল। অন্য হাদীছে আছে তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজেব হইয়া গেল। রেওয়ায়েতে আছে হুজুর বলেন যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে ছালাম করিল আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি। শরহে কবীরে লিখিত আছে হজ্ব করার পর হুজুর এবং হুজুরের দুই সাথী হজরত আবু বকর এবং হজরত ওমর (রাঃ)-এর জিয়ারতের জন্য যাওয়া মোস্তাহাব।

(১) عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله ص من زار قبری وجبت له شفاعتی - (دارقطنی)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি আমার জিয়ারত করিল তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইয়া গেল।

(২) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءنی زائرا لا یهمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا - (طبرانی)

হুজুর এরশাদ করেন যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আমার জিয়ারতের জন্য আসিল ইহাতে তাহার অন্য কোন নিয়ত ছিল না তাহার জন্য সুপারিশ করা আমার জন্য জরুরী হইয়া গেল।

দুনিয়ার বুকে এমন কে আছে যাহার জন্য হাশর ময়দানের মহা সংকটের দিন আমার প্রিয় নবীর সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না, আর কত বড় ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যার জন্য সেই দয়াল নবী সুপারিশের জিম্মাদারী নিতেছেন।

আল্লামা জরকানী লিখিতেছেন। এখানে সুপারিশের অর্থ হইল খুচুচী সুপারিশ। বেহেশতেই সম্মান বৃদ্ধির জন্য বা কঠিন সংকটে নিরাপত্তার জন্য অথবা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের জন্য।

এবনে হাজার মক্কী বলেন হুজুরের জিয়ারতের সহিত মসজিদে নব্বীতে এতেকাফের নিয়ত, ছাহাবাকে জিয়ারতের নিয়ত এমন কি মসজিদে নব্বীর জিয়ারতের নিয়ত করা হুজুরের জিয়ারতের পরিপন্থী নয়। হানাফী মজহাবের বিখ্যাত ইমাম এবনে হামাম বলেন হাদীছের মর্মানুসারে শুধু কবর মোবারকের নিয়তই হওয়া উচিত। মোল্লা জামী (রঃ) এক সময় শুধু জিয়ারতের নিয়তে ছফর করেন, উহাতে হজ্বকেও শামিল করেন নাই। মহব্বত ইহাকেই বলে।

(৩) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله ص من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي - (بيهقى طبراني)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন আমার মৃত্যুর পর যে আমার জিয়ারত করিল সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার সহিত জিয়ারত করিল।

হাদীছের অর্থ এই নয় যে সে ছাহাবী হইয়া যাইবে বরং উদ্দেশ্য হইল আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জীবিত আছেন, ব্যাপারটি এমন হইল যেমন কোন ব্যক্তি নবী ছাহেবের ঘরের দরজায় পৌঁছিয়া বাহিরে দাড়াইয়াই সাক্ষাত করিয়া আসিল।

মদীনায়ে মোনাওয়ারা হজ্বের আগে যাইবে না পরে যাইবে

মদীনা শরীফ হজ্বের আগে যাওয়া উচিত না পরে ইহাতে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এবনে হাজার লিখিয়াছেন অধিকাংস মাশায়েখের মত হইল হজ্ব প্রথমে করিতে হয়। তবে যদি এই কথা পরিষ্কার জানা থাকে যে তাড়াহুড়া না করিয়া জিয়ারত শান্তভাবে করিয়া ধীরেস্থীরভাবে হজ্ব করা যায় তবে জিয়ারত আগে করাই ভাল। মোল্লা আলী কারী লিখিয়াছেন ফরজ হজ্ব হইলে হজ্ব আগে আদায় করিবে। কিন্তু শর্ত হইল মদীনা শরীফ পথে না হওয়া চাই। কারণ উহা পথে পাড়লে হুজুরের জিয়ারত ব্যতীত সম্মুখে অগ্রসর হওয়া বড় অন্যায়ের কথা। তবে হজ্বের সময় সূচীতে যেন কোন ব্যাঘাত না হয়। আর যদি হজ্ব নফল হয় তবে ইচ্ছা, জিয়ারত আগেও করা যায় এবং পরেও করা যায়। তবে উত্তম হইল হজ্ব আগে করা, যেহেতু ঐ ছুরতে গোনাহ হইতে পাক-ছাফ হইয়া নবীজীর দরবারে হাজির হওয়া যায়।

(৪) عن رجل من ال الخطاب عن النبي ص قال من زارني

متعمدا كان فى جوارى يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات فى احد الحرمين بعثه الله من الامنين - (بيهقى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া আমার জিয়ারত করিবে কেয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশী হইবে আর যে মদীনা শরীফে বসবাস করিয়া ওখানের দুঃখ-কষ্টের উপর ছবর করিবে তাহার জন্য কেয়ামতের দিন আমি সাক্ষী থাকিব এবং সুপারিশ করিব। আর যেই ব্যক্তি হারামে মক্কা অথবা হারামে মদীনায় মারা যাইবে সে কেয়ামতের দিন নিশ্চিন্ত থাকিবে। (বয়হকী)

(৭) عن ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى -

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি হজ্ব করিল আর আমার জিয়ারত করিল না, সে আমার উপর জুলুম করিল। বাস্তবিকই হুজুর (ছঃ)–এর উম্মতের উপর যে অপরিসীম দয়া ও এহছান উহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ক্ষমতা থাকা সত্বেও যদি কোন উম্মত দরবারে হাজির না হইল তবে এর চেয়ে জুলুমের কথা আর কি হইতে পারে।

(৮) عن انس رض قال لما خرج رسول الله ص من مكة اظلم منها كل شيء ولما دخل المدينة اضاء منها كل شيء فقال رسول الله ص المدينة بها قبرى وبها بيتى وتربتى وحق على كل مسلم زيارتها - (ابو داؤد)

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) যখন হিজরতের সময় মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন তখন মক্কার যাবতীয় বস্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, আর যখন মদীনা পৌঁছিলেন তখন সেখানের যাবতীয় বস্তু আলোকিত হইয়া গিয়াছিল। হুজুর এরশাদ করেন মদীনা আমার ঘর সেখানে আমার কবর হইবে এবং মদীনার জিয়ারত করা প্রত্যেক মুছলমানের উপর জরুরী।

সেই পবিত্র ভূমির জিয়ারত প্রত্যেকের জন্য জরুরী। আর ঐ সব মুছলমান কতই না ভাগ্যবান যাহারা সেই প্রিয় নবীর প্রিয়তম শহরে

বসবাস করে।

(৭) عن انس رض قال قال رسول الله ص من زارنی فی المدینة محتسبا کان فی جواری وکنت له شفیعا یوم القیامة - (بیهقی)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি মদীনায়ে মোনাওয়ারা আসিয়া ছওয়াবের নিয়তে আমার জিয়ারত করিল সে আমার প্রতিবেশী হইবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

এখানে হাদীছের শব্দ জাওয়ার যদি জীমের উপর পেশ দিয়া জোয়ার হয় তবে অর্থ হইবে সেই ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়া যাইবে। সেই মহাসংকটের দিন, যে ব্যক্তি হুজুরের আশ্রয়ে আসিবে তাহার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে হইতে পারে।

(৮) عن ابن عباس من حج الی مکة ثم قصدنی فی مسجدی کتب له حجتان مبرورتان - (اخرج الدیلمی)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি হজ্বের জন্য মক্কা শরীফ যাইবে অতঃপর আমার এরাদা করিয়া আমার মসজিদে আগমন করিবে তাহার জন্য দুইটা মাবরুল হজ্বের ছওয়াব লেখা হইবে।

(৯) عن ابی هریرة ان النبی صلی الله علیه وسلم قال ما من احد یسلم علی عند قبری الارد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام - (رواه احمد)

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন কোন ব্যক্তি যখন আমার কবরের পাশে আসিয়া আমার উপর ছালাম পড়ে তখন আল্লাহ পাক আমার মধ্যে রূহ আনিয়া দেন এবং আমি তাহার ছালামের উত্তর দিয়া থাকি।

এবনে হাজার শরহে মানাছেকের মধ্যে লিখিয়াছেন আমার রূহ আমার মধ্যে আনার অর্থ হইল আমার মধ্যে কথা বলিবার শক্তি দান করেন। কাজী এয়াজ বলেন হুজুরের রূহ মোবারক আল্লার দরবারে এবং দীদারে ডুবিয়া থাকে, কেহ ছালাম করিলে উত্তর দেওয়ার চেতনে আসিয়া যায়।

(১০) وقال ابن ابی فدیك سمعت بعض من ادركت یقول بلغنا انه من وقف عند قبر النبی ص فتلا هذه الایة

ان الله وملائكته يصلون على النبى ثم يقول صلى الله عليك يا محمد من يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ولم تسقط له حاجة -

বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি হুজুরের কবরের পাশে দাঁড়াইয়া এই আয়াত পড়িবে ইন্নাল্লাহা অ-মালায়েকাতাহু……তারপর সত্তর বার "ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মোহাম্মাদু" বলিবে তখন একজন ফেরেশতা বলে—হে লোকটি ঃ তোমার উপর আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করিতেছেন। এবং তাহার সমস্ত হাজত পুরা করিয়া দেওয়া হয়।

মোল্লা আলী কারী বলিয়াছেন, 'ইয়া মোহাম্মাদু' পড়া ভাল না ইয়া রাছুলুল্লাহ পড়া বেশী ভাল। আল্লামা জরকানী বলেন হুজুরের নাম নিয়া ডাকা নিষেধ আসিয়াছে তাই ইয়া মোহাম্মাদ'র পরিবর্তে ইয়া রাছুলুল্লাহ পড়া উত্তম। তবে সব দোয়া-দুরূদ নামসহ বর্ণিত আছে ঐগুলিতে নাম লইলে কোন দোষ নাই। হজরত শায়েখ বলেন এই নাপাক অধমের খেয়ালে তোতার মত মানি মতলব না জানিয়া পড়ার চেয়ে সত্তর বার আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ পড়া সবচেয়ে উত্তম। আল্লামা জরকানী বলেন সত্তর বারের বিশেষত্ব এইজন্য যে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য এই সংখ্যাটির একটা বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কোরান শরীফে আল্লাহ পাক মোনাফেকদের শানে ফরমাইয়াছেন, "হে নবী আপনি যদি তাহাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা চাহেন তবুও আল্লাহ পাক তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।"

(১১) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص من صلى على عند قبرى سمعة ومن صلى على نائيا كفى امر دنياه واخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة - (بيهقى)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়া থাকি। আর যে দূর হইতে আমার উপর দরূদ পড়ে আল্লাহ পাক দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় প্রয়োজন তাহার মিটাইয়া দেন। এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী দিব তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে আমার নিকট ছালাম পৌছাইয়া থাকে। ছোলায়মান বিন ছোহায়েম বলেন আমি হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে জিয়ারত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ ! যাহারা খেদমতে হাজির হইয়া ছালাম করে তাহাদের বিষয় আপনার কি এলেম হইয়া থাকে ? হুজুর বলেন হাঁ আমি তাহাদিগকে জানি এবং তাহাদের ছালামের জওয়াবও দিয়া থাকি।

(১২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله ص لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساجد - المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجدى هذا - (متفق عليه)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন দিকে ছফর করিবে না, হারাম শরীফের মসজিদ, মসজিদে আকছা এবং আমার এই মসজিদ। (বোখারী)

কিছু সংখ্যক ওলামা এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে রওজায়ে পাকের নিয়তে ছফর করাও নিষেধ, যাইতে হইবে মসজিদে নববীর নিয়তে। অবশ্য সেখানে পৌছিলে রওজায়ে পাকের জিয়ারত করিতে কোন অসুবিধা নাই। তবে সম্মিলিত ওলামায়ে কেরামের অভিমত হইল যে, শুধু নিয়ত করিয়া কোন মসজিদের ছফর করিতে হইলে এই তিন মসজিদ ব্যতীত মসজিদের নিয়ত করিয়া যাওয়া না জায়েজ হাঁ ইহার অর্থ এই নয় যে অন্য তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন ছফর নাজায়েজ। বরং হাদীছে বর্ণিত আছে আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন আবার অনুমতি দিতেছি জিয়ারত করিতে পার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আম্বিয়ায়ে ও আওলিয়ায়ে কেরামের মাজারে জিয়ারতের জন্য যাওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ। তদুপরি বিভিন্ন সূত্রে জেহাদের ছফর, তলবে এলেমে'র ছফর, হিজরতের ছফর, ব্যবসায়ের জন্য ছফর, তাবলীগী ছফর ইত্যাদির জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

শায়েখ অলি উদ্দিন এরাকী বলেন যে আমার পিতা জয়নুদ্দিন এরাকী এবং শায়েখ আবদুর রহমান এবনে রজব হাম্বলী হজরত ইব্রাহীম খলিলের জিয়ারতে চলিয়াছিলেন। যখন শহরের নিকটবর্তী হইলেন তখন এবনে রজব বলিতে লাগিলেন আমি খলিলুল্লার মসজিদে নামাজ পড়িবার নিয়ত

করিয়া লইলাম, যেন জিয়ারতের নিয়ত না থাকে। আমার পিতা বলিলেন আপনিত হুজুরের এরশাদের বিপরীত করিলেন, হুজুর ফরাইয়াছেন তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের জন্য ছফর করা যায় না। অথচ আপনি চতুর্থ এক মসজিদের নিয়ত করিয়া ফেলিলেন। আর আমি হুজুরের এরশাদের উপর আমল করিয়াছি হুজুর এরশাদ করেন তোমরা কবর জিয়ারত করিতে থাকিবে। এমন কোন হাদীছ নাই যে যাহাতে নবীদের কবরকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আমি হুজুরের এরশাদ মোতাবেক আমল করিয়াছি। (জরকানী) ছাহাবা এবং তাবেয়ীনের কবর জিয়ারতের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

(১) আল্লামা শিবলী লিখিয়াছেন, শিরিয়া হইতে মদীনা পর্যন্ত জিয়ারতের জন্য হজরত বেলালের ছফর মজবুত দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে রেওয়ায়েত আছে বায়তুল মোকাদ্দাছ বিজয়ের পর হজরত বেলাল (রাঃ) হজরত ওমরের নিকট অনুমতি চাহিলেন যে আমাকে এখানে থাকিতে দেওয়া হউক। আসল কথা হুজুরের এন্তেকালের পর মদীনায় অবস্থান করা ও হুজুরের স্থান শূন্য দেখা তাঁহার জন্য অসহ্য হইয়া গিয়াছিল। হজরত ওমর অনুমতি দিলেন ও সেখানে তিনি বিয়েশাদী করেন। একদিন তিনি স্বপ্ন যোগে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন। হুজুর (ছঃ) তাঁহাকে বলিলেন হে বেলাল। ইহা কত বড় জুলুমের কথা যে তুমি একবারও আমার নিকট আসিতেছে না। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই তিনি মদীনায়ে মোনাওয়ারা রওয়ানা হইয়া আসিলেন, হুজুরের কলিজার টুকরা হজরত হাছান এবং হোছায়েন তাঁহাকে আজান দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, নবীজীর আদরের দুলাল নাতিদ্বয়ের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি আজান দিতে আরম্ভ করিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বহু বৎসর পর হুজুরের জমানার আজানের শব্দ শুনিবা মাত্র সারা মদীনায় এক মর্মস্পর্শী শোকের রোল পড়িয়া গেল। এমন কি আনছার ও মোহাজেরদের পর্দানশীন মেয়েলোকগণ পর্যন্ত ক্রন্দন করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এখানে স্বপ্ন দ্বারা জিয়ারতের কোন প্রমাণ লওয়া হয় নাই বরং হজরত বেলালের ছফরের দ্বারা লওয়া হইয়াছে।

(২) হজরত ওমর বিন আবদুল আজীজ সামদেশ হইতে উট ছওয়ার শুধু রওজায়ে পাকে তাঁহার ছালাম জানাইবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন

(৩) ইহুদীদের বিখ্যাত পণ্ডিত হজরত কা'বে আহবার যখন ইছলাম গ্রহণ করেন তখন আনন্দিত হইয়া হজরত ওমর তাঁহাকে হুজুরের কবর জিয়ারতের জন্য মদীনায় আসিতে বলেন। সে উহা কবুল করিয়া মদীনায় আসিয়াছিল।

(৪) মোহাম্মদ বিন ওবায়হুল্লাহিল আতাবী বলেন আমি হুজুরের রওজায়ে আকদাছে হাজির হওয়ার পর একদিকে বসিয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে একজন উট ছওয়ার বেদুইনের মত ছুরত হাজির হইল ও আরজ করিল, হে সর্বশ্রেষ্ঠ রাছুল। আল্লাহপাক আপনার উপর কোরান শরীফ নাজেল করিয়া ফরমাইয়াছেন—

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

"যদি ইহারা যাহারা আপন নফছের উপর জুলুম করিয়াছে আপনার নিকট আসিত এবং আল্লার নিকট আপন গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত এবং রাছুলুল্লাহ ও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেন তবে তাহারা নিশ্চয় আল্লাহকে তওবা কবুলকারী এবং অতিশয় মেহেরবান পাইত।"

হে আল্লার রাছুল। আমি আপনার খেদমতে হাজির হইয়াছি এবং আল্লাহতায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এই ব্যাপারে আমি আপনার সুপারিশের প্রত্যাশা করিতেছি। এই বলিয়া সেই বেদুইন খুব কাঁদিতে লাগিল এবং এই বয়াত পড়িতে লাগিল।

يا خير من دفنت بالقاع اعظمه
فطاب من طيبهن القاع والاكم

হে সর্বশ্রেষ্ঠ জাত! ঐসব লোকের মধ্যে যাহাদের হাড়সমূহ সমতল ভূমিতে দাফন করা হইয়াছে যদ্দারা জমীন এবং টিলাসমুহের সৌরভ ছড়াইয়া গিয়াছে।

نفسي الفداء لقبر انت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم

"আমার প্রাণ উৎসর্গ ঐ কবরের উপর যেখানে আপনি শায়িত আছেন যেখানে রহিয়াছে পবিত্রতা, যেখানে রহিয়াছে দান এবং বখশিশ।

তারপর লোকটি এস্তেগফার করিয়া চলিয়া গেল। আতাবী বলেন

আমার একটু চক্ষু লাগিয়া গেল এবং আমি স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলাম। হুজুর আমাকে বলিলেন। যাও সেই বন্ধুকে বল যে আমার সুপারিশে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিয়াছেন। আল্লামা নববী সেই লোকটার পড়া আরও দুইটি বয়াত বর্ণনা করেন—

انت الشفيع الذى ترجى شفاعته
على الصراط اذا ما زلت القدم

"আপনি এমন সুপারিশ করনেওয়ালা যাঁহার সুপারিশের আমরা ঐ সময় আশা রাখি যখন পুলছেরাতের উপর মানুষের পদস্খলন হইতে থাকিবে।"

وما حبابك لا انساهما ابدا
منى السلام عليكم ما جرى القلم

"এবং আমি আপনার দুই সাথীদিগকে ত কখনও ভুলিতে পারিব না।

আমার তরফ হইতে আপনাদের উপর পর্যন্ত ছালাম বর্ষিত হউক যতদিন পর্যন্ত লিখিবার জন্য কলম চলিতে থাকিবে।"

নবম পরিচ্ছেদ

রওজায়ে পাক জিয়ারত করিবার আদব

উর্দু ফারসি ভাষায় আজ পর্যন্ত যত কিতাব হজ্ব সম্পর্কে লেখা হইয়াছে উহার প্রত্যেকটাতেই রওজায়ে মোবারকে হাজির হওয়া এবং জিয়ারতের আদবসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফকীহ এছহাকবিন ইব্রাহীম লিখিয়াছেন: ইছলামের প্রাথমিক যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ক্রমাগত এই ধারা চলিয়া আসিতেছে যে, যেই ব্যক্তিই হজ্ব করিবে সেই ব্যক্তি মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হয় এবং মসজিদে নব্বীতে নামাজ পড়ে ও রওজায়ে পাক জিয়ারত করিয়া বরকত হাছেল করে। রওজা এবং মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান এবং হুজুর (ছঃ) যেখানে বসিয়াছেন হাত লাগাইয়াছেন ইত্যাদি স্থান হইতে বরকত হাসিল করে। মোল্লা কারী লিখিয়াছেন এইসব বিষয়ের মধ্যে একমাত্র রওজার জিয়ারতই আসল নিয়ত হওয়া উচিত বাকী অন্যান্য জিনিষের আনুসাঙ্গিক নিয়ত হওয়া উচিত। ছাহাবায়ে কেরামের জমানা হইতে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুছলমান যদি

রওজায়ে পাকের জিয়ারতের জন্য না গিয়া শুধু মসজিদে নববীর নিয়তে যাইত তবে বায়তুল মোকাদ্দাছের জিয়ারতের জন্য" কমপক্ষে তার দশ ভাগের এক ভাগও যাইত। কেননা মনোনীত তিন মসজিদের মধ্যে উহাও ত একটি মসজিদ। হাম্বলী মাজহাবের দলীলুত্তালেব কিতাবে রওজা শরীফের জিয়ারতকে ছুন্নত এবং মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াকে মোস্তাহাব বলা হইয়াছে। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জিয়ারতের সময় আদাব এবং আদাবের তরীকা বয়ান করা যাইতেছে।

محبت تجھکو اداب محبت خود سکھا دیگی

"মহব্বত স্বয়ং তোমাকে মহব্বতের তরীকা শিখাইয়া দিবে।"

(১) হজ্ব প্রথমে করা ভাল না জিয়ারত প্রথমে করা ভাল ইহার বিস্তারিত বর্ণনা অষ্টম পরিচ্ছেদের তৃতীয় হাদীছে করা হইয়াছে।

(২) যখন জিয়ারতের এরাদা করিবে তখন নিয়ত কি করিতে হইবে ইহাতে মতভেদ আছে। অনেকের মতে রওজায়ে পাকের নিয়তের সাথে সাথে মসজিদের নিয়তও লইবে। ইহাতে কোন প্রকার প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। শায়েখ এবনে হুমাম ফতহুলকাদীরে লিখিয়াছেন, শুধুমাত্র হুজুরের জিয়ারতের নিয়তই হওয়া চাই, ইহাতে হুজুরের একরামও বেশী করা হইল এবং "আমার জিয়ারত ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।" এই হাদীছের উপরও আমল করা হইল। হাঁ পরে আবার কোন সময় আল্লাহ পাক তৌফিক দান করিলে কবর শরীফের সাথে সাথে মসজিদের জিয়ারতের নিয়তও করিয়া লইবে। কুতুবে আলম হজরত গঙ্গুহী (রঃ) এর ইহাই অভিমত।

(৩) যখন জিয়ারতের নিয়তে ছফর করিবে চাই কবর শরীফের জিয়ারত হউক বা মসজিদের জিয়ারত ছফর হউক তখন খালেছ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়ত করিয়া লইবে। কোন প্রকার রিয়া, অহংকার, নেকনামীর খেয়াল বিলাশ ভ্রমণ বা দুনিয়াবী অন্য কোন উদ্দেশ্য ঘূণাক্ষরেও যেন না থাকে। অথবা লোকে বলিবে যে কৃপণতা বশতঃ মদীনা যায় নাই। এইসব অনর্থক ধ্যান-ধারণা অন্তরে আসিলে নিজের সমস্ত পরিশ্রম ফাও হইয়া যাইবে এবং যাবতীয় অর্থ ব্যয় বৃথা নষ্ট হইবে।

(৪) মোল্লা আলী কারী বলেন নিয়ত খালেছ হওয়ার চিহ্ন হইল ফরজ এবং ছুন্নতসমূহ যথারীতি আদায় হওয়া। উহাতে ত্রুটি হইলে মনে

করিতে হইবে যে জিয়ারতের দ্বারা জান এবং মালের নোকছান ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই। বরং তওবা কাফফারা আদায় করা জরুরী হইয়া গেল। আমার খেয়ালে যদি ছফরের হালতে ছুন্নতের হুকুমে কিছুটা হাল্কা হইয়া যায় তবুও মদীনায়ে পাকের ছফরে খুব গুরুত্বসহকারে ছুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যথাসম্ভব তালাশ করিয়া হুজুরের আমল এবং আদতসমুহের তাবেদারী করার চেষ্টা করিলে শান মোতাবেক ছফর হইবে।

(৫) এই ছফরে নেহায়েত ধ্যানের সহিত দরূদ শরীফ খুব বেশী বেশী করিয়া পড়িবে। মোল্লা আলী কারী বলেন এই ছফরে ফরজ এবং জীবিকার প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া বাকী সব সময় দরূদ শরীফ পড়িয়া কাটাইবে। এমন কি এবনে হাজার লিখিয়াছেন এই ছফরে দরূদ শরীফ পাঠ করা কোরান তেলাওয়াতের চেয়েও বেশী ছওয়াব। কেননা উহা একটি সাময়িক অজিফা। হাঁ স্বাভাবিকভাবে কোরান তেলাওয়াত হইল শ্রেষ্ঠ নফল এবাদত। কিন্তু যেখানে যেখানে খাছ খাছ অজিফার হুকুম আসিয়াছে, সেখানে সেখানে তেলাওয়াতের চেয়ে ঐ সব অজিফা পড়া উত্তম। যেমন রুকু ছেজদায় ভিন্ন ভিন্ন তাছবীহ পড়ার হুকুম আসিয়াছে। উহাতে যদি কেহ তেলাওয়াত করিল তবে মাকরূহ কাজ করিল।

(৬) মনের আবেগ ও আগ্রহ বর্দ্ধিত করিবে এবং যতই প্রিয়তম মাহবুবের শহর নিকটবর্তী হইবে ততই আবেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে

وعدۂ وصل چوں شود نزدیک
آتش شوق تیز تر گردد

মিলনের ওয়াদা যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে আবেগের অগ্নি ততই প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে। কখনও কখনও অধিক আগ্রহের জন্য আবেগ-জনিত কণ্ঠে আমার প্রিয় নবীর প্রশংসামূলক "না'ত" কবিতা পাঠ করিতে থাকিবে।

(ক) ইহা খাকছার অনুবাদকের পক্ষ হইতে—
যেমন পড়িবে—

نصیبہ کا سکندر ہے وہی اس دار فانی میں
مدینہ کی زیارت ہو جسے اس زندگانی میں
دکھا دے یا الٰہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے
جہاں پر رات دن مولیٰ تری رحمت برستی ہے

کئی بود یا رب کہ رود ریثرب و بطحا کنم
گہ بمکہ منزل و گہ د رمد ینہ جا کنم
برد رباب السلام ایم وگریم زارزا رؔ
گہ بباب جبرا ئیل ا زشوق وا ویلا کنم
گرد صحرا ئے مد ینہ بو یئت ا مد یا رسول
جا ن خود را من فد ا ئے خا ک ا نصحرا کنم

তা-ছাড়া সম্ভব হইলে হুজুরে পাক (ছঃ) এর কোন জীবনী পড়িয়া লইবে অথবা শুনিয়া লইবে। আপোষের মেলামেশার মজলিসে হুজুরের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের আলাপ আলোচনা করিতে থাকিবে। এবং যতই মদীনায়ে পাক ঘনাইয়া আসিবে ততই খুশী এবং উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে।

(৭) পথিমধ্যে যেখানে যেখানে হুজুরে আকরাম অথবা ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থান অথবা নামাজ পড়া জানা থাকিবে সেইসব জায়গার জিয়ারত এবং নামাজ, তেলাওয়াত, জিকির ইত্যাদি আদায় করিবে। এইভাবে রাস্তায় যেইসব কুপের পানি বরকতের বলিয়া কিতাবে প্রমাণিত ঐসব কূপের জিয়ারত করিয়া যাইবে। ঐসবের মধ্যে জুল হোলায়ফার নিকটবর্তী মোয়াররাছ নামক স্থানে নামাজ পড়া শাফেয়ী মজহাবে ছুন্নতে মোয়াক্কাদা বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ উহাকে ওয়াজেবও বলিয়াছেন। (শরহে মানাছেকে নববী)

(৮) যখন মদীনায়ে তাইয়্যেবা একেবারে নিকটে আসিয়া যাইবে তখন শরীর জওক শওক এবং অধিক আগ্রহ ও আবেগের মধ্যে ডুবিয়া যাইবে। বারংবার বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাকিবে। এবং গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি ছওয়ারীকে খুব দ্রুত চালাইতে থাকিবে। হাদীছে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) যখন ছফর হইতে তাশরীফ আনিতেন এবং মদীনার নিকটবর্তী হইতেন তখন ছওয়ারীকে খুব দ্রুত চালাইতেন।

وا برح ما یکون الشوق یوما
اذا د نت الخیام الی الخیام

"সবচেয়ে অধিক আগ্রহ এবং আবেগ ঐদিন হইয়া থাকে। যেইদিন প্রেমিকের তাঁবুর নিকটবর্তী হইয়া যায়।"

(৯) যখন মাহবুবের শহর মদীনায়ে মোনাওয়ারা দৃষ্টিগোচর হইবে এবং উহার সুগন্ধিযুক্ত বাগানসমূহ নজরে আসিবে যাহা বী'রে আলীর পর হইতে দেখা যাইতে থাকে তখন উত্তম হইল ছওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িবে এবং খালী পায়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে থাকিবে

ولما رأينا رسم من لم يدع لنا
فوا دا لعرفان الرسوم ولا لبا
نزلنا عن الاكوار منشى كرامة
لمن بان عنه ان نلم به ركبا

"যখন আমরা সেই মাহবুবের শহরের নিশানসমূহ দেখিলাম, যেইসব নিশান চিনিবার জন্য না আমাদের নিকট সেই অন্তর আছে না কোন বিবেক বুদ্ধি আছে। তখন আমরা আপন ছওয়ারী হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং উহার সম্মানে পায়দল চলিলাম কেননা মাহবুবের দরবারে ছওয়ার হইয়া যাওয়া মাহবুবের শানের পরিপন্থী. কথিত আছে যে আগের জমানার আমীর কবীর ও রাজা বাদশাহগণ ছয় মাইল দূরবর্তী জুল হোলায়ফা হইতে পদব্রজে গমন করিতেন। বাস্তবিক এই পায়ের বদলে যদি মাথা মাটির দিকে রাখিয়াও হাঁটা যায় তবুও সেই পূর্ণ বিন্দুমাত্র হক ও আদায় হইবে না।"

لو جئتكم قا صدا اسعى على بصرى
لم اقض حقا واى الحق اديت

"আমি যদি তোমার খেদমতে পায়ের পরিবর্তে চক্ষুর সাহায্যে হাঁটিয়া আসিতাম তবুও আমি তোমার হক আদায় করিতে পারিব না।"

হে মাহবুব মনিব! আমি যাহা করিতেছি তাহাতে তোমার হক কতটুকুই বা আদায় করিতেছি।

ولما راينا من رجوع حبيبنا
بطيبة اعلاما اثرن لنا الحبا
وبالترب منها اذا كحلنا جفوننا
شفينا فلا باسا نخاف ولا كربا

"যখন মদীনায়ে মোনাওয়ারায় মাহবুবের মঞ্জিলের চিহ্নসমূহ নজরে পড়িল তখন সেইগুলি অন্তরের ভালবাসাকে উত্তেজিত করিয়া এবং যখন সেখানের মাটি চক্ষুতে সুরমা স্বরূপ ব্যবহার করিলাম তখন চক্ষুর যাবতীয়

রোগ দূর হইয়া গেল। এখন কোন প্রকার রোগও নাই আর কষ্টও নাই।"

(১০) হজরত কোজ্রায়েল এবং নেওয়াজ (রঃ) মদীনায়ে পাকে পৌঁছিয়া দরূদ শরীফের পর এই দোয়া পড়েন—

اللهم هذا حرم نبيك فا جعله لى و قا يةمن النار وا ما نا من العذاب و سوء الحساب ـ

"হে খোদা! এইত তোমার মাহবুবের হারাম আসিয়া গেল, উহাকে তুমি আমার জন্য আগুন এবং আজাব হইতে বাঁচিবার উছিলা বানাইয়া দাও। এবং হিসাবের দুরবস্থা হইতে বাঁচিবার উপায় করিয়া দাও।"

তারপর সেই পবিত্র শহরের খায়ের ও বরকত হাছিল করার জন্য, উহার আদব রক্ষা করিয়া চলিবার তওফীকের জন্য এবং কোন প্রকার বেআদবী বা অন্যায় আচরণে লিপ্ত না হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে বিনয়ের সহিত খুব বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে।

(১১) সবচেয়ে উত্তম হইল শহরে প্রবেশ করিবার আগেই গোছল করিয়া লইবে। আগে সম্ভব না হইলে প্রবেশ করিবার পর জিয়ারতের পূর্বে অবশ্যই করিয়া লইবে। আর তাহাও সম্ভব না হইলে কমপক্ষে অজু ত নিশ্চয় করিবে। তবে গোছল করা উত্তম। কারণ যতবেশী পবিত্রতা হাছিল হইবে ততই ভাল। তারপর উৎকৃষ্ট পোষাক পরিয়া সুগন্ধি লইবেন। যেমন দুই ঈদ এবং জুমার জন্য লাগান হয়। কিন্তু খুব নম্রতা ভদ্রতা এবং ভয়ভীতির সহিত অগ্রসর হইবে।

বিখ্যাত আবদুল কয়েছ গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন হুজুর (ছঃ) এর দরবারে আসিয়াছিল তখন আনন্দে ও আবেগভরে তাহারা উটের পিঠ হইতে লাফাইয়া পড়িল, ছওয়ারী এবং আছবাব সব ছাড়িয়া দৌড়াইয়া দরগাহে নববীতে হাজির হয়। কিন্তু তাহাদের সর্দার মোনজের বিন আয়েজ যাহাকে শায়েখ আবদুল কয়েজ বলা হইত তিনি আছবাব পত্র ও উটের সহিত আসিয়া সব সাথীদের ছামান পত্র ঠিকমত গুছাইয়া রাখিয়া দেন। তারপর গোছল করেন এবং নুতন-কাপড় পরিয়া আস্তে আস্তে খুব ভদ্রতার সহিত মসজিদে নব্বীতে হাজির হন। প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া দোয়া করেন অতঃপর হুজুরে পাকের দরবারে হাজির হন। তাহার চাল চলন পছন্দ করিয়া হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমার মধ্যে দুইটি অভ্যাস এমন আছে যাহা আল্লাহ

পাক পছন্দ করেন। প্রথমতঃ সহিষ্ণুতা, দ্বিতীয়তঃ ভদ্রতা। (মাজাহের)

(২) কোন কোন আলেম বলেন মসজিদে দাখেল হওয়ার পূর্বে অল্প হইলেও কিছুটা ছদক করিয়া লইবে। সেই ছদকা মদীনাবাসীদের উপর খরচ হওয়া উত্তম। হাঁ অন্য লোক যদি বেশী অভাব গ্রস্থ হয় তবে তাহারা ও পাইতে পারে। আমার মতে ছদকা করার হুকুম এই আয়াত দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে আয়াতের অর্থ :

"হে ঈমানদারগণ! যখন রাছুলুল্লার সহিত তোমরা কথা-বার্তা বলিবে তখন তার পূর্বে কিছুটা ছদকা খয়রাত করিয়া লও। ইহা তোমাদের জন্য খুবই ভাল এবং পবিত্র। আর যদি তোমাদের মধ্যে ছদকা করার ক্ষমতা না থাকে তবে আল্লাহ পাক বড় ক্ষমতাশীল এবং দয়ালু।

অবশ্য এই হুকুম প্রথম অবস্থায় ওয়াজেব ছিল। পরে ইহা বাতেল হইয়া যায়। হজরত আলী বলেন এই আয়াতের উপর সর্ব প্রথম আমি আমল করিয়াছি। হুজুরের সহিত কথা বলার পূর্বে আমি এক দেরহাম করিয়া ছদকা করিতাম।

(১৩) শহরে যখন দাখেল হইতে থাকিবে বিশেষ দোয়া সমূহ পড়িতে পড়িতে খুব বিনয় ও খুশু খুজুর সহিত দাখেল হইবে। এত দিন যে আসিতে পারি নাই সেই জন্য দুঃখ করিবে। আখেরাতে হুজুরের জিয়ারত লাভ হইবার আকাংখা করিবে। এবং ভাগ্যে আছে কি-না সেই ভয় অন্তরে পোষণ করিবে। এবং বড় দরবারে হাজির হওয়ার সময় যেই প্রভাব অন্তরে পড়ে সেই ভাবে প্রভাবান্বিত হইবে। অন্তরে হুজুরের আজমতের খেয়াল করিয়া তারপর দরুদ শরীফ পড়িতে থাকিবে।

(১৪) যখন বহু আকাংখিত সেই 'কোব্বায়ে খাজরা" অর্থাৎ সবুজ গুম্বজ নজরে পড়িবে তখন হুজুরের আজমত, এবং উচু শান ইত্যাদি মনের মধ্যে হাজির করিয়া এই কথা চিন্তা করিবে যে সারা মাখলুকের সেরা মানব আম্বিয়ায়ে কেরামের সর্দার ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জাত এই কবরে শায়িত আছেন। আরও মনে করিবে যেই জায়গা হুজুরের শরীর মোবারকের সহিত মিলিত আছে উহা আল্লাহ পাকের আরশ হইতে ও শ্রেষ্ঠ, কা'বা হইতেও শ্রেষ্ঠ কুরছি হইতেও শ্রেষ্ঠ এমনকি আছমান ও জমীনের মধ্যে অবস্থিত যে কোন স্থান হইতে ও শ্রেষ্ঠ।

(১৫) শহরে প্রবেশ করিবার পর সর্ব প্রথম মসজিদে নব্বীতে হাজির হইতে হইবে। তবে মেয়েলোক অথবা ছামান পত্র থাকিলে ভিন্ন কথা

ওলামাদের সর্ব সম্মত অভিমত হইল যে সর্বপ্রথম মসজিদেই হাজির হইতে হইবে। কারণ হুজুরের ও আমল ছিল ছফর হইতে আসিলে প্রথম মসজিদে হাজির হইতেন।

(১৬) মেয়েলোকদের জন্য সংগত হইল তাহারা যদি দিনের বেলায় শহরে প্রবেশ করে তবে যেন কিছুটা অপেক্ষা করিয়া রাত্রি বেলায় মসজিদে হাজির হয়।

(১৭) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া প্রবেশ করিবে। এবং মসজিদে ঢুকিবার দোয়া আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা ইত্যাদি দোয়া পড়িয়া লইবে এবং এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া লইবে। যে কোন মসজিদে প্রবেশের সময় যদি এ'তেকাফের নিয়ত করিয়া লওয়া হয় তবে বিনা কষ্টে অনেক ছওয়াব লাভ করা যায়।

(১৮) মসজিদে প্রবেশ করিবার সময় বাবে জিব্রীল দিয়া প্রবেশ করাই উত্তম। কেননা হুজুরে পাক (ছঃ) প্রায় সময় ঐ দরজা দিয়াই প্রবেশ করিতেন। সম্ভবতঃ সেই দরজার নিকটেই আম্মাজানদের হুজরা সমূহ ছিল। তবে অন্য কোন দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেও কোন ক্ষতি নাই।

(১৯) মসজিদে প্রবেশ করিবার পর বিনয় নম্রতা এবং খুশু খুজু যতটুকু সম্ভব ততটুকু পালন করিবে। সেখানের মনোরম দৃশ্য, কালীন গালিচা, ঝাড়, ফানুস বিজলী বাতি ইত্যাদির সৌন্দর্য্যে লাগিয়া যাইবে না, বরং সেই দিকে ভ্রূক্ষেপও করিবে না। নেহায়েত আদব এবং ভদ্রতার সহিত নীচের দিকে নজর রাখিয়া খুব বেশী আদব এবং এহতেমামের সহিত অগ্রসর হইবে। বে-পরওয়া এবং বে-আদবীর লেশ মাত্রও যেন কোন কাজে কর্মে প্রকাশ না পায়। বহুত বড় উচু দরবারে আসিয়া পৌছিয়াছ। বড় সাবধানতার সহিত লক্ষ্য রাখিবে যেন কোন প্রকার বে-আদবীর দরুণ বঞ্চিত না হইতে হয়।

(২০) মসজিদে প্রবেশ করার পর সর্ব প্রথম রওজায়ে পাকে হাজির হইবে উহা মিম্বার এবং কোব্বা শরীফের মধ্যখানে অবস্থিত। উহাকে রওজা এইজন্য বলা হয় যে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার কবর এবং মিম্বরের মাঝখানের স্থানটা বেহেশতের বাগিচা সমূহ হইতে একটি বাগিচা। রওজা বাগিচাকে বলা হয়। বাবে জিব্রীল দিয়া প্রবেশের সুযোগ হইলে হুজুরা শরীফের পিছন দিয়া রওজার মধ্যে যাইবে তাহা হইলে সামনে দিয়া যাইবার সময় ছালাম ব্যতীত যাইতে হইবে না।

(২১) রওজায়ে মোকাদ্দাছে পৌছিয়া প্রথমে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িবে। মসজিদে হাজির হওয়ার পর হুজুরে পাকের দরবারে

হাজির হওয়ার পূর্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া উত্তম। কেননা নামাজ হইল আল্লার হক, আর হুজুরের হকের চেয়ে আল্লার হক আগে আদায় করিতে হইবে। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমি ছফর হইতে আসিয়া হুজুরের খেদমতে হাজির হই। হুজুর তখন মসজিদে ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়াছ? আমি বলিলাম পড়ি নাই। হুজুর বলিলেন প্রথমে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া আস, তারপর আমার সহিত দেখা কর।

(২২) তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকাতে ছূরায়ে কুলইয়া এবং ছূরায়ে কুল হুয়াল্লাহ পড়া উত্তম। কেননা প্রথম ছূরায় শেরেককে অস্বীকার করা হয় আর দ্বিতীয় ছূরায় আল্লার তাওহীদকে স্বীকার করা হয়।

(২) ওলামাগণ লিখিয়াছেন হুজুর (ছঃ) এর খাড়া হওয়ার স্থানে বরকতের জন্য খাড়া হওয়া উত্তম। জুবদা নামক গ্রন্থে সেই নিদৃষ্ট স্থানের পরিচয় এইভাবে দেওয়া হইয়াছে যে, মিম্বর ডান কাঁধের বরাবর থাকিবে এবং ঐ খুঁটি যাহার সামনে সিন্দুক রহিয়াছে সামনে থাকিবে। এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে ইমাম গাজ্জালী ও এইভাবে লিখিয়াছেন যে ঐ খুঁটি যাহার নিকট সিন্দুক রহিয়াছে মুখের সামনে থাকিবে, এবং মসজিদের কেবলার দিকের দেওয়ালে অঙ্কিত দায়েরা সামনে থাকিবে। কিন্তু শরহে মানাছেকে এবনে হাজার লিখিয়াছেন, বর্তমানে সেখানে সিন্দুক নাই উহা জ্বলিয়া গিয়াছে, বরং এখন সেখানে একটি মেহরাব বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাকে মেহরাবুন্নবী বলা হয়। প্রাচীন ওলামারা সকলেই সেখানে দণ্ডায়মান হওয়াকে উত্তম বলিয়াছেন এই জন্য সেই বরকত ওয়ালা স্থানের এহতেমাম করা উচিত। কিন্তু এই নাপাক জাকারিয়া মদীনায়ে পাকে এক বৎসর থাকা সত্বেও সেই মোবারক স্থানে একবারও দাঁড়াইবার সাহস হয় নাই এই জায়গা যদি কোন কারণবশতঃ হাছিল না হইল তবে সমস্ত রওজার যে কোন এক স্থানে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়িয়া লইবে।

(২৪) তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করার পর আল্লাহ পাকের লক্ষ লক্ষ শোকরিয়া এই মনে করিয়া আদায় করিবে যে তিনি আমাকে এত বড় নেয়ামত দান করিয়াছেন। এবং হজ্ব ও জিয়ারত কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে। দুই রাকাত শোকরানা নামাজ পড়িলেও চলিবে। ওলামায়ে কেরাম এই সময় শোকরের একটি

সেজদা আদায় করার কথা লিখিয়াছেন। হানাফী মজহাবে শুধুমাত্র একটি সেজদা আদায় করার কোন বিধান নাই। কিন্তু হানাফীরাও এইস্থানে সেজদায়ে শোকরকে জায়েজ বলিয়াছেন। তবে শাফেয়ী মজহাবে ছেজদায়ে শোকর জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও এইখানে উহা আদায় করার বিধান নাই।

(২৫) মসজিদে প্রবেশ করার পর যদি সেখানে ফরজ নামাজের জামাত শুরু হইয়া যায় তবে ফরজ নামাজেই শরীক হইয়া এবং তার সাথে সাথে তাহিয়্যাতুল মসজিদের নিয়ত করিয়া লইবে। আর যদি মাকরূহ ওয়াক্ত হয় তবে নফল পড়িবে না।

(২৬) নামাজ শেষ করিয়া কবর শরীফের দিকে রওয়ানা হইবে এবং অন্তরকে যাবতীয় পাপ পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র রাখিবে এবং আপাদ মস্তক প্রিয়তম নবীজীর জাতের দিকে রুজু রাখিবে। ওলামারা লিখিয়াছেন যেইসব অন্তরে দুনিয়ার নাপাকী, খেলতামাশা, খায়েশ ইত্যাদি ভরপুর সেইসব অন্তরে ওখানের ফয়েজ ও বরকত কিছুই অনুভব হইবে না, বরং রাগ এবং নারাজীর আশংকাও বিদ্যমান। আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীর দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাজেই প্রত্যেক মুছলমানকে সেই সময় আল্লাহ পাকের অফুরন্ত ক্ষমতা দান ও বখ শিশের আশা রাখিবে এবং হুজুর (ছঃ) রহমাতুল্লিল আলামীনের উছিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

(২৭) যে কোন কবরে হাজির হইলে মুর্দার পায়ের দিক দিয়া হাজির হইবে। কেননা আল্লাহ পাক যদি মূর্দাকে জিয়ারতকারীকে কাশফের দ্বারা দেখাইবার ইচ্ছা করেন তবে মুর্দা সহজেই তাহাকে দেখিতে পায়। মাথার দিক দিয়া আসিলে দেখিতে মুর্দার কষ্ট হয়, তার কারণ হইল মুর্দা ডান দিকে কাৎ হইয়া নজর করিলে নজর স্বাভাবিক ভাবে পায়ের দিকে পড়ে। তবে কেহ কেহ এখানে সাধারণ নিয়মের খেলাফ মাথার দিক দিয়া আসিতে বলিয়াছে। কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদ মাথার দিকে পড়া হইয়াছে। এখন যদি পায়ের দিকে যাইতে হয় তবে এক প্রকার তওয়াফের মত করিয়া পায়ের দিকে যাইতে হয়। আর কবরকে তাওয়াফ করা না জায়েজ। এ জন্য না জায়েজ কাজের সহিত মিল হইতে বাঁচিবার জন্য এখানে মাথার দিক দিয়া আসিতে

বলা হইয়াছে। তবে সাধারণ নিয়ম হইল যে কোন কবরে পায়ের দিক দিয়া আসিতে হইবে।

(২৮) কবর শরীফে হাজির হইলে মাথার দিকে দেওয়ালের কোনে যে খুঁটি আছে উহা হইতে তিন চার হাত দুরে দাঁড়াইবই এবং কেবলাকে পিছনে রাখিয়া বাম দিকে সামান্য ঝুকিয়া থাকিবে। এই ছুরতে চেহারায়ে মোবারকের একেবারে সম্মুখে হইবে। ছাহেবে এহ্‌ইয়াক বলেন এই খুটি বর্তমানে পিতলের দেওয়ালের ভিতর গিয়াছে। মোল্লা আলী কারী বলেন দেওয়ালের মধ্যে লাগান রূপার কাঁটার বরাবর দণ্ডায়মান হইবে। এব্‌নে হাজার বলেন চাঁদীর কাঁটার উপর যেখানে স্বর্ণর ঝুল রহিয়াছে উহা চেহারায়ে আনোয়ারের একেবারেই সামনে।

(২৯) দেওয়াল হইতে তিন' চার গজ দুরে থাকিবে বেশী নিকট হইবে না কেননা উহা আদবের খেলাপ। দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিবে, সেখানে এদিক সেদিক দেখা শক্ত বেআদবী। হাত পা খুব নীরব নিস্তব্ধ থাকিবে এবং মনে করিবে হুজুরের চেহারা মোবারক এখন আমার সম্মুখে। আমি যে হাজির হইয়াছি হুজুর (ছঃ) তাহা জানেন। কিতাবে বর্ণিত আছে যতটকু বিনয়, আজেজী, এনকেছারী, নম্রতা, ভদ্রতা আদায় করা মানুষের দ্বারা যতটুকু সম্ভব তার চেয়ে বেশী করিবার চেষ্টা করিবে। কেননা যে হুজুরের উছিলায় দোয়া করিয়াছে তাহার দোয়াই কবুল হইয়াছে, মনে করিবে যেন আমি হুজুরের জীবিতাবস্থায় তাঁহার দরবারে হাজির হইয়াছি। কেননা উম্মতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার ব্যাপারে সেই সময় হুজুরের হায়াত এবং মওতের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না।

(৩০) তারপর হুজুরে পাক (ছঃ) এর উপর ছালাম পাঠ করিবে। বিভিন্ন বজুর্গাণ বিভিন্ন তরীকায় ছালাম পাঠ করিতেন আসল কথা হইল কবির ভাষায় এইরূপ—

یاں لب پہ لاکہ سخن اضطراب میں
واں اک خاموشی تری سب کے جواب میں

কোন কোন বুজুর্গ খুব সংক্ষিপ্ত শব্দে ছালাম পড়িতেন—

دے زبانی ترجمان شوق بیحد ہو تو ہو
ورنہ پیش یار کام اتی ہیں تقریریں کہیں

মোল্লা আলী কারী (রঃ) লিখিয়াছেন হযরত এবনে ওমর শুধু আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অ-রাহমাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু

পড়িতেন। হযরত গাঙ্গুহী (রঃ) বলেন ছালামের শব্দ বেশী হইলেও কোন ক্ষতি নাই তবে আগের জামানার বুজুর্গেরা এখানে সংক্ষিপ্ত ছালামকেই ভাল বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। হজরত এবনে ওমর শুধু মাত্র আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহে! আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া আবা বকরিন পড়িতেন। এই অধমের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আসে যে ব্যক্তির ছালামের অর্থ জানা না থাকে তবে তোতা পাখীর মত শিখান শব্দ বাড়াইয়া বাড়াইয়া পড়ার চেয়ে নেহায়েত আদব এবং জওক শওকের সহিত আস্তে আস্তে থামিয়া "আচ্ছালাতু আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ পড়িতে থাকিবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জওক শওক বাড়তি অনুভব করিবে এই শব্দ সমূহ অথবা অনুরূপ কোন ছালাম বারংবার পড়িতে থাকিবে। প্রথম পরিচ্ছেদে ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহু সত্তর বার পড়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। বান্দা নাচীজ খাকছার অনুবাদক যখন স্বপ্নযোগে......

(৫১) এই কথা খুব বেশী মনে রাখিবে যে ছালাম পড়ার সময় যেন কোন শোর গোল করা না হয়। বেশী আওয়াজ ও নয় এবং একেবারে চুপে চুপে ও নয় বরং এমন আওয়াজে পড়িবে যেন উহা কবর শরিফ পর্য্যন্ত পৌছিয়া যায়। নিজের বদ আমলের কথা স্মরণ করিয়া খুব লজ্জিত অবস্থায় পড়িতে থাকিবে। বোখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হজরত ছায়েব (রাঃ) বলেন আমি মসজিদে নববীতে ছিলাম, কোন এক ব্যক্তি আমার দিকে একটা পাথরের কণা নিক্ষেপ করিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম তিনি হযরত ওমর (রাঃ) তিনি আমাকে ইশারায় ডাকিয়া বলিলেন এই দুই ব্যক্তি যে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলিতেছে তাহাদিগকে আমার নিকট নিয়া আস। আমি তাহাদিগকে হযরত ওমরের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের বাড়ী কোথায়? তাহারা বলিল আমরা তায়েফের অধিবাসী। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন তোমরা যদি এখানের অধিবাসী হইতে তবে মজা অনুভব করিতে। তোমরা হুজুরের মসজিদে কেন বড় আওয়াজে কথা বলিতেছ? অন্য হাদীছে আছে তোমাদিগকে এমন বেত্রাঘাত করিতাম যদ্দারা তোমাদের শরীর ব্যাথা হইয়া যাইত। বিদেশী লোক হওয়াতে রক্ষা পাইয়াছ।

হজরত আয়শা (রাঃ) যখন কোন ব্যক্তি কতৃক তারকাঁটা ইত্যাদি মারিবার আওয়াজ শুনিতেন তখন লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে বাধা দান করিতেন যে তোমরা হুজুরের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

হজরত আলী (রাঃ) ঘরের কেওয়াড় বানাইবার সময় মিস্ত্রিকে বলিতেন তোমরা বাড়ীতে নিয়া গিয়া ইহা তৈয়ার করিয়া আন তাহা হইলে উহার আওয়াজ আর হুজুর (দঃ) পর্যন্ত পৌছিবে না। আল্লামা কোস্তলানী লিখিয়াছেন হুজুরের জীবিতাবস্থায় যেইরূপ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল ঠিক মৃত্যুর পরও ঐরূপ আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কেননা হুজুর (ছঃ)কবর শরীফে জীবিত আছেন। আল্লাহ পাক ছূরায়ে হুজুরাতে নির্দেশ দিয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ -

"হে ঈমানদারগণ। তোমরা আপন আপন আওয়াজ হুজুরের আওয়াজের উপর উঁচু করিবে না এবং তাঁহার সহিত এমন জোরে কথা বলিবে না যেমন তোমরা আপোষে বলিয়া থাক। যেহেতু হইতে পারে ঐ ছূরতে তোমাদের পিছনের যাবতীয় নেকী অলক্ষ্যে বরবাদ হইয়া যাইতে পারে।"

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে—এক সময় কোন এক পরামর্শের ব্যাপারে হজরত আবু বকর (রাঃ) এবং হজরত ওমরের (রাঃ) মধ্যে হুজুরের দরবারে কিছুটা কথা কাটাকাটি হইয়া আওয়াজ একটু বড় হইয়া গিয়াছিল প্রসঙ্গে, এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। যখন হুজুরের দুই দোস্তের উপর এত বড় ধমক তখন আমি এবং তুমি কোন গণনার মধ্যে শামিল রহিয়াছি। কথিত আছে ইহার পর হজরত ওমর (রাঃ) হুজুর (ছঃ)-এর সহিত এত ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে, কোন কোন সময় একটি কথা বার বার বলার প্রয়োজন হইত। হজরত ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বলেন ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমি এখন হইতে এইভাবে কথা বলিব যেমন কোন গোপন কথা কানে কানে বলা হয়।

হজরত ছাবেত বিন কয়েছের (রাঃ) আওয়াজ স্বাভাবিকভাবেই বড় ছিল। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর চিন্তায় অস্থির হইয়া ঘরে বসিয়া গেলেন এবং বলিতেন আমিত জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি। কয়েকদিন পর হুজুর জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার ঘটনা জানিতে পারিলেন। হুজুর (ছঃ) তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন তুমি বেহেশতী।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাহারা কবর মোবারকের নিকট শোরগোল করে তাহাদের ভীত এবং সাবধান হওয়া উচিত।

(৩২) ছালামের পর হুজুরের উছিলায় আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবে এবং হুজুরের নিকট সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করিবে হানাফী মজহাবের বিখ্যাত মুগনী গ্রন্থে ছালামের ভাষা এইরূপ বলা হইয়াছে—

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا وَقَدْ اَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِّنْ ذُنُوْبِيْ مُسْتَشْفِعًا بِكَ اِلٰى رَبِّيْ فَاَسْئَلُكَ يَا رَبِّ اَنْ تُوْجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا اَوْجَبْتَهَا لِمَنْ اَتَاهُ فِيْ حَيَاتِهٖ ـ

হে খোদা! তোমার পবিত্র এরশাদ এবং তোমার এরশাদ নিশ্চই সত্য। উহা এই যে,

"তাহারা যদি পাপ করিয়া আপনার দরবারে হাজির হয় এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রাছুল ও তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাফ চান তবে আল্লাহ পাককে নিশ্চয় তাহারা তওবা কবুলকারী ও দয়ালু পাইবে।"

এখন আমি হুজুরের দরবারে গোনাহ মাফের জন্য আসিয়াছি। আমার পরওয়ারদেগারের নিকট আমি আপনার সুপারিশ চাহিতেছি। হে খোদা! আপনার নিকট আমার প্রার্থনা আপনি আমায় ক্ষমা করিয়া দিন। হুজুরের হায়াতে কেহ তাঁহার নিকট আসিলে আপনি ক্ষমা করিয়া দিতেন।

আব্বাছীয় বংশের খলিফা মানছুর হজরত ইমাম মালেকের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে দোয়ার সময় হুজুরের দিকে মুখ করিব না কেবলার দিকে। ইমাম মালেক (রঃ) বলেন তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কি প্রয়োজন যখন তিনি তোমারও উছিলা এবং তোমার বাবা আদমেরও উছিলা। হুজুরের নিকট সুপারিশ চাও। আল্লাহ পাক সুপারিশ কবুল করিবেন। (শরহে মাওয়া...)

আল্লামা কোস্তলানী লিখিয়াছেন জিয়ারতকারীদের উচিত ...

বেশী করিয়া দোয়া প্রার্থনা করে। হুজুর (ছঃ)-এর উছিলা ধরে। ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য হুজুরের সুপারিশ তলব করে। বিভিন্ন কিতাবে লেখা আছে, ছালামের পর এইভাবে দোয়া করিবে।

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللّٰهِ فِيْ

اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ -

'হে আল্লার নবী আমি আপনার নিকট সুপারিশ চাই। এবং এই প্রার্থনা করি যেন আমার মৃত্যু হয় আপনার দ্বীনের উপর এবং আপনাদের ছুন্নাতের উপর হয়।'

হুজুরের উছিলায় দোয়া করার তরীকা সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীন জায়েজ রাখিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আদম (আঃ) যখন নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়াছিলেন তখন হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উছিলায় দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন হে আদম! তুমি মোহাম্মদ (ছঃ)-কে কি করিয়া জানিলে? আমি ত এখন পর্যন্ত তাঁহাকে পয়দাও করি নাই। তখন হযরত আদম বলিলেন, হে খোদা! আপনি যখন আমাকে পয়দা করেন এবং আমার মধ্যে জান ঢালিয়া দেন তখন আরশের খুটির উপর আমি এই কালেমা লেখা দেখিতে পাই—লা-ইলা হা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ। তখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনার মোবারক নামের সহিত যাহার নাম মিলাইয়াছেন সে নিশ্চয় সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় হইবে। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয় সে আমার নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয়। তাঁহার উছিলায় যখন তুমি প্রার্থনা করিয়াছ তখন আমি তোমার গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। নাছায়ী এবং তিরমিজী শরীফে বর্ণিত আছে—জনৈক অন্ধ আসিয়া হুজুরের দরবারে চক্ষু লাভের জন্য দোয়া চাহিলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন তুমি বলিলে আমি দোয়া করিতে পারি। কিন্তু ছবর করিতে পারিলে সেটা তোমার জন্য বেশী ভাল। লোকটি দোয়ার জন্য দরখাস্ত করিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন প্রথমে ভাল করিয়া অজু কর, তারপর এই দোয়া পড়—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى

رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ لِتَقْضِيَ لِيْ اَللّٰهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ -

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এবং আপনার নবী যিনি রহমতের নবী তাঁহার উছিলায় আপনার দিকে রুজু করিতেছি হে মোহাম্মদ (ছঃ) আমি আপনারা তোফায়েলে আপন প্রভুর দিকে রুজু করিতেছি যেন আমার এই হাজত পূর্ণ হয়। হে খোদা! হুজুরের সুপারিশ আমার বিষয়ে আপনি কবুল করুন।"

বায়হকী শরীফে দোয়ার সহিত এই কথাও বাড়তি ছিল যে, "তোমার নবীর উছিলায় এবং তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায়।"

(৩৩) এই দোয়া করার সময়ও মুখ হুজুরের চেহারা মোবারকের দিকে থাকিতে হইবে। যদিও অন্যান্য দোয়ার সময় চেহারা কেবলার দিকে রাখিতে হয় কেননা এখানে কেবলার দিকে ফিরিলে হুজুর পিছনে হইয়া যান যাহা আদবের খেলাপ। তাই হুজুরের দিকে মুখ করিয়া দোয়া করিবে।

(৩৪) তারপর অন্য কেহ হুজুরের খেদমতে ছালাম বলিবার হুকুম করিয়া থাকিলে এইভাবে ছালাম আরজ করিবে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ

اِلٰى رَبِّكَ -

"হে আল্লাহর নবী! অমুকের বেটা অমুকের তরফ হইতে আপনার উপর ছালাম। সে আপনার দরবারে আল্লাহ পাকের নিকট সুপারিশ চাহিতেছে।"

অমুকের বেটা অমুকের স্থলে লোকটির নাম এবং তাহার পিতার নাম লইবে। আল্লামা জরকানী লিখিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও ছালাম পেঁছাইতে বলে এবং সে উহা কবুল করে তবে তাহার উপর ছালাম পেঁছান ওয়াজেব হইয়া যায়। কেননা সে কবুল করিয়াছে বিধায় ইহা একটি আমানতের মত হইয়া গেল। আগের জামানার রাজা-বাদশাহগণ হুজুরের খেদমতে ছালাম পেঁছাইবার জন্য রীতিমত দূত পাঠাইত।

সাহেবরা আমার এই বাংলা অনুবাদ খানা পড়িবেন তাহাদের খেদমতে আমি না লায়েক পাপী গোনাহগারের সবিনয় ও করজোড়ে আবেদন, সেই মোবারক সময়ে এই অদম খাকছারের কথা আপনার যদি মনে আসিয়া যায় তবে অনুগ্রহ পূর্বক আমার প্রিয় নবীজীর খেদমতে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ سَخَاوَتِ اللهِ بْنِ سُلْطَانِ اَحْمَدَ يَسْتَشْفِعُ اِلٰى رَبِّكَ -

আরজ করিবেন, বড়ই এহছান হইবে। যদি আরবী শব্দ মনে না থাকে তবে উর্দু অথবা বাংলাতেই হুজুরের দরবারে আমার ছালাম খানী পৌছাইয়া দিবেন, এই বলিয়া যে, ইয়া রাছুলাল্লাহ। ছোলতান আহম্মদের বেটা ছাখাওয়াত উল্লাহ আপনার খেদমতে ছালাম পৌঁছাইতেছে এবং আপনার পরওয়ারদেগারের নিকট আপনার সুপারিশ চাহিতেছে।

(৩৫) হুজুরে পাক (ছঃ)-এর উপর ছালাম পড়িয়া একহাত পরিমাণ ডান দিকে হাটিয়া হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের (রাঃ) উপর ছালাম পড়িবে. বর্ণিত আছে যে, জনাব ছিদ্দীকে আকবরের কবর হুজুরে পাকের কবর শরীফের একটু পিছনে এই ভাবে যে, হজরত ছিদ্দীকের মাথা হুজুরের কাঁধ বরাবর কাজেই এক হাত ডান দিকে হইয়া দাঁড়াইলে তাঁহার একেবারে সামনে হওয়া যায়।

(৩৬) হজরত ছিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) কবরে ছালাম পাঠাইবার পর ডান দিকে এক হাত হাটিয়া হজরত ওমর ফারুকের উপর ছালাম পড়িবে।

(৩৭) ঐ দুই ছাহাবার খেদমতে ছালাম পৌঁছাইবার জন্য আপনার নিকট যদি কেহ দরখাস্ত করিয়া থাকে তবে আপন আপন ছালাম পৌঁছাইবার পর তাহার পক্ষ হইতেও ছালাম পৌঁছাইবেন। হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন এই পাপীও আপনার নিকট দরখাস্ত করিতেছে যে যদি স্মরণ থাকে তবে এই বান্দার ছালাম খানিও হুজুরের ছাহাবা দ্বয়ের খেদমতে পৌঁছাইবেন। আপনাদের খেদমতে এই পাপী নরাধম অনুবাদক মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহও প্রার্থনা করিতেছে যদি সেই সময় স্মরণ হয় তবে এই বান্দার ছালাম খানিও হজরত ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হজরত ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে পৌঁছাইবেন।

(৩৮) অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন হজরত ওমর (রাঃ)-এর

ও ফারুকের (রাঃ) উপর ছালাম পড়ার পর উভয়ের কবরের মাঝখানে দণ্ডায়মান হইয়া দুই জনকে লক্ষ্য করিয়া একত্রে এই ভাবে ছালাম পড়িবে—

السلام عليكما يا ضجيعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقيه ووزيريه جزاكما الله احسن الجزاء جئنا كما نتوسل بكما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا ان يحيينا على ملته وسنته ويحشرنا فى زمرته وجميع المسلمين -

"রাছুলুল্লার পাশে শায়িত হে ছাহাবীদ্বয়। আপনাদের উপর ছালাম আল্লাহ তায়ালা আমাদের তরফ হইতে আপনাদিগকে উপযুক্ত প্রতিদান দান করুন। আমরা আপনাদের খেদমতে এই জন্য হাজির হইয়াছি যে, আপনারা হুজুরের দরবারে আমাদের জন্য এই বলিয়া দরখাস্ত করিবেন যে হুজুর যেন আল্লার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করেন যেন তিনি আমাদিগকে হুজুরের দ্বীনের উপর এবং হুজুরের ছুন্নতের উপর জিন্দা রাখেন এবং আমাদের সমস্ত মুছলমানের হাশর যেন হুজুরের জমাতের মধ্যে হয়।

(২৯) তারপর আবার ডান দিকে সরিয়া হুজুরে পাকের সামনে দাঁড়াইয়া হাত উঠাইয়া প্রথমে এখানে যে আনিয়াছেন তার জন্য আল্লাহ পাকের খুব প্রশংসা এবং শোকরিয়া আদায় করিবে। অতঃপর আবেগ ভরে শওকের সহিত হুজুরের উপর দরূদ শরীফ পড়িবে। তারপর হুজুরের উছিলায় আল্লার দরবারে নিজের জন্য এবং আপন মাতা পিতা পীর উস্তাদ আওলাদ ফরজন্দ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আর যাহারা দোয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে তাহাদের জন্য এবং জীবিত মৃত সমস্ত মোছলমানের জন্য খুব বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবে এবং আমীন শব্দ দ্বারা দোয়া শেষ করিবে। (শরহে লোহাব)

আর যদি মনে পড়ে তবে এই অধম জাকারিয়াকে এবং অনুবাদক এই পাপিষ্ঠ ছাখাওয়াত উল্লাহকেও আপনাদের মোবারক দোয়ায় শামিল করিবেন।

(৩০) মোহাদ্দেছীনগণ হুজুর (ছঃ) এবং শায়খাইনের (রাঃ) কবরের ছুরত সাত প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি ছুরত ছহী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত।

প্রথম ছুরত কবর শরীফের এই রকম—

হুজুরে পাক (ছঃ)

হজরত আবুবকর (রাঃ)

হজরত ওমর ফারুক (রাঃ)

ওফাউল ওফা এবং এতহাফ গ্রন্থে এই ছুরতকে সর্বাধিক ছহী রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ছুরতের নকশা এইরূপ—

হুজুরে পাক (ছঃ) | হজরত ওমর (রাঃ)

হজরত আবুবকর (রাঃ)

এই ছুরতের রেওয়ায়েত আবু দাউদ শরীফে আসিয়াছে এবং হাকেম ইহাকেই ছহী রেওয়ায়েত বাত্‌লাইয়াছেন।

(৪১) তারপর হজরত আবু লোবাবার খুঁটির নিকট আসিয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়া দোয়া করিবে।

(৪২) অতঃপর পুনরায় রওজার মধ্যে গিয়া নফল পড়িবে ও দোয়া দরূদ ইত্যাদিতে মশগুল হইবে।

(৪৩) তারপর মিম্বরের নিকট আসিয়া দোয়া করিবে ওলামাগণ লিখিয়াছেন মিম্বরের ঐ স্থান যাহাকে রুমানা বলা হয়, সেখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিবে যেহেতু নবীয়ে করীম (ছঃ) ওখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিতেন। ছাহাবায়ে কেরামও সেখানে হাত রাখিয়া দোয়া করিতেন। আনারের মত মিম্বরের কিনারায় মুকুট সমূহকে রুমানা বলা হয়। হজরত এব্‌নে ওমর (রাঃ) হুজুরের বসিবার জায়গায় হাত ফিরাইয়া সেই হাত মুখে ফিরাইয়া লইতেন।

(৪৪) তারপর উস্তওয়ানায়ে হান্নানাহ্ অর্থাৎ ক্রন্দনকারী খুঁটির নিকট গিয়া খুব এহ্‌তেমামের সহিত দরূদ পড়িবে ও দোয়া করিবে।

(৪৫) তারপর অন্যান্য প্রসিদ্ধ খুঁটি সমূহের নিকট গিয়া দোয়া করিবে।

(৪৬) মদিনা শরীফ থাকা কালীন চেষ্টা করিবে যেন এক ওয়াক্ত

নামাজ ও জামাতের সহিত মসজিদে নববীতে পড়া ছুটিয়া না যায়।

(৪৭) জিয়ারতের সময় দেওয়াল সমূহে হাত লাগান অথবা চুমা দেওয়া অথবা জড়াইয়া পেট পিঠ লাগান শক্ত বেয়াদবী। কবর শরীফে মাথা ঠুকান জমীনে চুম্বন করা, কবরের দিকে মুখ করিয়া কবর আছে এই খেয়ালে নামাজ পড়া কঠোরবাভে নিষেধ। কবরকে তাওয়াফ করা হারাম।

(৪৮) নামাজে অথবা নামাজের বাহিরে কবর শরীফের দিকে শক্ত ওজর ব্যতীত কখনও পিঠ দিবে না। বরং নামাজে এমন জায়গায় দাঁড়াইতে চেষ্টা করিবে যেখানে দাঁড়াইলে কবর মোবারকের দিকে না মুখ থাকে না পিঠ থাকে।

(৪৯) হুজুরের কবরের সামনে দিয়া যাইবার সময় চাই মসজিদের ভিতর হউক বা মসজিদের বাহিরে হউক দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে। জনৈক ছাহাবী বলেন আমি হুজুর (ছঃ) কে স্বপ্নে দেখিলাম তিনি বলেন আবু হাজেমকে গিয়া বল যে তুমি আমার নিকট দিয়া যাও অথচ দাঁড়াইয়া একটু ছালাম ও করিয়া যাও না। আবু হাজেম বলেন আমি তারপর হইতে যখনই সেই দিক দিয়া যাইতাম দাঁড়াইয়া ছালাম করিয়া যাইতাম।

(৫০) মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকা অবস্থায় হুজুরের কবর শরীফে বেশী বেশী হাজির হওয়ার চেষ্টা করিবে, ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইহাকে পছন্দ করিতেন। তবে ইমাম মালেক (রঃ) বারংবার হাজির হওয়াতে মনে কোন অনাগ্রহ জন্মে নাকি সেই জন্য তিনি বেশী বেশী হাজির হওয়াকে না পছন্দ করিতেন।

(৫১) মসজিদে নববীতে থাকা কালীন হুজরাশরীফের দিকে এবং মসজীদের বাহিরে গেলে কোব্বা শরীফের দিকে যেখান পর্যন্ত নজরে আসে খুব মহব্বত ও আবেগের সহিত দেখিতে থাকিবে।

(৫২) মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকা কালীন যত বেশীবেশী সম্ভব মসজিদ শরীফে থাকিয়া জিকির তেলাওয়াত এবং দরূদ শরিফে লিপ্ত থাকিবে। কম পক্ষে কোরআন শরীফ এক খতম পড়ার চেষ্টা করিবে। রাত্রে বেশীর ভাগ সেখানে কাটাইবে।

(৫৩) হুজুরের কবর শরীফের জিয়ারতের পর প্রতিদিন অথবা প্রতি জুমার দিন মদিনা শরীফের কবর স্থান জান্নাতুল বাকী-তে যাইবে। কেননা সেখানে হজরত ওছমান, হজরত আব্বাছ, হজরত হাছান, হজরত ইব্রাহীম

এবং হুজুরের বিবি ছহেবান ও বহু সংখ্যক ছাহাবা শুইয়া আছে। জান্নাতুল বাকী-তে জিয়ারতের সময় সর্বপ্রথম হজরত ওছমান এবং সর্ব শেষ হুজুরের ফুফু হজরত ছুফিয়ার জিয়ারত করিবে। শরহে লোবাবে বর্ণিত আছে বহিরাগতদের জন্য প্রতি দিন যাওয়া মোস্তাহাব আর মদিনা ওয়ালাদের জন্য প্রতি শুক্রবার যাওয়া মোস্তাহাব। ইমাম মালেক বলেন জান্নাতুল বাকী-তে কম পক্ষে দশ হাজার ছাহাবীর কবর রহিয়াছে। প্রত্যেকের জন্য দোয়া এবং ইছালে ছওয়াব করিবে। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) যে রাত্রে আমার ঘরে থাকিতেন সে রাত্রে সব সময় তিনি জান্নাতুল বাকীতে জিয়ারত করিতে যাইতেন।

জিয়ারতের সময় অধিকাংশের মত হজরত ওছমানের কবর প্রথম জিয়ারত করিবে। কেননা সেখানে যাবতীয় ছাহাবাদের মধ্যে তিনিই হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আবার কেহ কেহ বলেন হুজুরের বেটা ইব্রাহীমের কবর জিয়ারত করিবে। আবার কেহ বলেন হজরত আব্বাছের জিয়ারত করিবে কেননা তিনি হুজুরের চাচা।

(৫৪) ইমাম গাজ্জালী লিখিয়াছেন, মোস্তাহাব হইল বৃহস্পতিবার ভোরে ফজরের নামাজ পড়িয়া অহুদের শহীদানের জিয়ারতে যাইবে তাহা হইলে জোহরের নামাজ মসজিদে নববীতে পড়া সহজ হইবে। শহীদানে অহুদ এবং অহুদ পাহাড় উভয়ের নিয়ত করিয়া যাইবে। কেননা জাবালে অহুদের ফজীলত ও হাদীছ শরীফে অনেক আসিয়াছে। সেখানে গিয়া সর্বপ্রথম শহীদ শ্রেষ্ঠ হজরত হামজার জিয়ারত করিবে। তারপর অন্যান্য জিয়ারত গাহে যাইবে।

(৫৫) ইমাম নুরী বলেন মসজিদে কোবায় হাজির হওয়ার তাকীদ আসিয়াছে। শনিবারে যাওয়াই উত্তম। মসজিদ জিয়ারতের এবং সেখানে নামাজ পড়ার উভয় নিয়তই হইতে হইবে। হাদিছে আসিয়াছে কোবায় নামাজ পড়া ওমরার সমতুল্য। মক্কা, মদিনা, মসজিদে আকছার পর উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। হুজুরের অভ্যাস ছিল প্রতি শনিবার সেখানে যাওয়ার, সোমবার এবং বিশে রমজান যাওয়ার রেওয়ায়েতও আসিয়াছে।

(৫৬) তারপর মদীনায়ে মোনাওয়ারার অন্যান্য মোবারক স্থান সমূহের জিয়ারত করিবে। বর্ণিত আছে যে ঐরূপ প্রায় ত্রিশটি স্থান রহিয়াছে। এই ভাবে সাতটি কুয়ার পানি দ্বারা অজু করিবে ও পান করিবে সাতটি কুয়ার নাম—

১ নং বী'রে আরীছ, কথিত আছে এই কুয়ায় হুজুর (ছঃ) আপন মুখের লালা অথবা থুথু ফেলিয়াছিলেন। ২নং বী'রেহা ৩নং বী'রে রুমা, ৪নং বী'রে গারছ, ৫নং বী'রে বোজায়া, ৬নং বী'রে বাচ্চা, ৭নং বী'রে ছুফায়া অথবা বী'রে জামাল অথবা বী'রে এহেন। কেহ কেহ বলেন যে, ঐরূপ বরকত ওয়ালা কুয়ার সংখ্যা সতের।

(৫৭) যতদিন মদিনায়ে মোনাওয়ারা থাকিবে সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা অথবা বহিরাগত বাসিন্দাদের উপর খুব বেশী বেশী করিয়া অকাতরে ছদকা খয়রাত করিবে। মদিনা বাসীদের সহিত মহব্বত রাখা ওয়াজেব। কাজেই হুজুরের প্রতিবেশীদের উপর দান খয়রাত করা যেমন হুজুরের খেদমত করা।

(৫৮) মদিনা ওয়ালাদের উপর ছদকা করার চেয়ে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত করাই বেশী ভাল। কারণ ছদকার চেয়ে হাদিয়া উত্তম। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন জিনিষ খরিদ করিলে তাহাদের সাহায্য করার নিয়ত থাকিতে হইবে। তাহা হইলেও এক প্রকার ছদকার মধ্যে শামিল হইবে।

(৫৯) সমস্ত মদিনা বাসিদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কেননা তাহারা হুজুরের প্রতিবেশী। কোন লোকের তরফ হইতে অশোভনীয় কোন কাজ প্রকাশ পাইলে তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হুজুরের প্রতিবেশী হিসাবে তাহাকে সম্মান করিবে।

فيا ساكنى اكناف طيبة كلكم
الى القلب من اجل الحبيب حبيب

"হে মদিনা শরীফের বাসিন্দাগণ! তোমরা সকলেই আমার হৃদয়ের নিকট মাহবুবের কারণে মাহবুব।"

হজরত ইমাম মালেক যখন আমীরুল মোমেনীন মাহদীর নিকট যান তখন বাদশাহ্ বলেন হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। ইমাম মালেক বলেন সর্বপ্রথম আল্লার ভয় এবং পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে। তারপর মদিনা ওয়ালাদের উপর মেহেরবানী করিবে কারণ তাহারা হুজুরের প্রতিবেশী। হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন মদিনা আমার হিজরতের স্থান। এখানে আমার কবর হইবে, এখান হইতে আমি কেয়ামতের দিন উঠিব। এখানের বাসিন্দারা আমার প্রতিবেশী, আমার উম্মতের জন্য জরুরী তাহারা যেন মদিনাবাসীদের খবর লয়। যেই ব্যক্তি আমার খাতিরে মদিনা ওয়ালাদের

খবর লইবে কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সুপারিশ করিব। আর যাহারা আমার অছিয়ত মোতাবেক আমার প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে না আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে তী'নাতুল খেয়াল পান করাইবেন। তী'নাতুল খেয়াল জাহান্নামীদের পূঞ্জীভুত পূঁজ ঘাম ও রক্তকে বলা হয়।

(৬০) মদিনায় অবস্থান কালে মদীনার আজমত বুজুর্গী সব সময় হাজির রাখিবে। এই কথা মনে করিবে যে, এই শহরে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব নবীর হিজরতের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। হুজুর এখানে থাকিতেন, এই শহরের অলিতে গলিতে চলাফেরা করিতেন। শরীয়তের হুকুম আহকাম এখানেই অবতীর্ণ হয়। হুজুরের ছুন্নত সমূহ এখান হইতে জারী হয়। এই শহরে আসিয়া হুজুর জেহাদ করেন, এই শহরে হুজুর শায়িত আছেন। আরও চিন্তা করিবে এই শহরের মাটিতে আমার প্রিয় নবীর কদম পড়িত, হয়তঃ যেখানে হুজুরের কদম পড়িয়াছে আমার কদম ও সেখানে পড়িতেছে। তাই খুব ধীর স্থির ভাবে কদম রাখিবে। তারপর মনে করিবে আমার প্রিয় নবীর প্রিয় ছাহাবারা এই শহরে থাকিতেন হুজুরের বরকত ওয়ালা কালাম শুনিয়া তাঁহারা ধন্য হইতেন।

جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا خار گلشن میں
بتاتا تھا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا

তারপর আফছোছ করিবে যে. হায় এই দুনিয়াতে আমি হুজুরের এবং ছাহাবাদের দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেলাম, না জানি আমার বদ আমলের দরুণ আখেরাতেও তাঁহাদের দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই নাকি। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই শোকরিয়া ও আদায় করিবে যে, আমার বাড়ী ঘর কত দেশ দেশান্তর দুরে হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ পাক আমাকে হুজুরের দরবার পর্যন্ত আসিবার সৌভাগ্য দান করিয়াছেন। আশা করি সেই মেহেরবান খোদা কেয়ামতের দিন আমাকে হুজুরের মোবারক দর্শন হইতেও বঞ্চিত করিবেন না। আল্লাহ পাক এই অধমকেও পরকালে হুজুরের মোবারক দীদারের দ্বারা ভাগ্যবান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন।

(৬১) ফখ্‌রে দোআলম ছরওয়ারে কায়েনাত হুজুরে পাক (ছঃ) এর এবং পবিত্র স্থান সমূহের জিয়ারত শেষ করার পর যখন ফিরিয়া আসিবার মনস্থ করিবে তখন মসজিদে নববীতে দুই রাকাত বিদায়ী নফল নামাজ আদায় করিবে। নামাজ রওজাতে পড়িতে পারিলে উত্তম। তারপর

কবর শরীফে শেষ 'ছালাম পৌঁছাইবার জন্য হাজির হইবে এবং দরূদ ও ছালাম পেঁাছাইয়া নিজের যাবতীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য এবং হজ্ব ও জিয়ারত মাকবুল হইবার জন্য দোয়া করিবে এবং ছহী ছালাতে ফিরিবার জন্য এবং খাছ করিয়া এই হাজেরী যেন আখেরী হাজেরী না হয় সেই জন্য দোয়া করিবে। এই দোয়ার সময় কিছু চোখের পানি ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিবে কান্না না আসিলে কান্নার মত ভান করিয়া চিন্তা ও ফিকিরের সহিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আফছোছ করিতে করিতে মসজিদ হইতে বাহির হইবে এবং বলিবার সময় যতটুকু সম্ভব ছদকা খয়রাত করিয়া ছফর হইতে ফিরিবার সময়ের দোয়া সমুহ পড়িয়া ফিরিবে। কবি বলেন—

اٹھ کے ثاقب کوچلا آیا ہوں اس کے بزم سے
دل کی تسکین کا مگر ساماں اسی محفل میں ہے

তাঁহার মাহফিল হইতে যদি ও ছাকেব উঠিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তবুও মনের শান্তির সামগ্রী সেই মাহফিলেই রহিয়া গিয়াছে।"

নিজের অযোগ্যতা বশতঃ দরবার নববীতে হাজির হওয়ার পুরা পুরা আদাব সমূহ লিখিতে সামর্থ হই নাই, নমুনা স্বরূপ মাত্র কিছু লিখিয়া দিলাম। জিয়ারতকারী ভাই বন্ধুগণ দুইটি উছুলের পাবন্দি করিয়া শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকিয়া যতটুকু করিতে পারেন ত্রুটি করিবেন না। প্রথম আদব এবং সম্মান, দ্বিতীয়, আবেগ এবং জওক শওক। অতঃপর জিয়ারত কারীদের কিছু ঘটনাবলী নমুনা স্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি।

নবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী

(১) হজরত ওয়ায়েছ করণী (রঃ) বিখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন, হুজুরের জামানা সত্ত্বেও মায়ের খেদমতের দরুণ তিনি হুজুরের খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। একটি রেওয়ায়েতে আছে তিনি কোন বিষয় কছম করিলে আল্লাহ পাক উহা পূর্ণ করিয়া দেন। হুজুর (ছঃ) হজরত ওমর ও আলীকে বলেন তাহার সহিত সাক্ষাত হইলে মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাহিও। হজরত আলীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া ছেপফীনের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তিনি হজ্ব করিয়া মদীনায় আসিয়া মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন তখন কেহ ইশারায় হুজুরের কবরে আতহার দেখাইয়া দেওয়া মাত্রই তিনি বেহুশ হইয়া পড়িয়া যান। হুঁশ হওয়ার পর এরশাদ করেন যেখানে আমার প্রিয় নবী শুইয়া আছেন আমি কি করিয়া সেখানে শান্তি পাইব। তোমরা

আমাকে এখান হইতে লইয়া চল। (এত্হাফ)

(১) জনৈক বেদুইন হুজুরের কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আরজ করিল, হে রব! তুমি গোলাম আজাদ করিবার হুকুম করিয়াছে। ইনি তোমার মাহবুব আর আমি তোমার গোলাম। আপন মাহবুবের কবরের উপর আমি গোলামকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দাও। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল তুমি একা নিজের জন্য কেন আজাদী চাহিলে? সমস্ত মানুষের জন্য কেন আজাদী চাহিলে না। আমি তোমাকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দিলাম। (মোওয়াহেব)

(৩) হজরত আচমায়ী বলেন, জনৈক বেদুঈন কবর শরীফে হাজির হইয়া বলিল, ইয়া আল্লাহ! ইনি তোমার মাহবুব। আমি তোমার গোলাম এবং শয়তান তোমার দুশমন! যদি তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও তবে তোমার মাহবুবের দিল খুশী হইবে। আর তোমার গোলাম কৃতকার্য হইয়া যাইবে এবং তোমার দুশমনের মনে ব্যাথা হইবে। আর যদি তুমি আমায় ক্ষমা না কর তবে তোমার মাহবুবের মনে কষ্ট হইবে। আর তোমার দুশমনের সন্তুষ্ট হইবে এবং তোমার এই গোলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে। হে পরওয়ারদেগার! আরবের সম্ভ্রান্ত লোকের অভ্যাস, তাহারা আপন সর্দারের কবরের পার্শ্বে গোলাম আজাদ করিয়া থাকে। আর এই পবিত্র নবী সারা জাহানের সর্দার, তুমি তাঁহার কবরের পার্শ্বে আমাকে দোজখ হইতে আজাদ করিয়া দাও। হজরত আছমায়ী বলেন, হে আরবী! তোমার এই উৎকৃষ্ট প্রশ্নের উপর নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মাওয়াহেব)

(৪) হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন বিখ্যাত ছুফী হজরত হাতেম আছম যিনি দীর্ঘ তিরিশ বৎসর যাবত একটি কোব্বার মধ্যে চিল্লা কাশী করেন, বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও বলেন নাই। তিনি হুজুরের কবর শরীফে হাজির হইয়া শুধু এই কথাটুকু আরজ করেন, ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার হাবীবের কবরে হাজির হইয়াছি তুমি আমাদিগকে নৈরাশ করিয়া ফিরাইওনা। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল আমি তোমাদিগকে মাহবুবের কবর জিয়ারত এইজন্যই নছীব করিয়াছি যে উহাকে কবুল করিব! যাও আমি তোমার এবং তোমার সাথে যত লোক এখানে হাজির হইয়াছে সকলের গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। (জরকানী)

কোন কোন সময় দোয়ার বাক্য ছোট হইলেও যদি উহা এখলাছের সহিত হয় তবে উহা সোজা দরবারে গিয়া পৌঁছে।

(৫) শায়েখ ইব্রাহীম এব্‌নে শায়বান বলেন, হজ্বের পর মদীনায়ে পাক পৌঁছিয়া কবর শরীফে হাজির হইয়া আমি হুজুরে পাকের খেদমতে ছালাম আরজ করিলাম। উত্তরে হুজরা শরীফ হইতে অ-আলাই-কাচ্ছালামু শুনিতে পাই।

(৬) আল্লামা কোছতলানী বলেন, আমি একবার এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হই যে, ডাক্তরগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া যায়। অবশেষে আমি মক্কা শরীফ অবস্থানকালে হুজুরের উছিলায় দোয়া করিলাম। রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্নে দেখি এক ব্যক্তি আমাকে একটি কাগজের টুক্‌রা হুজুরের তরফ হইতে দিয়া বলে যে ইহা আহমদ বিন কোছতলানীকে দাও। আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি যে আমার মধ্যে রোগের কোন চিহ্নই নাই। ৮৮৫ হিজরীতে অন্য একটি ঘটনা ঘটে। তাহা এই যে মক্কা শরীফ হইতে ফিরিবার পথে একটি হাবশী হরিণ আমার খাদেমাকে খেষিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে সে কিছুদিন যাবত খুব অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমি হুজুরের উছিলায় তাহার জন্য দোয়া করি। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে এক ব্যক্তি একটি জিনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল ইহাকে হুজুরে পাক (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। সে হরিণের ছুরতে আসিয়া আপনার খাদেমাকে সিং লাগাইয়া যায়। কোছতলানী বলেন আমি সেই জিনকে খুব শাসাইয়া দেই। এবং এই রকম কাজ যেন সে জীবনে কখনও না করে সেই জন্য তাহাকে কছম দিয়া দেই। তারপর চোখ খোলা মাত্র আমি দেখিতে পাই যে খাদেমার শরীর কষ্টের আর কোন চিহ্নই নাই।

(৭) হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বলেন, একবার আমি ছফরের হালতে পিপাসায় খুব কাতর হইয়া পড়িলাম। অবশেষে চলিতে চলিতে আমি অস্থির হইয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। ইত্যবসারে জনৈক ব্যক্তি আমার মুখে পানি ঢালিয়া দিলেন। আমি চোখ মেলিয়া দেখি একজন অতীব সুন্দর চেহারাওয়ালা লোক ঘোড়ার পিঠে আমার সামনেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে আমাকে পানি পান করাইয়া বলিলেন ঘোড়ায় ছাওয়ার হইয়া যাও। তারপর কিছুক্ষণ চলিয়াই সে বলিয়া উঠিল দেখত এইটা কোন্‌ শহর ? আমি বলিলাম ইহাত মদিনা শরীফ আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন তুমি নামিয়া পড় রওজায়ে আকদাছে পৌঁছিয়া এই

কথা বলিবে যে আপনার ভাই খিজির ছালাম আরজ করিয়াছে।

(৮) শায়েখ আবুল খায়ের আকতা বলেন, আমি একবার মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির হইয়া পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে উপবাস থাকিতে হয়। খাওয়ার জন্য কিছুই না পাইয়া অবশেষে আমি হুজুরের এবং শায়খাইনের কবরের মধ্যে ছালাম পড়িয়া আরজ করিলাম ইয়া রাছুল্লাহ্। আমি আজ রাত্রে হুজুরের মেহমান হইব। এই কথা আরজ করিয়া মিম্বর শরীফের নিকট গিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখি যে হুজুরে পাক (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন; ডানে হযরত আবু বকর বামদিকে হজরত ওমর এবং সামনে হজরত আলী। হজরত আলী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন এই দেখ হুজুর (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিবা মাত্রই হুজুর আমাকে একটা রুটী দিলেন, আমি উহার অর্দ্ধেক খাইয়া ফেলী। তারপর যখন আমার চোখ খুলিল তখন আমার হাতে বাকী অর্দ্ধেক ছিল।

(৯) আবদালদের মধ্যে হইতে এক বুজর্গ হজরত খিজির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার চেয়ে কোন বুজর্গ ব্যক্তি কি আপনি কখনও দেখিয়াছেন। তিনি বলিলেন হাঁ দেখিয়াছি। একদিন মোহাদ্দেছ আবদুর রাজ্জাক মসজিদে নববীতে হাদিছ শুনাইতেছিলেন। তাঁর চতুর্দিকে লোকজনের খুব ভীড় ছিল। তিনি সকলকে হাদীছ শুনাইতেছিলেন। মসজিদের এক কোনে জনৈক যুবক হাটুর উপর মাথা রাখিয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন আমি তাহার নিকট গিয়া বলিলাম আপনি সকলের সহিত কেন শুনিতেছেন না? তিনি বলিলেন যে লোকজন রাজ্জাকের গোলামের নিকট হাদিছ শুনিতেছে আর এখানে স্বয়ং রাজ্জাক হইতে আমি হাদীছ শুনিতেছি। হজরত খিজির বলিলেন তোমার কথা সত্য হইলে বলত আমি কে? সে আমার দিকে মুখ উঠাইয়া বলিল আমার ধারণা ঠিক হইল বলিতেছি আপনি হজরত খিজির। হজরত খিজির বলেন ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আল্লার অলীকে আমিও চিনিতে পারিনা।

(১০) জনৈক বুজর্গ বলেন আমরা কয়েকজন মদিনা শরীফে আল্লাহ ওয়ালাদের কেরামতের বিষয় আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের পার্শ্বেই একজন অন্ধ বসা ছিল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল আপনাদের কথা আমার কাছে বড় ভাল লাগিতেছে, আপনারা আমার একটা কথা শুনুন। আমি একজন পরিবার পরিজন ওয়ালা ব্যক্তি ছিলাম। জান্নাতুল বাকী হইতে কাঠ কাটিয়া আনিতাম। একদিন আমি রেশমী কাপড় পরিহিতা জনৈক যুবককে দেখিলাম যে জুতা হাতে করিয়া সে

যাইতেছে। আমি তাহাকে পাগল মনে করিয়া তাহার কাপড় ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। সে বলিল যাও আল্লার হেফাজতে থাক আমি দুইবার তিনবার যখন চেষ্টা করিলাম তখন সে বলিল তুমি কি নিশ্চয় আমার কাপড় ছিনাইয়া নিতে চাও? আমি বলিলাম নিশ্চয় নিব। যুবকটি আঙ্গুল উঠাইয়া আমার চোখের দিকে ইশারা করিল সঙ্গে সঙ্গে আমার দুইটি চক্ষু খুলিয়া পড়িয়া গেল আমি তাহাকে কছম দিয়া বলিলাম বলুনত আপনি কে? তিনি বলিলেন আমি ইব্রাহীম খাওয়াছ ছাহেবে রওজ বলেন হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ তাঁহার ডাকাতদের জন্য অন্ধ হইবার দোয়া করিয়াছিলেন আর হজরত ইব্রাহীম আদহাম ডাকাতদের জন্য জান্নাতের দোয়া করিয়াছিলেন। হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বুঝিয়াছিলেন, শাস্তি ব্যতীত চোর তওবা করিবে না। তাই তিনি শাস্তি দিয়া তওবা করাইলেন।

(১১) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি ছনআ লইতে যখন হজ্বের জন্য রওয়ানা হই তখন আমাকে বিদায় দিবার জন্য বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল আপনি যখন মদীনা শরীফ যাইবেন তখন হুজুরের খেদমতে ও শায়খাইনের খেদমতে আমার ছালাম পৌঁছাইবেন। ঘটনা চক্রে সেই লোকটির কথা আমি ভুলিয়া যাই, ফিরিবার পথে জুল হোলায়ফা আসিয়া লোকটির কথা মনে পড়িলে আমি কাফেলার লোকদিগকে বলিলাম আপনারা চলিতে থাকুন: আমি একটি কাজ ভুলিয়া আসিয়াছি। কাজেই আমাকে আবার মদীনায় যাইতে হইবে। এই বলিয়া আমার উট সহ তাহাদের সপর্দ করিয়া আমি মদীনা শরীফ ফিরিয়া গেলাম এবং হুজুর ও শায়খাইনের খেদমতে সেই লোকটির ছালাম পৌঁছাইলাম, মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আমি শুনিতে পাইলাম কাফেলা রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। তখন রাত্রি হইয়া যাওয়াতে আমি মসজিদে গিয়া শুইয়া রহিলাম। মনে মনে ভাবিলাম মক্কাগামী কোন কাফেলা পাইলে তাহাদের সহিত রওয়ানা হইয়া যাইব শেষ রাত্রে আমি হুজুর পাক (ছঃ) ও হজরত ছিদ্দীক ও হজরত ওমরকে স্বপ্ন দেখিলাম। হজরত ছিদ্দীক বলেন, হুজুর এই সেই ব্যাক্তি। হুজুর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আবুল ওফা। আমি বলিলাম হুজুর আমার কুনিয়ত আবুল আব্বাছ। হুজুর ফরমাইলেন তোমার নাম আবুল ওফা। অর্থাৎ ওয়াদা পুরা করনেওয়ালা। তারপর হুজুর আমার হাত ধরিয়া আমাকে মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমি মক্কা শরীফে আট দিন থাকার পর কাফেলার সাথীরা মক্কায় আসিয়া আমার সহিত

একত্র হন।

(১২) আবু এমরান ওয়াছেতী (রঃ) বলেন, আমি মক্কা শরীফ হইতে মদীনা শরীফের দিকে হুজুরের এবং শায়খাইনের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম পথিমধ্যে আমার এত বেশী পিপাসা লাগে যে প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া আমি একটি বাবুল গাছের তলায় বসিয়া পড়ি। হঠাৎ একজন ঘোড় ছওয়ার আমার সামনে আসিয়া হাজির হয়। তাহার ঘোড়া; লেগাম, জিন সব-কিছু সবুজ রং-এর ছিল। সেই ছওয়ার সবুজ গ্লাসে করিয়া সবুজ রং-এর শরবত আমার সামনে পেশ করিল। আমি উহা তিনবার করিয়া পান করিলাম কিন্তু গ্লাসের শরবত একটু ও কমিল না। লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল আপনি কোথায় যাইতেছেন আমি বলিলাম হুজুরে পাক (ছঃ) ও তাঁহার সাথী দ্বয়কে ছালাম করিবার জন্য আমি মদীনায় যাইতেছি। তিনি বলিলেন আপনি যখন মদীনায় গিয়া তাঁহাদিগকে ছালাম করিবেন তখন তাঁহাদের খেদমতে আরজ করিবেন যে রেজওয়ান ফেরেশতা আপনাদের খেদমতে ছালাম বলিয়াছেন।

রেজওয়ান ঐ ফেরেশ্তাকে বলা হয় যিনি বেহেশ্তের নাজেম হইবেন।

(২৩) বিখ্যাত ছুফী ও বুজর্গ হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রঃ) ৫৫২ হিজরী সনে হজ্ব সমাপন করিয়া জিয়ারতের জন্য মদীনায় হাজির হন। কবর শরীফের সামনে দাঁড়াইয়া এই দুইটা বয়াত পড়েন—

فى حالة البعد روحى كنت ارسلها
تقبل الارض عنى وهى نائبتى
وهذه دولة الاشباح قد حضرت
فامدد يمينك كى تحظى بها شفتى

"দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম, সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ আমি শশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হুজুর আপন দস্ত মোবারক বাড়াইয়া দিন যেন আমার ঠোঁট উহাকে চুম্বন করিয়া তৃপ্তি হাছেল করিতে পারে।"

বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে, এবং হজরত রেফায়ী (রঃ) উহাকে চুম্বন করিয়া ধন্য হন। বলা হয় যে, সেই সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মোবারকের চমক দেখিতে পায়।

তাঁহাদের মধ্যে মাহবুবে ছোবহানী হজরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ) ও ছিলেন।

(১৪) ছাইয়্যেদ নুরুদ্দিন আইজী শরীফ সম্পর্কে বলা হয় যে তিনি রওজায়ে মোবারক পৌঁছিয়া যখন আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অরহমাতুল্লাহে অবারাকাতুহু বলেন তখন উপস্থিত সকলেই শুনিতে পান যে কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসে অ-আলাইকাচ্ছালামু ইয়া অলাদী।

(১৫) শায়েখ আবু নছর আবদুল ওয়াহেদ কারাখী বলেন, আমি হজ্ব সম্পাদন করিয়া জিয়ারতের জন্য হাজির হই। হুজরা শরীফের নিকট আমি বসা ছিলাম। ইত্যবসারে সেখানে দিয়ারে বিকরের শায়েখ আবু-বকর আসিয়া কবর শরীফে ছালাম করেন আচ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছূলাল্লাহ! তখন কবর শরীক হইতে উত্তর আসে অ-আলাইকাচ্ছালামু ইয়া আবা বকরিন। এই উত্তর উপস্থিত সমস্ত লোকেই শুনিয়াছিল।

(১৬) ইউছুফ বিন আলী বলেন, জনৈক হাশেমী মেয়েলোক মদীনায় বাস করিত। তাহার কয়েকজন খাদেম তাহাকে বড় কষ্ট দিত। সে হুজুরের দরবারে ফরিয়াদ লইয়া হাজির হইল। রওজা শরীফ হইতে আওয়াজ আসিল তোমার জন্য কি আমার মধ্যে নিদর্শন পাও নাই। অর্থাৎ তুমি ছবর কর যেমন আমি ছবর করিয়াছিলাম। মেয়েলোকটি বলে যে এই শান্তনা বাণী শুনিয়া আমার যাবতীয় দুঃখ মুছিয়া গেল ওদিকে ঐ তিনজন বদ আখলাক খাদেম মরিয়া গেল।

(১৭) হজরত আলী বলেন, আমরা যখন হুজুরকে দাফন করিলাম তখন জনৈক বদ্দু কবরের উপর আসিয়া পড়িয়া গেল এবং আরজ করিল হে আল্লার রাছূল আপনি যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা শুনিয়াছি আল্লাহ পাক আপনার উপর নাজেল করিয়াছেন—

"মানুষ নিজের নফছের উপর জুলুম করিয়া যদি আপনার নিকট আসিয়া আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নবীও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহেন তবে আল্লাহ তায়ালাকে তাহারা নিশ্চয় তওবা কবুল করনে-ওয়ালা এবং দয়ালু পাইবে।"

তারপর সেই বদ্দু বলিল নিশ্চয় আমি নফছের উপর জুলুম করিয়াছি এবং এখন আপনার দরবারে মাগফিরাতের আশায় হাজির হইয়াছি। এই কথার পর কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসিল নিশ্চয় তোমাকে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(১৮) হজরত আবদুল্লা বিন ছালাম বলেন, শত্রুগণ যখন হজরত

ওছমানকে অবরোধ করিয়াছিল তখন আমি ছালাম করিবার জন্য তাঁহার নিকট যাই। তিনি বলিলেন আসিয়াছ বেশ ভালই করিয়াছ ভাই। আমি এই জানালা দিয়া হুজুরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছি। হুজুর আমাকে বলিলেন এইসব লোকেরা কি তোমাকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে আমি বলিলাম জী হাঁ। হুজুর বলিলেন তাহারা কি পানি বন্ধ করিয়া তোমাকে পিপাসিত রাখিয়াছে ? আমি বলিলাম জী হুজুর। তারপর হুজুর (ছঃ) আমাকে এক বাল্‌তি পানি দিলেন। আমি খুব তৃপ্তি সহকারে পান করি। যেই পানির শীতলতা আমার বুকের মধ্যে আমি এখনও অনুভব করিতেছি। তারপর হুজুর এরশাদ করেন তুমি যদি চাও শত্রুর মোকাবেলায় তোমাকে সাহায্য করা হইবে আর তোমার মনে চায় তবে আমার নিকট আসিয়া ইফতার করিতে পার। আমি বলিলাম হুজুর আমি আপনার খেদমতে হাজির হইতে চাই। সেই দিনই তিনি শহীদ হইয়া যান। রাজিয়াল্লাহু আনহু।

(১৯) মক্কা শরীফে এব্‌নে ছাবেত নামক এক বুজর্গ বাস করিতেন। ষাট বৎসর যাবত তিনি হুজুরের জিয়ারতের জন্য মদীনা শরীফ গমন করিতেন। ঘটনা ক্রমে এক বৎসর তিনি যাইতে পারেন নাই। একদিন নিজের কামরায় বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন, হঠাৎ হুজুরের জিয়ারত নছীব হইল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করিলেন, এব্‌নে ছাবেত তুমি আমার জিয়ারতের জন্য যাও নাই এই জন্য আমি তোমার জিয়ারতের জন্য আসিয়াছি।

(২০) হজরত ওমরের জমানায় একবার মদীনা শরীফে ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছিল। জনৈক ব্যক্তি হুজুরের কবর শরীফে হাজির হইয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্ আপনার উম্মত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন। লোকটি হুজুরের জিয়ারত লাভ করিল। হুজুর (ছঃ) বলিলেন ওমরের নিকট গিয়া আমার ছালাম পৌঁছাইয়া বল যে বৃষ্টি হইবে তার এই কথাও বলিয়া দাও যে, সে যেন বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ করে। সেই ব্যক্তি হজরত ওমরের খেদমতে গিয়া হুজুরের পয়গাম পৌঁছাইল। শুনিয়া হজরত ওমর কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে খোদা ! আমিত নিজের শক্তি অনুসারে কোন ত্রুটি করিতেছিনা। (ওফা)

(২১) মোহাম্মদ বিন মোনকাদের বলেন, এক ব্যক্তি আমার বাবার নিকট আশীটি আশরাফী আমানত রাখিয়া জেহাদে চলিয়া যায়, এবং ইহাও বলিয়া যায় যে প্রয়োজন হইলে খরচ করিবেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া নিয়া নিব। লোকটির যাওয়ার পর মদীনা শরীফে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আমার বাবা টাকাগুলি খরচ করিয়া ফেলেন। লোকটি জেহাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার নিকট নিজের টাকাগুলি ফেরত

চাহিল। আমার পিতা আগামী কাল দিবার ওয়াদা করিলেন। রাত্রি বেলায় কবর শরীফের এবং মিম্বর শরীফের নিকট খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে থাকেন। ফজরের সময় একটু একটু অন্ধকার থাকিতে কেহ বলিল আবু মোহাম্মদ এই যে লও। আমার পিতা হাত বাড়াইয়া লইলেন। লোকটি একটি থলে দিল উহার মধ্যে আশীটা আশরাফী ছিল।

(২২) আবু বকর এবনে মুক্করী বলেন আমি ইমাম তিবরানী এবং আবু শায়েখ মদীনা শরীফে ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছিলাম। রোজার উপর রোজা রাখিতাম। রাত্রি বেলায় হুজুরের কবর শরীফে গিয়া ক্ষুধার বিষয় অভিযোগ করিলাম। ফিরিবার সময় তিবরানী বলেন বসিয়া পড় হয় কিছু খানা আসিবে না হয় মৃত্যু আসিবে। এবনে মোনকাদের বলেন, আমি এবং আবু শায়েখ দাঁড়াইয়া গেলাম। তিবরানী বসিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছিল হঠাৎ একজন আলাভী দরজা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিল আমরা দরজা খুলিয়া দিলাম, দেখিলাম তাহার সহিত দুইজন গোলাম তাহাদের হাতে বড় বড় দুইটা থলিয়া। সেখানে হইতে আমাদিগকে খাওয়াইলেন এবং বাকী সব আমাদের জন্য রাখিয়া আলাভী বলিয়া গেলেন, তোমরা হুজুরের নিকট অভিযোগ করিয়াছ আমি স্বপ্নযোগে হুজুর হইতে তোমাদের নিকট কিছু পৌঁছাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছি।

(২৩) এবনে জালা বলেন আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় বড় অভাবের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। হুজুরের কবরের নিকট গিয়া আরজ করিলাম, হুজুর! আমি আপনার মেহমান, ইত্যবসারে আমার একটু চোখ লাগিয়া আসিল। হুজুর আমাকে একটা রুটি দিলেন, আমি উহার অর্দ্ধেক খাইলাম। জাগ্রত হইয়া দেখি বাকী অর্দ্ধেক আমার হাতে।

(২৪) ছুফী আবু আবদুল্লাহ বিন আবি জোরআ বলেন আমি একবার আমার পিতার সঙ্গে মক্কা শরীফ যাই। আমরা ভীষণ অভাব গ্রস্থ ছিলাম ঐ অবস্থায় মদীনা শরীফ চলিয়া যাই। রাত্রি বেলায় ক্ষুধায় চট্‌পট্‌ করিতে থাকি, আমি নাবালেগ ছিলাম বারংবার পিতার নিকট ক্ষুধার কথা বলিতেছিলাম। আমার পিতা কবর শরীফের নিকট গিয়া বলিলেন, হুজুর আমরা আজ আপনার মেহমান এই বলিয়া তিনি মোরাকাবায় বসিয়া গেলেন। অনেক ক্ষণ পর তিনি মাথা উঠাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং হাসিয়া উঠিলেন। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলেন আমার

হুজুরের জিয়ারত নছীব হইয়াছে। হুজুর (ছঃ) আমাকে কিছু দেরহাম দান করিয়াছেন। দেখা গেল যে তাহার হাতে অনেকগুলি দেরহাম রহিয়াছে। ছুফীজী বলেন আল্লাহ পাক উহাতে এত বরকত দান করিয়াছেন যে সিরাজ ফিরিয়া যাওয়া পর্যান্ত আমরা উহা হইতে খরচ করিতে থাকি।

(২৫) শায়েখ আহমদ বলেন আমি তের মাস পর্যন্ত ময়দানে জঙ্গলে পেরেশান অবস্থায় ফিরিতে থাকি। উহাতে আমার শরীরের চামড়া পর্যান্ত খশিয়া যায়। অবশেষে হুজুরের ও শায়খাইনের খেদমতে ছালাম করিতে যাই। রাত্রি বেলায় হুজুর (ছঃ) স্বপ্নে আমাকে বলেন আহমদ তুমি আসিয়াছ? আমি বলিলাম হুজুর আমি আসিয়াছি? আমি বড় ক্ষুধার্ত, আমি হুজুরের মেহমান, হুজুর বলিলেন দুই হাত খোল। আমি দুই হাত খুলিলে দেরহাম দিয়া উহাকে ভর্তী করিয়া দিলেন, জাগ্রত হইয়া দেখি আমার হাত দেরহামে ভর্তী। আমি উহা দ্বারা কিছু খাইয়া আবার জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হইলাম।

(২৬) ছাবেত বিন আহমদ বলেন তিনি একজন মোয়াজ্জেনকে মসজিদে নববীতে আজান দিতে দেখিয়াছিলেন। মোয়াজ্জেন যখন আচ্ছালাতু খায়রুম মিনাওম বলিল তখন একজন খাদেম আসিয়া তাহাকে একটি থাপ্পড় মারিল। মোয়াজ্জেন কাঁদিয়া উঠিয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আপনার উপস্থিতিতে আমার উপর এইরূপ হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে সেই খাদেমের শরীর অবশ হইয়া গেল। লোকজন তাহাকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তিন দিন পর সে মরিয়া গেল।

(২৭) ছাইয়েদ আবু মোহাম্মদ হোছাইনী বলেন আমি মদিনা শরীফে তিন দিন পর্যন্ত ভুকা ছিলাম, অতঃপর মিম্বর শরীফের নিকট গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া হুজুরের দরবারে আরজ করিলাম, দাদাজান আমি ভুকা আছি এবং ছরিদ খাইতে আমার দিল চায়। তারপর আমি শুইয়া পড়িলাম। ক্ষনেক পর একজন লোক আসিয়া আমাকে জাগাইল এবং একটি পেয়ালায় করিয়া ছরীদ পেশ করিল যেখানে খুব গোশত, ঘি এবং খুশবু ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কোথা হইতে আসিল। সে বলিল আমার সন্তানগন তিন দিন পর্যন্ত ইহা খাইতে চায়। অবশেষে আল্লাহ পাক ব্যবস্থা করিয়াছেন আমি উহা পাক করিয়া শুইয়া পড়ি। খাবে আমার নবীজীকে দেখিতে পাই যে তিনি বলিতেছেন মসজিদে তোমার এক ভাই ছরিদ খাইতে চায় তাহাকে ও কিছু দিয়া দাও।

(২৮) শায়েখ আবদুছ ছালাম বিন আবিলকাছেম বলেন আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি মদিনা শরীফে উপস্থিত ছিলাম।

আমার নিকট খাওয়ার মত কিছুই ছিল না। ইহাতে আমি খুব দুর্বল হইয়া গেলাম ও হুজুরের খেদমতে গিয়া আরজ করিলাম হে দোজাহানের সর্দার! আমি মিসরের বাসিন্দা পাঁচ মাস পর্য্যন্ত হুজুরের খেদমতে পড়িয়া আছি। এখন হুজুরের খেদমতে আরজ করিতেছি যে আমার খাওয়ার খবর নেয় এমন একজন লোকের ব্যবস্থা করিয়া দিন অথবা আমাকে দেশে ফিরিবার এন্তেজাম করিয়া দিন। হঠাৎ একজন লোক হুজরা শরীফের নিকট আসিয়া কি যেন বলিয়া অবশেষে আমার নিকট আসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল আমার সহিত চল। সে আমাকে লইয়া বাবে জিব্রিল দিয়া বাহির হইয়া জান্নাতুল বাকীর অপর দিকে একটি তাবুর মধ্যে লইয়া গেল সেখানে নিয়া খানা পাকাইয়া আমাকে খুব তৃপ্তি সহকারে খাওয়াইল। পরে সে আমাকে দুইটি থলিয়ার মধ্যে প্রায় সের পরিমান খেজুর দিয়া বলিল তোমাকে কছম দিয়া বলিতেছি দাদা আব্বার নিকট তুমি আর অভিযোগ করিবে না ইহাতে তাঁহার কষ্ট হয়। যখনই তোমার খানা শেষ হইয়া যাইবে তোমার নিকট আবার নুতন খানা পৌছিবে। এই বলিয়া সে খেজুরের থলিয়া আপন গোলামকে হুজরা শরীফ পর্য্যন্ত দিয়া আসিতে বলেন। আমি চার দিন পর্য্যন্ত উহা হইতে খাইতে থাকি। উহার খেজুর শেষ হওয়ার পর সেই গোলাম আবার খানা পৌছাইয়া যাইত। এই ভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর ইয়াম্বুগামী একটি কাফেলার সহিত আমি দেশে চলিয়া যাই।

(২৯) আবুল আব্বাছ এবনে নফছ মুকরী একজন অন্ধ ছিলেন। তিনি বলেন আমি তিন দিন পর্য্যন্ত মদীনা শরীফে ভুকা অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে খুব দুর্বল হইয়া হুজুরের খেদমতে আরজ করিলাম যে হুজুর আমি খুধায় কষ্ট পাইতেছি দুর্বলতায় আমি শুইয়া পড়িলাম। এমতাবস্থায় একটি মেয়ে আসিয়া পায়ের দ্বারা আমাকে জাগাইল ও আমাকে তাহার ঘরে লইয়া গেল। এবং আটার রুটি ঘি এবং খেজুর খাইতে দিল। মেয়েটি বলিল আবু আব্বাছ খাও! আমার দাদাজান তোমাকে খাওয়াইতে বলিয়াছেন যখনই ক্ষুধা পাইবে আমাদের এখানে আসিয়া খাইয়া যাইও।

(৩০) জনৈক ব্যক্তি খোরাছান হইতে প্রতি বৎসর হজ্ব করিতে আসিত এবং মদিনায়ে মোনাওয়ারা পৌছিয়া ছাইয়েদ তাহের আলাভীর খেদমতে হাদিয়া পেশ করিত। মদিনার অন্য এক ব্যক্তি খোরাছানীকে বলিল তুমি তাহের আলাভীকে অনর্থক টাকা পয়সা দিতেছ সে গোণাহের কাজে সব উড়াইয়া ফেলে, ইহা শুনিয়া খোরাছানী তাহের ছাহেবকে কিছুই দিল না।

এবং পরের বৎসরও কিছু না দিয়া অন্যান্য লোকদের উপর দান খয়রাত করিয়া গেল। তৃতীয় বৎসর হজ্বে রওয়ানা হওয়ার সময় খোরাছানী হুজুরে পাক (দঃ) কে স্বপ্নে দেখে। হুজুর বলিতেছেন তুমি শত্রুর কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহেরের অজিফা বন্ধ করিয়া দিয়াছ। সাবধান এমন যেন না হয়। পাছেরগুলি ও আদায় করিয়া দিবা ভবিষ্যতেও সম্ভব মত দিতে থাকিও। ইহাতে খোরাছানী ভীত হইয়া তিন বৎসরের অজিফা ছয় শত আশরাফী একটি থলিতে ভরিয়া হজ্বে রওনা হয়, মদীনা পৌছিয়া ছাইয়্যেদ তাহেরের বাড়ীতে গিয়া দেখে যে সেখানে লোকজনের খুব ভীড়। সৈয়দ ছাহেব তাহাকে দেখিয়া বলেন আসুন আমাকে ছয় শত আশরাফী দিয়া দিন। আপনি শত্রুর কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার অজিফা বন্ধ করিয়া দিয়া ছিলেন। আমি প্রথম বৎসর খুব অসুবিধায় পড়িয়া যাই এবং পরের বৎসর আপনার আসা যাওয়া লক্ষ্য করিতে থাকি। ইহাতে আমি মনে খুব ব্যথা অনুভব করি এবং হুজুরে পাক আমাকে স্বপ্নযোগে শান্তনা দিয়া বলেন আমি আমার অমুক খোরাছানীকে সাবধান করিয়া দিয়াছি। অদ্য আপনাকে দেখিয়াই মনে হয় যে নিশ্চয় হুজুরের ইশারায় আপনি আমার জন্য আশ-রাফী নিয়া আসিয়াছেন। খোরাছানী তাহার হাতে ছয়শত আশরাফীর থলি দিয়া তাঁহার হাতকে চুম্বন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

(৩১) একজন মহিলা আম্মাজান আয়শার খেদমতে আসিয়া বলিলেন আমাকে হুজুরের কবর জিয়ারত করাইয়া দিন। হজরত আয়শা কবর শরীফের পর্দা সরাইয়া দিলেন ও মেয়েলোকটি জিয়ারত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে সেখানেই এন্তেকাল করিয়া গেল রাজিয়াল্লাহু আনহা।

(৩২) খালেদ বিন মা'দনের বেটী আবদা বলেন আমার বাবাজানের সব সময় অভ্যাস ছিল রাত্রে শুইবার সময় হুজুরের জিয়াতের আগ্রহে পেরেশান হইয়া যাইতেন এবং আনছার ও মোহাজেরীনদের নাম লইয়া লইয়া বলিতেন ইয়া আল্লাহ। ইহারা আমার মূল এবং শাখা। তাহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমার অন্তর অস্থির হইয়া আছে। হে খোদা! তাড়াতাড়ী মৃত্যু দিয়া তাহাদের সহিত মিলিবার সুযোগ দিয়া দাও। এই সব কথা বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িতেন।

(৩৩) ওছমান বিন হানীফ বলেন জনৈক ব্যক্তি হজরত ওছমানের

খেদমতে গিয়া নিজের কোন জরুরতের কথা পেশ করিল। ইহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। লোকটি বারংবার গিয়া নৈরাশ হইয়া অবশেষে ওছমান বিন হানীফের নিকট সেকায়েত করিল। তিনি বলিলেন তুমি মসজিদে নব্বীতে গিয়া দুই রাকাত নফল পড়িয়া এই দোয়া পড়িয়া আল্লার দরবারে হাজত পুরা হইবার প্রার্থনা কর। দোয়া এই—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَیْكَ بِنَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ ص نَبِیِّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰی رَبِّكَ اَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِیْ۔

লোকটি এই আমল করিয়া হজরত ওছমানের দরবারে গেল। এবারে তিনি তাহার কাজ করিয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে ও প্রয়োজন হইলে আসিতে বলিলেন। এই দোয়ার মধ্যে হুজুরের উছিলায় হাজত পূর্ণ হইবার দরখাস্ত রহিয়াছে।

(৩৪) আবদুল্লা বিন মোবারক বলেন আমি ইমাম আবু হানীফার নিকট শুনিয়াছি, যখন আইউব ছখতিয়াবী (রাঃ) মদীনা শরীফে হাজির হন তখন আমি মদীনায় ছিলাম। আমি মনে করিলাম তিনি কিভাবে কবর শরীফে হাজির হন আমি দেখিতে থাকিব। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি কেবলার দিকে পিঠ করিয়া হুজুরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলেন ও ভীষণ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

بے زبانی ترجمانِ شوقِ بے حد ہو تو ہو
ورنہ پیشِ یار کام آتی ہیں تقریریں کہاں

(৩০) বর্ণিত আছে গ্রানাডার এক ব্যক্তি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারগণ পর্যন্ত নৈরাশ হইয়া তাহার জীবনের আশা ত্যাগ দেয়। উজীর আবু আবদুল্লাহ কয়েকটি বয়াতসহ হুজুর (ছঃ)-এর খেদমতে একটি পত্র লিখিয়া হাজীদের কাফেলার সাথে পাঠাইয়া দেয়। লোকটির স্বাস্থ্যের জন্য যখন ঐ পত্রটি হুজুরের কবর শরীফের নিকট পড়া হয় তখনই সে পূর্ণ স্বাস্থ লাভ করিয়া ভাল হইয়া যায়।

(৩৬) হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন আমার পিতা হজরত আবুবকর (রাঃ) মৃত্যু শয্যায় অছিয়ত করেন যে আমার মৃত্যুর পর আমার লাশ হুজুরের কবর শরীফের নিকট নিয়া আরজ করিবে যে ইয়া রাছুলাল্লাহ। ইহা আবুবকরের লাশ। অনুমতি হইলে আপনার নিকট সমাহিত হইতে চায়, এজাজত পাইলে তোমরা আমাকে সেখানে দাফন করিও নচেত মুছলমানদের সাধারণ কবর স্থান বাকীতে দাফন করিও। তাঁহার অছিয়াত মোতাবেক সেখানে নিয়া যখন অনুমতি চাওয়া হইল তখন ভিতর হইতে একটা আওয়াজ আসিল। দোস্তকে দোস্তের নিকট ইজ্জত ও একরামের সহিত পৌঁছাইয়া দাও। (খাছায়েছে কোবরা)

(৩৭) বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর যাবত তাকবীরে উলার সহিত জামাতে নামাজ আদায় করেন। এবং পঞ্চাশ বৎসর যাবত এশার অজু দিয়া ফজর আদায় করেন। ৬৩ হিজরীতে এজীদের লস্করের সহিত মদীনাওয়ালাদের যুদ্ধ হয়। যাহাকে হাররার যুদ্ধ বলা হয়। সতের শত বিশিষ্ট আনছার ও মোহাজেরীন ও সেই যুদ্ধে দশ হাজার সাধারণ মুছলমান শহীদ হন। মদীনার মছজিদে সৈন্যদের ঘোড়া দৌড়াইত। সেই ভীষণ দুর্যোগের সময় হজরত ছায়ীদ বিন মোছাইয়েব একা একা মসজিদে নববীতে নামাজ পড়িতে থাকিতেন। তিনি বলেন যতদিন পর্য্যন্ত কোন লোক মসজিদে আশা শুরু করে নাই ততদিন আমি প্রত্যেক নামাজের সময় আজান এবং একামতের শব্দ কবর শরীফ হইতে শুনিতে পাইতাম। (খাছায়েছে কোব্‌রা)

কবর শরীফের সাথে বে-আদবী করার পরিণাম

(৩৮) আমীরুল মোমেনীন হজরত মোয়াবিয়ার আমলে তাঁহার ইশারায় অথবা মদীনার গভর্ণর মারওয়ানের নিজস্ব খেয়ালে ইচ্ছা হইল যে হুজুরের মিম্বর শরীফ মদীনায়ে মোনাওয়ারা হইতে নিয়া দামেস্কের মসজিদে রাখা হইবে। এই জন্য মিম্বার খুলিতে আরম্ভ করা হইল। সেই সময় হঠাৎ মদীনায় সূর্য্য গ্রহণ দেখা যাইতে লাগিল। মারওয়ান ইহাতে ভীত হইয়া লোকজনের কাছে ওজর পেশ করিল যে আমীরুল মোমেনীন লিখিয়াছেন মিম্বর শরীফে উই লাগার সম্ভাবনা আছে তাই উহাকে উঁচু করিয়া দিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজমিস্ত্রী ডাকিয়া আসল মিম্বরের নীচে

আরও ছয়টি সিঁড়ি বানাইয়া মোট নয়টি সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (নোজহাত)

(৩১) ছোলতান নুরুদ্দিন বহুত বড় ন্যায় বিচারক ও মোত্তাকী বাদশাহ ছিলেন। রাত্রির অধিকাংশ তাহাজ্জুদ এবং আজিফায় কাটাইয়া দিতেন। ৫৫৭ হিজরীতে একদিন রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার পর স্বপ্নে দেখেন যে হুজুরে পাক (ছঃ) দুইজন নীল চক্ষু বিশিষ্ট লোকের দিকে ইশারা করিয়া বলিতেছেন যে ইহাদের দুষ্টামী হইতে আমাকে হেফাজত কর ছোলতান ঘাবড়াইয়া ঘুম হইতে উঠিয়া আবার নফল নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়িলেন এবারও প্রথমবারের মত স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া গেলেন। আবার উঠিয়া অজু করিয়া নফল পড়িলেন ও একটু তন্দ্রা আসার পর পুনরায় সেই স্বপ্ন দেখিলেন। এবার তিনি চিন্তা করিলেন আর ঘুমাইবার কোন অর্থ নাই, সঙ্গে সঙ্গে রাত্রি বেলাই তাঁহার নেকবখত ও বুজুর্গ উজীর জামালুদ্দিনকে ডাকিয়া সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। উজীর বলিলেন, আর কাল বিলম্ব না করিয়া মদীনায় রওয়ানা হওয়া উচিত। আর এই স্বপ্নের কথা কাহারও নিকট বলা যাইবে না। বাদশাহ্ রাত্রি বেলায়ই প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন এবং সেই উজীর ব্যতীত আরও বিশজন বিশ্বস্ত খাদেমকে সঙ্গে করিয়া বহু মাল-পত্র সহকারে মদীনা পাকের দিকে রওয়ানা হইলেন। দ্রুতগামী উটে আরোহণ করিয়া তাঁহারা মিশর হইতে ষোল দিনে মদীনায় গিয়া পৌছিলেন। মদীনার বাহিরে গিয়া তিনি গোছল করিলেন ও জিয়ারেত আদব এবং এহ্‌তেমামের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিয়া রওজায় গিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে, এখন কি করা যায় ওদিকে উজীর ঘোষণা করিয়া দিল যে বাদশাহ জিয়ারত করিতে আসিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত মদীনা বাসীর উপর তিনি দান খয়রাত করিবেন। ঘোষণা শুনিয়া দলে দলে লোকজন আসিয়া বাদশার দান গ্রহণ করিতে লাগিল। বাদশাহ খুব বিচক্ষণতার সহিত সেই স্বপ্নে দেখা দুইজন লোককে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায়, সমস্ত মদীনাবাসী দান গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেল তবুও সেই দুইটি লোকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বাদশাহ খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, এবং কোন লোক বাকী রহিয়াছেন কিনা খোঁজ খবর নিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে দুইজন মাগরেবী বুজুর্গ রহিয়া গিয়াছে তাহারা কিন্তু কাহার ও দান গ্রহণ করে না বরং মদীনাবাসীর উপর অকাতরে দান করিয়া থাকে। প্রতিদিন জান্নাতুল বাকীতে যায় এবং প্রতি শনিবার মসজিদে কোবায় গমন করে। বাদশাহ

তাহাদিগকে ডাকিলেন ও দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। বাদশাহ তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল আমরা মাগরিবের বাসিন্দা হজ্ব করিতে আসিয়াছিলাম। এখন বাকী জীবন হুজুরের প্রতিবেশী হইয়া থাকিতে মনস্থ করিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন সত্য সত্য বল। তাহারা আগের মত উত্তর দিল। অবশেষে বাদশাহ তাহাদের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে রওজার পার্শ্বের একটি রিবাতে তাহারা বাস করে। বাদশাহ তাহাদিগকে সেখানে রাখিয়া স্বয়ং তাহাদের বাসস্থানে গিয়া খুব অনুসন্ধান করিলেন, সেখানে অনেক মাল-পত্র এবং কিতাব পাইলেন। কিন্তু স্বপ্নের বিষয় বস্তু সম্পর্কে কোন কিছুই পাইলেন না। বাদশাহ ভীষণ চিন্তায় ও পেরেশানীতে পড়িয়া গেলেন। মদীনাবাসীও তাহাদের সুপারিশের জন্য আগাইয়া আসিতে লাগিল যে ইহারা বেশ বুজুর্গ লোক। দিনে রোজা রাখে ও রাত্রি বেলা নামাজে কাটাইয়া দেয়। গরীব দুঃখীদিগকে খুব সাহায্য সহযোগিতা করে। বাদশাহ পেরেশান অবস্থায় এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি তাহাদের চাটাইয়ের উপর বিছান নামাজের মছল্লা উঠাইলেন। দেখিলেন উহার নীচে একটা পাথর বিছান রহিয়াছে। উহাকে উঠাইয়া দেখিতে পাইলেন, নীচের দিকে একটা সুড়ঙ্গ পথ। যাহা অনেক দূর চলিয়া গিয়া কবর শরীফের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। বাদশাহ রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ও তাহাদিগকে পিটাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঘটনা কি হইয়াছে সত্য সত্য বর্ণনা কর। তাহারা এবার স্বীকার করিল আমরা দুইজন খৃষ্টান। খৃষ্টান বাদশাহ আমাদিগকে বহু ধন-রত্ন দিবার ওয়াদা করিয়া পাঠাইয়াছে যে, আমরা যেন নবীজীর লাশ মোবারককে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া যাই। আমরা রাত্রি বেলায় যখন কাজ করি তখন দুইটি চামড়ার মশকে ভর্তি করিয়া ঐ মাটি জান্নাতুল বাকীতে ফেলিয়া আসি। বাদশাহ আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করিলেন ও তাহাকে যে এতবড় খেদমতের জন্য কবুল করা হইল সেই জন্য খুব বেশী করিয়া কাঁদিলেন। অবশেষে সেই পাপাচার লোক দুইটিকে হত্যা করিয়া দেওয়া হইল এবং হুজুরের কবর শরীফের চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করাইয়া তথায় রাঙ সীসা গলাইয়া ভর্তি করাইয়া দিলেন যেন ভবিষ্যতে আর কেহ হুজুরের কবর পর্যন্ত যাইতে না পারে।

(৪০) শায়েখ শামছুদ্দিন ছাওয়াব যিনি হারামে নববীর খাদেমগণের

সর্দার ছিলেন। তিনি বলেন যে, আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল। মদীনার গভর্ণরের নিকট তাহার বেশ আনাগোনা ছিল। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকেও সে গভর্ণর পর্যান্ত পৌছাইত। একদিন সেই বন্ধু আমার নিকট আসিয়া খবর দিল যে, ভাই আজ একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ব্যাপার হইল এই যে হলবের কিছু সংখ্যক লোক গভর্ণরের নিকট আসিয়া তাহাকে ধন-রত্ন ঘুস দিয়া রাজী করাইয়াছে যে হজরত আবুবকর ছিদ্দীক ও হজরত ওমরের লাশ মোবারক মসজিদে নববী হইতে উঠাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে সে যেন তাহাদিগকে সাহায্য করে। শায়েখ ছাওয়াব বলেন এই মারাত্মক ঘটনা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর কাঁপিয়া গেল। পেরেশানীর অন্ত রহিল না। আমি চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়ি, ইত্যবসারে গভর্ণরের বিশেষ লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। আমীর আমাকে বলিয়া দিল, আজ রাত্রে কিছু সংখ্যক লোক মসজিদে গমন করিবে তাহারা যেই কাজই করে উহাতে তুমি কোন বাঁধা দিবা না। আমি আচ্ছা ঠিক আছে বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু সারাদিন হুজরা শরীফের পিছনে বসিয়া কাঁদিতে-ছিলাম এক মূহূর্তের জন্যও আমার কান্না থামে নাই। আর আমার উপর কি হাশর গোজারিয়া যাইতেছিল সেই বিষয় কাহারও কোন খবরই ছিল না। অবশেষে এশার নামাজের পর যখন সমস্ত লোক চলিয়া যায়, আমি ও সমস্ত দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ফেলি তখন বাবুচ্ছালাম দিয়া যাহা আমীরের বাড়ীর কিছুটা নিকটে ছিল একদল লোক মসজিদে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি একজন একজন করিয়া দেখি তাহারা মোট চল্লিশজন ছিল, প্রত্যেকের হাতে কোদাল টুকরি এবং মাটি কাটার যন্ত্রপাতি। তাহারা মসজিদে প্রবেশ করিয়া সোজা কবর শরীফের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। খোদার কছম! তাহারা মিম্বরের নিকটেও যাইয়া সারে নাই হঠাৎ সমস্ত সাজ-সরঞ্জামসহ সেখানের জমীন তাহাদিগকে এমনভাবে গিলিয়া ফেলে যে তাহাদের আর কোন নাম নিশানাও দেখিতে পাইলাম না। ওদিকে আমীর দীর্ঘক্ষণ পর্যান্ত তাহাদের অপেক্ষা করিয়া আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা ছাওয়াব! ঐ সমস্ত লোক কি এখন ও তোমার নিকট পৌছে নাই? আমি বলিলাম, হাঁ আসিয়াছিল সত্য, তবে ঘটনা এইরূপ হইয়া গেল। আমীর বলিল দেখ কি বলিতেছ সাবধানে বল, আমি বলিলাম আপনি আমার সহিত চলুন তাহারা সেখানে দাবিয়া গিয়াছে আমি সেই স্থানও

আপনাকে দেখাইতে পারি। আমীর বলিল এই ঘটনা এখানেই যেন শেষ হইয়া যায়। কাহার ও নিকট প্রকাশ হইয়া গেলে তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। (অফায়ে আওয়াল)

হুজুর (ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখার তাৎপর্য

হুজুর ছঃ)-কে স্বপ্নে দেখার বিষয় কয়েকটি কথার উপর সকলকেই অবহিত হওয়া উচিত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যে আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে বাস্তবিকই আমাকে দেখিল। কারণ শয়তানের এমন কোন শক্তি নাই যে, আমার ছুরত ধরিয়া হাজির হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, যে জিনিষ দ্বারা দেখা হয় উহাত দর্শকের শরীরের একটা অঙ্গ। কাজেই দর্শকের মধ্যে দেখার যে যোগ্যতা, সেই যোগ্যতা অনুসারেই হুজুরকে দেখিয়া থাকে। যেমন বিভিন্ন রং-এর চশমা চোখে লাগাইয়া দেখিলে একই জিনিষকে বিভিন্ন রঙে দেখা যায়। লাল সবুজ পাত্রে পানি রাখিলে পানিকে ও লাল এবং সবুজ পাত্রে পানি রাখিলে ও লাল এবং সবুজ দেখা যায়। দুরবীন যন্ত্রের বিভিন্নতায় সেই বস্তুকেও ছোট বড় দেখা যায়। চক্ষুর কোন কোন অবস্থাভেদে একটি বস্তুকে দুইটি করিয়া দেখা যায়। ঠিক তদ্রূপ আমার প্রিয় নবীজীকে দেখার ব্যাপারে যদি কেহ হুজুরের শানের খেলাপ দেখিল তবে সেটা তার নিজেরই দেখার ত্রুটি। এইভাবে হুজুরের কাছ থেকে শরীয়তের কোন খেলাপ কথা শুনিলে শুনিবার ত্রুটি মনে করিতে হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিল হুজুর (ছঃ) তাহাকে অমুক কাজ করিতে হুকুম করিতেছেন বা নিষেধ করিতেছেন। তখন সেই কাজকে হাদীছ ও কোরানের সহিত মিলাইতে হইবে। মিলাইলে যদি দেখা যায় যে, উহা শরীয়তের হুকুম মোতাবেক তবে উহার উপর আমল করিবে আর শরীয়ত বিরোধী হইলে উহা প্রত্যাখ্যান করিবে। ঐ ছুরতে মনে করিতে হইবে যে খাব সত্য কিন্তু শয়তানের প্রভাবে কানে এমন শব্দ আসিয়াছে যাহা প্রকৃত পক্ষে হুজুর বলেন নাই। তাহজীবুল আছমা গ্রন্থে ইমাম নববী লিখিয়াছেন, যে হুজুরকে দেখিল সে সত্য সত্যই হুজুরকে দেখিল কারণ শয়তান হুজুরের ছুরত ধরিতে পারে না। কিন্তু খাবে যদি শরীয়তের খেলাপ আহকাম সম্পর্কে কিছু হুজুর বলিয়া থাকেন তবে তাহার উপর আমল করা জায়েজ নাই। উহা এইজন্য নয় যে খাবের মধ্যে কোন সন্দেহ আছে বরং এইজন্য যে ঘুমন্ত দর্শকের দৃষ্টি শক্তির উপর বিশ্বাস করিয়া শরীয়ত কোন হুকুম

দশম পরিচ্ছেদ

মদীনায়ে তাইয়্যেবার ফজীলত

সেই শহরকে আল্লাহ পাক আপন মাহবুব, দোজাহানের সর্দারের বাসস্থান হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন। সেই শহরের ফজীলতের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে উহাকে মাহবুবের জন্য পছন্দ করিয়াছেন। যেখানের অলি গলিতে আছমান হইতে অহী অবতীর্ণ হইত, যেখানে সকাল বিকাল ফেরেশ্তা কুলের সর্দার জিব্রাঈল মীকাঈলের আশা যাওয়া হইত, যাহার ময়দান সমূহ জিকির ও তাছবীহের দ্বারা গুঞ্জন করিতে থাকিত. যাহার মৃত্তিকা রাশী আমার প্রিয় হুজুরের শরীর মোবারককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যেখান হইতে দ্বীনের মশাল জ্বলিয়া সারা জগত আলোকিত হইয়াছে, যেখান হইতে দ্বীনের আহকাম এবং হুজুরের রাশি রাশি ছুন্নত ঝর্ণা ধারার মত প্রবাহিত হইয়া সারা বিশ্ব ভুবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে, যেখানের প্রতিটি ধূলি-কণা আমার প্রিয় নবীর এবং তাঁহার সহচরবৃন্দের কদম মোবারকের স্পর্শে ধন্য হইয়া সেই মহিয়ান ও পরিয়ান নগরীর মাঠ-ঘাঠ-প্রান্তর আর পাহাড় পর্বত কিছুই সর্বকালের সর্ব মানুষের জন্য পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপযোগী। অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাভরে উহার প্রতিটি ধূলি-কণা চুম্বন পাওয়ার উপযোগী। সেই মহিমান্বিত শহরের এবং উহার বিভিন্ন স্থানের পবিত্রতা হাদীছ শরীফও বহু জাওগায় বর্ণিত হইয়াছে।

(১) عن جابر بن سمرة رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى سمى المدينة طابة ـ (مسلم)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন এই মদীনা শহরের নাম তাবা রাখা হইয়াছে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে তৈয়্যেবা রাখা হইয়াছে। উহার অর্থ হইল পবিত্রতা অথবা উত্তম। যেহেতু এই শহর শেরেকের কলুষিতা হইতে পবিত্র অথবা উহার আবহাওয়া বসবাসের জন্য উত্তম। অতএব কারণে উহার এই নামকরণ হইয়াছে।

এবনে হাজার মক্কী মদীনা শরীফের প্রায় এক হাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পাঁচটি নাম প্রসিদ্ধ। মদীনা, তাবা, ইয়াছেরেব, তৈয়্যেবাহ্, দার। তন্মধ্যে ইয়াছরেব নাম অন্ধকার যুগে ছিল। হুজুর উহাকে না-পছন্দ করিয়া মদীনা রাখিয়াছেন। ছাহেবে এতহাফ

লিখিয়াছেন নাম বেশী হওয়ার ভিতর ও শারাফতের আভাস পাওয়া যায়।

(২) عن ابى هريرة رض قال قال رسول الله صلعم امرت بقرية تاكل القرى يقولون يثرب وهى المدينة تنفى الناس كما ينفى الكير خبث الحديد - (متفق عليه)

"হুজুর এরশাদ করেন আমাকে এমন এক বস্তিতে বাস করার হুকুম করা হইয়াছে যাহা সমস্ত বস্তিকে খাইয়া ফেলে। মানুষ উহাকে ইয়াছরব বলে। উহার নাম হইল মদীনা। সে খারাপ লোকদিগকে এমনভাবে দুর করে যেমন ভাট্টি লোহার ময়লাকে দুর করিয়া দেয়।"

হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে আছমান হইতে একটি চন্দ্র মক্কা শরীফে অবতরণ করিয়াছে, যদ্বারা সমস্ত মদীনা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর সেই চাঁদ আকাশে উঠিয়া পুনরায় মদীনায় গিয়া অবতরণ করে যদ্বারা মদীনা ভূমি আলোকিত হইয়া যায়। তারপর উহা হযরত আয়েশার ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখানের জমীন ফাটিয়া গেলে চাঁদটি সেখানে গায়েব হইয়া যায়।" এই খাবের তাবীর তিনি করিয়াছেন যে, হুজুর মদীনায় হিজরত করিবেন এবং শেষকল আয়েশার ঘরে তাঁহার কবর হইবে। (খামীছ)

উহা সমস্ত বস্তিকে খাইয়া ফেলিবে তার অর্থ হইল, মর্যাদার সামনে অন্যান্য শহরের কোন মর্যাদা নাই। অথবা সেখানের বাসিন্দাগণ অন্যান্য শহরকে জয় করিয়া ফেলিবে।

হাদীছে বর্ণিত আছে এই শহরে প্রথমে কাওমে আমালেকা আসিয়া আশে-পাশের সমস্ত শহর এবং দেশ জয় করিয়া লয়। পরে ইহুদীরা আসিয়া আমালেকার উপর জয়লাভ করে। তারপর খ্রীষ্টানগণ আসিয়া ইহুদীদের উপর প্রভুত্ব করে। তারপর হুজুরে পাক ছঃ) আসিয়া মাশরেক হইতে মাগরিব পর্যন্ত সারা বিশ্বকে জয় করেন।

মদীনা খারাপ লোকদিগকে স্থান দেয় না। কাহারও মতে ইছলামের প্রাথমিক যুগের কথা বলা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলে যে শেষ জমানায় দাজ্জালের আবির্ভাব হইলে সে মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। বোখারী শরীফেও বর্ণিত ফেরেশতাগণ মক্কা এবং মদীনাকে দাজ্জালের হামলা হইতে রক্ষা করিবে।

মদীনা সমস্ত শহর হইতে উত্তম ইহার মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে চার ইমামের নিকট সর্বসম্মতভাবে মদীনা শরীফ হইতে মক্কা শরীফ

আফজল। কিন্তু মদীনা শরীফের যেই জায়গায় প্রিয় নবী শায়িত আছেন উহা ইছলাম জগতের সমস্ত ওলামাদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে সমস্ত জায়গা হইতে শ্রেষ্ঠ। বায়তুল্লা হইতেও শ্রেষ্ঠ। কাজী এযাজ বলেন উহা আরশে আজীম হইতেও শ্রেষ্ঠ। উহার কারণ ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে যেইস্থানে নবীগণ দাফন হন সেখানের মাটি দ্বারা তাঁহাদের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কাজেই সেই স্থানের মাটি দ্বারা হুজুরের শরীর মোবারক তৈয়ার হইয়াছে মনে করিতে হইবে। এই কারণে আবার কেহ কেহ যেহেতু হুজুরের শরীর জমীনে রহিয়াছে জমীনকে আছমান হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামাদের মতে আছমান সমূহ জমীন হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ সেখানে কোন নাফরমানী হয় না। আর জমীনে শেরেক কুফর হইয়া থাকে।

মদীনা শরীফের ফজীলতে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক শহর তলোয়ারের সাহায্যে জয় হইয়াছে আর মদীনা জয় হইয়াছে কোরানের সাহায্য।

(১) عن سعد رض قال قال رسول الله ص اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عضاهها او يقتل صيدها وقال المدينة -

হুজুর এরশাদ করেন মদীনার দুই পার্শ্বের প্রস্তরময় স্থানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি হারাম সাব্যস্ত করিতেছি এই হিসাবে যে এখানের গাছ কাটা যাইবেনা এবং শিকার ও করা যাইবে না। হুজুর আরও বলেন মদীনা মুছলমানদের জন্য শ্রেষ্ঠ বাসস্থান তাহারা যদি জানে তবে এখানের অবস্থান ত্যাগ করিবে না। যেই ব্যক্তি অধৈর্য্য হইয়া মদীনা ছাড়িল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এখানে উহার উত্তম বিনিময় নিয়া দিবেন। আর যে কষ্টসহ্য করিয়াও মদীনায় অবস্থান করিবে আমি কেয়ামতের দিন তাহার জন্য সাক্ষী হইব এবং সুপারিশ করিব।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে জাবালে আয়ের এবং জাবালে ছুর (অহুদের নিকট ছোট একটি পাহাড়)-এর মধ্যবর্তীস্থান হারামে মদীনা। হানাফী মজহাব মতে হারামে মক্কায় ঘাস কাটিলে ও শিকার করিলে বদলা দেওয়া ওয়াজেব আর হারামে মদীনায় উহা ওয়াজেব নয় বরং নিষিদ্ধ কাজ, না করা ভাল।

(২) عن ابي هريرة رض ان رسول الله ص قال ان الايمان

ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى جحرها - (رواه البخاري)

হুজুরে পাক এরশাদ করেন নিশ্চয় ঈমান মদীনায় এমন ভাবে প্রবেশ করিবে যেমন সাপ আপন গর্তের মধ্যে প্রবেশ করে।

ইহার অর্থ কয়েক প্রকার হইতে পারে। প্রাথমিক যুগে দ্বীন শিখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোকজনের মদীনায় আসার দিকে ইশারা, অথবা সর্বকালে সারা দুনিয়ার মুছলমান হুজুরের এবং ছাহাবাদের এবং পবিত্র স্থানসমুহের জিয়ারতের জন্য মদীনায় আগমন করিবে। অথবা শেষ জমানায় কেয়ামতের পূর্বে সমস্ত দুনিয়া হইতে মিটিয়া দ্বীন মদীনায় আসিয়া পৌছিবে।

(১) عن انس رض عن النبي ص قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة - (متفق عليه)

হুজুর দোয়া করেন হে খোদা! আপনি মক্কা শরীফের যত বরকত দান করিয়াছেন মদীনা শরীফে উহার ডবল দান করেন। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে যেই ব্যক্তি মদীনাওয়ালাদের সহিত ধোকাবাজীর খেয়াল করিবে সে এইভাবে গলিয়া যাইবে যেমন পানিতে নমক গলিয়া যায়।

অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে মদীনাবাসীদের উপর জুলুম করিবে অথবা তাহাদিগকে ভয় দেখাইবে তাহার উপর আল্লার লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত এবং সমস্ত দুনিয়ার লা'নত তাহার কোন ফরজ এবাদত ও কবুল হয় না কোন নফল এবাদত ও নয়।

যাহারা বিদেশ হইতে মদীনায় জিয়ারতের জন্য গমন করিবে তাহারা এসব হাদীছের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মদীনা থাকা কালীন সেখানের অধিবাসিদের সঙ্গে চলা-ফেরায়, কাজে-কর্মে বেচা-কেনায়, যেন কোনরূপ চালবাজী বা ধোকাবাজী না হয় সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিবে।

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ এইভাবে পড়িবে যে এক ওয়াক্ত নামাজ ও ফওত না হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আজাব হইতে আগুন হইতে এবং মোনাফেকী হইতে মুক্তি দিয়া দেন। জিয়ারত কারীগণ এই বিষয় খুব লক্ষ্য রাখিবে যেন মদীনা শরীফে কম পক্ষে আট দিন থাকা হয় ইহাতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পূর্ণ হইবে। আরও লক্ষ্য রাখিবে যেন কোন মধ্যে ইহার নামাজ ফওত না হয় এবং কোন জিয়ারতে গেলে ফজরের পর গিয়া জোহরের আগে আগে যেন ফিরিয়া আসা যায় সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) কছম করিয়া বলিয়াছেন যাহার কুদরতী হাতে আমার জান তাঁহার কছম করিয়া বলিতেছি মদীনার মাটি প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা স্বরূপ, হজরত আয়েশা বলেন হুজুর রুগীর জন্য এই দোয়া পড়িতেন। "তোরবা-তো আর-দেনা বেরীকাভে বা'জেনা লিইয়াশফী ছাক্বীমুনা" হুজুর (ছঃ) আঙ্গুলের মধ্যে থুথু লইয়া সেই আঙ্গুলী মাটিতে মিশাইয়া দরদের স্থানে এই দোয়া পড়িয়া লাগাইতেন। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে মদীনার মাটি শ্বেতকুষ্ঠ রোগের জন্য বিশেষভাবে উপকারী। হজরত শায়খুল হাদীছ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছেন যে মদীনার মাটি দ্বারা প্লেগের গোটা ও ভাল হইয়া যায়। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি মদীনায় মরনের শক্তি রাখে সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরন করে কারণ ঐ ব্যক্তির জন্য আমি সুপারিশ করিব যে মদীনায় মারা যায়। এখানে সুপারিশের অর্থ হইল খাছ সুপারিশ, নচেৎ হুজুরের সুপারিশ সমস্ত মুছলমানের জন্য হইবে।

আমার শ্রদ্ধেয় বুজুর্গ হজরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ যিনি হজরত হোছায়েন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর বড় ভাই ছিলেন এবং মদীনা শরীফে মাদ্রাছায়ে শরীইয়ার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তিনি প্রায় বলিতেন হিন্দুস্থানের দোস্তদিগকে দেখিবার জন্য দিল একবার সেখানে যাইতে চায়, কিন্তু বার্ধক্য আসিয়া গিয়াছে তাই মদীনার মউত ভাগ্যে না আছে নাকি সেইজন্য যাইতেছি না।

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ (রঃ) মোলতাজাম ধরিয়া মদীনার মউত হইবার জন্যও দোয়া করিতেন। হজরত ওমরের বিখ্যাত—

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ ـ

হে খোদা! তোমার রাস্তায় আমাকে শাহাদাত দান কর এবং হুজুরের শহরে আমার মৃত্যু দান কর।

কি আশ্চর্য্য দোয়া? মদীনায় থাকিয়া তিনি শহীদ হন। অর্থাৎ আবু লুলু কাফেরের হাতে ছাহাবাদের বিরাট জামাতের মধ্যে থাকিয়া হুজুরের শহরেই তিনি শহীদ হন ও মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীছে বর্ণিত আছে দুইটি কবরস্থান আছমান ওয়ালাদের নিকট

এমনভাবে চম্‌কিতেছে যেমন জমীন ওয়ালাদের নিকট চন্দ্র সুরুজ চম্‌কিতেছে। প্রথম জান্নাতুল বাকীর কবরস্থান। দ্বিতীয় আছকালানের কবরস্থান। মদীনা শরীফে মৃত্যু বাস্তবিকই বড় সৌভাগ্যের কথা। হুজুরের দুই বিবি ব্যতিত বাকী সকল বিবি ছাহেবানেরও পরিবার পরিজনের কবর তথায় আছে। ইমাম মালেক বলেন প্রায় দশ হাজার ছাহাবীর কবর সেখানে রহিয়াছে। হুজুর বলেন সর্বপ্রথম আমি কবর হইতে উঠিব, তারপর আবুবকর উঠিবে তারপর ওমর উঠিবে। বাকীতে গিয়া সেখানের সবাইকে উঠাইয়া সঙ্গে লইব। অবশেষে মক্কা শরীফের কবরস্থান ওয়ালারা মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিবে।

(১০) عن ابى هريرة رض عن النبى ص ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض جنة ومنبرى على حوضى - بخارى ومسلم

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আমার ঘর (কবর) এবং আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান বেহেশ্‌তের বাগান সমূহের একটি বাগান। আর আমার মিম্বর আমার হাউজে কাওছারের উপর। (বোখারী মুছলিম)

ঘর শব্দের অর্থ হজরত আয়েশার ঘর, যেখানে পরে হুজুরের কবর শরীফ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঘর অর্থ সমস্ত বিবি সাহেবানদের ঘর। যেগুলি বাদশাহ অলীদ বিন আবদুল মালেকের জমানায় মসজিদের মধ্যে দাখিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যবর্তী পুরা স্থানটি বেহেস্তের টুক্‌রা। (নুজহাত

বেহেশ্‌তের টুক্‌রা শব্দের অর্থ বেহেশ্‌তের মত ওখানে সব সময় রহমত নাজেল হইতে থাকে। অথবা সেখানে এবাদত করিলে বেহেশ্‌ত যাওয়ার উছিলা হইবে অথবা বাস্তবিকই বেহেশতের টুকরা। বেহেশত হইতে আসিয়াছে আবার বেহেশতের সহিত মিলিয়া যাইবে।

মিম্বর হাওজের উপর তার অর্থ হইল উহা হুবহু হাওজের উপর কেয়ামতের দিন বদলি হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় অর্থ হইল ইহা একটি ভিন্ন কথা অর্থাৎ হাওজে কাওছারেও আমার জন্য একটা মিম্বর হইবে। তৃতীয় সেখানে এবাদত ও দোয়া করিলে হাওজে কাওছার নছীব হইবে।

বোখারী শরীফে আটটি ছতুনকে বিশেষ বরকত ওয়ালা বর্ণনা করা হইয়াছে—

( ) উছতুওয়ানায়ে মোখলাকা ইহা সবচেয়ে বেশী বরকতওয়ালা। ইহাকেই হান্নানাহ অর্থাৎ ক্রন্দনকারী বলা হয়। এখানেই হুজুর বেশী করিয়া নামাজ পড়িতেন। প্রথমে ইহাতে টেক লাগাইয়া হুজুর খোত্বা পড়িতেন। পরে যখন মিম্বর তৈয়ার হইয়া যায় তখন হুজুর মিম্বরের উপর গিয়া খোত্বা আরম্ভ করা মাত্র এই খুঁটি কাঁদিতে আরম্ভ করে এবং এমন জোরে কাঁদিতে থাকে যে মনে হয় যেন উহা ফাটিয়া যাইবে। উহার ক্রন্দনে মসজিদের সমস্ত ছাহাবী কাঁদিতে লাগিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া হুজুর মিম্বর হইতে নামিয়া উহার গায়ে গিয়া হাত রাখা মাত্র বাচ্চার মত হেচ্‌কী লইতে লইতে তাঁহার ক্রন্দন থামিয়া যায়। হুজুর এরশাদ করেন আমি হাত না রাখিলে উহা কেয়ামত পর্যন্ত ক্রন্দন করিত। উহা বর্তমানে দাফন অবস্থায় আছে। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ মদীনার গভর্ণর থাকা কালীন ওখানে মেহরাব বানাইয়া দেওয়া হয়। ইমাম মালেক বলেন নামাজের জন্য মসজিদে নববীতে ইহাই শ্রেষ্ঠ স্থান।

(২) উস্‌তুওয়ানায়ে আয়েশা বা উস্‌তুওয়ানায়ে মোহাজেরীন। মোহাজেরীণগণ এখানেই বেশীর ভাগ বসিতেন। উহাকে উস্‌তুওয়ানায়ে কোরআনও বলা হয়। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মসজিদে এমন একটি জায়গা আছে লোকে যদি জানিত সেখানে বসিবার জন্য লটারী হইত। আম্মা আয়েশা প্রথমে ঐ স্থানের পরিচয় দেন নাই। পরে আবদুল্লাহ বিন জোবায়েরের অনুরোধে তিনি উহা দেখাইয়া দেন এই জন্যই উহাকে আয়েশার খুঁটি বলা হয়।

(৩) উছতুওয়ানায়ে তওবা বা আবু লোবাবাহ, ঐ খুঁটিতে বন্দনাবস্থায় হজরত আবু লোবাবার তওবা কবুল হয়।

(৪) উছতুওয়ানায়ে ছারীর, ঐ জায়গায় হুজুর এ'তেকাফ করিতেন ও আরাম করিতেন।

(৫) উসতুওয়ানায়ে আলী। উহাতে পাহারাদারগণ বিশেষ করিয়া হজরত আলী থাকিতেন।

(৬) উসতুওয়ানায়ে উফুদ, আরবের কোন প্রতিনিধিদল আসিলে ওখানে বসান হইত। হুজুর (ছঃ) সেখানে তাহাদিগকে আহকাম শিক্ষা

দিতেন।

(৭) উসতুওয়ানায়ে তাহাজ্জুদ. হুজুর ঐ খুঁটির নিকট প্রায়ই তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

(৮) উসতুওয়ানায়ে জিব্রাঈল, উহা বর্তমানে হুজরা শরীফের ভিতর আসিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে মসজিদে নববীতে এমন কোন স্থান নাই যেথানে হুজুর (ছঃ) অথবা ছাহাবায়ে কেরামের পবিত্র কদম মোবারক বারংবার পড়ে নাই ; এই জন্য উহার প্রতিটি ইঞ্চি বরকতে পরিপূর্ণ। আল্লাহ পাক ঐ সবের বরকতে আমাদিগকে উপকৃত হইবার তওফীক দান করেন। আমীন।

পরিশিষ্ট

বিদায় হজ্ব

সারা মুসলিম বিশ্ব এই বিষয়ে একমত যে হুজুরে পাক (ছঃ) হিজরতের পর একটি মাত্র হজ্ব করিয়াছেন, যাহাকে হাজ্জাতুল বেদা অর্থাৎ বিদায় হজ্ব বলা হয়। হুজুরের জীবনের শেষ বৎসর দশম হিজরীতে যখন হুজুরে পাক (ছঃ) ঘোষনা করিয়া দিলেন যে তিনি এ বৎসর সদলবলে হজ্ব করিতে যাইবেন তখন সারা আরবের বুকে এক অভূত পূর্ব সাড়া পড়িয়া যায়। দিক বিদিক হইতে হাজার হাজার ভক্ত বৃন্দ পবিত্র ভূমি মক্কা নগরীতে একত্র হইতে লাগিল। হুজুরের সাহচর্যে ইসলামের পঞ্চম রোকন পবিত্র হজ্ব কার্য্য সমাপনের অদম্য স্পৃহা ও আকাংখা নিয়া হুজুরের রওয়ানা হইবার পূর্বেই বিরাট এক দল মদিনায় আসিয়া সমবেত হয়। আবার কেহ পথি মধ্যে আসিয়া হুজুরের কাফেলার সহিত সংযুক্ত হয়। আবার কোন কোন গোত্রের লোকেরা পবিত্র মক্কা নগরীতে আসিয়া সরাসরি আরাফাতের ময়দানে হুজুরের সহিত মিলিত হয় ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে সর্ব মোট একলক্ষ চব্বিশ হাজার ছাহাবী আরাফাতের ময়দানে হুজুরের সহিত হজ্ব কার্যা সমাধা করেন।

চব্বিশ অথবা পঁচিশ অথবা ছাব্বিশ জিলকাদ বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার অথবা শনিবার মসজিদে নববীতে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া হুজুরে আকারম (ছঃ) জুল হোলায়ফা আসিয়া আছরের নামাজ আদায় করেন। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) জুল হোলায়ফা অবস্থান করেন

এবং যেই সব বিবিসাহেবান হুজুরের সাথে ছিলেন সেই রাত্রে সকলের সহিত হুজুর সহবাস করেন। ইহার দ্বারা ওলামাগণ প্রমান করিয়াছেন যে বিবি সাথে থাকিলে এহরামের পূর্বে সহবাস করা মোস্তাহাব ছওয়াব। কেননা উহা এহরামের দীর্ঘ সময়ের জন্য উভয়ের মানষিক পবিত্রতার সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় দিন হুজুরে পাক (ছঃ) জোহরের নামাজ আদায় করার পূর্বে এহরামের জন্য গোছল করেন এবং এহরামের পোষাক পরিয়া জুল হোলাইফার মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করিয়া হজ্বে কেরানের নিয়তে এহরাম বাঁধেন। কেননা রাত্রি বেলায় হযরত জিব্রাঈল তাশরীফ আনিয়া হুজুরকে বলেন যে ইহা পবিত্র ভূমি আকীক উপত্যাকা। আপনি এখানে নামাজ পড়ুন এবং হজ্ব ও ওমরা উভয়ের জন্য একত্রে এহরাম বাঁধিবেন। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরামকে, কেরান তামাত্তু, বা এফরাদ কোন একটির এহরাম বাঁধিতে এখতিয়ার দেন তারপর হুজুর মসজিদ হইতে বাহিরে আসিয়া উটনীর উপর ছওয়ার হইয়া জোরে লাব্বায়েক পড়িলেন। মসজিদ হইতে লাব্বায়েকের আওয়াজ কাছের লোকেরা শুনিয়াছিল আর বাহিরের আওয়াজ অনেক দুর পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছিল বশতঃ অনেকের ধারণা হইল যে এখান হইতেই হুজুর এহরাম বাঁধিয়াছেন। তারপর হুজুরের মোবারক উটনী হুজুরকে পিঠে লইয়া বায়দা পাহাড়ের উপর আরোহন করে। নিয়ম হইল যে কোন উঁচু জায়গায় উঠিলে হাজিদিগকে লাব্বায়েক জোরে বলিতে হয়। তাই হুজুর বায়দা পাহাড়ে আরোহন করিয়া খুব জোরে লাব্বায়েক বলিতে লাগিলেন। যেহেতু পাহাড়ের চুড়ায় আওয়াজ অনেক দুর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায় সেই জন্য একটি বিরাট দল মনে করেন যে হুজুর সেখান হইতেই এহরাম বাঁধিয়াছেন। এইভাবে জিব্রাঈলের নির্দেশ মোতাবেক হুজুর ছাহাবাদিগকে লাববায়েক জোরে বলিতে আদেশ করেন ও কাফেলা মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয় পথিমধ্যে রওহা উপত্যাকায় হুজুর নামাজ আদায় করেন এবং এরশাদ করেন যে এখানে সত্তরজন নবী নামাজ পড়িয়াছেন।

হুজুর আকরাম এবং হজরত ছিদ্দীকে আকবরের আছবাবপত্র একটি উটের উপর ছিল যাহা হজরত আবুবকর ছিদ্দীকের একজন গোলামের সপর্দ ছিল। উপত্যাকায় আসিয়া তাঁহারা অনেক্ষণ যাবত গোলামের এন্তেজার করিয়াছিলেন। অবশেষে গোলাম আসিয়া ওজর দেখাইল যে উট হারাইয়া গিয়াছে। হজরত আবুবকর ছিদ্দীক গোলামকে এই বলিয়া

মার দিলেন যে একটি উট আবার কি করিয়া হারায়। ওদিকে ব্যাপারটা দেখিয়া হুজুর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন দেখ মোহ্‌রেম ব্যক্তি কি করিতেছে। অর্থাৎ এহ্‌রাম অবস্থায় মারধর করিতেছে।

ছাহাবায়ে কেরাম যখন জানিতে পারিলেন হুজুরের উট পাওয়া যাইতেছেনা তখন তাড়াতাড়ি খানা পাক করিয়া হুজুরের সামনে আনিলেন। হুজুর হজরত ছিদ্দীককে ডাকিলেন আসুন আল্লাহ পাক উৎকৃষ্ট খাবার পাঠাইয়া দিয়াছেন। হজরত আবুবকরের রাগ তখনও থামে নাই। তারপর হজরত ছায়াদ এবং আবু কয়েছ নিজেদের আসবাবের উট আনিয়া বলিলেন হুজুর ইহা কবুল করুন, হুজুর ফরমাইলেন আল্লাহ পাক তোমাদিগকে বরকত দান করুন। খোদার রহমতে আমাদের উটনী পাওয়া গিয়াছে।

মক্কা শরীফের সন্নিকট আছফান উপত্যাকায় পৌছার পর হজরত ছোরাকা (রাঃ) হুজুরকে বলেন, হুজুর আমাদিগকে হজ্বের মাছায়েল এমন ভাবে শিক্ষা দিন যেমন আমরা আজ পয়দা হইয়াছি। হুজুর তাহাদিগকে কি কি কাজ করিতে হইবে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া দেন। কাফেলা যখন ছফরে পৌছে তখন আম্মাজান আয়েশার হায়েজ দেখা দিল। তিনি পেরেশান হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে আমার ছফরই নাকি ব্যর্থ হইয়া গেল। ওদিকে হজ্ব একেবারে নিকটবর্তী। অথচ আমি নাপাক হইয়া গেলাম। হুজুরে পাক তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ইহা সমস্ত মেয়েলোকেরই হইয়া থাকে। তারপর তিনি কি করিবেন হুজুর বাতলাইয়া দিলেন। হুজুর ছাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন যাহাদের সহিত কোরবাণীর জানোয়ার নাই তাহারা যেন মক্কা শরীফ প্রবেশ করিয়া ওমরা আদায় করিয়া এহ্‌রাম খুলিয়া ফেলে।

মক্কা শরীফের নিকটবর্তী আজরাক উপত্যাকায় হুজুর যখন এরশাদ করেন যে আমার সম্মুখে এখন ঐ দৃশ্য ভাসিতেছে যখন হযরত মূছা (আঃ) এই ময়দান দিয়া হজ্ব করিতে যাইবার সময় কানের মধ্যে আঙ্গুলি দিয়া খুব জোরে লাব্বায়েক পড়িতেছিলেন। তারপর হুজুর মক্কা শরীফের একেবারেই নিকটে জুতুয়া পৌছিয়া রাত্রি বেলায় সেখানে অবস্থান করিয়া সকাল বেলায় মক্কা শরীফ প্রবেশ করিবার নিয়তে গোছল করেন এবং ৪র্থ জিলহজ্ব শনিবার চাশ্‌তের নামাজের ওয়াক্তে পবিত্র মক্কা ভূমিতে পদার্পণ করেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়াই হুজুর প্রথমে মসজিদে হারামে তাশরীফ নেন এবং হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করিয়া তাওয়াফ করেন। কোন তাহিয়্যাতুল

মসজিদ পড়েন নাই। বরং মসজিদে দাখিল হইয়াই তাওয়াফ শুরু করিয়া দেন, তাওয়াফ শেষ করিয়া মোকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত তাওয়াফের নামাজ আদায় করেন। যাহার মধ্যে ছূরায়ে কুলইয়া এবং কুল হুয়াল্লাহ পড়েন। তারপর পুনরায় তিনি হাজরে আছওয়াদকে চুম্বন করেন এবং বাবুছছাফা দিয়া বাহির হইয়া ছাফা পাহাড়ে তাশ্‌রীফ নিয়া যান। এত উপরে উঠেন যে সেখান হইতে বায়তুল্লা দেখা যাইতেছিল। হুজুর সেখানে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সময় যাবত আল্লাহর প্রশংসা ও তাকবীর বলিতে থাকেন এবং দোয়া করিতে থাকেন। তারপর ছাফা মারওয়ায় সাতবার চক্কর দেন এবং মারওয়া পাহাড়ের চক্কর শেষ করিয়া যাহাদের সাথে কোরবানীর জানোয়ার নাই তাহাদিগকে এহরাম খুলিতে বলেন। তারপর চারদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করেন।

হুজুর ৮ই জিলহজ্ব বৃহস্পতিবার চাশ্‌তের সময় মিনায় চলিয়া যান এবং ছাহাবায়ে কেরামও এহরাম বাঁধিয়া হুজুরের সঙ্গী হন। পাচ ওয়াক্ত নামাজ মিনায় আদায় করেন। সেই রাত্রেই হুজুরের উপর ছূরায়ে অল্‌ মোরছালাত অবতীর্ণ হয়। শুক্রবার ভোরবেলায় সূর্য উঠার পর পরই আরাফাতের ময়দানে পৌঁছিয়া যান। নামেরার তাঁবুতে অল্প সময় অবস্থান করেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরের পর কাছওয়া নামক উট্‌নীতে আরোহন করিয়া নিকটস্থ বত্‌নে আরনায় গমন করেন এবং সেখানে লম্বা চওড়া এক খোত্‌বা পাঠ করেন সেই মোতাবেকই উহাকে ঐতিহাসিকগণ বিশ্বমানবতার মুক্তিসনদ নামে আখ্যায়িত করেন। যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

বিদায় হজ্বের ভাষণ

"হে আমার প্রিয় ছাহাবাগণ! আজ যে কথা তোমাদিগকে আমি বলিব উহা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে। আমার আশংকা হইতেছে হয়তঃ তোমাদের সহিত একত্রে হজ্ব করিবার সুযোগ নাও হইতে পারে। হে মুছলমানগণ, অন্ধকার যুগের সমস্ত ধ্যান ধারণাকে ভুলিয়া নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত কুসংস্কার, অনাচার অত্যাচার আর পাপ প্রথা সমূহ বাতিল হইয়া গেল। মনে রাখিও সব মুছলমান আপোষে ভাই ভাই, কেহ কাহারও চেয়ে ছোটও নও আবার কাহারও চেয়ে বড়ও নও। আল্লার নিকট সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলিও না। তাহাদের উপর তোমাদের যেইরূপ অধিকার আছে তোমাদের উপরও তাহাদের সেইরূপ অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের উপর অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও আল্লাহকে সাক্ষী

বানাইয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

সাবধান; ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। অতীতে বহু জাতি এ বাড়াবাড়ির ফলেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

আজিকার এই দিন যেমন পবিত্র, ঠিক তেমনি পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ কাজেই মুসলমানের জীবন ও সম্পদকে পবিত্র জানিবে।

হে মুছলমানগণ! দাস দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের উপর কোন জুলুম অত্যাচার করিওনা। তোমরা যাহা খাইবে তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে। যাহা পরিবে তাহাই পরাইবে। ভুলিয়া যাইওনা তাহারা তোমাদের মতই মানুষ।

হুশিয়ার! নেতার আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিবে না। যদি তোমাদের উপর নাক কাটা কোন হাবসী ক্রীতদাসকেও আমীর বানাইয়া দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করে তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে। সাবধান! মুর্তিপূজার অভিশাপ যেন আর তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। শিরিক করিবে না। চুরি করিবে না, জিনা করিবে না, সর্বপ্রকার পাপাচার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়া পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবে।

মনে রাখিও একদিন তোমাদিগকে আল্লার নিকট যাইতে হইবে। সেই দিন তোমাদের আপন কৃতকর্মের জবাব দিতে হইবে। বংশ গৌরব করিওনা। আর যে ব্যক্তি নিজের বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয় তাহার উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজিল হয়।

হে আমার প্রিয় উম্মতগণ। তোমাদের নিকট আমি যেই দুইটি সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি যতদিন পর্যন্ত তোমরা উহাকে আকড়াইয়া ধরিবে ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে না। তাহার একটি হইল আল্লার কোরআন ও অপরটি হইল তাঁহার রাছুলের আদর্শ, নিশ্চয় জানিয়া রাখিও আমার পর আর কোন নবী আসিবে না। তাহার একটি হইল যাহারা উপস্থিত আছ তাহারা অনুপস্থিত সকলের নিকট আমার এইসব বানী পৌছাইয়া দিবে।

তারপর আকাশের দিকে মুখ করিয়া প্রিয় নবী বলিতে লাগিলেন হে আমার পরওয়ারদেগার আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে পৌছাইয়া দিতে পারিলাম।

আরাফাতের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া লক্ষ কণ্ঠে আওয়াজ উত্থিত হইল নিশ্চয়। নিশ্চয় আপনী পৌছিাইয়াছেন বরং পৌছানোর হক

আদায় করিয়া দিয়াছেন। হুজুরে পাক তখন কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন। হে প্রভূ! তুমি সাক্ষী থাক তুমি সাক্ষী থাক, তুমি সাক্ষী থাক যে ইহারা বলিতেছে আমি আমার কর্তব্য যথাযত ভাবে পালন করিয়াছি।

সেই খোতবার ভিতর এমন কতকগুলি শব্দ ছিল যে হয়তঃ তোমরা এ বৎসরের পর আর আমাকে দেখিবে না এখানে হয়তঃ তোমাদের সহিত আমার আর সাক্ষাত নাও হইতে পারে ইত্যাদি।

খোৎবার পর হজরত বেলালকে তাকবীর দিতে বলেন এবং জোহর ও আছরের নামাজ জোহরের ওয়াক্তেই পড়ান, জোহরের পর আরাফাতের ময়দানে তাশরীফ আনেন মাগরিব পর্য্যন্ত খুব এহতেমামের সহিত দোয়ায় মশগুল থাকেন। ঐ সময়ে হজরত উম্মে ফজল হুজুর রোজা রাখিয়াছেন কিনা ইহা পরিস্কার জন্য হুজুরের খেদমতে এক পেয়ালা দুধ পাঠান। হুজুর আপন উটের উপর থাকিয়া সমস্ত লোকের সামনে উহা পান করেন এই খেয়ালে যে লোকে যেন জানিতে পারে হুজুর রোজাদার নহেন। ঐ সময়ে জনৈক ছাহাবী উট পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, হুজুর এরশাদ করেন তাহাকে এহরামের কাপড়ে কাফন দিয়া দাফন করা হউক। কেয়ামতের দিন সে লাব্বায়েক বলিতে বলিতে উঠিবে। সেইস্থানে নজদের দিক হইতে সরাসরি একটি জামাত আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর হজ্ব কি জিনিষ? হুজুর বলেন হজ্ব আর-ফাতের ময়দানে আসাকেই বলা হয়। যেই ব্যক্তি দশই জিলহজ্বের ফজরের পূর্বে আরফাতে পৌঁছিবে তাহার হজ্ব হইয়া যাইবে।

হুজুর (ছঃ) মাগরিব পর্য্যন্ত উম্মতের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করিতে থাকেন। আল্লাহ পাক জালেম ব্যতীত আর সকলের গোনাহ মাফ করিয়া দিবার ওয়াদা করেন। হুজুর তবুও বিনীত সহকারে আরজ করেন হে খোদা ইহাও ত হইতে পারে যে আপনি নিজের কাছ থেকে মাজলুমকে প্রতিদান দিয়া জালেমকে মাফ করিয়া দিবেন। সেই সময় অবতীর্ণ হয় –

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ অদ্যকার দিনে তোমাদের জন্য আমি দ্বীনকে পরিপূর্ণ করিয়া দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করিয়া দিলাম এবং ইছলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনিত করিলাম। বর্ণিত আছে যে এই সময় তাঁহার ওজনে হুজুরের উটনী দাড়াইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল।

সূর্য্যাস্তের পর নামাজের পূর্বেই হুজুর সেখান থেকে রওয়ানা হন উট্নী এত দ্রুত কদমে চলিতেছিল যে উহার লেগাম টানিয়া রাখিতে হইত। হজরত উছামা হুজুরের পিছনে বসা ছিল। পথিমধ্যে হুজুরের পেশাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। অবতরণ করিয়া হুজুর পেশাব করিয়া লইলেন। হযরত উছামা হুজুরকে অজু করাইলেন। হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরের অভ্যাস ছিল যখনই তিনি হজ্ব করিতেন সেখানে নামিয়া অজু করিয়া বলিতেন আমি এই জন্য এখানে অজু করিলাম যেহেতু আমার প্রিয় নবীজী এখানে অজু করিয়াছেন। অজুর পর হজরত উছামা হুজুরকে মাগরিবের নামাজের কথা স্মরন করাইয়া দেন। হুজুর এরশাদ করিলেন সামনে চল।

মোজদালাফা পৌছিয়া সর্ব প্রথম হুজুরে পাক (ছঃ) নূতন অজু করিয়া মাগরিব এবং এশার নামাজ পড়াইলেন তারপর দোয়ায় মশগুল হইয়া গেলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক জানা যায় যে এই জায়গায় জালেমদের ব্যাপারে ও হুজুরের দোয়া কবুল হইয়া যায়। ছোট ছোট বাচ্চা এবং মেয়েলোক দিগকে কষ্ট হইবার ভয়ে হুজুর (ছঃ) রাত্রেই মোজদালাফা হইতে মিনার দিকে পাঠাইয়া দেন। স্বয়ং হুজুর ছাহাবীদিগকে নিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করেন এবং সকাল সকাল ফজরের নামাজ পড়িয়া সূর্য উঠার পূর্বেই মিনা রওনা হন। এবারে হজরত উছামা পায়দল চলিলেন হজরত ফজল এব্নে আব্বাছ হুজুরের উট্নীর উপর বসিলেন। রাস্তার মধ্যে একজন যুবতী মহিলা হুজুরের নিকট আপন পিতার হজ্বে বদল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হজরত ফজল যুবক ছিলেন বিধায় মহিলাটির দিকে দেখিতেছিলেন। হুজুর স্বীয় হাত মোবারক দ্বারা ফজলের চেহারাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন এবং বলেন, গায়ের মোহরমকে দেখিতে নাই। বরং অদ্যকার দিনে যেই ব্যক্তি আপন চক্ষু এবং কান ও জবানের হেফাজত করিবে আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। রাস্তা হইতে হজরত ফজল হুজুরের জন্য পাথরের টুকরা সমূহ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। লোকজন মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিত ও হুজুর উত্তর দিতেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল হুজুর আমার মাতা এত বৃদ্ধা যে ছওয়ারীতে বসাইয়া দিলেও তাহার মৃত্যুর আশংকা। আমি কি তার বদলে হজ্ব করিতে পারি? হুজুর এরশাদ করেন তোমার মায়ের জিম্মায় কাহারও কর্জ থাকিলে তুমি আদায় করিতে না? ইহাকেও সেইরূপ মনে কর। পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছাব পৌছিলে হুজুর নিজের উটনীকে সেখানে খুব দ্রুত দৌড়াইলেন এবং বলিলেন, আজাবের

স্থান তাড়াতাড়ি অতিক্রম করিতে হয়। কেননা মক্কা শরীফ ধ্বংস করিবার জন্য যে আবরাহা বাদশাহ আসিয়াছিল আল্লার আজাবে (আবাবিল মারফত) তাহারা এখানেই ধ্বংস হইয়াছিল।

মিনায় পেঁছিয়া হুজুর সর্বপ্রথম জুমরায়ে আকাবা পেঁছেন এবং সাতটি কঙ্কর মারেন এবং এ যাবত যে সব লাব্বায়েক বলা হইতেছিল। উহা বন্ধ করিয়া দেন। তারপর মিনায় অবস্থান কালে এক লম্বা চওড়া ওয়াজ করেন। যাহার মধ্যে অনেক আহকামের বর্ণনা ছিল। তাহার মধ্যে এমন সব কথাও ছিল যদ্দারা প্রতীয়মান হয় যে হুজুর আর বেশী দিন দুনিয়াতে থাকিবেন না। অতঃপর কোরবানীর জায়গায় গিয়া স্বহস্তে আপন বয়স মোতাবেক তিষট্টিটা উট কোরবানী করেন তন্মধ্যে ৬/৭টা উট তাড়াতাড়ি কোরবান হইবার জন্য হুজুরের সামনে আগাইয়া নিজে নিজেই আসিয়া দাঁড়াইতেছিল। বাকী উটগুলি হযরত আলী (রাঃ) জবেহ করেন। সর্বমোট একশত উট কোরবানী করা হয়।

কোরবানীর পর ঘোষণা করেন যে যার যার ইচ্ছা গোস্ত কাটিয়া নিতে পারে। তারপর হজরত আলীকে বলিলেন প্রত্যেক উট হইতে এক এক টুকরা করিয়া লইয়া একটি বরতনে করিয়া পাক করা হউক। হুজুর সেখান হইতে সুরবা পান করিয়া সকল উটকে ধন্য করিলেন। হুজুর বিবি ছাহেবানদের পক্ষ হইতে গরু কোরবানী করিয়াছেন। কোরবানীর কাজ শেষ করায় হুজুর হজরত মা'মার অথবা হজরত খারাশকে ডাকিয়া খেরী কাজ সম্পন্ন করেন। মাথা মুণ্ডন করেন, মোঁচ মোবারক ছোট করেন, নখ কাটেন, এবং চুল ও নখ ভক্ত বৃন্দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন। বর্তমান বিশ্বে যেখানে যেখানে চুল মোবারক রহিয়াছে সেই চুলেরই অংশ বিশেষ। তারপর এহরামের চাদর খুলিয়া কাপড় পরেন ও খুশ্‌বু লাগান। ইত্যবসারে বহু সংখ্যক ছাহাবী আসিয়া মাছায়েল জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। সেইদিন চারটি কাজ সম্পন্ন হয়। শয়তানকে পাথর মারা, কোরবানী করা, মাথা মুড়ান এবং তাওয়াফে জিয়ারত, কোন কোন ছাহাবী আসিয়া আরজ করিলেন ঐ চার কাজ আমার আগে পিছে হইয়া গিয়াছে। হুজুর এরশাদ করেন ইহাতে কোন গোণাহ নাই। গোণাহ্ হইল কোন মুছলমানের ইজ্জতের উপর হামলা করা। জোহরের সময় হুজুর তাওয়াফে জিয়ারতের জন্য মক্কা শরীফ যান। জোহর সেখানে পড়েন অথবা মিনায় ফিরিয়া আসিয়া পড়েন। তাওয়াফ শেষ করিয়া জমজমের নিকট গিয়া

হুজুর স্বয়ং বাল্তি দিয়া পানি উঠাইয়া খুব পান করেন। পানি দাঁড়াইয়া পান করেন। জমজম পান করিয়া দ্বিতীয়বার ছাফা মারওয়ায় ছায়ী করিলেন বা করিলেন না ইহাতে মতভেদ আছে হানাফী মজহাব মতে ছায়ী করিয়াছেন। তারপর মিনায় গমন করিয়া তিনদিন সেখানে অবস্থান করেন। এবং প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তিন তিন জায়গায় শয়তানকে পাথর মারিতে থাকেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে মিনায় অবস্থান কালে সেই তিনদিন রাত্রিবেলায় তাওয়াফ এবং জিয়ারতের জন্য হারাম শরীফ তাশরীফ নিয়া যাইতেন। মিনায় অবস্থান কালেই হুজুরের উপর اذا جاء ছূরা নাজেল হয়। হুজুর নাকি বলিয়াছেন এই ছূরার মধ্যে আমার মৃত্যু সংবাদ দেওয়া হইয়াছে আমি অতিসত্বর চলিয়া যাইতেছি

অতঃপর ১৩ই জিলহজ্ব শনিবার দ্বিপ্রহরের পর শেষবারের কঙ্কর মারিয়া মিনা হইতে রওয়ানা হইয়া মক্কা শরীফের বাহিরের মোহাচ্ছাব নাম স্থানে যাহাকে বত্হা এবং খাইফে বনি কেনানাহ্ও বলা হয়। একটি তাবুর মধ্যে হুজুর অবস্থান করিয়া চার ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। এখানে বসিয়াই কোন এক সময় কাফেরগণ পরামর্শ করিয়াছিল যে বনু হাসেম এবং বনু মোত্তালেবের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হইবে। হুজুর (ছঃ) এশার পর সেখান হইতে তাওয়াফে বেদার জন্য মক্কা শরীফ গমন করেন। সেই রাত্রেই হজরত আয়েশাকে তাঁহার ভাইয়ের সহিত তান্ঈম পাঠাইয়া এহরাম বাধাইয়া ওমরাহ করাইয়া লন। আম্মাজান আয়েশা ওমরা আদায় করিয়া যখন তানঈম পৌছেন তখনই হুজুর কাফেলাকে মদীনায় রওয়ানা হইবার নির্দেশ দেন।

১৮ই জিলহজ্ব সোমবার জোহফার নিকটবর্তী গাদীরে খোম পেঁাছিয়া হুজুর একটি উঁচু টিলায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘ ভাষণদান করেন। উহাতে হজরত আলির বেশ প্রশংসাও করা হইয়াছিল। ইহাকেই বিগড়াইয়া রাফেজী সম্প্রদায় ঈদে গাদীর পালন করিয়া থাকে। হজরত আলী বলেন আমার ব্যাপারে দুই দল লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। প্রথমতঃ যাহারা আমার মহব্বতের দাবীতে মাত্রা ছাড়িয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যাহারা শত্রুতার ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে। অর্থাৎ রাফেজী এবং খারেজী।

অতঃপর জুল হোলায়ফা পেঁাছিয়া সেখানে রাত্রি যাপন করেন এবং মোয়াররাছের পথে মদিনা শরীফ এই দোয়া পড়িতে পড়িতে প্রবেশ করেন।

"আ-য়েবুনা লিরাব্বেনা হমেদুনা।"

অতঃপর মাত্র দুইমাস হুজুরে আকদাছ এই নশ্বর পৃথিবীতে থাকিয়া অবশেষে আপন মাওলার সহিত গিয়া মিলিত হন।

এই খোতবার বিষদ বিবরণ হজরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের মূল গ্রন্থে নাই, বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া উহা আমি নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইতি—অনুবাদক

পরিশেষে রওজুর রিয়াহীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি আল্লাহওয়ালাদের কেচ্ছা বর্ণনা করা যাইতেছে আশা করি যাহারা হজ্ব করিবেন তাহাদের জন্য ঐসব ঘটনা বিশেষ উপকারে আসিবে।

আল্লাহওয়ালাদের কয়েকটি ঘটনা

(১) হজরত জুননুন মিছরী (রঃ) বলেন, আমি একদিন বায়তুল্লা শরীফের তাওয়াফ করিতেছিলাম। সমস্ত লোক অপলক নেত্রে কা'বা শরীফের দিকে দেখিতেছিল। হঠাৎ একটা লোক আসিয়া এই বলিয়া দোয়া করিতে লাগিল। হে পরওয়ারদেগার! তোমার দরবার হইতে পলাতক আবার তোমার দরবারে ধর্ণা দিয়াছে। আয় খোদা! আমি তোমার নিকট ঐ জিনিস চাহিতেছি যাহা আমাকে তোমার অধিকতর নিকটবর্তী করে এবং তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়। হে মাওলা! আমি তোমার পছন্দীদা বান্দাগন এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের উছিলায় প্রার্থনা করিতেছি তুমি আমাকে তোমার মহব্বতের এক পেয়ালি শারাব পান করাইয়া দাও। এবং মারেফতের দ্বারা আমার অন্ধকার দূর করিয়া দাও। তবে যেন আমি মারেফতের বাগিচায় গিয়া তোমার সহিত গোপন আলাপ করিতে পারি। এইসব বলিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া পানি জমীনে পড়িতে লাগিল। অতঃপর তিনি হাসিতে হাসিতে রওয়ানা হইলেন। হজরত জুননুন মিছরী বলেন লোকটি হয়তঃ কোন কামেল বুজুর্গ হইবেন না হয় পাগল হইবে। এই কথা ভাবিয়া আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। সে আমাকে বলিল তুমি কোথায় যাইতেছ, আপন কাজে যাও। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত নাজেল করুন আপনার নাম কি? তিনি বলিলেন আবদুল্লাহ্। আমি বলিলাম আপনার পিতার নাম কি? তিনি বলিলেন আবদুল্লাহ্। আমি বলিলাম আসলে ত সকল মানুষই আল্লাহর বান্দা, আপনার আসল পরিচয় দিন। তিনি বলি-

লেন আমার পিতা আমার নাম রাখিয়াছেন ছায়াদুন। বলিলাম লোক যাহাকে ছায়াদুন পাগলা বলে সেই ছায়াদুন নাকি, তিনি বলিলেন হ্যাঁ। আমি বলিলাম, যাহাদের উছিলায় দোয়া করিলেন সেই পছন্দীদা বান্দা কাহারা? তিনি বলিলেন যাহারা আল্লাহর দিকে এমনভাবে দাঁড়ায় যেমন কোন ব্যক্তি প্রেমের পথে দৌড়ায়। তারপর বলেন জুননুন তুমি আছবাবে মারেফাত জানিতে চাও। তারপর তিনি দুইটি বয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ হইল এই যে, মারফতওয়ালাদের দিল সব সময় মাওলার স্মরণে আসক্ত হইয়া থাকে এবং আসক্তিতে কান্না করিতে থাকে। এমনকি তাহার দরবারে তাহার ঘর বানাইয়া লয় আর সেখান হইতে কোন বস্তু তাহাদিগকে হাটাইতে পারেনা।

(২) হজরত জোনায়েদ বাগদাদী বলেন আমি একদিন রাত্রি বেলায় তাওয়াফ করিতেছিলাম, তখন দেখিতে পাই যে একটি অল্পবয়স্ক মেয়ে তওয়াফ করিতেছে ও এই কবিতাবগুলি দ্বারা গান গাহিতেছে, যাহার অর্থ এই—

"আমি আপন এস্ক ও মহব্বতকে যতই গোপন রাখিয়াছিলাম কিন্তু উহা কিছুতেই গোপন রহিল না বরং আমার নিকট মনে হয় তাবু গাড়িয়াছে।"

"মাহবুবের ইয়াদে আমার অন্তর চমকিয়া উঠে, যদি আমি মাহবুবের নৈকট্য চাই তবে সাথে সাথেই সে আমার নিকটে আসিয়া যায়।"

"আর যখন সে আত্মপ্রকাশ করে তখন আমি তাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাই, তখন আমি অপরিসীম স্বাদ এবং লজ্জত পাইতে থাকি।"

হজরত জোনায়েদ বলেন, আমি বলিলাম হে মেয়ে! তোমার লজ্জা হয় না! এতবড় মোবারক স্থানে তুমি গান গাইতেছ! মেয়েটি আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, জোনায়েদ!

"আল্লার ভয় না থাকিলে তুমি আমাকে আরামের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চক্কর দিতে দেখিতে না!"

"তাঁহার মহব্বতের সংস্পর্শে আমি ভব ঘুরের মত ফিরিতেছি এবং তাঁহার মহব্বতই আমাকে পেরেশান করিয়া রাখিয়াছে।"

তারপর মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল জোনায়েদ তুমি আল্লার তাওয়াফ করিতেছ না বায়তুল্লার তওয়াফ, আমি বলিলাম বায়তুল্লার তওয়াফ করিতেছি। ইহা শুনিয়া মেয়েটি আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিতে লাগিল

তোমার বড় আশ্চর্য শান। মানুষ পাথরের মতই এক মাখলুক। সে আবার অন্য একপাথরের তাওয়াফ করিতেছে, তারপর সে আরও তিনটি বয়াত পড়িল, যার অর্থ এই—

"মানুষ পাথরের তাওয়াফ করিয়া আপনার নৈকট্য তালাশ করে। তাহাদের দিল স্বয়ং পাথর হইতেও শক্ত, তাহারা পেরেশানিতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং আপন ধ্যান ধারণা মত নৈকট্যের মহলে পৌছিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা প্রেমের দাবীতে সত্য হইত তবে জড়বাদী গুণাবলী দূর হইয়া তাহার মধ্যে আল্লার মহব্বতের গুণাবলী পয়দা হইত। হজরত জোনায়েদ বলেন আমি তাহার এই সব কথা শুনিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলাম। হুশ হইলে পর দেখিলাম মেয়েটি আর সেখানে নাই।

(৩) হজরত বশর হাফী (রঃ) বলেন আরাফাতের ময়দানে আমি এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে বেকারার অবস্থায় শুধু ক্রন্দন করিতেছে আর শের পড়িতেছে যাহার অর্থ এই যে—

"তিনি কত বড় পাক জাত, আমরা যদি কাঁটার উপর অথবা সুইয়ের উপর তাহার সামনে সেজদায় রত হই তবুও তাঁহার নেয়ামতের দশ ভাগের এক ভাগ বরং সেই এক ভাগেরও দশ একভাগ শোকরিয়া আদায় হইবে না।" তারপর আরও পড়িল—"হে পাক জাত আমি কতবার অন্যায় করিয়াও তোমাকে স্মরণ করি নাই অথচ হে মালেক তুমি আমাকে অলক্ষ্যে কখনও ভুল নাই' আপন মুর্খতার দরুণ আমি বহুবার পাপ করিয়া অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু তুমি চরম ধৈর্যের সহিত আমার উপর দয়া ও মেহেরবানী করিয়া আমার পাপকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ।"

হজরত বশর হাফী বলেন অতঃপর লোকটি হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম উনি হজরত আবু ওবায়েদ খাওয়াছ (রঃ)। কথিত আছে তিনি নাকি সত্তর বৎসর যাবত আকাশের দিকে নজর উঠাইয়া দেখেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন অত বড় দাতার সম্মুখে এই কাল নাফরমান মুখ কি করিয়া উঠাইতে পারে। আল্লাহ তাহাদের উছিলায় আমাদিগকে ও ক্ষমা করুন।

(৪) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন—আমি হজ্বে রওয়ানা হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে একজন যুবককে দেখিতে পাই যে সে পায়দল যাইতেছে তাহার নিকট কোন ছাওয়ারীও নাই খাদ্য দ্রব্যও নাই। আমি তাহাকে ছালাম করিলাম সে উত্তর দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে যুবক!

তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? সে বলিল তাহার নিকট হইতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছ ? উত্তর করিল তাহার নিকট, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, খাদ্য সামগ্রী কোথায় ? উত্তর করিল তাহার জিম্মায়। বলিলাম, ছামান ব্যতীত ত চলেনা কি আছে বল, সে বলিল আমি ছুফরের শুরুতে পাঁচটি হরফকে পাথেয় স্বরূপ নিয়াছি كهيعص। আমি বলিলাম উহার অর্থ বুঝে আসিল না। যুবক বলিল। কাফ অর্থ কাফী যথেষ্ট। হা অর্থ হাদী। ইয়া অর্থ ঠিকানা দাতা। আইন অর্থ আলেম সর্বজ্ঞানী। ছাদ অর্থ ছাদেক। তিনি যথেষ্ট হেদায়েত দানকারী ঠিকানা দাতা সর্বজ্ঞানী এবং ওয়াদা খেলাপ করে না সেই জাত থাকিতে আবার ভয় কিসের। হজরত মালেক বলেন তার কথা শুনিয়া আমি তাহাকে আপন কোর্তা দিয়া দিতে চাই। সে অস্বীকার করিয়া বলিল, বড় মিয়া। দুনিয়ার কোর্তার চেয়ে উলঙ্গ থাকা ভাল। হালাল বস্তু সমূহের হিসাব দিতে হইবে আর হারাম মালের জন্য ভোগ করিবে আজাব। রাত্রির অন্ধকারে সেই যুবক আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিল হে জাতে পাক! বান্দা এবাদত করিলে যিনি সন্তুষ্ট হন, আর পাপ করিলে যাঁহার কোন ক্ষতি নাই আমাকে ঐ জিনিস দান করুন যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হউন, আর ঐ জিনিস হইতে হেফাজত করুন যাহাতে আপনার কোন ক্ষতি নাই। তারপর লোকজন এহ্‌রাম বাঁধিয়া লাব্বায়েক বলিতে লাগিল কিন্তু সে লাব্বায়েক বলিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কেন লাব্বায়েক বলিতেছ না। সে বলিল এই ভয়ে যে আমি লাব্বায়েক বলিলে সেই দিক হইতে লা লাব্বায়েক উত্তর আসে নাকি।

তারপর সারাটি পথ তাহাকে দেখিলাম না। অবশেষে মিনায় তাকে দেখিলাম, সে শের পড়িতেছে তাহার অর্থ এই যে -

ঐ মাহবুব আমার রক্ত বহাইতেপছন্দ করেন। আমার রক্ত তাঁহার জন্য হারামের বাহিরে ও হালাল এবং হারামের ভিতরেও হালাল।'

"খোদার কছম আমার রূহ যদি জানিত যে কাহার সহিত তাহার সম্পর্ক তবে সে পায়ের বদলে মাথার উপর দাঁড়াইত।

"হে তিরস্কারকারীগণ! তোমরা যদি দেখিতে আমি যাহা দেখিতেছি তবে কখনও তিরস্কার করিতে না।"

"মানুষ শরীরের দ্বারা বয়াতুল্লার তওয়াফ করে তাহারা যদি আল্লার

জাতের তওয়াফ করিত তবে হারামেরও কোনপ্রয়োজন ছিল না।

"ঈদের দিন লোকজন ভেড়া বকরী কোরবানী করিতেছে আর মাশুক আমার জান কোরবান করিয়া ফেলিয়াছে।' কাজেই আমি আমার রক্ত এবং জান কোরবান করিতেছি।

"মানুষ হজ্ব করিতেছে আর আমার হজ্ব হইল সেই জিনিস আমার মনে শান্তি।'

যুবকটি তারপর এই দোয়া করিল -

মানুষ তোমার নৈকট্য লাভের জন্য কোরবানী করিতেছে আর আমার নিকট কোরবানী করার মত কিছুই নাই কাজেই তোমার দরবারে আমি আমার জানটুকু পেশ করিতেছি। তুমি উহা কবুল কর। তারপর এক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং মুর্দা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল তারপর গায়েব হইতে একটি আওয়াজ আসিল। ইনি আল্লার দোস্ত। আল্লার জন্য কোরবান হইয়াছে।

হজরত মালেক বলেন আমি তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করি। সারারাত আমি চিন্তাযুক্ত ছিলাম। একটু তন্দ্রা আসিলে আমি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, জনাব আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। সে বলিল তাঁহারা কাফেরদের তরবারীতে শহীদ হইয়াছেন আর আমি মাওলার প্রেমের তলোয়ারে শহীদ হইয়াছি। (রওজ)

ঘটনার অর্থ এই নয় যে সর্ব বিষয়ে শহীদানের চেয়ে বেশী মর্যাদা পাইয়াছে। কারণ ভিন্নভাবে তাঁহাদের ছাহাবী হওয়ার গৌরবও ছিল।

(৫) হজরত জুন নূন মিছরী (রঃ) বলেন হজ্বের ছফরে কোন এক ময়দানে আমার একজন নওজোয়ান যুবকের সহিত সাক্ষাত হয়। এত সুন্দর চেহারা তার, যেন চাঁদীর টুকরা। তার শরীরে মনে হইতেছিল এশক ও মহব্বত ঢেউ খেলিতেছে। সেও হজ্বে যাইতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, বেটা বড় লম্বা ছফর। সে একটা বয়াত পড়ি, যার অর্থ হইল —

"যাহারা ক্লান্ত এবং অলস তাহাদের জন্য এই ছফর দুরের, কিন্তু যাহারা প্রেমিক তাহাদের জন্য দুরের নয়।"

(৬) হজরত শিবলী (রঃ) যখন আরাফাতের ময়দানে যান তখন প্রথম চুপচাপ থাকেন, পরে যখন মিনায় রওয়ানা হইয়া হারামের সীমানা অতিক্রম করেন তখন তাঁহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং বয়আত পড়িতে লাগিলেন। যাহার অর্থ হইল—

"আমি তোমার মহব্বতের মোহর অন্তরে মারিয়াছি এই জন্য যে অন্তরে যেন অন্য কিছু আসিতে না পারে।

"হায়! আমার চক্ষু যদি এমনভাবে বন্ধ হইয়া যাইত যে তোমার দীদার ব্যতীত অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইত।

"বন্ধু মহলে এমন বন্ধু রহিয়াছে যাহারা শুধু একের জন্য পাগল আবার অনেকে আছে যাহাদের ভালবাসা কৃত্তিম। হঁা চক্ষুর পানি প্রবাহের দ্বারাই বন্ধুত্বের আসল চেহারা ফুটিয়া উঠে।"

(৭) হজরত ফোজায়েল এবনে এয়াজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে একেবারে চুপচাপ ছিলেন সূর্যাস্তের পর বলিয়া উঠিলেন হে খোদা! যদি ও তুমি ক্ষমা করিয়া দিয়াছ তবুও আমার দুরাবস্থার উপর আফছোছ হইতেছে।

(৮) হজরত ইব্রাহীম বিন মোহাল্লাব বলেন। তওয়াফ অবস্থায় আমি একটি বঁাদীকে দেখিতে পাই যে, কা'বা শরীফের পর্দা ধরিয়া কঁাদিয়া কঁাদিয়া বলিতেছে হে আমার সর্দার! আপনি যে আমাকে মহব্বত করেন উহার কছম দিয়া বলিতেছি আপনি আমার অন্তরকে ফিরাইয়া দিন। আমি বলিলাম হে মেয়ে! তুমি কি করিয়া জান যে আল্লাহ পাক তোমাকে মহব্বত করেন। বঁাদী বলিল, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন তবে আমার জন্য ইছলামী সৈন্য পাঠাইয়া কাফেরদের কবজা হইতে উদ্ধার করিয়া আমাকে মুছলমান বানাইতেন না। এবং তাঁহার মহব্বত ও মারেফত আমাকে দান করিতেন না ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত তোমার কিরূপ মহব্বত? বঁাদী বলিলেন শরাবের চেয়ে বাব্রিক এবং আরকে গোলাব হইতে ও পছন্দনীয়। তারপর মেয়েটি কতকগুলি এস্ক ও মহব্বতে ভর পুর বয়াত পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল।

(৯) হজরত মালেক বিন দীনার বলেন আমি এক দিন দেখিতে পাইলাম যে একটি যুবক বেকার হইয়া কাঁদিতেছে তাহাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলি। সে বছরার এক ধনী ব্যক্তির খুব আদরের ছেলে ছিল। সে ও আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল মালেক! আপনাকে কছম দিয়া বলিতেছি আপনি আমার জন্য দোয়া করুণ যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে মাফ করিয়া দেয়। তারপর যুবকটি কয়েকটি প্রেমপুর্ণ বয়াত পড়িতে পড়িতে কোথায় চলিয়া গেল। তার কিছু দিন পর আমি হজ্ব করিতে যাইয়া হারাম শরীফের মসজিদে দেখিতে পাই যে একটি যুবকের চারিপাশে লোকের খুব ভীড়

এবং মধ্যখানে একটি যুবক পেরেশান হইয়া কাঁদিতেছে। আমি গিয়া দেখিতে পাই যে সেই যুবকটি কাঁদিতেছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম বেটা তোমার অবস্থা কি বর্ণনা কর। সে বলিল, আল্লাহ পাক আপন মেহেরবানীতে আমাকে এখানে ডাকিয়াছেন। আমি যাহাই তাহার নিকট চাহিয়াছি তাহাই পাইয়াছি। তারপর তিনি প্রেমের কবিতা পড়িতে পড়িতে তাওয়াফ শুরু করেন।

(১০) জনৈক বুজুর্গ বলেন একবার আমি ভীষণ গরমের দিনে হজ্বে রওয়ানা হই, ঘটনা ক্রমে আমি কাফেলা হইতে পৃথক হইয়া পড়ি। হঠাৎ হেজাজের সেই কঠিন মরু প্রান্তরে অতীব সুন্দর চেহারার একটা বাচ্চাকে দেখিতে পাই। ছেলেটি এত সুন্দর যে মনে হইল যে তাহার চেহারা চতুর্দ্দশীর পূর্ণ চন্দ্র বরং দ্বিপ্রহরের সূর্য। আমি তাহাকে ছালাম করা মাত্র সে উত্তর দিল অ-আলাই কুমুচ্ছালামু হে ইব্রাহীম। আমি আশ্চার্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম বেটা আমার নাম তুমি কি করিয়া জানিলে? সে বলিল ইব্রাহীম যেই দিন হইতে তাহার মারফত আমার হাসিল হইয়াছে সেই দিন হইতে আর কোন জিনিস অজানা নাই। আমি বলিলাম, বাবা! এই কঠিন ও দুর দুরান্ত পথে একা একা তুমি কি করিয়া চলিতেছ। সে বলিল যেই দিন হইতে আমি তাঁহাকে বন্ধু বানাইয়াছি সেই দিন হইতে অন্য কাহাকেও আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করি নাই। আমি বলিলাম বেটা তোমার খাওয়া পরার ব্যবস্থা কি? সে উত্তর করিল আমার মাহবুব আপন জিম্মায় করিয়া রাখিয়াছেন। আমি বলিলাম, বেটা কছম খোদার বাহ্যিক নজরে তোমার হালাক হইয়া যাইবার যাবতীয় আছবাব আমি দেখিতেছি। তখন মুক্তার মত টপ টপ করিয়া তাহার চক্ষু হইতে পানি পড়িতে লাগিল এবং বয়াত পড়িতে লাগিল যার অর্থ হইল এই যে—

"কঠিন জঙ্গল এবং ময়দানের ভয় আমাকে কে দেখাইতে পারে? অথচ আমি সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আপন মাহবুবের দিকে যাইতেছি। আমার ক্ষুধা লাগিলে আল্লার জিকিরে আমার পেট ভরিয়া দেয় এবং তাঁহার প্রশংসাই আমার পিপাসা মিটাইয়া দেয় যদিও আমি দুর্বল হই তবুও মাহবুবের এস্ক আমাকে হেজাজ হইতে খোরাছান পর্যন্ত এবং পুর্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত নিয়া যাইতে পারে। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে কম বয়স্ক মনে করিয়া তুমি আমাকে তিরস্কার করিও না।"

ইব্রাহীম বলিলেন বেটা আমি তোমাকে কছম দিয়া বলিতেছি বল

তোমার বয়স কত? বাচ্চা বলিল আপনি বড় কঠিন কথা দিয়াছেন। 'আমার বয়স মাত্র বার বৎসর, আমি বলিলাম তোমার কথায় আমি আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া গেলাম যে তুমি এই সব কি বলিতেছ? ছেলে বলিল আল্লার শোকর তিনি আমাকে বহু নেয়ামত দান করিয়াছিলেন এবং অনেক মোমেনের উপর সম্মান দান করিয়াছেন। ইব্রাহীম বলেন ছেলের চন্দ্রেরমত ঝলমলে চেহারা এবং আখলাক ও মিষ্টি কথার উপর আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য বোধ করি এবং মনে মনে ভাবি ছোবহানাল্লাহ্! কত সুন্দর ছুরত আল্লাহ পাক তৈয়ার করিয়াছেন। ছেলে কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া পুনরায় আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করিয়া পড়িতে লাগিল :

আমার শাস্তি যদি জাহান্নাম হয় তবে এই সৌন্দর্য আমার ধ্বংস হইয়া যাইবে। আর যারা আল্লাহ্‌র হুকুম পালনকারী হইবে তাহাদের চেহারা চতুর্দশীর পূর্ণিমা চন্দ্রের মত ঝলমল করিতে থাকিবে" ইত্যাদি। তারপর ছেলে বলিল হে ইব্রাহীম! আপনি সাথীদের কাছ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন? আমি বলিলাম হ্যাঁ। ছেলেটি তখন ঠোঁট নাড়িয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া মনে হইল যেন কি বলিতেছে। হঠাৎ আমার তন্দ্রা আসিয়া গেল। তন্দ্রা ভাঙ্গার পর দেখিতে পাইলাম আমি কাফেলার মাঝখানে উটের পিঠে বসিয়া যাইতেছি। আর ছেলে কি আকাশের দিকে উড়িয়া গেল, না জমীনে রহিয়া গেল আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তারপর আমরা যখন সারা পথ অতিক্রম করিয়া হারাম শরীফে পৌঁছি। তখন দেখিতে পাই যে সেই ছেলেটি কা'বা ঘরের পর্দা ধরিয়া কাঁদিতেছে এবং এশ্ক ও মহব্বতে পরিপূর্ণ বয়াতসমূহ পড়িতেছে। বয়াত পড়িতে পড়িতে দেখিলাম, সে ছেজদায় পড়িয়া গেল আমি তাহার নিকট গিয়া তাহাকে ডাকিলাম। দেখিলাম কোন সাড়া শব্দ নাই। অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছে। আমি তাহার কাফন-দাপনের ব্যবস্থার জন্য তাড়াতাড়ী ঘরে যাইয়া দুইজন সঙ্গীকে নিয়া আসি। আসিয়া দেখিতে পাই যে তাহার লাশ আর সেখানে নাই। আফ্‌ছোছ করিতে করিতে আমি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ি। স্বপ্নে আমি সেই ছেলেকে দেখিতে পাই যে একটি বিরাট জমাতের মধ্যে সে আগে আগে রহিয়াছে। তাহার শরীরে এত মহামূল্যবান পোষাক ও নুর চম্‌কিতেছে যে ভাষায় উহার বর্ণনা করা যায় না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি মারা গিয়াছ? সে বলিল জী-হ্যাঁ। আমি বলিলাম, আফ্‌ছোছ আমি তোমার কাফনের ব্যবস্থা

করিতে পারিলাম না। ছেলে বলিল, যেই মাহবুব আমাকে শহর হইতে বাহির করিয়া, আপনজন হইতে পৃথক করিয়া আপন মহব্বতের শরাব পান করাইয়াছেন অপরের সর্পদ না করিয়া তিনিই আমার কাফন দিয়াছেন। আমি বলিলাম তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। ছেলে বলিল আমাকে আল্লাহ সম্মুখে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করেন। তুমি আমার নিকট কি চাও। আমি বলিলাম, হে খোদা! আমি শুধুমাত্র আপনাকেই চাহিতেছি এবং আমার জমানার সমস্ত মানুষের জন্য আমার সুপারিশ কবুল করিতে হইবে। উত্তর হইল তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহাই পাইবে। তারপর ছেলেটি বিদায়ের জন্য হাত বাড়াইয়া আমার সহিত মোছাফাহা করিয়া বিদায় নিল। আমি নিদ্রা হইতে উঠিয়া চট্‌পট্‌ করিতে থাকি। তারপর হজ্বের বাকী কাজসমূহ সম্পাদন করিয়া দেশে রওয়ানা হই। কাফেলার লোকজন বলাবলি করিতে লাগিল তোমার হাতের সুগন্ধীতে সমস্ত মানুষ হয়রান হইয়া যাইতেছে। কথিত আছে মৃত্যু পর্যন্ত ইব্রাহীমের হাত হইতে খুশ্‌বু বাহির হইত। (রওজা)

(১১) হজরত ইব্রাহীম খাওয়াছ বলেন আমি এক বৎসর হজ্বে যাইতেছিলাম। অনেক বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ছিল। বহুদুর পথ অতিক্রম করার পর মনে হইল আমি একাকী ছফর করিব। তাই আমি অন্য পথ ধরিলাম। তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত আমি একাধারে চলিতে থাকি। সেই নির্জন পথে হঠাৎ আমি একটি মনোরম ফলে ফুলে ভর্তী বাগান ও একটি নহর দেখিতে পাই। উহা এতই সুন্দর যে বেহেশ্‌তের বাগানের মত মনে হইল। দৃশ্য দেখিয়া আমি অবাক হইয়া পড়িলাম। হঠাৎ দেখি মানুষের ছবিওয়ালা সুন্দর চাদর পরিহিত একদল লোক। আমি দেখিয়াই চিনিলাম যে জ্বিন জাতি। আমি ছালাম করিলাম তাহারা উত্তর দিল। আমি বলিলাম আমার কাফেলা কত দূরে আপনারা বলিতে পারেন? একজন হাসিয়া উঠিয়া বলিল এখানে কোন সময় কোন মানুষ আসে নাই। শুধু একজন যুবক আসিয়াছিল ঐ নহরের ধারে তাহার কবর আছে। তারপর তাহারা বলিল আমরা বয়াতুল আকাবার রাত্রে হুজুরের নিকট কোরান শরীফ শ্রবণ করিয়া সংসার ত্যাগী হইয়া যাই। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য এখানে এইসব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাহারা ঐ যুবকের কেচ্ছা আমার নিকট এইভাবে বলিল যে, আমরা একদিন এস্ক ও মহব্বতের আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। হঠাৎ সেই যুবক তথায় আসিয়া হাজির। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম পর সে বলিল, সাতদিন পথ চলিয়া আমি নিশাপুর হইতে আসিয়াছি আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম

তুমি কোথায় যাইতেছ ? যুবক বলিল, আল্লাহ পাক বলিতেছেন :

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ -

"তোমরা আপন প্রভুর দিকে রুজু কর এবং আজাব আসিবার আগে আগে তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ পরে তোমরা আর কোন সাহায্য পাইবে না।"

আমরা প্রশ্ন করিলাম রুজু কর অর্থ কি এবং আজাব কি জিনিস সে বলিতে লাগিল এবং আজাবের অর্থ বলার সময় সজোরে এক চীৎকার মারিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। আমরা তাহাকে ওখানে দাফন করিয়া দেই। ইব্রাহীম বলেন আমি কবরের নিকট গিয়া দেখি তার পাশে এক নারগিছ ফুলের তোড়া। উহাতে এমন সুগন্ধী যাহা আমি জীবনে কখনও পাই নাই। উহার পাতার মধ্যে রুজু করার তাফছীর লেখা রহিয়াছে। জিন্নাতের প্রশ্নে আমি উহার অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কবরের মধ্যে লেখা ছিল ইহা আল্লাহর দোস্তের কবর।

হজরত ইব্রাহীম বলেন তারপর আমার একটু তন্দ্রা আসিল। অতঃপর চক্ষু খুলিলে পর দেখিতে পাই যে আমি তানঈম অর্থাৎ হজরত আয়েশার মসজিদের নিকট। যাহা হারাম শরীফের একেবারেই নিকটে অবস্থিত। আমরা কাপড়ের মধ্যে দেখি ফুলের একটি তোড়া। যাহা তরু তাজা অবস্থায় আমার নিকট এক বৎসর যাবত ছিল। তার কিছুদিন পর উহা আপনা-আপনি হারাইয়া যায়।

(১২) একদা কোন ব্যবসায়ীদল হজ্বে যাইতেছিল। পথিমধ্যে তাহাদের জাহাজ বিকল হইয়া যায়। ওদিকে হজ্বের সময়ও একেবারে ঘনাইয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক ব্যবসায়ীর পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রা পরিমাণ মাল ছিল। সাথীরা তাহাকে বলিল তুমি যদি কয়েকদিন অপেক্ষা কর তবে তোমার কিছুমাল উদ্ধার করিতে পার, সে বলিল খোদার কছম সমস্ত দুনিয়ার মাল পাওয়া গেলেও আমি হজ্ব বাদ দিতে পারি না। কারণ হজ্বের মধ্যে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অবশেষে

সকলের অনুরোধে সে একটি ঘটনা এইভাবে বয়ান করিল যে—

এক সময় আমাদের কাফেলার পানির ভীষণ অভাব পড়িয়া গিয়াছিল। কাহারও নিকট পান করিবার মত এক বিন্দু পানি ও ছিল না। আমি পিপাসায় কাতর হইয়া পেরেশান অবস্থায় একদিকে চলিতে থাকি। হঠাৎ একজন ফকির দেখিতে পাই। তাহার হাতে একটা বর্শা এবং একটা পেয়ালা, সে বর্শাটা একটা হাউজের নালির মধ্যে পুতিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে নালি হইতে জোশ মারিয়া পানি উঠিতে লাগিল এবং হাউজ ভর্তী হইয়া গেল। কাফেলার সমস্ত লোক তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়া আপন মশক ও ভর্তি করিয়া লইল। কিন্তু সেই হাউজের পানি বিন্দুমাত্র ও কমে নাই। যেই স্থানে এমন বুজুর্গ লোকেরা আসেন সেখানে হাজির না হইয়া কে থাকিতে পারে।

(১৩) আবু আবদুল্লাহ জওহারী বলেন, আমি এক বৎসর আরাফাতের ময়দানে হাজির ছিলাম। সেখানে আমার একটু তন্দ্রা আসায় আমি দেখিতে পাই যে আছমান হইতে দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করিয়া একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিল এই বৎসর কতজন লোক হজ্ব করিতে আসিয়াছে। সাথী উত্তর করিল ছয় লক্ষ হজ্ব করিয়াছে। কিন্তু মাত্র ছয় জনের হজ্ব কবুল হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি এত মনক্ষুন্ন হইয়া পড়িলাম যে মনে চাহিল নিজের গালে থাপ্পড় মারি এবং খুব কান্নাকাটি করি। এমতাবস্থায় প্রথম ফেরেশ্‌তা আবার জিজ্ঞাসা করিল যাহাদের হজ্ব কবুল হয় নাই আল্লাহ পাক তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় ফেরেশ্‌তা উত্তর করিল আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন ছয় জনের বদলে, ছয় লক্ষ লোকের হজ্ব কবুল করিয়াছেন। ছোবহানাল্লাহ।

(১৪) আলী বিন মোয়াফফেক বলেন, আমি ষাট হজ্ব শেষ করার পর হারাম শরীফে বসিয়া একবার চিন্তা করিলাম আর কতকাল মাঠ ঘাট আর মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিব। অনেক হজ্ব করিয়া ফেলিয়াছি। এবার শেষ হজ্ব। তখনই আমার একটু তন্দ্রা আসে, গায়েব হইতে আওয়াজ শুনিতে পাই, কে যেন বলিতেছে এব্‌নে মোয়াফেক্ক! ঐ ব্যক্তি বড় ভাগ্যবান যাকে এদিকে ডাকা হয়, তিনি যাকে পছন্দ করেন তাকেই আপন ঘরের দিকে ডাকিয়া থাকেন।

(১৫) হজরত জুননুন মিছরী (রঃ) বলেন এক সময় কা'বা শরীফের নিকট জনৈক যুবককে দেখিতে পাই যে ধড়াধড় শুধু সেজদার উপর

ছেজদাই করিতেছে। আমি বলিলাম, খুব বেশী বেশী নামাজ পড়িতেছ মনে হয়। যুবক বলিল দেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিতেছি। হঠাৎ দেখি উপর হইতে একটা কাগজের টুকরা পড়িল, উহাতে লেখা ছিল বড় ক্ষমাশীল এবং ইজ্জতওয়ালা মনিবের তরফ হইতে শোকর গোজার বান্দার প্রতি ; তুমি দেশে ফিরিয়া যাও এই অবস্থায় যে তোমার আগের পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইল।

(১৬) ছহল বিন আবদুল্লাহ বলেন, আবদুল্লাহ বিন ছালেহ একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি মক্কা শরীফ অবস্থান করেন। এক সময় আমি তাঁহাকে বলিলাম আপনি মক্কা শরীফ খুব বেশী বেশী থাকিতেছেন কেন। তিনি বলেন এই শহরে কেন থাকিব না এই শহরে দিবারাত্রি আল্লাহর রহমত যতটুকু অবতীর্ণ হয় অন্য কোথায়ও তা হয় না। এমন কি এখানে এমন এমন ঘটনা সমূহ হয় যাহা প্রকাশ করিলে দুর্বল ঈমান ওয়ালারা বিশ্বাস করিবে না। আমি বলিলাম আপনাকে কছম দিয়া বলিতেছি আমাকে কিছু ঘটনা শুনাইয়া দিন। তিনি বলেন এমন কোন কামেল অলী নাই যিনি প্রতি জুমার রাত্রে এই শহরে আসেন না। বিভিন্ন ছুরতে ফেরেশতাগণ আনাগোনা করেন। এই ঘরের চারিপার্শ্বে আম্বিয়া আওলিয়া ফেরেশ্তা সকলেই আসিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা, মালেক বিন কাছেম নামক জনৈক অলির সহিত আমার দেখা। তাঁহার হাত হইতে গোস্তের সুগন্ধি আসিতেছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম মনে হয় আপনি গোস্ত খাইয়া আসিয়াছেন তিনি বলিলেন, আমি ত সাত দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই। তবে আম্মাকে খানা খাওয়াইয়া ফজরের নামাজ ধরিবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি আসিয়াছি। আবদুল্লাহ বলেন যেখান হইতে তিনি জমাতে শরীক হইবার জন্য আসিয়াছিলেন মক্কা হইতে উহার দূরত্ব ছিল সাতাইশ শত মাইল। ইহার পর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি ইহা বিশ্বাস হইয়াছে ? আমি বলিলাম জী-হাঁ। বিশ্বাস হইয়াছে। আবদুল্লাহ বলেন আলহামদু লিল্লাহ একজন ঈমানদার লোক পাইলাম।

(১৭) ইমাম মালেক (রঃ) বলেন হাশেমী খান্দানের মধ্যে হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের মত মোত্তাকী পরহেজগার আমি আর দেখি নাই। এতদসত্ত্বেও তিনি যখন হজ্বে গমন করেন। এহরাম বাঁধার পর

তাহার জবান হইতে লাব্বায়েক শব্দ বাহির হইতেছিল না। যখনই লাব্বায়েক বলিতে এরাদা করিতেন বেহুশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন, সারাটি পথ তাঁহার এইভাবে কাটিয়া যায়। এমনকি উটের পিঠ হইতে পড়িয়া তাঁহার হাঁড় ভাঙ্গিয়া যায়।

হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বড় হেকমতের কথাসমূহ বলিতেন। তিনি বলেন, কোন কোন লোক আল্লাহর ভয়ে এবাদত করে। ইহা ত গোলামদের এবাদত। (যেমন ডাণ্ডার জোরে কাম লওয়া হয়) আবার কেহ এনআমের জন্য এবাদত করে। ইহা ব্যবসায়ীদের এবাদত। কারণ তাহারা প্রত্যেক কাজেই লাভের অঙ্ক তালাশ করে। আজাদ ব্যক্তিদের এবাদত হইল তাঁহার শোকর গোজারীর মধ্যে এবাদত করে।

(১৮) হজরত আবু ছায়ীদ খাররাজ (রঃ) বলেন হারাম শরীফের মসজিদে আমি ছেঁড়া পুরাণ কাপড় পরিহিত একজন ফকীরকে দেখিলাম সে লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে। আমি মনে মনে ভাবিলাম এইসব লোকেরাই মানুষের উপর বোঝাস্বরূপ। লোকটি আমার দিকে চাহিয়া এই আয়াত পড়িল—

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ (بقره)

অর্থাৎ—এই কথা জানিয়া রাখ যে আল্লাহ পাক তোমার দিলে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর।”

আবু ছায়ীদ বলেন আমি বদগুমানীর উপর মনে মনে তওবা করিয়া লইলাম। লোকটি আমাকে আওয়াজ দিয়া পুনরায় এই আয়াত পাঠ করিল -

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ -

‘তিনি আপন বান্দাদের তওবা কবুল করিয়া থাকেন এবং সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দেন।”

(১৯) জনৈক বুজুর্গ বলেন আমি কাফেলার সহিত যাইতেছিলাম পথি মধ্যে আমি একজন মহিলাকে দেখিতে পাই যে, সে কাফেলার সম্মুখ দিয়া আগে আগে যাইতেছে, আমি মনে মনে ভাবিলাম মেয়ে লোকটি দুর্বল বশতঃ কাফেলা হইতে পৃথক হইয়া যায় নাকি সেইজন্য আগে আগে যাইতেছে আমি পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছিলাম এবং বলিলাম কাফেলা মঞ্জিলে পৌঁছিলে চান্দা করিয়া আপনার জন্য ছওয়ারীর ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইবে। মেয়েলোকটি উপরের দিকে

হাত উঠাইয়া কি যেন হাতে লইল দেখিলাম তাহার হাতে টাকা। সে ঐগুলি আমাকে দিয়া বলিল লও তুমি পকেট হইতে লইয়াছ ; আর আমি গায়েব হইতে লইয়াছি। তারপর মেয়েলোকটাকে আমি দেখিয়াছি যে, সে গেলাপে কা'বা ধরিয়া এস্ক ও মহব্বতে ভরপুর কবিতা-সমূহ পড়িতেছে।

(২০) হজরত আবদুর রহমান খফীফ বলেন, আমি হজ্বে রওয়ানা হইয়া বাগদাদ শরীফ পৌছি সেখানে হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর সহিত সাক্ষাত করি। তখন আমার ছুফীগিরির উপর একটু ভরষা ছিল। কারণ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খাইও নাই পান ও করি নাই। কঠিন মোজাহাদার মধ্যে ছিলাম, আকীদায়ও বড় মজবুত ছিলাম। সবসময় অজুর সহিত থাকিতাম। বাগদাদ হইতে আমি একাকী রওয়ানা হই। পথিমধ্যে কঠিন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ি। হঠাৎ মরু প্রান্তরে একটা কুয়ার মধ্যে একটি হরিণকে পানি পান করিতে দেখি। আমি যখন কুয়ার নিকট যাই তখন হরিনটি আমাকে দেখিয়া চলিয়া যায়। এবং কুয়ার পানি ও নীচে পড়িয়া যায়। আমি আশ্চর্য হইয়া বলি হে খোদা। তোমার দরবারে এই হরিণের চেয়ে ও কি আমি ছোট হইয়া গেলাম ? তখন পিছন থেকে একটি আওয়াজ শুনিতে পাই তুমি অধৈর্য্য হইয়া অভিযোগ শুরু করিয়াছ সেইজন্য আমি তোমাকে পরীক্ষা করিয়াছি। হরিণ পেহালা এবং রশি ব্যতীত আসিয়াছিল আর তুমি রশি পেয়ালা নিয়া আসিয়াছ। আস পানি পান করিয়া যাও। আমি কুয়ার ধারে গিয়া যে কুয়া পানিতে ভর্তি। আমি উহা হইতে পেয়ালা ভর্তি করিয়া লইলাম। আমি সেখান হইতে পান করিতে থাকি ও অজু করিতে থাকি কিন্তু মদীনা শরীফ যাওয়া পর্য্যন্ত উহা শেষ নাই। হজ্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া যখন বাগদাদ জামে মসজিদে গমন করি তখন হজরত জোনায়েদ বলেন তুমি যদি ছবর করিতে তবে তোমার পায়ে তলা হইতে জোপ মারিয়া পানি উঠিত।

(২১) হজরত শফিক বলখি বলেন, মক্কা শরীফের পথে আমার সহিত একজন লেংড়া লোকের সাক্ষাত হয়। সে হেঁছড়াইয়া হেঁছড়াইয়া যাইতেছিল আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, সে বলিল আমি ছমর কন্দ হইতে আসিয়াছি ; আমি প্রশ্ন করিলাম কতদিন পূর্বে রওয়ানা হইয়াছ ? সে উত্তর করিল দশ বৎসর পূর্বে রওয়ানা হইয়াছি। আমি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে

বলিল শফিক কি দেখিতেছ? বলিলাম তোমার দুর্বলতা এবং ছফরের দূরত্ব দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম, সে বলিল আমার অন্তরের আবেগ ছফরের দূরত্বকে নিকটবর্তী করিয়া দিয়াছে, শফিক যেই দুর্বলকে স্বয়ং মালেক লইয়া যাইতেছে তাহার উপর তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছ?

راہ پیا بم یا نیا بم آرزوئے می کنم
حاصل آید یا نیاید جستجوئے می کنم

বন্ধুর মিলন পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি বা না পারি চেষ্টা'ত করিয়া যাইব।

(২২) হজরত শায়েখ নজমুদ্দিন ইস্পেহানী মক্কা শরীফে কোন এক জানাজায় শরীক হইয়াছিলেন, দাফনের পর মুর্দাকে তালকীন করার জন্য এক ব্যক্তি কবরের পাশে বসিয়া তালকীন করিতে লাগিল। তখন শায়েখ নজমুদ্দিন হঠাৎ হাসিয়া উঠিলেন। অথচ তিনি কখনও হাসিতেন না। জনৈক খাদেম হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধমক দিয়া তাহাকে চুপ করাইয়া দিলেন। কয়েকদিন পর তিনি বলিলেন, তালকীনের সময় কবরওয়ালাকে আমি বলিতে শুনিয়াছি বড় আশ্চার্য্য কথা এই যে একজন মুর্দা জিন্দা ব্যক্তিকে তালকীন করিতেছে।

মুর্দা ব্যক্তি আল্লাহর এস্কের দরুণ জিন্দা ছিল। আর জিন্দা ব্যক্তি ঐ দৌলত হইতে বঞ্চিত থাকায় মুর্দার সমতুল্য।

মৃত ব্যক্তি কবরের নিকট বসিয়া কালেমা এবং মনকীর নকীরে ছওয়াল জওয়াবকে বারংবার পড়ার নাম তালকীন, আরব দেশে ইহার নিয়ম আছে।

(২৩) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারা হাজির ছিলাম। তখন একজন আজমী বুজুর্গকে দেখিলাম যে তিনি হুজুরের খেদমতে বিদায়ী ছালাম বলিয়া মক্কা শরীফে রওয়ানা হইয়াছে, আমিও তাঁহার পিছনে রওয়ানা হইলাম। তিনি জুলহোলায়ফা পৌছিয়া নামাজ পড়িয়া এহরাম বাঁধিলেন। আমিও নামাজ পড়িয়া এহরাম বাঁধিলাম তিনি যখন রওয়ানা হইলেন আমিও তাহার পিছনে রওয়ানা হইলাম। এবার তিনি আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম আপনার সহিত মক্কা শরীফ যাইতে চাই। তিনি অস্বীকার করিলেন। আমি অনেক খোশামদ, তোশামদ করিয়া তাঁহাকে রাজী করাইলাম। তিনি শর্ত করিলেন যদি যাইতেই চাও তবে আমার কদমে কদম রাখিয়া চলিও। আমি শর্ত মোতাবেক চলিতে লাগিলাম। খানিকটা রাত্রির অন্ধ-

কারে চলার পর বাতি নজরে আসিল। তিনি আমাকে বলিলেন ইহা মসজিদে আয়েশা। মক্কা শরীকের মাত্র তিন মাইল দূরে তানঈমে অবস্থিত তিনি আমাকে বলিলেন, আমি আগে বাড়িয়ে যাইব। আমি বলিলাম আপনার যাহা মঞ্জুর হয়। তারপর তিনি আগে চলিয়া গেলেন। আমি সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়া সকাল বেলায় মক্কা শরীফ পৌঁছি। তাওয়াফ এবং ছায়ীর পর হজরত শায়েখ আবু বকর কাত্তানীর খেদমতে হাজির হই। সেখানে অনেক মাশায়েখ ও বুজর্গান বসা ছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন তুমি মদীনা শরীফ হইতে কবে আসিয়াছ। আমি বলিলাম গত রাত্রে মদীনায় ছিলাম, ইহা শুনিয়া সকলে একে অপরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। শায়েখ কাত্তানী বলেন কাহার সহিত আসিয়াছ? আমি বলিলাম এই রকম এক বুজুর্গের সহিত আসিয়াছি, তিনি বলিলেন উনি হইলেন শায়েখ আবু জাফর ওয়ামেগানী। তাঁহার অন্যান্য ঘটনা-বলীর মধ্যে ইহা ত একটি সাধারণ ব্যাপার।

(২৫) হযরত ছুফিয়ান এব্নে ইব্রাহীম বলেন আমি মক্কা শরীফে হুজুরের জন্মস্থানে ইব্রাহীম এব্নে আদহামকে খুব কান্না অবস্থায় দেখিতে পাই। আমি তাঁহাকে ছালাম করি এবং সেখানে কিছু নামাজ পড়িয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, হুজুর কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন কিছুইনা। আমি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন তুমি যদি কথা গোপন রাখিতে পার তবে কারণ বর্ণনা করিতে পারি। আমার স্বীকৃতি পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ আমার সেকবাজ খাইতে মন চায়। (সেকবাজ সিরকা, গোস্ত এবং ফল মিশ্রিত এক প্রকার সুস্বাদু খাদ্য) আমি মোজাহাদা করিয়া উহা হইতে নফছকে বিরত রাখি। রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্নে দেখি, একজন ঝক্ ঝকে নুরানী চেহারাওয়ালা যুবক আমার নিকট হাজির। তাহার সবুজ পেয়ালা, যাহার মধ্য হইতে ধুঁয়া উঠিতেছে এবং সেখান হইতে সেকবাজের সুগন্ধি আসিতেছে আমি নিজেকে সংযত করিয়া নিলাম। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন ইব্রাহীম ইহা খাও। আমি বলিলাম একমাত্র আল্লাহর জন্য যাহা দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত বর্জন করিয়াছি উহা আমি খাইতে পারি না। তিনি বলিলেন যদি স্বয়ং আল্লাহ খাওয়ান তবুও না? তখন কান্না ছাড়া আমার আর কি কাজ হইতে পারে। যুবক বলিল আল্লাহ পাক তোমার উপর রহম করুণ ইহা খাও। আমি বলিলাম পূর্ণ তাহকীক ব্যতীত আমি কোন জিনিষ খাই না। তখন যুবক বলিল আল্লাহ পাক তোমার হেফাজত

করুণ! বেহেশতের নাজেল রেজওয়ান ফেরেশতা আমাকে বলিল যে, খিজির তুমি গিয়া ইব্রাহীমকে ইহা খাওয়াইয়া আস, সে বহুত ছবর করিয়াছে। খাহেশকে খুব বেশী দমন করিয়াছে। ইব্রাহীমকে আল্লাহ পাক খাওয়াইতেছে আর তুমি অস্বীকার করিতেছ। আমি ফেরেশতাদের নিকট শুনিয়াছি, না চাওয়া জিনিস পাইলে যে ব্যক্তি লইতে চায় না পরে চাইলেও সে ঐ জিনিস পায় না। আমি বলিলাম দেখ আমি এখনও ওয়াদা ভঙ্গ করি নাই। হঠাৎ অপর একজন যুবক আসিয়া খিজিরকে কি যেন দিয়া বলিল ইহার লোকমা বানাইয়া ইব্রাহীমের মুখে দিয়া দাও। সে আমাকে খাওয়াইতেছিল। যখন আমার চক্ষু খুলিল তখন মুখে মিষ্টি অনুভব করি ঠোঁটে জাফরানের রং দেখিতে পাই। জমজমের ধারে গিয়া মুখ ধুইয়া ফেলি তবুও মুখের লজ্জত এবং রং এখনও যায় নাই, ছুফিয়ান বলেন আমি ও তাঁহার মুখে জাফরানের রং দেখিতে পাই। তারপর ইব্রাহীম এবনে আদহাম আমার জন্যও খুব দোয়া করেন।

(২১) হজরত ইব্রাহীম এবনে আদহাম এক সময় তাওয়াফের হালতে জনৈক নওজোয়ান সুদর্শন যুবককে দেখিতে পান। যুবকের সৌন্দর্যে সমস্ত লোক আশ্চর্য বোধ করিতেছিল। ইব্রাহীম তাহার দিকে খুব মনযোগ দিয়া দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। তাঁহার কোন কোন সঙ্গী বদগুমান করিয়া ইন্না-লিল্লাহও পড়িয়া ফেলিলেন। এবং শায়েখকে বলিলেন এই রকম চাওয়ার অর্থ কি? তিনি বলিলেন যাহার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ আছি তাহা ভঙ্গ করিবার উপায় নাই নচেৎ এই ছেলেকে আমার নিকট ডাকিতাম ও তাহাকে স্নেহ করিতাম কারণ সে আমারই সন্তান। এবং আমার চক্ষুর পুতুল। আমি শিশুকালে এই ছেলেকে ঘরে রাখিয়া সংসার ত্যাগী হইয়াছি, সেই বাচ্চা এখন যুবক হইয়াছে। কিন্তু আমার বড় লজ্জা হইতেছে যাহাকে একবার ছাড়িয়াছি সেই দিকে আবার কি করিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারি। তারপর তিনটি বয়াত পড়িলেন যাহার অর্থ হইল এই যে -

"যেদিন হইতে আমি সেই পাক জাতকে চিনিয়াছি সেদিন হইতে আমি যেদিকেই নজর করি সেই দিকেই মাহবুবকে দেখিতে পাই।"

"আমার দৃষ্টির বড় লজ্জা হয় যে আমি তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকে ও দেখি। হে আমার পুঁজির শেষ প্রান্ত, যে আমার স্বর্ণ সম্পদ। তোমার মহব্বত যেন হাশর পর্যন্ত আমার অন্তরে থাকে।"

তারপর শায়েখ আমাকে বলিলেন, তুমি সেই ছেলের কাছে গিয়া আমার ছালাম বল হয়তঃ উহার দ্বারাই আমার মনে একটু প্রবোধ

আসিবে। আমি ছেলের নিকট গিয়া বলিলাম বেটা আল্লাহ পাক তোমার পিতার মধ্যে বরকত দান করুণ। ছেলে শুনিয়াই চমকিয়া উঠিল বলিলেন চাচাজান আমার আব্বাজান কোথায়? তিনিত ছোট বেলায় আমাকে ছাড়িয়া আল্লার রাস্তায় চলিয়া গিয়াছেন, হায় আফছোছ! আমি যদি জীবনে একবারও তাঁহার দর্শন লাভ করিতাম সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। এই বলিয়া সে ভীষণ ক্রন্দন শুরু করিল। আবার বলিতে লাগিল কছম খোদার আমি যদি একবার তাঁহাকে দেখিয়া মরিয়া যাইতাম তার পর ছেলে শুধু এস্ক ও মহব্বত পূর্ণ বয়াত পড়িতে লাগিল। ওদিকে আমি ইব্রাহীম এবনে আদহামের নিকট ফিরিয়া দেখিলাম তিনি ছেজদায় পড়িয়া কাঁদিতেছেন। আর বলিতেছেন, হে খোদা! আমি তোমার জন্য সর্বহারা হইয়াছি। আপন পরিবার পরিজনকে এতীম করিয়াছি। তোমার এস্ক এবং মহব্বত ব্যতীত অন্য কোন স্থানে আমার মনে শান্তি নাই।" আমি শায়েখকে বলিলাম আপনি ছেলের জন্য দোয়া করুণ, হজরত ইব্রাহীম বলিলেন, আল্লাহ পাক তাহাকে গোনাহ হইতে হেফাজতে রাখুন এবং তাঁহার মর্জিমত চলিবার তৌফিক দান করুণ। রওজ

(২৬) হজরত আবু বকর দাক্কাক বলেন, আমি বিশ বৎসর যাবত মক্কা শরীফ ছিলাম। মনে চাহিয়াছিল একটু দুধ পান করি কিন্তু ইচ্ছা করিয়া উহা বর্জন করি। অবশেষে দুধ পানের আকাংখ্যা যখন বাড়িয়া গেল তখন মক্কা ছাড়িয়া আছকালান চলিয়া গেলাম। সেখানে আমি এক আরব পরিবারের মেহমান হইলাম। তাহাদের এক অনিন্দ সুন্দরী মেয়ের প্রতি আমার নজর পড়িল। এত সুন্দরী ছিল যে সে আমার হৃদয় কাড়িয়া লইয়া গেল। মেয়েটি আমাকে বলিল তুমি যদি সত্য হইতে তবে দুধের খায়েশ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিতে। এই কথা শুনিয়া আমি মক্কা শরীফ ফিরিয়া আসিলাম, বায়তুল্লার তওয়াফ করিয়া রাত্রি বেলায় স্বপ্নে হজরত ইউছুফ (আঃ) কে দেখতে পাই। বলিলাম হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ পাক আপনার চক্ষুকে ঠাণ্ডা রাখুক, আপনি জোলখানার চক্রান্ত হইতে বেশ রক্ষা পাইয়াছেন। হযরত ইউছুফ বলিলেন বরং আপনি আছকালানের মেয়ে হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করিলেন।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ -

"যেই ব্যক্তি আপন প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয় রাখে তাহার জন্য দুইটি বেহেশ্‌ত।"

জনৈক বুজুর্গ বলেন নফছের চক্রান্ত হইতে নফছের দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায় না। হাঁ নফছের বেড়াজাল হইতে আল্লাহ পাকের দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন যেই ব্যক্তি আল্লাহর সহিত মিলিত হইয়া শান্তি লাভ করিল সে নাজাত পাইল। আর যে আল্লাহকে ছাড়িয়া শান্তি লাভ করিল সে ধ্বংস হইয়া গেল।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষের দৃষ্টি কোন মেয়েলোকের উপর পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে যদি উহা হটাইয়া নেয় তবে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন এবাদতের তওফিক দান করেন যাহার লজ্জত সে অনুভব করিয়া থাকে। (মেশকাত)

(২৭) হজরত শায়েখ আবু তোরাব বখশি বলেন যেই ব্যক্তি কোন জিকির করনেওয়ালাকে অন্য কাজে লিপ্ত করিয়া দেয় তাহার উপর ঐ সময় আল্লার আজাব এবং গজব নাজেল হইয়া যায়।

অনেক লোক কোন বুজুর্গ ব্যক্তি জিকিরে ফিকিরে মশগুল থাকিলে তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দেয় এইসব ব্যাপারে খুব সাবধান থাকিতে হইবে।

(২৮) জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি একাকী হজ্ব করিতে গিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন কেহই সাথে ছিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিবে না। চলিতে চলিতে এমন সময় আসিয়া গেল এখন আর তাহার নিকট কিছুই নাই। দুর্বলতায় শরীর অবশ হইয়া আসিল। মনে মনে এই চরম মুহূর্তে কাহারও নিকট কিছু চাওয়া যায়। তবুও প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া বলিলেন মরিয়া গেলেও চাহিব না। এই ভাবিয়া কেবলামুখী হইয়া শুইয়া মৃত্যুর প্রহর গুনিতে লাগিল। হঠাৎ সেখানে একজন ছওয়ার আসিয়া তাহাকে পানি পান করাইল ও যাবতীয় প্রয়োজনও মিটাইয়া দিল। ও পরে বলিল তুমি কি কাফেলার সহিত মিলিতে চাও বুজুর্গ বলিলেন তাহারা ত এখন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। ছওয়ার বলিল দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে চল। এইভাবে কয়েক কদম হাটার পর বলিল তুমি এখানে বস, পিছন হইতে কাফেলা তোমার নিকট আসিয়া পৌছিবে। লোকটি সেখানে বসিয়া গেল। এবং কাফেলা আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইল।

(২৯) আবুল হাছান ছেরাজ বলেন, এক সময় তওয়াফ করা অবস্থায় একটি মেয়েলেকের চেহারায় আমার নজর পড়িয়া যায় এত উজ্জল

চমকপ্রদ চেহারা কছম খোদার আমি জীবনে কখনই দেখি নাই। বলিলাম তাহার চেহারায় এত লাবণ্য এই জন্য যে, মনে হয় তার জীবনে কোন দুঃখ কষ্ট নাই। মেয়েলোকটি আমার কথা শুনিয়া ফেলিল এবং বলিল তুমি কি বলিয়াছ? চিন্তা ও দুঃখের সাগরে আমি ডুবিয়া আছি। এই দুনিয়ায় আমার চিন্তার মধ্যে অন্য কেহ শরীক নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি হইয়াছে? সে বলিতে লাগিল আমার স্বামী কোরবানী উপলক্ষে একটি বকরী কোরবানী করিয়াছিল। আমার দুই ছেলে খেলিতেছিল এবং অপর এক ছেলে আমার কোলে দুধ খাইতে-ছিল। আমি গোস্ত পাকাইতেছিলাম। ছেলে দুইটির একটি অপরটিকে বলিল আব্বা কিভাবে বকরী জবেহ করিয়াছিল আমি কি তোমাকে দেখাইব? সে বলিল হাঁ দেখাও। এই বলিয়া এক ভাই অপর ভাইকে জবেহ করিয়া দিল। যে জবেহ করিয়াছিল সে ভয়ে গিয়া পাহাড়ে উঠিল। সেখানে তাহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিল। আমার স্বামী ছেলের তালাশে বাহির হইয়া তালাশ করিতে করিতে পানির পিপাসায় মরিয়া গেল। স্বামীর দেরী দেখিয়া আমি কোলের শিশুকে ঘরে রাখিয়া ঘরের দরওয়াজার দিকে স্বামীর খোঁজে গিয়াছি ইত্যবসারে ছোট বাচ্চা চুলার ধারে হামাগুড়ি দিয়া টগবগে হাণ্ডিধরিয়া টান দিল যাহাতে তাহার সমস্ত শরীরের মাংস খসিয়া পড়িয়া যায়। বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছিল স্বামীর বাড়ীতে থাকিয়া বাপের বাড়ীর এইসব দুর্ঘটনা শুনিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া যায় ও তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়।' এই সবের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাকেই একমাত্র রাখিয়াছেন। আমি বলিতে লাগিলাম ছবর এবং বেছবরের মধ্যে আকাশ জমীন তফাৎ। আমি এতবড় মছিবতের সময় ছবর করিয়াছি যদি সেই মছিবত পাহাড়ের উপর পড়িত তবে উহাও টুকরা টুকরা হইয়া যাইত। আমি পরম ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া চোখের পানিকে সংযত করিয়াছি এবং সেই চোখের পানি ভিতরে ভিতরে আমার কলিজার উপর পতিত হয়।

(২০) হজরত শায়েখ আলী এবনে মোয়াফফেক বলেন আমি একবার ছওয়ার হইয়া হজ্বে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে একটি পায়দল জমাত দেখিতে পাই ছাওয়ারী ত্যাগ করিয়া আমিও তাহাদের সহিত শরীক হই। আমরা প্রকাশ্য পথ ছাড়িয়া অন্য পথ ধরিয়া যাইতে থাকি। চলিতে চলিতে আমরা এক জায়গায় গিয়া রাত্রি যাপন করি। রাত্রে

স্বপ্নে দেখি যে কয়েকটি মেয়ে স্বর্ণের রেকাবী এবং চাঁদীর বাটী হাতে করিয়া পায়দল জমাতের পা ধুইয়া দিতেছে এবং আমি ব্যতিত সকলের পা ধুইয়া দেয়। তন্মধ্যে একজন বলিল এই লোকটাও ত তাহাদের মো একজন। বাকী সকলে বলিল না এই লোকটার নিকট ছাওয়ারী আছে। প্রথম মেয়েটি বলিল না ইনিও পায়দল জমাত পছন্দ করিয়াছেন। তখন তাহারা আমার পাও ধুইয়া দিল যদ্দারা পায়দল চলার যাবতীয় ক্লান্তি আমার দূর হইয়া যায়।

(৮.) জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি কোন এক সময় তাওয়াফ করিবার সময় একটি মেয়েকে দেখিতে পাইলাম যে তাহার কাঁধের উপর একটি ছোট বাচ্চা রহিয়াছে। মেয়েটি বলিতেছিল হে করীম! হে করীম! আমার এবং তোমার মধ্যের সেই সময়টুকু কতই না শোকরিয়া আদায়ের যোগ্য। আমি বলিলাম সেটা তোমার কেমন সময় ছিল? মেয়েটি বলিল আমি ব্যবসায়ীদের একটি জমাতের সহিত কোন সময় নৌকাযোগে করিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ ভীষণ তুফান আসিয়া নৌকাটি ডুবাইয়া দেয়। এবং সমস্ত লোক ধ্বংস হইয়া যায়। আমি এবং এই শিশু একটি তক্তার উপর ভাসিতেছিলাম এবং একজন হাবসী অপর একটি তক্তায় ভাসিতেছিল। যখন একটু ভোর হইয়া আসিল। তখন ঐ হাবসী আমাকে দেখিতে পাইল। সে পানিকে হঠাইয়া হঠাইয়া আমার নিকট পৌঁছিল এবং আমার তক্তায় ছওয়ার হইয়া গেল তারপর সে আমার সহিত অপকর্ম করিবার খায়েশ জাহের করিল। আমি বলিলাম এই মহা বিপদের সময় এবাদত করিয়াও ত রক্ষা পাওয়ার উপায় নাই আর তুমি গোনাহে লিপ্ত হইবার খায়েশ করিতেছ। সে বলিল ঐসব কথা ছাড়, কছম খোদার প্রথমে আমি ঐ কাজ করিয়াই ছাড়িব। নিরুপায় হইয়া আমি শিশুটিকে গোপনে এক চিমট দিয়া কাঁদাইয়া ফেলিয়া বলিলাম, আচ্ছা তবে এই বাচ্চাটাকে একটু শোয়াইয়া লই। তারপর যাহা তাকদীরে আছে তাহাই হইবে। লোকটি বাচ্চাটাকে টানিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিল। আমি নিরূপায় হইয়া আল্লাহর দরবারে আরজ করিলাম, হে খোদা! তোমার কুদরতি শক্তির দ্বারা এই হাবসীর কবল হইতে আমার ইজ্জতকে রক্ষা কর। কছম খোদার এই কথায় শেষ হইতে না হইতেই সমুদ্র হইতে এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার মুখ বাহির করিল ও সেই হাবসীকে লোকমা বানাইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। এবং আমাকে আল্লাহ পাক শুধু আপন কুদরতের দ্বারা

হেফাজত করিলেন। যেহেতু তিনি বড় কুদরতওয়ালা, পাক পবিত্র এবং শানওয়ালা। তারপর ভাসিতে ভাসিতে আমার তক্তা একটি চরে গিয়া ঠেকিল। সেখানে গিয়া আমি ঘাস এবং পানি খাইয়া আল্লাহর উপর ভরষা করিয়া চারিদিন কাটাইয়া দিলাম। পঞ্চম দিন সমুদ্রে একটি বড় নৌকা আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি একটি টিলার উপর দাঁড়াইয়া, কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে ডাকিলাম অবশেষে ছোট একটি নৌকায় করিয়া তিনজন লোক আমার নিকট আসিল আমাকে নিয়া তাহারা নৌকায় উঠিল। নৌকায় একটি লোকের নিকট আমার বাচ্চাটা দেখিতে পাইয়া আমি উহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলাম। ইহা ত আমার বাচ্চা, আমার কলিজার টুকরা। নৌকার লোকজন বলিল তুমি পাগল হইয়াছ নাকি কি বল। আমি বলিলাম না আমি কোন পাগল নই। তারপর পুরা ঘটনা তাহাদিগকে শুনাইলাম। শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে মাথা নত করিয়া ফেলিল ও বলিল এইবার বাচ্চার কাহিনী শুন। যাহা শুনিয়া তুমিও আশ্চার্য হইয়া যাইবে। আমরা অনুকুল হাওয়ায় বড় আরামে নৌকা চালাইয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় সমুদ্র হইতে একটি জানোয়ার এই বাচ্চাটিকে পিঠে করিয়া ভাসিয়া উঠিল। তার সাথে সাথে আমরা একটি গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে এই বাচ্চাটিকে উঠাইয়া লও না হয় নৌকা ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। আমরা বাচ্চাটিকে উঠাইয়া লইলাম। তোমার এবং এই বাচ্চার আশ্চার্যজনক ঘটনা দেখিয়া আমরা ও প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আমরা আর কখনও পাপ কাজ করিব না। (ছোবহানাল্লাহ্)

(১২) হজরত রাবী বিন ছোলায়মান বলেন, আমি একটি জমাতের সহিত আমার ভাইসহ একবার হজ্বে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে কুফা নগরে পৌছিয়া আমরা কিছু সদাই করিবার জন্য শহরে বাহির হইয়া পড়ি। বাজারে ঘুরাফেরার মধ্যে কোন একস্থানে আমি একটি মরা গাধা পড়িয়া থাকিতে দেখি। সেখানে দেখিলাম যে একটি ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিহিতা একটি মেয়েলোক একটি ছুরি দিয়া সেই গাধার গোস্ত কাটিয়া কাটিয়া একটি থলের ভিতর ভর্তি করিতেছে। দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইল যে এই মেয়েলোকটি যখন মৃত গাধার গোস্ত নিতেছে তবে নিশ্চয় উহার কোন কারন রহিয়াছে। ভাবিলাম এই ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। তাই মেয়েলোকটা যেই দিকে যাইতেছে আমিও তাহার অলক্ষ্যে সেই দিকে চলিলাম। অবশেষে সে একটি বিরাট বাড়ীতে প্রবেশ করিল ঘরের দরওয়াজায় গিয়া আওয়াজ দেওয়ার পর চারটি

জীর্ণশীর্ণ মেয়ে আসিয়া দরওয়াজা খুলিয়া দিল। মেয়েলোকটি থলিয়াটা তাহাদের সামনে রাখিয়া বলিল এই যে লও এইগুলি পাকাইয়া আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর, মেয়েরা ঐগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া ভুনিতে লাগিল আমি সব গোপনে লক্ষ্য করিতেছিলাম, মনে বড় ব্যথা লাগিল এবার বাহির হইতে আওয়াজ দিলাম। হে আল্লাহর বান্দি। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা এই গোস্ত খাইওনা, ঘর হইতে আওয়াজ আসিল কে? বলিলাম, আমি একজন বিদেশী মুছাফের। মেয়েলোকটি বলিতে লাগিল হে পরদেশী। তুমি আমাদের নিকট কি চাও। আমরা নিজেরাই আজ তিন বৎসর তাকদীরের শিকারে পরিণত হইয়া আছি, আমাদের কোন সাহায্য সহযোগিতাকারী নাই। তুমি আমাদের নিকট কি চাও। আমি বলিলাম অগ্নি উপাসকদের একটি দল ব্যতীত আর কোন ধর্মেই মরা পশু খাওয়া জায়েজ নাই। সে বলিয়া উঠিল, জনাব আমরা খান্দানে নবুওতের শরীফ বংশজাত লোক। এই মেয়েদের পিতা বড় শরীফ লোক ছিলেন। নিজেদের মত সৈয়দ খান্দানের ছেলের সহিত মেয়েদের বিবাহের মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তার পুর্বেই তিনি এন্তেকাল করিয়া যান, তাহার ত্যাজ্য সম্পদ সব নিঃশেষ হইয়া যায়। আমরা জানি মরা পশুর গোস্ত খাওয়া নাজায়েজ। কিন্তু কি করি বাবা, আজ চার দিন যাবত আমরা উপবাস রহিয়াছি। হজরত রাবী বলেন তাহার করুন কাহিনী শুনিয়া আমার কান্না আসিয়া গেল। ব্যথিত অন্তরে আমি ফিরিয়া আসিয়া ভাইকে বলিলাম আমি হজ্বের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছি। ভাই আমাকে হজ্বের ফাজায়েল ইত্যাদি বলিয়া অনেক বুঝাইলেন, আমি বলিলাম ভাই লম্বা চওড়া ওয়াজ করিও না। এই বলিয়া আমি আমার কাপড় চোপড় এহরামের কাপড় এবং যাবতীয় সরঞ্জাম এবং নগদ ছয়শত দেরহাম হাতে করিয়া রওয়ানা হইলাম। একশত দেরহাম আটা এবং একশত দেরহামের কাপড় কিনিয়া বাকী চারশত দেরহাম আটার বস্তায় ভরিয়া সেই বৃদ্ধার ঘরে পৌছিলাম এবং এইসব সাজসরঞ্জাম তাহাকে দিয়া দিলাম। মেয়েলোকটি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করিয়া বলিল হে এবনে ছোলায়মান আল্লাহ্ পাক তোমার আগের পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিন এবং তোমাকে জান্নাত নছীব করুন এবং তোমাকে এই সবের বিনিময় দান করুন। বড় মেয়ে বলিল আল্লাহ্ পাক আপনাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দান করুন এবং আপনার গোনাহ মাফ করুন। দ্বিতীয় মেয়ে বলিল, আল্লাহ পাক আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তার চেয়ে বেশী আপনাকে দান করুন। তৃতীয় মেয়ে বলিল, আল্লাহ্ পাক আপনাকে

আমাদের দাদাজীর সহিত হাশর নছীব করুন। চতুর্থ মেয়ে বলিল, হে খোদা! যে আমাদিগকে দান করিল তুমি তাহাকে উহার ডবল দান কর এবং তার সমস্ত গোনাহ মাফ কর।

হজরত রাবী (রঃ) বলেন, কাফেলা চলিয়া গেল। আমি বাধ্য হইয়া কুফায় রহিয়া গেলাম। এমন কি হাজীগণ হজ্ব করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমি একদল হাজীকে তাহাদের দোয়া নেওয়ার জন্য এস্তেক্‌-বাল করিতে গেলাম। দেখিয়া তাহাদিগকে বলিলাম আল্লাহ পাক আপনাদের হজ্ব কবুল করুন ইত্যাদি। আমি হজ্ব করিতে না পারায় দুঃখে চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া গেল। তন্মধ্যে একজন লোক বলিয়া উঠিল, আপনি কেমন দোয়া করিতেছেন! আমি বলিলাম আমি যে দরজায় পর্যন্ত হাজির হইতে পারি নাই। সে বলিল বড় আশ্চর্য্যের কথা আপনি আমাদের সহিত আরাফাতে ছিলেন না? তাওয়াফ করেন নাই? শয়তানকে পাথর মারেন নাই? আমি মনে মনে সব বুঝিয়া গেলাম যে, ইহা আল্লাহ পাকের অফুরন্ত মেহেরবানী ছাড়া আর কিছু নয়। তারপর অন্যান কাফেলা আসিয়াও তদ্রূপ রিপোর্ট দিল। এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল কি ভাই এখন কেন অস্বীকার করেন যখন আমরা কবরে আতহার জেয়ারত করিয়া বাবে জিব্রাঈল দিয়া বাহির হইতেছিলাম তখন খুব ভীড় হওয়াতে আপনি আমার নিকট আমানত স্বরূপ এই থলিয়াটি রাখিয়াছিলেন। উহার মধ্যে লেখা রহিয়াছে "যে আমার সহিত মোয়ামেলা করে সে লাভবান হয়।" এই যে আপনার থলিয়াটি নিয়া যান। রাবী বলেন কছম খোদার আমি বাড়ী ফিরিয়া এশার নামাজ আদায় করিয়া অজিফা শেষ করিয়া ভীষণ চিন্তায় মগ্ন হইয়া যাই যে ঘটনাটি কি হইল। তখন আমার একটু তন্দ্রা আসিয়া যায়। স্বপ্নে হুজুরে পাক (ছঃ)-এর জিয়ারত লাভ করি। আমি হুজুরকে ছালাম করি ও হুজুরের হস্ত চুম্বন করি। হুজুর মুচকি হাসিয়া ছালামের উত্তর দিয়া বলিলেন, হে রাবী! আমি আর কত সাক্ষী নিয়োগ করিব যে তুমি হজ্ব করিয়াছ। শুন, তুমি যখন আমার আওলাদের সেই মেয়ে লোকটির উপর সর্বস্ব ছদকা করিয়া হজ্বের এরাদা ত্যাগ করিয়াছ তখন আমি আল্লাহর দরবারে উহার যথেষ্ট প্রতিদান তোমাকে দেওয়ার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ পাক তোমার ছুরতের একজন ফেরেশ্‌তা নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে হুকুম দিয়াছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত প্রতি

বৎসর তোমার তরফ হইতে সে হজ্ব করিবে এবং দুনিয়াতে ও তোমাকে ছয়শত দেরহামের পরিবর্তে ছয়শত আশরাফী (স্বর্ণমুদ্রা) বিনিময় স্বরূপ দেওয়া হইল। তুমি স্বীয় চক্ষুকে শীতল কর। হজরত রাবী বলেন আমি ঘুম হইতে উঠিয়া থলিয়াটি খুলিয়া দেখিতে পাই যে উহার মধ্যে ছয়শত আশরাফী রহিয়াছে।

মাছায়েলে হজ্ব

কিতাবের এই অংশ হযরত শায়খুল হাদীছ সাহেবের মূল কিতাবে নাই। ইহা হাজী সাহেবানদের উপকারার্থে অনুবাদক নিজের তরফ হইতে লিখিয়াছেন।

মক্কা মোয়াজ্জামার বিশেষ বিশেষ স্থানকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ কার্য-পদ্ধতি সহকারে পরিদর্শন করাকে হজ্ব বলে উহা দুই প্রকার। ১। ফরজ হজ্ব। ২। ওমরাহ হজ্ব, প্রথমটি ফরজ দ্বিতীয়টি ছুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

হজ্বের শর্ত সমূহ

হজ্ব ফরয হওয়ার শর্ত আটটি। যথা—(১) মুছলমান হওয়া। (২) স্বাধীন হওয়া। (৩) সজ্ঞান হওয়া। (৪) বালেগ হওয়া। (৫) সুস্থ বা রোগহীন হওয়া। (৬) হজ্বের ছফর হইতে ফিরিয়া আসা পর্যন্ত পরিবারবর্গের খোরপোষ রাখিয়া মক্কা মোয়াজ্জামায় যাতায়াতের খরচ চালাইতে সক্ষম হওয়া। (৭) রাস্তা নিরাপদ হওয়া। (৮) মক্কা শরীফ পর্যন্ত ছফরের রাস্তা হইলে স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী অথবা কোন মহররম সঙ্গে থাকা।

হজ্বের ফরজ ও ওয়াজেব সমূহ

হজ্বের মধ্যে ফরয তিনটি যথা: (১) এহরাম বাঁধা। (২) ৯ই যিলহজ্ব আরাফার ময়দানে অবস্থান করা। (৩) তওয়াফে যিয়ারত করা।

হজ্বের মধ্যে ওয়াজেব ছয়টি, যথা: (১) মুযদালাফার ময়দানে অবস্থান। (২) ছফা ও মারওয়াহ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে দৌড়ান। (৩) শয়তানকে কঙ্কর মারা। (৪) বিদেশীদের জন্ত বিদায়কালীন বিদায়ী

তওয়াফ করা। (৫) মাথা মুড়ান অথবা স্ত্রীলোকের চুল হইতে কিছু কর্তন করা। (৬) কাফ্ফারা বা হজ্বের কার্যসমূহে ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য 'দম' বা একটি কোরবানী করা।

উপরোল্লিখিত ফরয ও ওয়াজেব কার্য্যাবলী ব্যতীত অন্যান্য সকল কাজ ছুন্নত ও মোস্তাহাব।

হজ্বের মাস সমূহ ও এহরামের স্থান

হজ্বের মাস তিনটি যথা: (১) শওয়াল, (২) যিলকা'দাহ, (৩) যিল হজ্ব মাসের প্রথম ১০ দিন। এই সময়ের পূর্বে হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধা মাকরূহ্।

এহ্রাম বাঁধিবার স্থান বা মীকাত পাঁচটি। যথা—(১) মদীনা বাসীদের জন্য যুল হোলায়ফা (২) শামবাসীদের জন্য জোহফা, ইরাক-বাসীদের জন্য যাতে এরক, নজদবাসীদের জন্য কার্ন্ এবং ইয়ামন-বাসীদের জন্য ইয়ালামলাম্।

উল্লেখিত স্থানগুলি উহাদের অধিবাসীদের জন্য ও যাহারা উহা অতিক্রম করিয়া মক্কা যাইবে তাহাদের এহরাম বাঁধিবার স্থান। যে ব্যক্তি মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক তাহার জন্য মীকাত হইতে বিনা এহ্রামে প্রবেশ করা হারাম। মীকাতে পৌঁছিবার পূর্বে ও এহরাম বাঁধিতে পারে, ইহাই উত্তম।

কিন্তু মীকাতের আভ্যন্তরীন অধিবাসী বিনা এহরামে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করিতে পারে। হজ্ব ও ওমরার জন্য তাহার এহরাম বাঁধিবার স্থান হেল্ল' (হারামের সীমার বহির্গত কোন স্থান)। মক্কাবাসীর জন্য হজ্বের এহরাম বাঁধিবার স্থান হারাম শরীফ এবং ওমরার এহরাম বাঁধিবার স্থান হেল্ল'।

এহ্রাম বাঁধিবার নিয়ম

যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধিতে ইচ্ছা করে সে প্রথমে হাত ও পায়ের নখ কাটিবে এবং গোঁফ ছোট করিয়া কাটিবে, এবং বগলের পশম মুণ্ডন করিব। অতঃপর অজু করিবে; কিন্তু গোছল করা উত্তম। অতঃপর ধোলাই করা সাদা নুতন একখানা তহবন্দ ও একখানা চাদর পরিধান করিবে এবং খোশবু ও আতর লাগাইবেন। অতঃপর এহরামের দুই রাকায়াত নামায পড়িবে। যদি সে শুধু এফরাদ হজ্বের এহরাম বাঁধিতে চায় তাহা হইলে বলিবে—

"হে আল্লাহ আমি হজ্ব করিতে ইচ্ছা করি তুমি উহা আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং কবুল কর।" অতঃপর হজ্বের নিয়ত করিয়া তালবিয়া পড়িবে। উহা এই—

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ـ

اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ـ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

ইহা হইতে কমাইবে না। যখন সে নিয়ত সহকারে তালবিয়া বলিল তখন তাহার এহরাম বাঁধা হইয়া গেল। এখন তাহাকে নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী হইতে বিরত থাকিতে হইবে।

মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ কার্য্যাবলী

১২টি কার্য্য মোহরেম ব্যক্তির জন্য নিষিদ্ধ যথা: (১) স্ত্রী সহবাস, (২) গুণাহের কাজ, (৩) ঝগড়া করা, (৪) পশুপক্ষী শিকার করা, (৫) উহার দিকে ইঙ্গিত করা, (৬) উহার দিকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, (৭) খোশবু ব্যবহার করা, (৮) নখ কাটা, (৯) মুখমণ্ডল ও মস্তক আবৃত করা (১০) মাথার চুল ও শরীরের পশম মুণ্ডন করা বা উৎপাটন করা, (১১) দাড়ী কর্তন করা, (১২) মাথার চুল ও দাড়ি খেতনী তৃণ দ্বারা ধৌত করা, পিরহান, পায়জামা, পাগড়ী, টুপি, মোজা ও সুগন্ধি দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরিধান করা।

কিন্তু মোহরেম ব্যক্তির জন্য গোছল করা, টাকার থলে কোমরে বাঁধা ও শত্রুর মোকাবেলা করা জায়েয আছে। মোহরেম ব্যক্তি সর্বদা নামাযের পরে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়িবে এবং উঁচু স্থানে আরোহন কিংবা নীচু স্থানে অবতরণের সময় অথবা কোন আরোহীর সঙ্গে দেখা হইলে তখনও তালবিয়া পড়িবে।

যখন মক্কা শরীফ পেঁৗছিবে

মক্কা নগরীতে পৌঁছিলে সর্বপ্রথম মছজিদে হারামে ঢুকিবে এবং কা'বার ঘরে দেখা মাত্র "আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলিবে। অতঃপর হাজরে আছওয়াদের (কাল পাথর) সম্মুখে যাইবে এবং আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলিয়া উভয় হস্ত নামাযের তাহরীমার ন্যায় কাঁধ পর্য্যন্ত

উত্তোলন করিবে ও কাহাকেও কষ্ট না দিয়া সম্ভব হইলে কাল পাথরকে চুম্বন করিবে। সম্ভব না হইলে কোন দ্রব্য দ্বারা কাল পাথরকে স্পর্শ করতঃ উহাকে চুম্বন করিবে এবং লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহে তায়া'লা অছাল্লাল্লাহু আলান্নবী'য়ে' বলিয়া উহার দিকে হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিবে তৎপর তওয়াফে কুদুমের জন্য বায়তুল্লার চতুর্দিকে চক্কর দিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিবে।

কাল পাথরের দিক হইতে ডান দিকে ঘুরিতে থাকিবে। তখন গায়ের চাদর ডান বগলের নীচে দিয়া চাদরের উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখিবে এবং তাওয়াফের সময় হাতীমের বহির্দেশ হইতে ঘুরিয়া আসিবে। কাল পাথর হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া পাথর পর্য্যন্ত পৌঁছিলে এক চক্কর হইল এইরূপ সাত চক্কর ঘুরিলে এক তওয়াফ হইবে। প্রথম তিন চক্করে রমল করিবে, অর্থাৎ দ্রুতভাবে কাঁধ নাড়াইয়া চলিবে। অবশিষ্ট চার চক্করে শান্তভাবে চলিবে। যখনই কাল পাথরের নিকট পৌঁছিবে তখনই উহাকে চুম্বন করিবে এবং পাথরকে চুম্বন দ্বারাই তাওয়াফ শেষ করিবে। তারপর মাকামে ইব্রাহীমের কাছে অথবা মছজিদের যে কোন স্থানে দুই রাকায়াত তওয়াফের ওয়াজেব নামায পড়িবে। অতঃপর কাল পাথরের নিকট পুনরায় গিয়া তাহাকে চুম্বন করিবে।

এই তওয়াফের পর ছাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হইবে এবং বায়তুল্লার দিকে মুখ করিয়া উহাতে চড়িবে ও হাত তুলিয়া দোয়া করিবে। অতঃপর মারওয়া পর্বতের দিকে আস্তে আস্তে চলিতে থাকিবে। যখন সবুজ খাম্বাদ্বয়ের নিকট পৌঁছিবে তখন ঐ স্থানটুকু অতিক্রম করার জন্য আস্তে আস্তে দৌঁড়াইবে এবং মারওয়া পর্বতের উপর গিয়া চড়িবে। সেখানেও দোয়া করিবে। এই হইল ছাফা মারওয়ার মধ্যে এক দৌড়। এই প্রকার সাতবার দৌড়াইতে হইবে। এবং মারওয়াতে গিয়া দৌড় শেষ করিবে। যদি ওমরার এহরাম বাঁধিয়া থাকে তবে ছাফা মারওয়া দৌড়ের পর মাথা মুড়াইয়া অথবা কিছুটা চুল কর্তন করিয়া এহরাম ছাড়িয়া মক্কাতে অবস্থান করিবে।

৭ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর যোহরের পূর্বে মছজিদে হারামে ইমাম ছাহেব একটি খোৎবা পড়িয়া থাকেন। ৮ই যিলহজ্জ ফজরের নামাজের পর মিনার দিকে রওয়ানা হইবে এবং সেখানে ৯ই যিলহজ্জের ফজর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া ফজরের পর আরাফাতের ময়দানে যাইবে।

আরাফাত ময়দানেই ৯ই যিলহজ্জ অকুফের স্থান। হজ্বের ইহা একটি ফরয আরাফার দিন সূর্য্য পশ্চিমে হেলিলে ইমাম সাহেব জুমার ন্যায় দুইটি খোৎবা পাঠ করেন। অতঃপর লোকজন লইয়া জোহরের সময় জোহর ও আছরের নামাজ পর পর আদায় করেন। নামাযের পর (অজু ও গোসল সহকারে) ইমামের সহিত কেবলামুখী হইয়া বসিবে। এবং আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ, তালবিয়া ও দরূদ পড়িবে। এবং আল্লাহ পাকের নিকট রোনাযারী করিয়া দোয়া করিবে। অতঃপর যখন সূর্য অস্ত যাইবে তখন সেখানে মাগরিব না পড়িয়া মোযদালায়ফা নামক স্থানে আসিবে এবং কোযাহ পর্বতের নিকট অবতরণ করিয়া একই আযান ও একামতে এশার সময় মাগরিব ও এশার নামাজ পড়িবে।

যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজ পথে অথবা আরাফাতে পড়িবে সে উহা ফজরের পূর্ব পর্যন্ত দোহরাইয়া পড়িবে। অতঃপর মোযদালাফাতে রাত্রি যাপন করিবে। যখন ছোবহে ছাদেক হইবে, তখন অন্ধকার থাকিতে নামায পড়িয়া মাশয়ারোল হারাম নামক স্থানে দিন ফর্সা হওয়া পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে এবং আরাফাতের ময়দানে যে রকম দোয়া দরূদ করিয়াছে সেখানেও তদ্রূপ দোয়া দরূদ করিবে। মোযদালায়ফায় এই অবস্থান (অকুফ) হজ্বের একটি ওয়াজেব।

যখন ফর্সা হইবে তখন সূর্য্য উদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হইবে। মিনাতে সর্বপ্রথম জামরায় আকবার তৃতীয় স্তম্ভের উপর সাতটি কঙ্কর মারিবার সময় হইতে তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবে। এবং সেখানে আর দাঁড়াইবে না। অতঃপর এফরাদ হজ্বকারী ইচ্ছা করিলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া অথবা চুলের কিছু অংশ কাটিয়া এহরাম ছাড়িবে। এখন তাহার জন্য স্ত্রীলোক ব্যতীত আর যাহা হারাম হইয়াছিল তাহা হালাল হইয়াছে।

অতঃপর কোরবানীর দিন সমূহের কোন একদিন মক্কা শরীফ যাইয়া সাতবার তওয়াফে যিয়ারত করিবে। ইহার পর তাহার জন্য স্ত্রীলোক হালাল হইবে। কোরবানীর দিন ফজর হইতে তৃতীয় কোরবানীর দিন পর্য্যন্ত তওয়াফে যিয়ারতের সময়। যদি কেহ ঐ দিনের পরে তওয়াফে যেয়ারত করে তাহা হইলে মাকরূহ হইবে এবং তাহার উপর একটি 'দম' (মেষ বা ছাগ) ওয়াজেব হইবে। এই তওয়াফ হজ্বের একটি ফরজ।

অতঃপর পুনর্বার মিনায় যাইবে এবং কোরবানীর দ্বিতীয় দিনের দ্বি-

দ্বিপ্রহরের পর তিন স্তম্ভের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। প্রথম স্তম্ভ (যাহা মছজিদে খায়ফের নিকটে) হইতে আরম্ভ করিবে এবং সাতটি কঙ্কর মারিবে। এবং প্রত্যেক বারে আল্লাহু আকবার বলিবে এবং কিছু সময় সেখানে দাঁড়াইয়া দোয়া করিবে অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তম্ভের উপর সাতটি করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে এবং তৃতীয় স্তম্ভের কাছে আর দাঁড়াইবে না। অতঃপর কোরবানীর তৃতীয় দিনেও পূর্বের ন্যায় তিন স্তম্ভে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর মক্কা শরীফ চলিয়া আসিবে।

যখন মক্কা হইতে প্রস্থানের ইচ্ছা করিবে তখন রমল ও ছায়ী ব্যতিরেকে সাতবার খোদার ঘরকে বিদায়ী তওয়াফ করিবে। এই তওয়াফ বিদেশীদের জন্য ওয়াজেব; মক্কাবাসীদের জন্য নয়। অতঃপর 'যমযমের' পানি পান করিয়া বায়তুল্লার চৌকাঠ চুম্বন করিবে। এবং তাহার নিজের বক্ষ, পেট ও ডান গাল বায়তুল্লার দরজা ও কাল পাথরের মধ্যস্থিত 'মোলতাযম' নামক স্থানের উপর রাখিবে। এবং কিছু সময় কা'বার গেলাফ হস্ত দ্বারা আকড়িয়া ধরিবে। এবং আল্লাহর সমীপে আজিযী ও এনকেছারীর সহিত অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করিবে। অতঃপর ক্ষুন্ন মনে উলটা পায়ে 'বাবুল বেদা' নামক দরজা হইতে হইবে।

মক্কায় না গিয়া আরাফাতের দিকে রওয়ানা

যদি কেহ মক্কায় না গিয়া এহরাম বাঁধিয়া ৯ই যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে যায় এবং তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে তাহার "তওয়াফে কুদুম" লাগিবে না এবং উহা ত্যাগ করার জন্য কোন কাফ্‌ফারাও লাগিবে না। যদি আরাফাতে ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর হইতে ১০ই যিলহজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত কিছু সময় অবস্থান করে তাহা হইলে সে হজ্ব পাইল। এবং যদি কেহ ইহা করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার হজ্ব হইল না; সুতরাং সে তখন বায়তুল্লার তওয়াফ ও ছায়ী করিয়া এহরাম ছাড়িয়া দিবে। এবং পরবর্তী বৎসর হজ্ব কাজা করিবে। ইহাতে তাহার কোন 'দম' লাগিবে না।

স্ত্রী পুরুষের হজ্ব কার্যে পার্থক্য

স্ত্রীলোক হজ্বের কার্য্যসমূহ পুরুষের ন্যায়ই আদায় করিবে। কিন্তু কয়েকটি বিষয় তাহারা ব্যতিক্রম করিবে। উহা এই—(১) স্ত্রীলোকে মুখমণ্ডল খোলা রাখিবে; কিন্তু মাথা খোলা রাখিবে না। (২) স্ব-শব্দে

তালবিয়া পড়িবে না। (৩) তওয়াফের মধ্যে রমল করিবে না। (৪) ছায়ীর সময় সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে দৌড়াইবে না, বরং আস্তে আস্তে হাঁটিবে। (৫) এবং মাথার চুল মুণ্ডন করিবে না, বরং ছোট করিবে। (৬) এবং সেলাই করা জামা-কাপড় পরিধান করিবে। (৭) তওয়াফের সময় কাল পাথরের নিকট পুরুষের ভিড় থাকিলে তথায় যাইবে না। (৮) এবং এহরাম অবস্থায় হায়েয হইলে গোছল করতঃ তওয়াফ ব্যতীত হজ্বের অন্যান্য কার্য আদায় করিবে। (৯) আর যদি তওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েয হয় তাহা হইলে তাহার তাওয়াফে ছদর (বেদা) লাগিবে না এবং উহা ত্যাগ করায় কাফ্ফারাও লাগিবে না।

কেরান হজ্ব

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ

وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ *

মীকাত হইতে হজ্ব ও ওমরাহ উভয়ের একত্রে এহরাম বাঁধাকে কেরান হজ্ব বলে। উহার নিয়ত এইরূপ করিবে—

ইহা তামাত্তু' হজ্ব ও এফ্রাদ হইতে উত্তম।

যখন হাজীগণ মক্কা শরীফে প্রবেশ করিবে তখন প্রথমে ওমরার জন্য তওয়াফ ও ছায়ী করিবে। অতঃপর হজ্বের জন্য তওয়াফে কুদুম ও ছায়ী করিবে।

উভয় তওয়াফ ও উভয় ছায়ী যদি এক সঙ্গে করে তবুও জায়েয হইবে। কিন্তু গুনাহ্গার হইবে। যখন দশই যিলহজ্ব তৃতীয় স্তম্ভে প্রথম কঙ্কর মারিবে তখন সে কেরান হজ্বের জন্য একটি কোরবানী করিবে।

তামাত্তু' হজ্ব

তামাত্তু' হজ্ব এই যে, হজ্বের মাসত্রয়ের (সওয়াল, যিলকা'দ যিলহজ্জ) মধ্যে প্রথমঃ ওমরার এহরাম বাঁধিবে। এবং ওমরার কাজ সমাধা করিবার পর এহরাম ছাড়িয়া ৮ই যিলহজ্ব পুনরায় হজ্বের জন্য এহরাম বাঁধিয়া হজ্বের কাজ সমাধা করিবে। ইহা এফরাদ হজ্ব হইতে উত্তম।

ইহার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মীকাত হইতে শুধু ওমরার এহরাম

বাঁধিবে। এবং মক্কা শরীফ গিয়া উহার জন্য তওয়াফ করিবে। এবং প্রথম তওয়াফের সঙ্গে সঙ্গে তালবিয়া পড়া বন্ধ করিবে। অতঃপর ছাফা মারওয়ার ছায়ী করতঃ মাথা মুড়াইয়া এহরাম ছাড়িয়া দিবে। অতঃপর ৮ই যিলহজ্জ হারাম শরীফ হইতে হজ্জের জন্য এহরাম বাঁধিয়া আরাফাত ময়দানে গমন করিবে। ১০ই যিলহজ্জ তৃতীয় স্তম্ভের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া তামাত্তুর জন্য একটি বকরী বা মেষ কোরবানী করিবে। মক্কাবাসী ও মীকাতের অন্তর্ভুক্ত লোকদের জন্য কেরান ও তামাত্তু হজ্ব করা জায়েজ নহে।

হজ্জের জন্য উত্তম দিন

৯ই যিলহজ্জ যদি শুক্রবার হয় তাহা হইলে সেই হজ্ব ৭০ বৎসরের হজ্ব হইতে উত্তম।

ইহা দেরায়া কেতাবের প্রণেতা বর্ণনা করিয়াছেন। এবং রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, ৯ই যিলহজ্ব শুক্রবার হইলে সেই হজ্ব ৭০ বৎসরের হজ্ব হইতে উত্তম (মুরুল ইজাহ্)।

হাজীদের জন্য নিষিদ্ধ কার্য্যবলী

নিষিদ্ধ কার্য্যবলী দুই প্রকার—

(ক) এহরামের কারণে নিষেধ—ইহা ৮ প্রকার। (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা, (২) সেলাই করা জামা কাপড় পরিধান করা, (৩) মাথা অথবা মুখমণ্ডল ঢাকা, (৪) শরীরের পশম দূর করা, (৪) নখ কাটা (৮) স্ত্রী সহবাস করা, (৭) পশু-পক্ষী শিকার করা, (৮) হজ্বের ওয়াজেব সমূহের কোন একটি তরক করা।

(খ) হারামের সম্মানার্থে নিষেধ—ইহা যে ব্যক্তি এহ্‌রামধারী নয় তাহার জন্যও নিষেধ। ইহা দুই প্রকার—(১) হারামের কোন পশু পক্ষী শিকার করা, (২) হারামের কোন গাছপালা কাটা (ব্যবহার করা)।

উপরোক্ত অপরাধকারীর প্রতি, অপরাধের গুরুত্ব হিসাবে একটি অথবা দুইটি 'দম' (কোরবানী) অথবা একটি ছদকা ওয়াজেব হইবে। কিন্তু কাক, চিল, বিচ্ছু, সাপ, কামড়ান কুকুর, মশা, ছারপোকা পিপীলিকা, কীটপতঙ্গ, বানর, কচ্ছপ ও যাহা শিকার নহে তাহা মারিলে কিছুই লাগিবে না।

বিনা এহ্‌রামে মীকাত অতিক্রম

যে ব্যক্তি বিনা এহ্‌রামে পঞ্চ মীকাতের কোন এক মীকাত অতিক্রম করিয়া হারামের সীমানার মধ্যে যায়, অতঃপর এহ্‌রাম বাঁধে, তাহার উপর একটি 'দম' (কোরবানী) ওয়াজেব হইবে। এহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে যদি সে মীকাতে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহার 'দম' মাফ হইয়া যাইবে। যদি কোন বহির্দেশীয় মুসলমান মক্কা শরীফে বিনা এহ্‌রামে প্রবেশ করে, তবে তাহাকে এহ্‌রাম বাঁধিয়া ও দম দিয়া অবশ্যই হজ্ব বা ওমরাহ আদায় করিতে হইবে।

বদলী বা নায়েবী হজ্ব

ফরজ হজ্ব করিতে নিজে অক্ষম হইলে মক্কা শরীফ না যাইয়া অপরের দ্বারা হজ্ব করান জায়েয আছে। আসল হজ্বকারী অক্ষম হইলে বা মরিয়া গেলে তাহার প্রতিনিধি দ্বারা হজ্ব করাইবে। প্রতিনিধি মালিকের পক্ষ হইতে নিয়ত করিলে মালিকেরই হজ্ব হইবে। যে একবারও হজ্ব করে নাই, তাহার দ্বারা নায়েবী হজ্ব করাইলে শুদ্ধ হইবে।

হজ্বের জরুরী দোয়া সমূহ ও তালবীয়াহ্‌

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ

وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ - (مسلم بخاری)

উচ্চারণ: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নেয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকু লা শারিকা লাকা।

অর্থ: ইয়া আল্লাহ! উপস্থিত! তোমার গোলাম উপস্থিত। উপস্থিত! তুমিই একমাত্র প্রভু তোমার কোন শরীক নাই। উপস্থিত! তোমার গোলাম, উপস্থিত! সমস্ত প্রসংশা এবং নেয়ামত তোমারই এবং সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই জন্য। কোথাও তোমার শরীক নাই

তওয়াফের নিয়ত

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُرِیْدُ طَوَافَ بَیْتِكَ الْحَرَامِ فَیَسِّرْهُ لِیْ وَتَقَبَّلْهُ

مِنِّي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلّٰهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

ইয়া আল্লাহ। আমি তোমার পবিত্র ঘর তওয়াফের নিয়ত করছি আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে সেই সাত পাক (তওয়াফ) কবুল করে নাও যাহা, হে মহান শক্তিমান আল্লাহতা'য়ালা (একমাত্র তোমারই) জন্য আমি করছি। (এখন হাজরে আসওয়াদের সামনে এসে সম্ভব হলে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু ভীড় বেশী থাকলে দুরে দাঁড়িয়েই কান পর্যন্ত দু'হাত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

সেই আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা। (এই বলে দু'হাতই নামিয়ে ফেলুন এবং খানায়ে কাবার প্রথম তওয়াফ শুরু করুন)

প্রথম তওয়াফের দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

আল্লাহতা'য়ালা পুতঃপবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, আর আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সেই আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ, পাপ পরিত্যাগ ও এবাদতের শক্তি একমাত্র মহান আল্লাহরই দেয়া। এবং সম্পূর্ণ রহমত ও শান্তি আল্লাহর রাসূল (হজরত মোহাম্মদ)-এর উপর বর্ষিত হোক।

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ط

ইয়া আল্লাহ ! তোমার উপর ঈমান রেখে, তোমার আহকামের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তা মেনে নিয়ে তোমার (সাথে কৃত) ওয়াদাকে পালন করে, তোমার নবী ও তোমার প্রিয় দোস্ত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি আছাল্লাম-এর ছুন্নতকে অনুসরণ করে (আমি এই তওয়াফ করছি)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ

فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ

مِنَ النَّارِ ط

ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে চাই সকল পাপের মার্জনা, সকল বালা-মছিবত থেকে রেহাই আর দ্বীন দুনিয়া ও আখেরাতে চাই ক্ষমা, মার্জনা আর চিরস্থায়ী শান্তি এবং (চাই) বেহেশ্‌তে লাভের সাফল্য ও দোযখের আগুন থেকে মুক্তি (রুক নে ইয়ামানীতে পৌছে এই দোয়া শেষ করুন এবং এগিয়ে যেতে যেতে এই দোয়া পড়ুন)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ط وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দুনিয়ার এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর এবং আমাদেরকে নেককারদের সাথে বেহেশ্‌তে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক ! (এবারে হাজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন। ভীড় থাকলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকেই দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে :) পড়ুন।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (বলতে বলতে হাত নামিয়ে ফেলুন এবং এগিয়ে গিয়ে এই দোয়া পড়তে পড়তে দ্বিতীয় বার (তওয়াফ শুরু করুন)

দ্বিতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ○ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ ○ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ، اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

ইয়া আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই হারাম তোমার হারাম, এখানকার শক্তি ও শান্তি তোমারই প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তোমারই বান্দা (দাস) আর আমিও তোমার একান্ত গোলাম মাত্র, তোমার গোলামের সন্তান। এই স্থান—তোমার সাহায্য লাভ করে দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাওয়ার জায়গা, (কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক) আমাদের শরীরের গোশত এবং চামড়াকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দাও। ইয়া আল্লাহ ঈমানকে আমাদের কাছে (অন্য সমস্ত কিছু থেকে অধিকতর) প্রিয় করে দাও আর উহার সৌন্দর্যকে আমাদের অন্তরে (দৃঢ়ভাবে) বসিয়ে দাও। এবং আমাদের অন্তরে কুফর, নাফরমানী ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দাও। আর আমাদেরকে সঠিক ও সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। ইয়া

আল্লাহ! তুমি আমাকে সেই মহাদিনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো যেদিন তুমি তোমার সকল বান্দাকে কবর থেকে জিন্দা করবে।

ইয়া আল্লাহ! (সেদিন) কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই, একন্তু অনুগ্রহ করে তুমি আমাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করো। (রুক্‌নে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া পড়ে ফেলুন হবে এগিয়ে যেতে যেতে নীচের দোয়া পড়ুন।)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ط وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। এবং দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আর আমাদের পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে বেহেশ্‌তে দাখিল কর। হে মহাপরাক্রান্ত শক্তিমান খোদা, হে মার্জনাকারী, হে সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক! (এখন হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন। ভীড় হলে এবং চুম্বন করতে ব্যর্থ হলে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। (ইহা পড়তে পড়তে তৃতীয় বার (তওয়াফ) শুরু করুন।)

তৃতীয় তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ

وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

وَالْوَلَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

سَخَطِكَ وَالنَّارِ ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ۔

ইয়া আল্লাহ! (তোমার সত্তা ও শক্তি সম্পর্কে আমাদের মনে) কোনরূপ সন্দেহ (সৃষ্টি হওয়া) থেকে তোমারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি; আর (তোমার সাথে কারো) শরীক মনে করা থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। (আরো পানাহ্ চাচ্ছি) তোমার আদেশ নির্দেশের বিরোধিতা করা থেকে এবং কপটতা, কু-স্বভাব ও কু দৃশ্য থেকে আর ধন, জন, ও সন্তান-সন্ততির অনিষ্টতা ও ধ্বংস হওয়া থেকে।

ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে আমি তোমার সন্তুষ্টি আর বেহেশ্ত কামনা করি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করি তোমার গজব (ক্রোধ) ও দোযখের আগুন থেকে।

ইয়া আল্লাহ! তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাই। আরো পানাহ্ চাই জীবন মৃত্যুর আপদ ও বিপদ থেকে। (রুক্নে ইয়ামানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া পড়ুন:)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ۔ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে, এবং বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে, এবং দাখিল কর আমাকে বেহেশ্তে নেক বান্দাদের সাথে, হে মহাপরাক্রম! হে

মার্জনাকারী! হে বিশ্বপালক! (হাজরে আসওয়াদে পৌছে চুম্বন করুন কিন্তু ভিড় থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহ্‌র নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর। এই পড়তে পড়তে দু'হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে অগ্রসর হোন, আর এই দোয়া পড়তে পড়তে চতুর্থ তওয়াফ শুরু করুন।

চতুর্থ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَّعَمَلًا صَالِحًا مَّقْبُوْلًا وَّتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ اَخْرِجْنِىْ يَا اللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَّالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۝ رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ۝

হে আল্লাহ্ আমার হজ্বকে কবুল কর, আমার এই প্রচেষ্টাকে সফল কর আমার গুনাহকে মাফ কর, আমার নেক আমলকে কবুল কর আর এমন ব্যবসা নসিব কর যাতে ক্ষতি নেই, হে অন্তরযামী! আমাকে আঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও। হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে পেতে চাই তোমার রহমত, পাপ মার্জনার উপায় সব গুনাহ থেকে বাঁচার পথ, সৎকাজের সামর্থ, বেহেশত প্রাপ্তি ও দোযখের আযাব থেকে নাজাত। হে প্রতিপালক! তোমার দেওয়া রুজিতে আমাকে তৃপ্তি দাও

বরকত দাও আমাকে তোমার দেওয়া নেয়ামতে, বদলা দাও আমাকে তোমার দেওয়া মুছিবতের জন্য নেকি। (রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করে অগ্রসর হতে থাকবেন এবং পড়বেন :)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

عَذَابَ النَّارِ ط وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ٥

হে প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া এবং আখেরাতে বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে, দাখিল কর আমাকে বেহেশতে নেক বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান! হে মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক। (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দূর থেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলুন এবং বলুন—)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুতে থাকুন আর এই দোয়া পাঠের সাথে পঞ্চম বার তওয়াফ শুরু করুন।)

পঞ্চম তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ

وَلَا بَاقِيَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً هَنِيْئَةً مَرِيْئَةً لَا نَظْمَأُ بَعْدَهَا

اَبَدًا ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَا

ذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ

فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ط

হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয় দাও যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, এবং তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না, পান করাও আমাকে তোমার নবীর হাউজ থেকে সুশীলতল সুস্বাদু পানীয় যেন এর পর পিপাসা না হয়, তোমার কাছে চাই কল্যাণ যা চেয়েছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ দঃ)। পানাহ্ চাই তোমার কাছে সর্ব অকল্যাণ থেকে যেমন পানাহ্ চেয়েছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে অচ্ছাল্লাম, হে আল্লাহ! চাই তোমার কাছে বেহেশ্‌ত এবং তার সব নেয়ামত আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশ্‌ত লাভে সাহায্য করবে; তোমার কাছে পানাহ্ চাই দোযখ থেকে এবং সে সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোযখে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

(রুক্‌নে ইয়ামানী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করবেন এবং অগ্রসর হতে হতে পড়বেন:)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا

عَذَابَ النَّارِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ

يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে,

রক্ষা কর দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল। (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় বেশী হলে দূর থেকে দু হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে বলুন :)

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ط

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে এগুতে থাকুন আর এই দোয়া পাঠের সাথে পঞ্চম বার (তওয়াফ) শুরু করুন।)

ষষ্ঠ তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَىَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ط اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِىْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّىْ وَاَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَّوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَّاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ ○

হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বহু হক আছে আমারও তোমার মধ্যে, এবং আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে, হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাফ কর, আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাফ করানোর দায়িত্ব নেও' হালাল কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও বন্দেগীর সামর্থ্য

দিয়ে গুনাহ থেকে বাঁচাও, তোমার করুণা দিয়ে অন্যের দ্বারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও, হে অসীম ক্ষমাশীল। হে আল্লাহ! তোমার ঘর তুমি করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি সহনশীল, মহানুভব, মহিমাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস তাই আমাকে ক্ষমা কর। (রুকনে ইয়ামানী পৌঁছা পর্যন্ত দোয়া শেষ করুন এবং সামনে এগুতে এই দোয়া পড়ুন :)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে বাঁচাও আমাকে দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর আমাকে বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান হে ক্ষমতাশীল। হে বিশ্বপালক (হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করবেন এবং ভীড় থাকলে দূরে থেকে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন :)

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর (এই বলতে হাত নামান এবং এগিয়ে যান আর নীচের দোয়া পাঠের সাথে সপ্তম (তওয়াফ) শুরু করুন।

সপ্তম তওয়াফের দোয়া

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ إِيْمَانًا كَامِلًا وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّكَسْبًا حَلَالًا طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَّتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً

بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ - رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّالْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ٥

হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে চাই দৃঢ় ঈমান, সাচ্চা একীন, পর্যাপ্ত রিযিক, ভীতিপূর্ণ অন্তর, তোমার স্মরণে লিপ্ত জিহ্বা, পাক হালাল উপার্জন, সত্যিকার তওবা, মরণের আগে তওবা, মরণকালে শান্তি ও মার্জনা, মৃত্যুর পর রহমত হিসাবের সময় রেহাই, বেহেশ্‌ত লাভের সাফল্য, দোযখ থেকে নাজাত তোমারই করুণায় হে শক্তিমান! হে ক্ষমতাশীল, হে প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর!

(রুক্‌নে ইয়ামনী পর্যন্ত এই দোয়া শেষ করুন এবং এগুতে এগুতে নীচের দোয়া পড়ুন:)

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ٥

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণ দাও দুনিয়া এবং আখেরাতে, বাঁচাও দোযখের আযাব থেকে এবং দাখিল কর বেহেশ্‌তে নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্বপালক

(হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড় থাকলে দূরে থেকে কান পর্যন্ত হাত তুলে বলুন:)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ٥

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর।

(এই বলতে বলতে হাত নামিয়ে নিন এবং এখন মুলতাজেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দোয়া পড়ুন :-- (হাজরে আসওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাঠের মাঝখানে যে স্থান তাকে মুলতাজেম বলে।)

মকামে মলতাজেমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ اٰبَائِنَا
وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ ○ يَا ذَا الْجُوْدِ
وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ وَالْاِحْسَانِ ○ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ
عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ
مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ اَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
وَاَخْشٰى عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ
وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ○

হে আল্লাহ! হে প্রাচীন ঘরের রক্ষক! বাঁচাও আমাদের, আমাদের বাপ, দাদা, মা, বোন এবং সন্তানদের দোযখের আগুন থেকে। হে মেহেরবান! হে করুণাময়! হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে আল্লাহ! আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর, বাঁচাও আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আযাব থেকে হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দার সন্তান, দাঁড়িয়ে আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি তোমার ঘরের চৌকাঠ, আকুল হয়ে কাঁদছি তোমার সামনে আরজ করছি তোমার রহমতের, ভয় করছি দোযখের আযাবের, হে চির মেহেরবান! হে

আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা—কবুল কর আমার এবাদত, নামিয়ে দাও আমার পাপের বোঝা, ফয়সালাহ্ করে দাও আমার সব কাজকে পবিত্র কর আমার অন্তরকে, আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, মাফ করে দাও আমার গুনাহকে, মাঙ্গছি তোমার কাছ থেকে বেহেশ্তে উঁচু মর্যাদা আমীন। (এই দোয়া শেষ করে মকামে ইব্রাহীমে আসুন এবং দু রাকাত নামাজ পড়ুন। তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ বলে নিয়ত করবেন ও ছালাম ফেরানোর পর নীচের দোয়া পড়ুন।)

মকামে ইব্রাহীমের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَ
تَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ وَتَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ
ذُنُوْبِىْ ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِىْ وَيَقِيْنًا
صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِىْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِىْ وَرِضَاءً
مِّنْكَ بِمَا قَسَمْتَ لِىْ اَنْتَ وَلِيِّىْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۝ تَوَ
فَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا فِىْ مَقَا
مِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً اِلَّا
قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا
وَاخْتِمْ بِالصّٰلِحَاتِ اَعْمَالَنَا ـ اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصّٰلِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً
مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ۝

হে আল্লাহ! আমার অন্তর বাহির দু'ই তুমি জান, কাজেই আমার অনুশোচনা কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাজেই পূরণ কর আমার প্রার্থনা তুমি জান আমার মনের কথা কাজেই ক্ষমা কর আমার গুনাহ; হে আল্লাহ তোমার কাছে চাই এমন ঈমান যা অন্তরে গেঁথে থাকবে, চাই দৃঢ় একীন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ তোমারই ইচ্ছেয় হচ্ছে, চাই পূর্ণ তুষ্টি তোমার দেওয়া কিসমতে, তুমি আমার বন্ধু দুনিয়া এবং আখেরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে মুসলিম হিসেবে; দাখিল কর আমাকে নেক-বান্দাদের দলে, হে আল্লাহ আমার একটি গুনাহ যেন এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে আর আমার সব মুস্‌কিল আসান করে দাও, সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও, অন্তরকে খুলে দাও, আলোকিত করে দাও আত্মাকে, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে, শামিল কর আমাকে নেক বান্দাদের মধ্যে বিনা অপমানে এবং বিনা বাধায় আমীন। হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হউক তাঁর দোস্ত মোহাম্মদ (ছঃ)-এর উপর এবং তার সব আল ও আসহাবের উপর। (এরপর জমজম শরীফে আসুন এবং কেবলামুখী হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তি সাথে আবে জমজম পান করুন আর আলহামদুলিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়ুন:—) হে আল্লাহ তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রদ জ্ঞান স্বচ্ছল জীবিকা। আর সকল রোগ থেকে আরোগ্য।

নবীয়ে করীম (ছঃ) এর কবর শরীফ জেয়ারতের সময় দরূদ ও ছালাম এইভাবে পড়িবে

সালাম

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفِيَّ اللهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَحْبُوْبَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ ـ

صَلٰوةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَسَلَامُهٗ دَائِمَيْنِ مُتَلَازِمَيْنِ

اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۝

BANGLA ISLAMIC ACADEMY
MADNI MASJID, DEOBAND-247554, U.P.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

দিল্লী ও কাকরাইলের মুরুব্বিয়ানে কেরামের এজাজতে লিখিত

ফাজায়েলে ছাদাকাত

প্রথম খণ্ড

(فضائل صدقات (حصہ اول

মূল লিখক
শায়খুল হাদীছ হজরত মাওলানা হাফেজ
মোহাম্মদ জাকারিয়া ছাহারানপুরী (রহঃ)
কর্তৃক সরাসরি দোয়া ও এজাজত প্রাপ্ত

অনুবাদক
মাওলানা মোঃ ছাখাওয়াত উল্লাহ
মোমতাজুল মোহাদ্দেছীন, রিসার্চ স্কলার

পেশ কালাম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি তাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহে আমাদিগকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করতঃ তাঁহার হাবীবে পাক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ঈমান একীন ও এলেম এবং মারফতের মত দৌলত দান করিয়াছেন। অতঃপর লক্ষ কোটি ছালাম ও দরূদ সেই মাহবুবে খোদার প্রতি যাঁহাকে রহমতুল্লিল আলামীন আখ্যা দিয়া তাঁহার উছিলায় কুল মাখলুকাতকে সৃজন করিয়াছেন।

আলহাম্‌দু লিল্লাহ! শায়খুল হাদীছ ছায়্যেদুল আওলিয়া হজরত মাওলানা হাফেজ মোঃ জাকারিয়া ছাহারানপুরী ছাহেব (রঃ) কৃত সারা বিশ্ব-মুছলিমের সর্বাধিক জনপ্রিয় উর্দু গ্রন্থ "ফাজায়েলে ছাদাকাতের" বঙ্গানুবাদ আজ বাংলার মুসলিম সমাজের সম্মুখে পেশ করা হইল, যে কোন মুসলমানকে আল্লাহ্ পাকের খাঁটি প্রেমিক বান্দা হিসাবে গড়িয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি হাছেল করার জন্য হজরত শায়েখের রচিত ইহা এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বুজুর্গানে দ্বীনের নির্দেশে সরল সহজ ভাষায় অনুবাদ করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতা এবং অযোগ্যতা বশতঃ ইহাতে ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক, তাছাড়া টাইপের ছাপা হিসাবে ছাপাগত ভুলভ্রান্তি থাকা মোটেই বিচিত্র নয়, তাই প্রিয় পাঠকদের খেদমতে আরজ যদি কোন ভাই আমাকে কোন ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করান তবে আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। বন্ধুদের খেদমতে আরও সবিনয় নিবেদন এই যে এই কিতাবের দ্বারা যদি কেহ বিন্দুমাত্রও উপকৃত হন তবে আপনাদের নেক দোয়ায় এই অধমকেও সামিল করিবেন যেন আল্লাহ পাক আমাকেও এই সবের উপর আমল করিবার তওফীক দান করেন এবং ইহার উছিলায় পরকালে নাজাত দান করেন, "আমীন।"

অনুবাদক

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّمُسَلِّمًا - اَمَّا بَعْدُ

পেশ কালাম

আল্লাহর রাস্তায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা সম্পর্কে এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখিত হইয়াছে। ফাজায়েলে হজ্ব নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে আমি লিখিয়াছিলাম যে চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) ফাজায়েলে ছাদাকাত নামক একটি গ্রন্থ লিখিবার জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিতে এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যথেষ্ট তাকীদও করিতে থাকেন। এমন কি একবার আছরের নামাজের একামত হইতেছিল ঠিক এমনি সময়ে তিনি সারি হইতে মুখ বাহির করিয়া এই অধমকে সম্বোধন করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন দেখ এই ব্যাপারে তুমি কখনও ভুল করিওনা। চাচাজানের এতসব তাকীদ সত্ত্বেও আমার অলসতার দরুণ ইহাতে বিলম্ব ঘটিতে থাকে। ইত্যবসরে তাকদীরের জোরে আমাকে ১৩৬৬ হিঃ সনে দীর্ঘদিনের জন্য দিল্লীর বস্তিয়ে নিজামুদ্দিনে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল তখন আমি ফাজায়েলে হজ্ব নামক গ্রন্থ লিখিতেছিলাম এবং ঐ গ্রন্থখানীর সংকলন শেষ হওয়ার পরও ছাহারানপুর ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগ হইতেছেনা দেখিয়া ১৩৬৬ হিঃ সনের ২৪শে শাওয়াল বুধবার এই গ্রন্থখানির সংকলন আরম্ভ করিয়া দেই।

আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের অবর্ণনীয় রহমতের উপর ভরসা করিয়া আশা করিতে পারি যে তিনি কিতাব খানির

সংকলন শেষ পর্যায়ে পৌঁছাইয়া কবুল করিবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ٥

এই কিতাবে সর্ব মোট ৭টি পরিচ্ছেদ থাকিবে, প্রথম পরিচ্ছেদে থাকিবে আল্লাহর রাস্তায় দান করার ফজীলত। ২য় পরিচ্ছেদে কৃপণতার কুফল। ৩য় পরিচ্ছেদে আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত কঠোর নির্দেশ। ৪র্থ পরিচ্ছেদে জাকাত ফরজ হওয়া ও উহার ফজীলত সম্পর্কে। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পরহেজগারী ও ছওয়াল না করার জন্য উৎসাহিত করা। ৭ম পরিচ্ছেদ বুজুর্গানে দ্বীন ও আল্লাহর রাস্তায় যাহারা দান করিয়াছেন তাহাদের ঘটনাবলী সম্পর্কে।

ফাজায়েলে ছাদাকাত

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ফজীলত

আল্লাহ পাকের কালাম এবং তাঁহার প্রিয় সত্যবাদী রাছুলের হাদীছ সমূহে ধনসম্পদ আল্লার রাহে খরচ করার ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহিত করা হইয়াছে যে যাহার কোন সীমা রেখা নাই। ঐসব পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে ধনসম্পদ নিকটে রাখার বা সঞ্চিত করার কোন বস্তুই নহে বরং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে দান করার জন্যই যেন এই সবের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে যাহা কিছু এরশাদ হইয়াছে উহার এক দশমাংশ বর্ণনা করাও সাধ্যাতীত, তাই আমার অভ্যাস মোতাবেক নমুনা স্বরূপ কিছু সংখ্যক আয়াত ও হাদীছের অনুবাদ পেশ করিতেছি।

আয়াত নং (১)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ
الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا
اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ -
اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - بقره

অর্থ : (এই কোরআনে মজীদ) ঐসব খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক যাহারা অদৃশ্য বস্তু সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে কিছুটা দান খয়রাতও করে আর যাহারা আপনার উপর নাজেল কৃত কিতাব ও আপনার পূর্ববর্তী পয়-

গাম্বরদের প্রতি নাজেল কৃত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতের উপর ও রহিয়াছে তাহাদের অটল বিশ্বাস। তাহারাই খোদা প্রদত্ত সত্য পথের পথিক এবং তাহারাই প্রকৃত সফলকাম।

ফায়েদা ঃ এই আয়াত শরীফে কয়েকটি বস্তু বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

(ক) "খোদাভীরুদের জন্য পথ প্রদর্শক" অর্থাৎ যাহাদের অন্তরে মালিকের ভয় নাই, মালিককে মালিক বলিয়া জানে না, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যে অজ্ঞ, কোরআন কর্তৃক প্রদর্শিত পথ কি করিয়া তাহার দৃষ্টি গোচরে আসিবে। রাস্তা ত সেই ব্যক্তিই দেখিতে পায় যাহার দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে, যার চক্ষু নাই সে কি করিয়া দেখিতে পাইবে। ঠিক তদ্রূপ যার অন্তরে মলিকের ভয় নাই সে মালিকের আদেশ নিষেধের পরওয়াই বা কি করিবে?

(খ) নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল নামাজের যাবতীয় নিয়ম কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গুরুত্ব সহকারে উহা আদায় করা, যাহার বিস্তারিত বর্ণনা ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল রুকু ছেজদা ঠিকমত আদায় করিয়া খুশু খুজু ও বিনয়ের সহিত নামাজ পড়া। হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, নামাজ কায়েম করার অর্থ হইল সময়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া রুকু ছেজদা ঠিক ঠিক ভাবে আদায় করা।

(গ) ফালাহ শব্দের অর্থ কামিয়াবী বা সাফল্য। যেখানেই এই শব্দ আসিয়াছে দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় সফলতাকেই বুঝান হইয়াছে।

ইমাম রাগেব (রঃ) বর্ণনা করেন পার্থিব কামীয়াবী ঐসব গুণাবলী হাছেল করার নাম যদ্দারা দুনিয়াবী জিন্দেগী উন্নতর হইয়া যায় যেমন পরমুখাপেক্ষী না হওয়া এবং মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া। আর পারলৌকিক কামিয়াবী হইল চার বস্তুর সমষ্টি। ঐ স্থায়িত্ব যার কোন ধ্বংস নাই, ঐ ঐশ্বর্য্য যেখানে কোন অভাবের লেশ মাত্র ও নাই। ঐ ইজ্জত যথায় কোন যিল্লাত নাই। ঐ জ্ঞান যেখানে কোন মূর্খতা নাই। আয়াতে পাকে যখন স্বাভাবিক কামিয়াবী বলা হইয়াছে তখন ইহলোকিক ও পারলৌকিক উভয় কামিয়াবীই উহার মধ্যে আসিয়া

গিয়াছে।

আয়াত নং (২)

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ

وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى

وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِى

الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۝

অর্থঃ আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন তোমরা নামাজ পড়ার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরাইবে ইহাতেই যাবতীয় বুজুর্গী সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রকৃত বুজুর্গীত ঐ ব্যক্তির আমল যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করে আল্লার উপর এবং কেয়ামতের দিন ও ফেরেস্তাদের উপর আর আসমানী কিতাব সমূহ ও পয়গাম্বরগণের উপর, তদুপরি ধন-সম্পদ প্রিয় বস্তু হওয়া সত্বেও আল্লার মহব্বতে দান করে আত্মীয় স্বজন এতীম মিছকীন ও মোছাফের, ভিক্ষুক এবং গোলাম আজাদ করার ব্যাপারে, আর নামাজ আদায় করে ও জাকাত আদায় করে, এইসব বস্তুই হইল প্রকৃত বুজুর্গীর পরিচয়।

উক্ত আয়াত শরীফে অন্যান্য আরও গুণাবলীর বর্ণনা করিয়া এরশাদ হইতেছে এইসব লোকই হইল প্রকৃত সত্যবাদী ও মোত্তাকী।

ফায়েদা ঃ হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা পশ্চিম মুখী হইয়া ও খৃষ্টানগণ পূর্ব মুখী হইয়া নামাজ পড়িত। তাহাদের শানে এই আয়াত নাজেল হয়। ইমাম জাচ্ছাছ বলেন আল্লাহু পাক যখন বায়তুল মোকাদ্দাছের পরিবর্তে বায়তুল্লাহ শরীফকে কেবলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন তখন ইহুদ নাছারাদের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন প্রকৃত নেকি হইল আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে, উহা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম মুখী হওয়ার কোন মূল্য নাই।

'আল্লাহর মহব্বতে ধন সম্পদ ব্যয় করে, তার অর্থ হইল মাল ব্যয় করার মধ্যে তাহাদের উদ্দেশ্য হইল একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি। লোক দেখানো, মান মর্যাদা বা সুনাম বৃদ্ধির আশায় দান করে না। কারণ এমতাবস্থায় নেকীর পরিবর্তে পাপের বোঝাই ভারী হইয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক ছুরত এবং মালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বরং তোমাদের আমল এবং অন্তরের প্রতি লক্ষ্য করেন যে তোমরা কোন নিয়তে আর কোন এরাদায় দান করিতেছ। অন্য এক হাদীছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন ছোট শেরেক সম্পর্কে তোমাদের জন্য আমি অধিক পরিমাণ ভয় করিতেছি। ছাহাবারা আরজ করিলেন হুজুর ছোট শেরেক কি জিনিস? হুজুর এরশাদ করিলেন রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর নিয়তে আমল করা। রিয়ার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যাহার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

উক্ত আয়াতের অর্থ কেহ কেহ আল্লার মহব্বতের পরিবর্তে খরচ করার মহব্বত বলিয়াছেন। অর্থাৎ মাল খরচ করিয়া সে এক অপূর্ব তৃপ্তি লাভ করে এবং উহার উপর এই বলিয়া অনুতাপ করে না যে আমি মাল কেন খরচ করিলাম, কত বড় বেওকফী করিলাম মাল কমিয়া গেল ইত্যাদি, অধিকাংশ আলেমগণ এই ভাবে অর্থ করিয়াছেন যে ধন সম্পদের সহিত মহব্বত থাকা সত্বেও আল্লার রাস্তায় দান করে।

একটি হাদিছে আসিয়াছে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! মালের মহব্বত বলিতে কি বুঝায়? মালকে তো সবাই মহব্বত করে। প্রিয় নবী (ছঃ) উত্তর করিলেন যখন তুমি টাকা পয়সা দান কর তখন তোমার মন বিভিন্ন প্রয়োজনাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এই ভাবে যে, তোমার হায়াত এখন ও অনেক বাকী, খরচ করিলে পরে তুমি পর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে। অন্য একটি হাদিসে অসিয়াছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন তুমি যখন সুস্থ সবল দেহ নিয়া অধিক কাল বাঁচিয়া থাকার আশা পোষণ কর তখনকার ছদকাই হইল তোমার জন্য সর্বোত্তম ছদকা। এমন যেন না হয় যে টাল বাহানা করিয়া দান

খয়রাত না করিতে করিতে হঠাৎ যখন মৃত্যুর সান্নিধ্যে আসিয়া পৌছিবে তখন বলিতে লাগিল যে এতটুকু অমুক মসজিদের জন্য এতটুকু অমুক মাদ্রাসার জন্য, অথচ এখনত নিজের আর কিছুই রহিল না। সব উত্তরাধীকারীদের হইয়া গেল। এখন দান করার দৃষ্টান্ত হইল যেমন—মিষ্টির দোকানে নানাজীর ফাতেহা' আর কি। যতদিন নিজের প্রয়োজন ছিল ততদিন ছদকা করার তওফীক হইল না যখন ওয়ারিশানের হাতে যাইতে লাগিল তখন তোমার দানের জযবা বাড়িয়া গেল, এই জন্যই পবিত্র শরীয়তের বিধান হইল মৃত্যুকালের অছিয়ত ওয়ারিশানের অনুমতি ছাড়া এক তৃতীয়াংশের অধিক মালের উপর প্রযোয্য হয় না।

আয়াত শরীফে আর একটি লক্ষণীয় বস্তু এই যে ধন সম্পদ এতীম মিছকীন ও মুছাফিরদের উপর ব্যয় করার হুকুম বর্ণনা করিয়া পরে আবার আলাদাভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে এইসব দান জাকাত ব্যতীত বাকী সব মালের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উহার বর্ণনা সামনের হাদীছের সাহায্যে করা হইবে।

আয়াত নং (৩)

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى

التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ بقره

অর্থ ঃ "এবং তোমরা আল্লার রাস্তায় দান করিতে থাক ও নিজের হাতেই নিজেদের ধংস সাধন করিও না। আর দান ইত্যাদির ব্যাপারে সঠিক পন্থা অবলম্বন করিও। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সঠিক পন্থিদেরকে ভাল বাসেন।

ফায়েদা ঃ হজরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, নিজের হাতে নিজের ধংসের অর্থ হইল অভাবের ভয়ে আল্লার রাস্তায় দান হইতে বিরত থাকা। হজরত এবনে আব্বাছ বলেন নিজেকে ধ্বংস করার অর্থ আল্লার রাস্তায় নিহত হওয়া নহে বরং উহার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় দান করা হইতে বিরত থাকা। হজরত জহাক বিন জোবায়ের বলেন আনছারগণ

দান খয়রাতে বড় পটু ছিলেন কিন্তু এক বৎসর দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাহাদের মনের গতি পরিবর্তন হইয়া যায় ও দান দক্ষিণা বন্ধ করিয়া দেয় তখনই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত আছলাম বলেন আমরা কনষ্টানটিনোপলের যুদ্ধে শরীক ছিলাম। কাফেরদের এক বিরাট বাহিনী আমাদের উপর আক্রমন চালায়। তখন মুছলিম বাহিনীর মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কাফেরদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে অন্যান্য মুছলিম সেনাদল চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল লোকটি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিল। হজরত আবু আইউব আনছারী ও সেই যুদ্ধে শরীক ছিলেন তিনি প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন ইহা নিজেকে ধ্বংস করা নহে। তোমরা কি আয়াত শরীফের এই অর্থ করিতেছ ? এই আয়াত ত আনছারদের শানে নাজেল হইয়াছে। কথা হইয়াছিল এই যে ইসলামের বিজয় যখন অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল এবং চতুর্দিকে ইছলামের সাহায্যকারীর সংখ্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন আনছারগণ গোপনে সলাপরামর্শ করিল যে এখন ইছলামের তরক্কী হইতে লাগিল ও দ্বীনের সাহায্যকারীর সংখ্যা বাড়িয়া গেল এবার চল আমরা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত খেত খামারের দিকে একটু মনযোগ দেই। আমাদের এই গোপন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াতে কারিমা নাজেল করেন সুতরাং ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল আল্লার রাস্তায় জেহাদ পরিত্যগ করিয়া অর্থ সম্পদের তত্বাবধানে লাগিয়া যাওয়া। (দুররে মনছুর)

মালের কতটুকু অংশ দান করিতে হয়

(৪) وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ ٥ بقره

অর্থঃ লোকজন আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে কতটুকু দান করিতে হইবে। আপনি বলিয়া দিন যে, যতটুকু তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ ধন সম্পদ ত দান করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যতটুকু থাকিবে উহার সবটুকুই দান করিয়া দিবে। হজরত এব্নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন নিজের পরিবার পরিজনের উপর খরচ করিয়া যতটুকু উদবিত্ত থাকিবে উহাকেই বলা হয় অতিরিক্ত। হজরত আবু ওমামা হইতে বর্ণিত আছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন হে মানুষ ! যা তোমার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত

তা দান করিয়া দেওয়ার মধ্যেই তোমার মঙ্গল আর জমা করিয়া রাখা তোমার জন্য অমঙ্গল। প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা দোষণীয় নহে। যাদের ব্যয়ভার তোমার উপর ন্যস্ত খরচ করার সময় তাদের উপর হইতে আরম্ভ করিবে। মনে রাখিবে উপর ওয়ালা হাত নীচওয়ালা হাত হইতে উত্তম অর্থাৎ দাতার হাত গ্রহিতার হাত হইতে শ্রেষ্ঠ।

হজরত আতা হইতেও বর্ণিত আছে عفو শব্দের অর্থই হইল প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল। হজরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) খুদরী বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছওয়ারী রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয় আর যাহার নিকট প্রয়োজনের বাহিরে ছামানা রহিয়াছে সে যেন উহা দান করিয়া দেয়। এই কথা হুজুর (ছঃ) এত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেন যে আমাদের মনে হইতেছিল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর উপর কাহারও কোন অধিকারই নাই। বস্তুতঃ মানুষের পূর্ণ মহত্বের পরিচয় এখানেই যে তার নিজস্ব প্রয়োজনের বাহিরে যা কিছু আছে উহার সবকিছুই আল্লার রাহে খরচ করিয়া দেওয়া। কোন কোন আলেমের মতে عفو শব্দের অর্থ হইল সহজ'। অর্থাৎ সহজভাবে যতটুকু খরচ করা সম্ভব ততটুকু খরচ করিবে। এমন করিবে না যে অতিরিক্ত খরচ করিয়া পরের মাথার বোঝা হইয়া দাঁড়াইবে অথবা পরের হক নষ্ট করিয়া পরকালে শাস্তি ভোগ করিবে। হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন অনেক লোক নিজের খাবারটুকু পর্য্যন্ত না রাখিয়া যথাসর্বস্ব দান করিয়া দিত যদ্দারা পরক্ষণেই অন্যের দারস্থ হইত। তাহাদের বিরুদ্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন এক সময় ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিত জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে। প্রিয় নবী (ছঃ) তাহার দুরাবস্থা দেখিয়া উপস্থিত লোকজনকে কাপড় ছদকা করার জন্য উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে অনেকগুলি কাপড় জমা হইয়া গেল। হুজুর সেখান হইতে দুইটা কাপড় লোকটাকে দিয়া দিলেন। হুজুর (ছঃ) ছদকা করার জন্য পুনরায় ছাহাবাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবার সেই গরীব লোকটিও তাহার দুইটি কাপড় হইতে একটি ছদকা করিয়া দিল। প্রিয় নবী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার কাপড় তাহাকে ফেরৎ দিলেন।

কোরআনে মজীদে অভাব গ্রস্থ হওয়া সত্বেও খরচ করিবার জন্য উৎসাহ দান করা হইয়াছে কিন্তু উহা ঐসব মহামানবদের জন্য যাহারা হাসিমুখে দুনিয়াবী কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্থ, উহার বিস্তারিত বিবরণ ৩৮ নং আয়াতে আসিয়াছে।

আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ কি

(৫) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ بقره

অর্থঃ "এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে আল্লাহ্ তায়ালাকে লাভ জনক কর্জ দান করিবে এবং আল্লাহ পাক উহাকে বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া পরিশোধ করিবেন। (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করিলে অভাবগ্রস্থ হইয়া পড়িবে তোমরা কখনও এইরূপ ভয় করিও না) কেননা সম্পদ বাড়ানো এবং কমানোর ক্ষমতা একমাত্র আল্লহ পাকের হাতেই রহিয়াছে। আর (মৃত্যুর পর) সবাইকে তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। (ছুরায়ে বাকারা)

ফায়েদা ঃ আল্লার রাস্তায় ব্যয় করাকে এইজন্য কর্জ বলা হইয়াছে যে, কর্জ পরিশোধ করা যেরূপ জরুরী, ঠিক আল্লার রাস্তায় দানের প্রতিদান লাভ করা সেইরূপ জরুরী। কাজেই উহাকে কর্জ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন আল্লাহকে কর্জ দেওয়ার অর্থ হইল আল্লহর রাস্তায় দান করা। হজরত এব্‌নে মাছউদ বলেন এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু দাহদাহ আনছারী হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন ইয় রাছুলাল্লাহ্, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট কর্জ চাহিতেছেন? হুজুর এরশাদ করিলেন নিশ্চয় চাহিতেছেন। তিনি আরজ করিলেন হুজুর আপনার হাতে হাত রাখিয়া একটি অঙ্গিকার করিব, নবীয়ে করীম (ছঃ) হাত বাড়াইলে ছাহাবী হুজুরের হাত মোবারক ধরিয়া বলিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! আমি আমার বাগান আল্লাহ তায়ালাকে কর্জ স্বরূপ দান করিয়া দিলাম। তাঁহার সেই বাগানে ছয়শত খেজুরের বৃক্ষ ছিল এবং তথায় তাহার পরিবার পরিজন বাস করিত। অতঃপর তিনি

হুজুরের দরবার হইতে উঠিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া স্বীয় বিবি উম্মে দাহ্‌দাহকে ডাকিয়া বলিলেন চল এই বাগান হইতে বাহির হইয়া পড় ইহা আমি আপন প্রভুকে দিয়া দিয়াছি। হুজুর (ছঃ) সেই বাগান কয়েকজন এতীমের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যখন—

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ۝

এই আয়াত অবতীর্ণ হয় অর্থাৎ যে একটি মাত্র নেকী করিল সে উহার দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। তখন প্রিয় নবী দোয়া করিলেন হে খোদা! তুমি আমার উম্মতের ছওয়াব বাড়াইয়া দাও তখন

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ۝

নাজিল হয়, তারপর হুজুর আবার দোয়া করিলেন হে খোদা তুমি ছওয়াব আর ও বেশী বেশী বাড়াইয়া দাও তখন

مثل الذين ينفقون ۝

এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর হুজুর আরও বর্দ্ধিত করার জন্য যখন দোয়া করিলেন তখন

انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ۝

অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ হইল ধৈর্য্যাবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ পাক অগণিত ও সীমাহীন ছওয়াব প্রদান করিবেন।

একটি হাদীছে আছে একজন ফেরেশতা আওয়াজ দিতে থাকে যে কে আছে এমন যে আজ কর্জ দিবে ও কাল কড়ায় গণ্ডায় উহার প্রতিদান বুঝিয়া নিবে। অন্য হাদীছে আছে আল্লাহ পাক বলেন, হে মানুষ তোমার সম্পদ আমার রাজ কোষে জমা রাখিয়া দাও যেখানে আগুন লাগিবার অথবা পানিতে নিমজ্জিত হইবার অথবা চুরি হইয়ার কোন ভয় নাই। আমি এমন সময় পুরা পুরা তোমাকে উহার প্রতিদান দিব যখন তুমি ভীষণ প্রয়োজনের সম্মুখীন হইবে।

(৬) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۝ بقرة

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! আমার দেওয়া রিজিকের কিয়দাংশ দান করিয়া দাও এমন এক মহাসংকট পূর্ণ দিন আসার আগে যেদিন না কোন বেচা বিক্রি চলিবে, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসিবে এবং আল্লার অনুমতি ভিন্ন না কোন সুপারিশের সুযোগ হইবে।

ফায়েদাঃ অর্থাৎ সেদিন কেহ কাহার ও নেকী খরিদ করিতে অথবা বন্ধুত্বের দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হইতে অথবা খোশামদ তোষামদ করিয়া কেহ কাহার ও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। মূল কথা অপরের সাহায্য প্রাপ্তির যাবতীয় পন্থা সেদিন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই সেই কঠিন দিনের জন্য কিছু করিতে হইলে আজই করিতে হইবে। আজ বীজ লাগাইবার দিন আর ক্বেয়ামতের দিন হইল ফসল কাটিবার দিন। সুতরাং যে যেইরূপ বীজ বপন করিবে সে সেইরূপ ফসলই কর্তন করিবে।

(৭) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ۝

অর্থঃ যাহারা আপন আপন ধনসম্পদ আল্লার রাস্তায় দান করে তাহাদের দৃষ্টান্ত হইল ঐ দানারমত যেখান হইতে এইরূপ সাতটি ছড়া নির্গত হইল যার প্রত্যেকটিতে একশত করিয়া দানা রহিয়াছে। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা আরও বেশী বেশী করিয়া দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ পাক অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক। যে কোন নিয়তে দান করেন সেই বিষয়েও তিনি জবরদস্ত জ্ঞানী। (বাকারা)

আমল ছয় প্রকার ও মানুষ চার প্রকার

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে আমল ছয় প্রকার ও আমল ওয়ালা মানুষ চার প্রকার। ছয় প্রকার আমলের মধ্যে দুই প্রকার আমল হইল এইরূপ যাহা দুইটা পরিণামকে ওয়াজিব করিয়া লয়, দুই প্রকার আমল সমান সমান। আর এক প্রকার আমলের ছওয়াব হইল দশগুণ, অন্য

এক আমলের বদল হইল সাতশত গুণ। প্রথমোক্ত দুই প্রকার আমল হইল—যে ব্যক্তি শেরেক না করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে শেরেক করিয়া মারা গেল সে নিশ্চয় জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। সমান দুই কাজ হইল যে সৎ কাজের নিয়ত করিয়াছে কিন্তু আমল করিতে পারে নাই সে এক গুণ ছওয়াব লাভ করিবে। আর যে একটি গুনাহ করিবে সে এক গুণ শাস্তি ভোগ করিবে। আবার যে একটি নেক কাজ করিয়া ফেলিল সে দশগুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে এবং যে অল্লাহর রাস্তায় দান করিল সে প্রতিটি দানের পরিবর্তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রাপ্ত হইল।

চার প্রকার মানুষ এই যে প্রথম যারা দুনিয়াতেও সুখী আখেরাতেও সুখী, দ্বিতীয় যারা দুনিয়াতে সুখী আখেরাতে দুঃখী, তৃতীয় যারা দুনিয়াতে দুঃখী আখেরাতে সুখী, চতুর্থ যারা দুনিয়াতেও দুঃখী আখেরাতেও দুঃখী। ইহারা আপন কর্ম দোষে উভয় কুল হারাইল। (কান্‌জুল ওম্মাল)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে বক্তি হালাল পবিত্র মাল হইতে একটি খেজুরও দান করিল কেননা হক তায়ালা শুধু পবিত্র মালই কবুল করিয়া থাকেন, তবে তিনি সেইরূপ ছদকাকে প্রতিপালন করিয়া বাড়াইতে থাকেন যেমন নাকি তোমরা গরুর বাচ্চাকে প্রতিপালন করিয়া থাক এমনকি সেই ছদকা বর্দ্ধিত হইতে হইতে পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি একটি খেজুরও আল্লার রাস্তায় দান করিল আল্লাহ্ পাক উহার ছওয়াব এত বেশী বাড়াইয়া দেন যে উহা অহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়। অহুদ হইল মদীনা শরীফের সর্ব বৃহৎ পাহাড়। এই ছুরতে সাত শত গুণ হইতে ও অধিকতর ছওয়াব হইতেছে দেখা যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে যখন সাত শত গুণ ওয়ালী আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন প্রিয় নবী (ছঃ) ছওয়াব আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিবার জন্য দোয়া করেন তখন আল্লাহ পাক ৫ নম্বরে বর্ণিত আয়াত নাজিল করেন।

(৮) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ

لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ بقره ٤

অর্থঃ যাহারা আপন মাল আল্লার রাস্তায় ব্যয় করে অতঃপর দান গ্রহিতার প্রতি কোন প্রকার খোঁটাও দেয় না অথবা কটুবাক্য ও বলে না। স্বীয় প্রভুর নিকট তাদের জন্য প্রতিদান রহিয়াছে কেয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নাই এবং কোন প্রকার চিন্তা যুক্ত ও হইবে না।

ফায়েদাঃ এই আয়াত শরীফে দানের প্রতি উৎসাহ ও দান করিয়া খোঁটা দিয়া উহাকে বরবাদ না করার প্রতি সতর্ক করা হইয়াছে। অন্য কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করার অর্থ হইল কাহার ও প্রতি এহছান করিয়া তাহাকে তুচ্ছ মনে করা। প্রিয় নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন কয়েক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ১ম যে দান করিয়া খোঁটা দেয়, ২য় যে মাতা পিতার নাফরমানী করে। ৩য় যে শরাব খায়। ইমাম গাজালী(রঃ) লিখিয়াছেন দান করিয়া খোঁটা দিয়া বা অসৎব্যবহার করিয়া উহাকে বরবাদ করিবে না। ওলামগণ মান্ এবং আজার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন—মান্ অর্থ স্বয়ং গ্রহিতার নিকট দানের আলোচনা করা। আর আজা শব্দের অর্থ এহছানের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করা। কেহ বলেন মান্ শব্দের অর্থ দান গ্রহিতা দ্বারা বিনা পারিশ্রমিকে কোন কাজ করানো, আর আজা শব্দের অর্থ তাহাকে গরীব বলিয়া উপহাস করা। আবার কেহ বলেন প্রথমটি হইল দান করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা আর দ্বিতীয়টি হইল ছওয়াল করার পর ধমক দেওয়া।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, প্রকৃত "মান" হইল নিজের অন্তরে অন্তরে ফকীরের উপর এহ্ছান করিয়াছে মনে করা, এই কারণে উল্লেখিত দুর্ব্যবহার সমূহ প্রকাশ পায়, অথচ প্রকৃত পক্ষে মনে করিতে হইবে ফকীর লোকটা আমার উপর বিরাট এহ্ছান করিয়াছে। কেননা সে দাতা লোকটা হইতে আল্লাহ পাকের হক উসুল করিয়া তাহাকে পুত পবিত্র বানাইয়া জাহান্নাম হইতে নিস্কৃতি দিয়াছে। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন, ফকীর মালের যতটুকু মুখাপেক্ষী

দাতা ব্যক্তি তার চেয়ে অধিকতর নিজেকে ছওয়াবের মুখাপেক্ষী মনে না করিলে সে আপন ছদ্‌কাকে বরবাদ করিয়া দিল। কেয়ামতের দিন সেই ছদকা তাহার মুখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। কেয়ামতের দিন ভয়ভীতি ও পেরেশানীর মহাসংকট পূর্ণ দিন। সেই দিন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকা বহুত বড় সৌভাগ্যের কথা।

ছদকা গোপনে না প্রকাশ্যে করা ভাল

(৯) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ بقره

অর্থঃ দান দক্ষিণা যদি তোমরা প্রকাশ্যে করিয়া থাক তবে সেটাও তোমাদের জন্য বেশ ভাল। আর যদি ফকীরদেরকে গোপনে দান করিতে থাক তবে উহা তোমাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলজনক। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কিছু গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকেফহাল। অন্য আয়াতে এরশাদ হইতেছে—

"যাহারা স্বীয় ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিনে গোপনে এবং প্রকাশ্যে দান করিয়া থাকে তাহাদের প্রতিদান আপন প্রভুর নিকট সুরক্ষিত থাকিবে আর তাহারা ভয়শূন্য ও চিন্তা মুক্ত থাকিবে। (বাকারা)

ফায়েদাঃ উল্লেখিত উভয় আয়াতে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে কোন উপায়ে ছদকা করার প্রশংসা করা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন জাগে কোন কোন আয়াতে এবং হাদীছে লোক দেখানো ছদকাকে গোনাহে কবিরা এবং শেরেক পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে তবুও প্রকাশ্যে দান করাকে প্রশংসনীয় কি করিয়া বলা যাইতে পারে? কাজেই প্রথমে রিয়ার বিশদ

ব্যাখ্যা জানা উচিত। মনে রাখিবে প্রকাশ্যে করা যাবতীয় কাজকে লোক দেখানো বা রিয়া বলা ঠিক নহে। বরং নিজের সুখ্যাতি অর্জন, মর্যাদা বৃদ্ধি ও ইজ্জত এবং বুজুর্গী হাছেল করার নিয়তে দান করার নামই হইল রিয়া, পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় দান করিলে যদি কোন কারণ বশতঃ উহা প্রকাশ্যে হইয়া পড়ে তবে উহাকে রিয়া বলা যায় না। তবে প্রত্যেক আমল বিশেষ করিয়া ছদকা খয়রাত গোপনে করাই উত্তম। কেননা উহাতে রিয়ার কোন আশংকাই থাকে না। আর দান গ্রহিতার অবমাননা ও হয় না। আর একটি হেকমত এই যে, যদিও দাতা দান করিবার সময় রিয়া মুক্ত থাকে কিন্তু দানের সুখ্যাতি যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মগর্ব পয়দা হইতে পারে তদুপরি ভিক্ষুকরা তাকে বিরক্ত করিতে পারে। আবার মালদার বলিয়া খ্যাত হইয়া গেলে অনেক পার্থিব অসুবিধা ও মাথা ছাড়া দিয়া উঠে। যেমন সরকারী ট্যাক্স, চোর ডাকাতের উপদ্রব হিংসুকদের চক্ষু শুল হওয়া ইত্যাদি। ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, ছদকা গোপনে করাই রিয়া হইতে বাঁচার একমাত্র উপায়। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন কোন গরীব ব্যক্তি কর্তৃক সাধ্যানুসারে অন্য কোন অধিকতর গরীব ব্যক্তিকে গোপনে দান করাই হইল সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর যে নিজের দানের আলোচনা করিয়া ফিরে সেতো নিজের সুখ্যাতি চায় আর যে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে দান করিল সে হইল রিয়াকার। আগেকার বুজুর্গেরা এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করিতেন যে, ফকীর পর্যন্ত জানিত না যে, কে তাহাকে দান করিয়াছে। তাই অনেকে অন্ধ ফকীর তালাশ করিয়া দিতেন, অনেকে ঘুমন্ত অবস্থায় ফকীরের পকেটে রাখিয়া আত্মগোপন করিতেন। আবার কেহ কেহ ফকীরকে অন্যের মারফত দান করিতেন যেন ফকীর লজ্জা না পায় এবং টের না পায় যে, কে দিল। মূল কথা রিয়া অথবা সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলে "নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম"।

ইমাম গাজালী (রঃ) লিখিয়াছেন, সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য হইলে আমল বরবাদ হইয়া যাইবে। এই জন্যইত জাকাত ফরজ হওয়ার উদ্দেশ্য হইল মালের মহব্বত অন্তর হইতে দূর করা। আর মান মর্যাদার লোভ মানুষের অন্তরে মালের মহব্বত হইতেও অধিকতর হইয়া

থাকে। উভয় লোভই আখেরাতে ধ্বংস করিয়া দিবে। কৃপণতা বিচ্ছুর ছুরতে ও রিয়া সর্পের ছুরতে কবরে আত্ম প্রকাশ করিবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষের অমঙ্গলের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে লোকে অঙ্গুলী দিয়া তাহার দিকে ইশারা করিতে থাকে চাই সেই ইশারা দুনিয়ার ব্যাপারে হউক বা আখেরাতের ব্যাপারে হউক। হজরত ইব্রাহীম বিন আদহাম বলেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি চায় সে আল্লাহর সহিত ভাল ব্যবহার করিল না। আইউব ছখতিয়াবী বলেন যে মাওলায়ে পাকের সহিত সততার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চায় সে ইহাও পছন্দ করে না যে, লোকে তাহার ঠিকানাটুকু পর্য্যন্ত জানুক যে সে কোথায় থাকে। হজরত ওমর (রাঃ) একবার হজরত মোয়াজকে দেখিতে পাইলেন যে; প্রিয় নবীর কবর শরীফের নিকট বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। হজরত ওমর (রাঃ) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মোয়াজ (রাঃ) বলেন, আমি হুজুরের জবান মোবারকে শুনিতে পাইয়াছি যে, রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশ-টুকুও শেরেক। এবং আল্লাহ পাক এমন মোত্তাকীন লোকদিগকে ভালবাসেন যাহারা অজ্ঞাত স্থানে আত্ম গোপন করিয়া থাকে। নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে তাহাদের সন্ধান কেহ করে না, মজলিশে আসিলে তাহাদেরকে কেহ চিনে না, তাহাদের অন্তর হইল হেদায়েতের দীপ্ত মশাল, পাপের অন্ধকার পরিবেশ হইতে তাহারা মুক্ত।

মূল কথা অসংখ্য হাদীছ ও আয়াত দ্বারা রিয়ার অমঙ্গল বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদসত্বেও কোন কোন সময়ে যুক্তি সঙ্গত কারণে ছদকা প্রকাশ্যে করার মধ্যে হেকমত নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ যখন অন্যকে উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয় বা দুই একজনের দ্বারা দ্বীনী প্রয়োজন মিটে না বিধায় প্রকাশ্যে দিলে অন্যেরা তাহাতে শরীক হইয়া দ্বীনের প্রয়োজন মিটিয়া যায়। অতএব কারণে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন কোরানে পাককে উচ্চস্বরে পড়া প্রকাশ্যে ছদকা দেওয়ার সমতুল্য আর আস্তে পড়া গোপনে ছদকার সমতুল্য। অর্থাৎ স্থান বিশেষে তেলাওয়াত যেইভাবে জোরে বা আস্তে পড়া যায় ছদকা ও তদ্রূপ প্রকাশ্যে বা গোপনে করা চলে।

বেশীর ভাগ ওলামাদের মতে প্রথম আয়াতে জাকাত এবং নফল

ছদকা উভয়ের বর্ণনাই আসিয়াছে ছদকায়ে ওয়াজেব অন্যান্য ফরজের মত প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম। কেননা উহাতে অন্যকে উৎসাহিত করা ছাড়াও নিজের উপর জাকাত দেয় না বলিয়া অপবাদের গ্লানী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। জামাতে নামাজে পড়ার মধ্যেও বিভিন্ন হেকমতের মধ্যে ইহাও একটি অন্যতম হেকমত। হাফেজ এবনে হাজার (রঃ) বলেন আল্লামা তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেন যে, ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা ও নফল ছদকা গোপনে করা উত্তম সম্পর্কে ওলামারা একমত। জয়েন বিন মুনীর (রঃ) বলেন, অবস্থাভেদে উহার মধ্যে তারতম্য হয়। যেমন শাসনকর্তা অত্যাচারী হইলে আর জাকাতের মাল গোপনীয় হইলে জাকাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। আবার কোন ব্যক্তি যদি সমাজের এইরূপ নেতৃস্থানীয় হয় যে লোক তার অনুসরণ করিয়া থাকে তবে তার জন্য নফল ছদকা ও প্রকাশ্যে করা উত্তম। উল্লেখিত আয়াত শরীফের তাফছীরে হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন গোপনে নফল ছদকা করা প্রকাশ্যে ছদকা করার উপর সত্তর গুণ বেশী ফজীলত রাখে। আর ফরজ ছদকা প্রকাশ্যে করা গোপনে করার উপর পঁচিশ গুণ বেশী ফজীলত রাখে। এইভাবে ফরজ এবং নফলের ব্যাপারে অন্যান্য এবাদতের অবস্থা, অর্থাৎ ফরজ এবাদত প্রকাশ্যে করাই উত্তম। কারণ উহাতে অন্যের অপবাদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তদুপরি পাড়া প্রতিবেশী মনে করিবে যে লোকটা এই এবাদত করে না। ইহাতে তাহাদের অন্তর হইতেও সেই এবাদতের গুরুত্ব কমিয়া যাইবে। আর নফলের মধ্যে ও যদি অন্যের অনুকরণ ও অনুসরণ উদ্দেশ্য হয় তবে প্রকাশ্যে হওয়াই উত্তম। অন্য হাদীছে আসিয়াছে নফল এবাদত গোপনে করাই উত্তম তবে অন্যের তাবেদারী মাকছুদ হইলে প্রকাশ্যে করা ভাল। হজরত আবুজর (রাঃ) হুজুরের নিকট উত্তম ছদকা কি জিজ্ঞাস করিলে হুজুর (ছঃ) বলেন অভাব গ্রস্থকে গোপনে কিছু দান করা, আর গরীব লোকের ছদকা করা। মূল কথা নফল ছদকা গোপনে করাই ভাল তবে কোন দ্বীনী হেকমতে প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম। কিন্তু মনে রাখিবে নফ্‌ছ এবং শয়তানের ধোকায় পড়িয়া যেন ছদকা বরবাদ না হয়। তাই প্রকাশ্যে দেওয়ার সময় গভীর ভাবে চিন্তা ফিকির করিয়া দিবে। আবার গোপনে ছদকা করিয়াও লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইলে উহা আর

গোপন থাকে না। একটি হাদীছে আছে মানুষ গোপনে ছদকা করিলে উহা গোপন আমল হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু কাহারও নিকট বলিয়া ফেলিলে উহা প্রকাশ্য আমলে রূপান্তরিত হয়। আবার যখন সে লোকের কাছে বলিয়া বেড়ায় তখন প্রকাশ্য আমল হইলে লোক দেখানো আমলে পরিণত হইয়া যায়।

সাত ব্যক্তি আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, সাত ব্যক্তি এমন রহিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ পাক সেই দিন আপন ছায়াতলে রাখিবেন যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া হইবে না, (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) ১ম ন্যায় বিচারক বাদশাহ। ২য় ঐ নওজোয়ান যুবক যার সময় সর্বদা আল্লাহর এবাদতেই কাটে। ৩য় যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে লাগিয়া থাকে। ৪র্থ ঐ দুই ব্যক্তি যাদের মহব্বত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নয়। উভয়ের মিলন এবং বিচ্ছেদ শুধু মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হয়। ৫ম ব্যক্তি যাহাকে কোন উচ্চ বংশীয় সুন্দরী নারী নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর সে পরিষ্কার বলিয়া দেয় যে আমি আল্লাহকে ভয় করি। তদ্রূপ কোন পুরুষ ডাকিলেও যুবতী বলিয়া দেয় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। ৬ষ্ঠ যে ব্যক্তি দান খয়রাতের ব্যাপারে এত বেশী গোপনীয়তা অবলম্বন করে যে তার বাম হাত ও টের পায় না যে, ডান হাত কি খরচ করিল। ৭ম ঐ ব্যক্তি যে গোপনে আল্লাহর জিকির করিতে থাকে ও কাঁদিতে থাকে এই হাদীছে সাত ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে, অন্যান্য হাদীছে বিভিন্ন গুণাবলীর লোকজনের ও উল্লেখ আসিয়াছে। এতহাফ গ্রন্থে আরশের নীচে ছায়া প্রাপ্ত লোকদের সংখ্যা বিরাশী পর্যন্ত উল্লেখ করা হইয়াছে। একাধিক হাদীছে বর্ণিত আছে গোপনে ছদকা করা আল্লাহ পাকের রাগকে ঠাণ্ডা করিয়া দেয়।

হজরত ছালেম বিন আবিল জা'দ বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা স্বীয় বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়া কোথাও যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি নেকড়ে বাঘ থাবা মারিয়া তাহার বাচ্চাকে নিয়া গেল, সে বাঘের পিছনে ধাওয়া করিল ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক তাহার নিকট কিছু চাহিলে সে নিজের একমাত্র রুটিখানা ভিক্ষুককে দান করিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে বাঘ ও তাহার বাচ্চাকে তাহার সামনে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন প্রকারের মানুষকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত ভালবাসেন আর তিন ধরণের মানুষের উপর তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট। যাহাদিগকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন তাহাদের মধ্যে প্রথম ঐ ব্যক্তি, কোন এক স্থানে সমবেত লোকদের নিকট জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা চাহিল অথচ সমবেত লোকদের সহিত তাহার আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নাই। তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সবার অজ্ঞাতসারে সেই ভিক্ষুককে কিছু দান করিল, যার দান সম্পর্কে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে নাই, এই দান শীল ব্যক্তি। ২য়, একদল মোছাফের রাত চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া যখন নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়ে, তার পর কিছুক্ষণের জন্য ছওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে থাকে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বিশ্রামের পরিবর্তে নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া পরওয়ারদেগারের সম্মুখে বিনিতভাবে আরজ নিয়াজ করিতে লাগিল এই ব্যক্তি। ৩য়, একদল মোজাহেদ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রায় পরাস্ত হইবার উপক্রম হইল ও লোকজন পিঠ দেখাইয়া পালাইতে লাগিল ঠিক তখনই এক বীর মোজাহেদ বুক পাতিয়া বীর বিক্রমে কাফেরদের মোকাবেলা করিতে লাগিল অতঃপর সে শহীদ হইয়া যায় অথবা বিজয় নিশান উড়াইয়া দেয়, এই বীর মোজাহেদ।

যে তিন ব্যক্তি আল্লার নিকট খুব নাপছন্দনীয় তাহারা হইল ১ম যে বৃদ্ধকালে জিনা করে, ২য় গরীব হইয়া অহঙ্কার করে, ৩য় ধনী হইয়া জুলুম করে।

হজরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকরাম (ছঃ) একবার এই মর্মে খোতবা করেন যে, হে লোক সকল! মৃত্যুর আগে আগে গুনাহ হইতে তওবা করিয়া লও, নেক কাজে তাড়াতাড়ি কর যেন অন্য কাজে লিপ্ত হইয়া উহা ফউত না হইয়া যায়। আল্লাহর সহিত সম্পর্ক জোরদার কর তাঁহাকে অতি মাত্রায় স্মরণ করিয়া এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদকা করিয়া, কেননা ইহা দ্বারা তোমাদিগকে রিজিক দেওয়া হইবে, তোমাদের সাহায্য করা হইবে, তোমাদের দুরাবস্থাকে শোধরাইয়া

দেওয়া হইবে। একটি হাদিছে আছে কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ছদকার ছায়ার নীচে থাকিবে অর্থাৎ সূর্য যখন একেবারেই নিকটবর্তী হইবে তখন প্রত্যেকেই আপন ছদকা পরিমাণ ছায়া পাইতে থাকিবে। অন্য একটি হাদীছে বর্ণিত আছে ছদকা কবরের উত্তাপকে নিরসন করে আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে ছদকা বালা মছিবতকে প্রতি রোধ করে।

বর্তমান যুগে যখন মুছলমান নিজ কৃত কর্মের ফলে বিভিন্ন রকম বালা মছিবতে জর্জরিত তখন তাহাদের বেশী বেশী করিয়া ছদকা করা উচিত। বিশেষতঃ সারা জীবনের সঞ্চিত ধন সম্পদ যখন নিমেষে ত্যাগ করিয়া সর্বহারা হইতে বাধ্য হইতেছে তখন গুরুত্বসহকারে অতিমাত্রায় ছদকা করিতে থাকিলে উহার বরকতে মালও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং নিজের উপর হইতেও বালা মছিবত হটিয়া যায়। কিন্তু এসব ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করার পরও আমরা ছদকার ব্যাপারে তৎপর হই না। হাদীছে আসিয়াছে ছদকা অমঙ্গলের সত্তরটি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়, ছদকা হায়াত বৃদ্ধি করিয়া দেয়, অপমৃত্যুকে রোধ করে। অহঙ্কারও গর্বকে বিনাশ করে।

একটি হাদীছে আছে আল্লাহ পাক রুটির একটি টুকরার দ্বারা অথবা একমুষ্ঠি খেজুর দ্বারা অথবা অমন কিছু সাধারণ বস্তু যদ্বারা ফকীরের প্রয়োজন মিটে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতবাসী করেন। প্রথম ঐ গৃহস্বামী যে ছদকার নির্দেশ দেয়, দ্বিতীয় ঐ ঘরওয়ালী যে রুটি ইত্যাদি তৈয়ার করে, তৃতীয় ঐ চাকর যে ভিক্ষুকের নিকট ছদকা পৌঁছায়। এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন সমস্ত তারীফ আমাদের ঐ খোদায়ে পাকের জন্য যিনি ছওয়াবের ব্যাপারে আমাদের চাকর নওকরকেও ভুলেন নাই।

একদিন হুজুরে পাক (ছঃ) ছাহাবাদিগকে প্রশ্ন করেন, তোমরা জান কি শক্তিশালী বীর পুরুষ কে? ছাহাবারা আরজ করিলেন যে আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধারাশায়ী করিয়া দেয়। হুজুর ফরমাইলেন প্রকৃত বীর পুরুষ হইল ঐ ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সামলাইয়া নিতে সক্ষম। হুজুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা জান কি বন্ধ্যা নারী বা পুরুষ কে?

ছাহাবারা বলিলেন যে নিঃসন্তান, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন 'না' বরং যে ব্যক্তি কোন শিশুকে নিজের মৃত্যুর পূর্বে পাঠাইয়া দিতে পারে নাই। অতঃপর হুজুর জিজ্ঞাসা করেন তোমরা জান কি সর্বহারা কে ? ছাহাবারা আরজ করিলেন, যার ধন-সম্পদ কিছুই নাই। হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, প্রকৃত সর্বহারা ঐ ব্যক্তি যার ধন দৌলত থাকা সত্ত্বেও ছদকা খয়রাত করিয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছুই পাঠাইতে পারিল না। (কারণ মহাসংকটের দিন সে খালি হাতেই দাঁড়াইয়া থাকিবে)।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হুজুর (ছঃ) মা আয়েশাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন এক টুক্‌রা খেজুর দিয়া হইলেও নিজকে আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা কর। আল্লাহ তায়ালার কোন জিজ্ঞাসাবাদ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। হে আয়েশা! কোন ভিক্ষুক যেন তোমার দ্বার হইতে খালি হাতে ফিরিয়া না যায়। বকরীর ক্ষুরই বা হউক না কেন। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) লিখিয়াছেন আগেকার লোকেরা কোন একটা দিন ছদকা হইতে খালি যাক তা তাহারা পছন্দ করিতেন না। চাই সেটা খেজুর হউক বা এক টুক্‌রা রুটি হউক। কারণ হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, হাসরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ছদকার ছায়াতলে আশ্রয় লইবে।

ছদকায় মাল বাড়ে আর স্বুদে ধ্বংস হয়

(১০) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِي الصَّدَقٰتِ ۝ بقره ٤

অর্থঃ আল্লাহ পাক সুদকে ধ্বংস করিয়া দেন এবং ছদকাকে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

ফায়েদাঃ অনেক রেওয়ায়েত দ্বারাই প্রমাণিত যে ছদকা আখেরাতে বর্দ্ধিত হইয়া পর্বত সমান হইয়া যাইবে। কিন্তু এখলাছের সহিত দান করিলে উহা অনেক সময় দুনিয়াতেও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় তবে সে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। তবে শর্ত হইল এখলাছ, রিয়া অথবা গর্বের নিয়তে যেন না হয়। পক্ষান্তরে সুদ আখেরাতে ত উহার ধ্বংস অনিবার্য, দুনিয়াতেও প্রায়ই ধ্বংস হইয়া যায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, সুদ যতই বাড়তি দেখা যাক না কেন কিন্তু উহার পরিণাম হইল কমতির

দিকে। হজরত মা'মার (রঃ) বলেন ৪০ বৎসরের মধ্যে সুদ ধ্বংস হইতে আরম্ভ করে। হজরত জহাক (রঃ) বলেন সুদ দুনিয়াতে বাড়িলেও আখেরাতে উহার ধ্বংস অনিবার্য। হজরত আবু মারজাহ্ বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন মানুষ একটা টুক্‌রা মাত্র দান করে কিন্তু আল্লাহর দরবারে বাড়িতে বাড়িতে উহা ওহুদ পাহাড় সমতুল্য হইয়া যায়।

প্রিয়তম বস্তু দান না করিলে প্রকৃত নেকী পাওয়া যায় না

(১১) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ০ ال عمران

অর্থঃ হে মুছলমানগণ! যে পর্য্যন্ত তোমরা প্রিয়বস্তু হইতে আল্লাহর রাস্তায় দান না করিবে সে পর্য্যন্ত তোমরা কখনও পূর্ণ নেকী হাসিল করিতে পারিবে না।

হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, আনছারদের মধ্যে হজরত আবু তালহার নিকট খেজুরের বাগান ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় বাগানের নাম ছিল বাইরাহা যাহা মসজিদে নববীর একেবারে সন্নিকটে ছিল। হুজুর (সঃ) প্রায়শঃ সেই বাগানে যাইতেন ও সেখানকার কূপ হইতে সুস্বাদু পানি পান করিতেন। উক্ত আয়াত শরীফ যখন অবতীর্ণ হয় তখন হজরত আবু তাল্‌হা (রাঃ) হুজুরের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলালাহ্! প্রিয় বস্তু দান না করিলে নেকী লাভ করা অসম্ভব তাই আমি সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বাগে বাইরাহা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিলাম। আল্লাহর দরবারে আমি উহার ছওয়াবের আশা রাখি, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে উহা ব্যয় করিতে পারেন। হুজুর (ছঃ) আনন্দ চিত্তে বলিয়া উঠিলেন লাভজনক সম্পদই বটে! আমি ভাল মনে করি উহা তুমি আপন আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও আবু তালহা বলিলেন বেশ ভাল কথা। অতঃপর তিনি উহা আপন চাচাত ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন, অন্য রেওয়ায়েতে আছে হজরত আবু তালহা বলেন, হুজুর আমার এত টাকা মূল্যের বাগান ছদকা করিলাম কিন্তু যদি সম্ভব হইত তবে সবার অগোচরেই করিতাম কিন্তু বাগানের ব্যাপার, যাহা অগোচরে করার সুযোগ নাই।

হজরত এব্‌নে ওমর (রাঃ) বলেন আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার পর

পর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি ? অবশেষে দেখিলাম আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হইল বাঁদী মারজানা। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আজাদ করিয়া দিলাম। যদিও আজাদ করার পর তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য জায়েজ ছিল কিন্তু ছদকার মধ্যে বাহ্যিক নজরে নফ্ছের কিছু দখল আসিয়া যায় নাকি এই ভয়ে তাহা ও ত্যাগ করিয়া আমার গোলাম নাফের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত এব্নে ওমর নামাজ পড়া অবস্থায় যখন উক্ত আয়াতে পৌঁছিয়া ছিলেন তখন নামাজের হালতেই ইশারায় নিজের একজন বাঁদীকে আজাদ করিয়া দেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐসব মহাপুরুষগণই প্রিয় হাবীবের ছাহাবী হইবার উপযুক্ত ছিলেন। হজরত ওমর (রাঃ) আবু মুছা আশাআরীকে লেখেন যে জলুলা হইতে একজন বাঁদী যেন খরিদ করিয়া তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দেয়। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ দাসী খরিদ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন হজরত ওমর তাহাকে নিকটে ডাকিয়া উক্ত আয়াত শরীফ পাঠ করিয়া তাহাকে আজাদ করিয়া দিলেন।

হজরত জায়েদ বিন হারেছার নিকট একটি ঘোড়া ছিল যাহা তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ছিল হুজুরের খেদমতে উহা হাজির করিয়া দিলেন ইহা আল্লাহর রাস্তায় ছদকা। হুজুর (ছঃ) কবুল করিয়া ঘোড়াটি তাহার পুত্র ওসামাকে দান করিয়া দিলেন। হজরত জায়েদ ইহাতে মনক্ষুণ্ণ হইলেও মনে মনে বলিলেন ঘরের মাল ঘরেইত রহিয়া গেল, প্রিয় নবী (ছঃ) বুঝিতে পারিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, তোমার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে, এখন সেটা আমার ইচ্ছা তোমার ছেলেকে দেই অথবা অন্য কাহাকেও দেই। ইহাতে তোমার ত কোন স্বার্থপরতা নাই। যেহেতু তুমি আমার হাওয়ালা করিয়া দিয়াছ।

হজরত আবুজর গেফারীর বদান্যতা

বনি ছোলাইম বংসের জনৈক ব্যক্তি বলেন, হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) বরজাহ নামক গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার প্রচুর উট ছিল। আমি তাঁহার সন্নিকটে কোন একস্থানে বাস করিতাম। একদিন আমি তাঁহার

খেদমতে হাজির হইয়া বলিলাম, হুজুর আমি আপনার ফয়েজ হাছেল করার জন্য আপনার খেদমতে থাকিতে চাই ইহাতে আমি আপনার বৃদ্ধ রাখালের সাহায্যও করিতে পারিব। হজরত আবু জর (রাঃ) বলিলেন আমার সহিত তো ঐ ব্যক্তি থাকিতে পারে যে আমার কথা মত চলিতে পারিবে। আমি বলিলাম হুজুর কোন্ বিষয়ে আপনার হুকুম মত চলিতে হইবে? তিনি বলিলেন আমি যখন কোন জিনিস কাহাকেও দান করিতে বলিব তখন সর্বোত্তম বস্তুই দান করিতে হইবে। আমি তাঁহার শর্ত কবুল করিয়া লইলাম (ইত্যবসারে তিনি জানিতে পারিলেন যে প্রতিবেশী লোকেরা ভীষণ অভাবের মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আমাকে উটের পাল হইতে একটা উট আনিতে নির্দেশ দিলেন। আমি সর্বোত্তম উটটি বাছাই করিয়া লইলাম। তারপর হঠাৎ চিন্তা করিলাম এই নর উটটি প্রজননের কাজে বিশেষ প্রয়োনীয়, কাজেই উহাকে ছাড়িয়া আমি দ্বিতীয় সর্বোৎকৃষ্ট একটি উট্নী তাঁহার খেদমতে পেশ করিলাম। হঠাৎ করিয়া হজরতের নজর সেই উটটির উপর পড়িয়া গেল যাহাকে আমি বিশেষ প্রয়োজনে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, হজরত আবুজর (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার সহিত ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলাম। তিনি সেই মাদা উটনীটা রাখিয়া নর উটটা লইয়া গেলেন ও উপস্থিত লোকজনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তোমাদের মধ্যে এমন দুই ব্যক্তি কেহ আছে কি যাহারা এই উট্কে জবেহ করিয়া এখানে যত ঘর রহিয়াছে তত টুক্‌রা করিয়া প্রত্যেক ঘরে এক এক টুক্‌রা এবং আমার ঘরেও সমপরিমাণ টুক্‌রা পৌঁছাইয়া দিবে। তাঁহার এই প্রস্তাব দুই ব্যক্তি কবুল করিয়া যথারীতি উট জবেহ করিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন।

জবেহ ও বণ্টনের পালা শেষ হওয়ার পর হজরত আবুজর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না যে তুমি আমার সঙ্গে কৃত ওয়াদা ভুলিয়া গিয়াছ নাকি তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার কথা অবহেলা করিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উট পেশ কর নাই। আমি আদবের সহিত আরজ করিলাম হজরত! আমি তালাশ করিয়া সর্ব প্রথম সেই উটটাই লইয়া উহাকে রাখিয়া অন্যটা পেশ করিয়াছি! তিনি বলিলেন সত্যি

সত্যিই তুমি আমার প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়া এইরূপ করিয়াছ? আমি বলিলাম জী-হাঁ সেই জন্যই করিয়াছি। হজরত আবুজর বলিলেন তোমাকে আমার প্রয়োজনের সময় বলিতেছি শুন। আমার প্রয়োজনের সময় ত হইল তখন যখন আমাকে কবরের গহ্বরে ফেলিয়া রাখা হইবে। সেই দিনই হবে আমার সব চেয়ে বেশী প্রয়োজনের দিন।

মনে রাখিবে; তোমার মালের মধ্যে তিনজন অংশীদার রহিয়াছে, প্রথম তোমার তাক্দীর, ইহা কাহারও জানা নাই যে, তাক্দীর কোন্ মূহুর্তে কার মাল চাহিয়া বসে অর্থাৎ যেই যেই মালকে আমি ভাল মনে করিয়া অনেক সময় হেফাজত করিয়া রাখি উহাই হঠাৎ করিয়া অদৃষ্টের পরিহাসে বিভিন্ন উপায়ে হাত ছাড়া হইয়া যায়, কাজেই সময় থাকিতে উহাকে এখনই কেন আমি আল্লাহর ব্যাংকে জমা করিয়া রাখিব না। ২য় অংশীদার হইল ওয়ারিশগণ তাহারা সব সময় তাক লাগিয়া রহিয়াছে যে কখন তুমি কবরের গর্তে পৌছিয়া যাইবে আর সমস্ত মাল তাহারা আপোষে বণ্টন করিয়া লইবে। তৃতীয় অংশীদার হইলে তুমি। অর্থাৎ তুমি স্বয়ং ধনসম্পদকে এখনই নিজের কাজে লাগাইতে পার। অতএব তুমি এই চেষ্টা কর যেন তিন অংশীদার হইতে তোমার অংশ কোন ক্রমেই কম না হয়। কারণ এমনওতো হইতে পারে যে অদৃষ্ট তোমার সর্বস্ব ধবংস করিয়া দিবে, অথবা ওয়ারিশগণ তোমার সব কিছু বণ্টন করিয়া নিবে, তার চেয়ে ভাল তুমি উহাকে যত শীঘ্র পার আল্লাহর সুরক্ষিত ভাণ্ডারে জমা করিয়া রাখ। তা ছাড়া পরওয়ারদেগার ফরমাইতেছেন লান্ তানালুল বের্‌রা অর্থাৎ "সবচেয়ে প্রিয় বস্তু দান না করিলে তোমরা কখনও আসল নেকী হাছেল করিতে পারিবে না" আর এই উট যখন আমার সব চেয়ে প্রিয় মাল, তখন কেন উহাকে আমি নিজের জন্য খাছ করিয়া আল্লাহর ব্যাংকে পাঠাইয়া দিব না।

আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন এক সময় প্রিয় নবীজীর খেদমত একটি জানোয়ারের কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। হুজুর (ছঃ) উহা নিজেও খাইলেন না, আর অপরকে খাইতেও নিষেধ করিলেন না। আমি বলিলাম ইহা ফকির মিস্কীনদেরকে দিয়া দিব?

হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন এমন বস্তু যা তুমি নিজে পছন্দ কর না অন্যকেও তা দিওনা।

বর্ণিত আছে হজরত এবনে ওমর (রাঃ) গুড় খরিদ করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন, খাদেম বলেন, হজরত ! গরীবের জন্য গুড়ের চেয়ে খাদ্যের প্রয়োজন বেশী; তিনি বলিলেন ঠিক বলিয়াছ আমি ও ইহা মনে করি, তবে রাববুল আলামীন বলিয়াছেন প্রিয়বস্তু দান না করিলে প্রকৃত ছওয়াব পাওয়া যায় না। যেহেতু আমি গুড় পছন্দ করি তাই গুড়ই দান করিলাম। ইহাকেই বলে মহব্বত ও প্রেমের চরম নিদর্শন, ওহ্ ! মাহবুবের জবান হইতে বাহির হওয়া কথার উপর আমল করিবার কত বড় জয্‌বা। চাই প্রকৃত পক্ষে উৎকৃষ্ট জিনিস অন্য কিছুই হউক না কেন।

(১২) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ - أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ

فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥

অর্থঃ "এবং তোমরা স্বীয় প্রভুর তরফ হইতে ক্ষমা প্রাপ্তির দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে দৌড়াইতে থাক যাহার প্রশস্ততা হইবে সপ্ত আছমান ও জমীনের সমতুল্য যাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছে এমন সব মোত্তাকীনদের জন্য যাহারা সুখে দুঃখ উভয় হালতেই আল্লাহর রাস্তায় দান খয়রাত করিয়া থাকে এবং রাগ আসিলে উহাকে হজম করিয়া লয় আর মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দেয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাক পরোপকারী লোকদেরকে ভালবাসেন"। (আল এমরান)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছাহাবাদের মধ্যে কেহ কেহ বনি ইস্রাঈলের এই কথার উপর ঈর্ষা করিয়াছিল যে, যখন তাহাদের মধ্যে কেহ পাপ করিত তখন তাহার দরওয়াজার সামনে উহা লেখা হইয়া যাইত এবং

সেই পাপের কাফ্ফারা যেমন নাক কাটা এবং কান কাটা ইত্যাদি শাস্তিও সাব্যস্থ হইয়া যাইত। ছাহাবাদের অন্তরে পাপের ভয় এত অধিক ছিল যে আখেরাতে শাস্তি ভোগ করার মোকাবেলায় ঐ সব গুরুতর শাস্তি সমূহকেও তাহারা হাল্কা মনে করিতেন। হাদীছের কিতাবে এরূপ অসংখ্য ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। পুরুষ ত পুরুষ মেয়েরা পর্য্যন্ত পাপ করিয়া আল্লাহর আজাব হইতে রক্ষা পাওয়ার আশায় হুজুরের দরবারে আসিয়া স্বেচ্ছায় ধর্ণা দিয়া শাস্তি ভোগ করিতে আবেদন করিতেন। জনৈকা মহিলার ঘটনা, ঘটনাচক্রে শয়তানের ধোকায় তিনি জিনায় লিপ্ত হইয়া পড়েন। গুনাহ হইতে পবিত্র হইবার নেশায় প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইয়া তাহাকে শরীয়তের বিধান মোতাবেক পাথর মারিয়া ছঙ্গেছার করিবার দরখাস্ত করেন। তাঁহাকে ছঙ্গেছার করা হইল। কী আশ্চর্য্যজনক ছিল উক্ত মহাপুরুষদের তওবা। গুনার বোঝা নিয়া আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার চেয়ে প্রস্তর নিক্ষেপে নিষ্পেসিত হওয়া তাহাদের নিকট অধিকতর সহজ ছিল। রাজিয়াল্লাহু আনহুম।

নামাজ পড়ার সময় হজরত আবু (রাঃ) তালহার অন্তরে স্বীয় বাগানের খেয়াল আসার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে ছদকা করিয়া দেন শুধু এই অভিমানে যে নামাজের মধ্যে দুনিয়ার খেয়াল কেন আসিল তাকে আর কিছুতেই নিজের করিয়া রাখা যায় না। অন্য এক ছাহাবী নামাজ পড়িতেছিলেন। খেজুর পাকার পুরা মৌছম তখন, পাকা খেজুরওয়ালা চমৎকার বাগানের দৃশ্য অন্তরে আসা মাত্রই নামাজান্তে হজরত ওছমানের খেদমতে হাজির হইয়া পুরা ঘটনা বর্ণনা করিয়া উহাকে আল্লাহর রাস্তায় ছদকা করিয়া দিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) উক্ত বাগান পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রী করিয়া দ্বীনের কাজে লাগাইয়া দেন। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ভুলবশতঃ সন্দেহজনক কিছু জিনিস খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণ পানি পান করিয়া এই ভয়ে বমি করিয়া ফেলেন যে, কি জানি সেই লোক্‌মা শরীরের অংশ বনিয়া যায় নাকি। এই প্রকার অনেক ঘটনাবলী হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এইসব ভয়-ভীতি যাঁহাদের অন্তরে তাঁহারা যদি বনি ইস্রাঈলের মত দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করিয়া পাপমুক্ত হইয়া যাওয়ার আকাংখা করে তবে তা কিছুতেই অযৌক্তিক নহে। হাঁ আমাদের মত অপদার্থদের অন্তরে

কল্পনাও আসে না যে গুনাহ কত বড় কঠিন বস্তু। প্রিয় ছাহাবায়ে কেরামদের এইরূপ উৎকণ্ঠার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বীয় মাহবুবের উম্মতের জন্য উক্ত আয়াত নাজেল করিয়া মুক্তির নোছ্‌খা বাত্‌লাইয়া দিলেন যে, নেক কাজ করিয়া ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়া যায়। বনি ইস্রাঈলের মত শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।

হজরত এব্‌নে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, সপ্ত আছমান ও জমীনকে পাশাপাশি রাখিয়া জোড়া দিয়া দিলে যতটুকু হইবে বেহেশতের পরিধি হইল ততটুকু। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) তাঁহার গোলাম কোরায়েবকে জনৈক ইহুদী পণ্ডিতের নিকট বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। সে হজরত মুছা (আঃ) এর ছহীফা সমুহ দেখিয়া বলিয়া দিলেন যে সপ্ত আকাশ ও জমীনের সমতুল্য হইল বেহেশতের পাশ আর লম্বা কতটুকু একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন হে লোক সকল! এইরূপ জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও যাহার পাশ হইল জমীন ও আসমান সমতুল্য। হজরত ওমায়ের বিন হামাম (রাঃ) আনছারী তাজ্জব হইয়া আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌! বেহেশতের পাশই কি এত অধিক হইবে? হুজুর (ছঃ) বলিলেন নিশ্চয়। হজরত ওমায়ের বলিলেন সাবাস সাবাস হুজুর। আমি সে বেহেশতে নিশ্চয় প্রবেশ করিব। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন হাঁ হাঁ নিশ্চয় তুমি সেই জান্নাতের অধিবাসী হইবে৷ তারপর হজরত ওমায়ের (রাঃ) পুট্‌লী হইতে কিছু খেজুর বাহির করিয়া যুদ্ধে শক্তি লাভের জন্য খাইতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর বলিয়া উঠিলেন এই সব খেজুর খাইতে খাইতে ত অনেক দেরী হইয়া যাইবে। এই বলিয়া ঐগুলি ছুঁড়িয়া মারিয়া রণ ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

উক্ত আয়াত শরীফে মোমেনদের আর একটি বিশেষ প্রশংসা এই করা হইয়াছে-তাহারা রাগ আসিলে উহাকে সংবরণ করিয়া লয় এবং কেহ অপরাধ করিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। ওলামারা লিখিয়াছেন তোমার ভাই যদি কোন অপরাধ করিয়া বসে তবে তাহাকে ক্ষমা করার নিয়তে সত্তরটা ওজর দাঁড় করাইয়া লও, তবু ও যদি তোমার মনে প্রবোধ না পায় তবে মনকে এই বলিয়া শাসাও যে তুমি কত নির্দয়, তোমার ভাই

স্বীয় দোষের জন্য সত্তর প্রকার ওজর পেশ করিতেছে, অথচ তুমি তাহা কবুল করিতেছ না। কেননা প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন কাহারও নিকট ওজর পেশ করিলে সে যদি উহা কবুল না করে তবে তার গুনাহের পরিমাণ হইবে অবৈধ ভাবে শুল্ক উসুলকারীর গুনাহের সমান। হুজুর (ছঃ) মোমেনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন যে, হঠাৎ রাগ আসে আবার তৎক্ষণাৎ রাগ থামিয়া যায়। রাগ একেবারে না আসাকে মহৎগুণ বলা হয় নাই। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন রাগের স্থলে রাগ না করিলে সে হইল শয়তান, এই কারণেই আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, যে রাগকে হজম করিয়া লয়, এই কথা বলেন নাই যে, যার রাগই আসে না। প্রিয়নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি রাগ করিয়া প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ নেয় না, আল্লাহ পাক তাহাকে ঈমান-আমানের দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া দেন। অর্থাৎ মজবুরী অবস্থায় ত প্রতি ক্ষেত্রেই ছবর হইয়া যায়, প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ না নেওয়ার নামই হইল ছবর। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে, মানুষ রাগের পেয়ালা পান করিয়া লয় এর চেয়ে পান করার জন্য উত্তম বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। তিনি উহা দ্বারা অন্তরকে ঈমানের দ্বারা ভর্তি করিয়া দেন। অন্য হাদীছে আছে যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্বে ও রাগ হজম করিয়া লইল কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে আল্লাহ পাক তাহাকে ডাকিয়া বলিবেন তোমার পছন্দ সই যে কোন একটি হুর নির্বাচন করিয়া লইয়া যাও। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন বীর পুরুষ ঐ ব্যক্তি নয় যে অন্যকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে রাগের মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিতে সক্ষম।

হজরত আলী এবনে হোছায়নের (রাঃ) এক বান্দী তাঁহাকে অজু করা [illegible]তেছিলেন, হঠাৎ বাঁদীর [illegible] হইতে লোটা পড়িয়া তাঁহার চেহারা জখমি হইয়া যায়। তিনি [illegible] বাঁদীর প্রতি [illegible] দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বাঁদী বলিয়া উঠি[illegible] [illegible]ল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন "যাহারা রাগের সময় আত্মসংবরণ করে"। হজরত আলী বলিলেন আমি রাগ হজম করিয়া [illegible]লিলাম। বাঁদী আবার বলিল "যাহারা মানুষকে ক্ষমা করিয়া দেয়" হজরত আলী বলেন আল্লাহ তোমার ত্রুটি মার্জনা করুন। বাঁদী পুনরায় বলিয়া উঠিল "আল্লাহ দয়াবানদের ভালবাসেন" হজরত আলী উত্তরে বলিলেন যাও তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম। অন্য এক সময় তাঁহার

গোলাম মেহমানের জন্য পেয়ালা ভর্তি গরম রুটি আনিতেছে হঠাৎ পেয়ালা তাঁহার ছোট ছেলের মাথায় পড়িল। ছেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল; হজরত আলী তৎক্ষণাৎ গোলামকে বলিলেন তুমি আজাদ. অতঃপর স্বয়ং আপন ছেলের কাফন দাফনে লাগিয়া গেলেন।

প্রকৃত ঈমানদারের নিদর্শন

(১৩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا - لَهُمْ
دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ انفال

অর্থঃ নিশ্চয় মোমেন ঐসব লোক যাহাদের নিকট আল্লাহর নাম জিকির করা হইলে তাহাদের অন্তর ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠে। এবং তাহাদের নিকট আল্লাহর আয়াত সমূহ তেলাওয়াত করা হইলে উহা তাহাদের ঈমানকে বর্ধিত করিয়া দেয় আর তাহারা আপন প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করিয়া থাকে। তাহারা নামাজ কায়েম করিয়া থাকে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে খরচ করিয়া থাকে। তাহারাই প্রকৃত মোমেন। তাহাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুউচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমা এবং সম্মানিত রিজিকের ব্যবস্থা রহিয়াছে। (আনফাল)

হজরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন অন্তর ভীত সন্ত্রস্থ হওয়া এইরূপ যেমন খেজুরের শুকনা পাতায় আগুন লাগিয়া যাওয়া। তারপর তিনি স্বীয় সাগরেদ শাহর বিন হাওশাবকে জিজ্ঞাসা করেন তুমি কি শরীরের কম্পন বুঝিতে পার? শাহর বলেন হাঁ আমি বুঝিতে পারি। তিনি বলেন সেই সময় দোয়া করিবে, কারণ তখন দোয়া কবুল হওয়ার সময়। হজরত ছাবেত বানানী (রঃ) বলেন জনৈক বুজুর্গ বলিতেছেন আমার কোন্ কোন্ দোয়া কবুল হয় তা আমি বুঝিতে পারি। লোকে বলিল হুজুর

তা কি করিয়া পারেন, তিনি বলেন আমার শরীরে যখন কম্পন আসিয়া যায়, অন্তরে ভয় ভীতির সঞ্চার হয়, এবং চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। তখনকার দোয়া কবুল হয়।

হজরত ছুদ্দী (রঃ) বলেন যখন তাহাদের সম্মুখে আল্লাহর জিকির আসিয়া যায় ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন ব্যাক্তি যদি কাহার ও উপর জুলুম করার ইচ্ছা করে বা অন্য কোন গুনাহের এরাদা করে এমতাবস্থায় যদি কেহ তাহাকে বলে যে তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া যায়।· হারেছ বিন মালেক (রঃ) নামক জনৈক অনছারী ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন হারেছ তোমার অবস্থা কি ? তিনি আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি একজন সাচ্চা মোমেন। দয়ার নবী এরশাদ ফরমাইলেন দেখ কি বলিতেছ চিন্তা করিয়া বল। প্রত্যেক বস্তুর একটা হাকীকত রহিয়াছে, তোমার ঈমানের হাকীকত কি, তুমি ফয়ছালা করিয়া নিলে যে তুমি একজন সাচ্চা মোমেন ? হারেছ বলিলেন, আমি স্বীয় নছফকে দুনিয়ার মোহ হইতে ফিরাইয়া লইয়াছি। রাত্রি বেলায় জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর এবাদত করি আর দিনের বেলায় রোজা রাখি, বেহেশতীদের পরস্পর মেলামেশা আমার চোখের সামনে ভাসিতেছে। দোজখীদের শোরগোল আর দুঃখ দুর্দশার দৃশ্য সর্বদা বিদ্যমান। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন হারেছ নিশ্চয় তুমি দুনিয়া হইতে মুখ ফিরাইয়াছ। ইহাকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। হুজুর (ছঃ) এই কথা তিনবার ফরমাইলেন। প্রকৃত পক্ষে যার সামনে সর্বদা বেহেশ্‌ত ও দোজখের দৃশ্য ভাসমান থাকে সে দুনিয়াতে কি করিয়া লিপ্ত হইতে পারে ?

(১৪) وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ○ انفال

অর্থঃ "এবং তোমরা যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিবে উহার প্রতিদান তোমাদিগকে পুরাপুরি দেওয়া হইবে। আর তোমাদের উপর কোন প্রকার জুলুম করা হইবে না"।

যেই সমস্ত আয়াত এবং হাদীছে ছাওয়াব বাড়াইয়া দেওয়া হইবে বর্ণিত হইয়াছে এই আয়াত উহাদের বিপরীত নয়। ইহার অর্থ হইল কাহার ও নেক কাজের ছওয়াব কম করা হইবে না। তবে ছওয়াবের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইবে স্থান, দাতার নিয়ত ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। ইহা ত আখেরাতের ছওয়াব সম্বন্ধে বলা হইল, অনেক সময় দুনিয়াতে ও পুরাপুরা বদলা মিলিয়া যায়। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা ২ নং আয়াতে ও ৮ নং হাদীছে আসিতেছে।

(১৫) قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ ٥

অর্থঃ আপনি আমার ঐ সমস্ত খালেছ বান্দাদেরকে বলিয়া দিন যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিকসমূহ হইতে প্রকাশ্যে এবং গোপনে এমন দিন আসার পূর্বেই যেন দান করে যে দিন কোন প্রকার কেনাকাটা ও বন্ধুত্ব কাজে আসিবে না"।

অর্থাৎ যখন যেই প্রকারের ছদকা প্রকাশ্যে হউক বা গোপনে তখন সেই প্রকারই দান করিতে হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) বলেন একবার প্রিয় নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে ফরমাইলেন যে, হে লোক সকল! তোমরা মৃত্যুর আগে আগেই তওবা করিয়া লও। এমন যেন না হয় যে, মৃত্যু আসিয়া যাইবে অথচ তওবা থাকিয়া যাইবে। আর বিভিন্ন ঝামেলায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। কারণ হয়ত ঝামেলায় লিপ্ত হইলে নেক কাজ করার আর সুযোগ থাকিবে না। আর বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করিয়া লও! এবং গোপনেও প্রকাশ্যে ছদকা করিয়া লও, যেহেতু উহা দ্বারা তোমাদের রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে তোমাদের সাহায্য করা হইবে, এবং তোমাদের দুরাবস্থা দুর হইয়া যাইবে।

(১৬) وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا اَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ حج

অর্থঃ আপনি ঐ সমস্ত বিনয়ী মুছলমানদিগকে সুখবর দিয়া দিন যাহাদের নিকট আল্লাহর জিকির করা মাত্রই তাহাদের অন্তর ভয়ে ভীত হইয়া যায়, আর তাহাদের উপর কোন মছিবত আসিয়া পৌঁছিলে তাহারা উহার উপর ছবর করিয়া থাকে, এবং তাহারা নামাজ কায়েম করে ও আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা ছদকা করিয়া থাকে।

উল্লেখিত আয়াতে "মোখবেতীন" শব্দের কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে, কেহ বলিয়াছেন যাহারা আল্লাহর হুকুম আহকামের সামনে মাথা নত করিয়া দেয়। কেহ বলিয়াছেন বিনয়ী, হজরত মুজাহেদ বলিয়াছেন অবিচলিত ও প্রশান্ত অন্তরওয়ালা, আমর বিন আওছ (রাঃ) বলেন যাহারা অন্যের উপর জুলুম করে না, তাহাদের উপর কেহ জুলুম করিলেও উহার প্রতিশোধ নেয় না। যহাক (রাঃ) বলেন বিনয়ী, এব্নে মাছউদ যখন হজরত রবি বিন খায়ছামকে দেখিতেন, বলিতেন তোমাকে দেখিলে আমার মোখবেতীন স্মরণ পড়ে।

(১৭) وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ يُسٰرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَهُمْ لَهَا سٰبِقُوْنَ ○ مؤمنون

অর্থঃ "আর যাহারা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া থাকে, দান করা সত্ত্বেও তাহাদের অন্তর কম্পিত থাকে এই ভয়ে যে, তাহাদিগকে আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, তাহারা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করে ও তাহার দিকে অগ্রসর হয়।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াও এই জন্য ভীত

হইয়া পড়ে যে, আল্লাহ পাক উহাকে কবুল করিলেন কি না করিলেন। যে যত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী তার অন্তরে আল্লাহর ভয়ও তত বেশী হইয়া থাকে। তদুপরি এই জন্য ও ভয় হইয়া থাকে যে আমাদের নিয়তের মধ্যে কতটুকু এখলাছ রহিয়াছে তাহা জানা নাই। কারণ অনেক সময় মানুষ নফছ ও শয়তানের ধোকায় কোন কাজকে নেকী মনে করিয়া করে অথচ প্রকৃত পক্ষে উহা নেকী নয়। ছুরায়ে কাহফের শেষ রুকুতে আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

"আপনি বলিয়া দিন হে মোহাম্মদ (ছঃ)! আমি তোমাদিগকে এমন লোকের সন্ধান বাত্‌লাইয়া দিব কি যাহারা আমল হিসাবে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ অর্থাৎ যাহাদের পার্থিব দুনিয়ার যাবতীয় নেক আমল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে অথচ তাহারা মনে করিত যে আমরা নেক কাজই করিতেছি।"

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন—মোমেন নেক কাজ করিয়াও ভয় পাইতে থাকে, আর মোনাফেক অন্যায় কাজ করিয়াও নির্ভীক থাকে। যেমন ফাজায়েলে হজ্বের মধ্যে এইরূপ অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে যে, যাহাদের অন্তরে আল্লাহর আজমত এবং বুজুর্গীর অনুভূতি রহিয়াছে তাহারা লাব্বায়েক বলিতে ভীত হইয়া যায় এই ভয়ে যে আমার হাজেরী আল্লাহ পাক কবুল করিলেন কি না করিলেন। আম্মাজন আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ্‌! و الذين يؤتون এই আয়াত কি ঐসব লোকের শানে নাজেল হইয়াছে যাহারা চুরি করে, জিনা করে, এবং অন্যান্য পাপ করিয়া আল্লাহর দরবারে কি ভাবে হাজির হইবে বা মুখ দেখাইবে ইহার ভয় পায়? হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, না; বরং যাহারা নামাজ রোজা ছদকা খয়রাত করিয়াও ভয় পায় যে উহা মাওলার দরবারে কবুল হইল কি না? হজরত এবনে আব্বাছ, ছায়ীদ বিন জোবায়ের, হাছান বছরী (রাঃ) প্রমুখ বুজুর্গান বলেন আয়াতের উদ্দেশ্য হইল যাহারা নেক কাজ করিয়াও হিসাব কিতাবের ভয়ে কম্পিত থাকে।

হজরত জয়নুল আবেদীন যখন অজু করিতেন চেহারার রং হলুদ বর্ণ হইয়া যাইত, আর যখন নামাজে দাঁড়াইতেন শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত, কেহ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন তোমাদের কি জানা আছে যে আমি কার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছি? ফাজায়েলে নামাজ

এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

(১৮) وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

অর্থঃ "এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা বুজুর্গ ও সম্পদশালী তাহার আত্মীয় স্বজন, গরীব এবং আল্লাহর ওয়াস্তে হিজরতকারীদিগকে দান খয়রাত না করার ব্যাপারে যেন কছম না খাইয়া বসে, বরং তাহাদের অপরাধীগণকে ক্ষমা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ পাক মহান ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

কোরআনে পাকে মা আয়েশার (রাঃ) পবিত্রতা ঘোষণা

ষষ্ঠ হিজরীতে গাজওয়ায়ে বনি মোস্তালেক নামীয় একটা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে নবীয়ে করীম (ছঃ) এর সহিত হজরত আয়েশা (রাঃ) ও শরীক ছিলেন। হজরত মা আয়েশার উট ছিল-পৃথক, তাহার উপর হাওদাজ লাগানো ছিল। তিনি তাঁহার হাওদাজেই অবস্থান করিতেন। যাত্রা কালে কয়েকজন লোক সেই হাওদাজকে উটের পিঠে উঠাইয়া দিত। যেহেতু তিনি অল্পবয়স্কা এবং খুব হাল্‌কা পাত্‌লা ছিলেন তাই চারজনে মিলিয়া হাওদাজ উঠাইবার সময় টের ও পাইত না যে উহার মধ্যে কেহ আছে কি নাই। অভ্যাস মোতাবেক কোন একস্থানে কাফেলা বিশ্রাম গ্রহণ পূর্বক পুনরায় যাত্রা শুরু করিলে কয়েকজন লোক হজরত আয়েশার হাওদাজ উটের পিঠে উঠাইয়া বাঁধিয়া দিল, ঘটনা ক্রমে মা আয়েশা (রাঃ) তখন খানিকটা দুরে এস্তেঞ্জা করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ গলায় হার না দেখিয়া উহার তালাশে আবার চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে কাফেলা রওনা হইয়া গেল। তিনি এই উন্মুক্ত মরু প্রান্তরে একাই রহিয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিলেন পথিমধ্যে আমার না থাকার বিষয় যখন হুজুর (ছঃ) জানিতে পারিবেন তখন কাহাকেও নিশ্চয় আমার সন্ধানে পাঠাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি সেখানে বসিয়া গেলেন ও

ঘুমাইয়া পড়িলেন। ভাবিলে আশ্চার্য্য লাগে আল্লাহ পাক নেক আমলের বরকতে তাঁহাদিগকে কত প্রশান্ত অন্তর দান করিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুমাত্র ও বিচলিত হইলেন না। এই যুগের নারী হইলে সে নির্জন প্রান্তরে ঘুমানতো দুরের কথা কান্নাকাটি করিয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিত।

হজরত ছফওয়ান বিন মোয়াত্তাল নামক ছাহাবীকে এই জন্য নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল যে; কাফেলা কোন জিনিস ফেলিয়া গেলে তিনি তাহা কুড়াইয়া নিবেন, তিনি ভোর বেলা ঐ স্থানে পৌছিয়া একজন লোককে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সজোরে ইন্নালিল্লাহ পড়িয়া উঠিলেন, যেহেতু পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি মা আয়েশাকে দেখিয়াছিলেন তাই তাঁহাকে মুহূর্তেই চিনিয়া ফেলিলেন। ছফওয়ানের আওয়াজ শুনিয়া আম্মাজানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। হজরত ছফওয়ান উটের রজ্জু ধরিয়া টানিয়া চলিল। ও কাফেলার মধ্যে পৌছাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সারা মদিনায় এক অশুভ কথার ঝড় বহিয়া গেল। আবদুল্লাহ বিন্ উবাই মোনাফেকদের নেতা ও মুছলমানদের চরম শত্রু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া মা আয়েশা ও হজরত ছফওয়ানের নামে এক জঘন্য কুৎসা রটাইতে আরম্ভ করিল। এই মিথ্যা অপবাদে কয়েকজন সরল প্রাণ মুছলমানও যোগ দিল, দীর্ঘ একমাস যাবত ইহাই একমাত্র আলোচ্য বস্তুতে পরিণত হইল। রাছুলুল্লাহ (ছঃ) ও মোমেনগণ দারুণ ভাবে মর্মাহত হইয়া পড়িলেন। হুজুর (ছঃ) নারী পুরুষ সকলের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই মানষিক শান্তি আসিতেছিল না।

দীর্ঘ একমাস পর মা আয়েশার পবিত্রতা ঘোষনা করিয়া ছুরায়ে নূরের পুরা একটা রুকু নাজেল হইল। এবং যাহারা বিনা প্রমাণে কুৎসা রটনা করিয়া থাকে তাহাদের প্রতি আল্লাহ পাক কঠোর ভাষায় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেন। মেছতাহ্ নামক জনৈক ছাহাবী এই কাজে জঘন্য ভাবে অংশ গ্রহণ করেন অথচ তিনি হজরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) হইতে নিয়মিত ভাতা পাইতেন ও তাঁহার নিকটাত্মীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা ও ছরকারে দোজাহানের পাক পবিত্র বিবির বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদে অংশ গ্রহণ করায় হজরত ছিদ্দীকে আকবার (রাঃ) রাগে ও ক্ষোভে কছম খাইয়া বসেন যে তিনি আর মেছতাহ্‌কে সাহায্য করিবেন

না। ইহার উপরেই উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় আরও কয়েক জন ছাহাবী এই অপবাদে অংশ গ্রহণ কারী লোকদের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আব্বাজান হজরত মেছতার সাহায্য দ্বিগুণ করিয়া দেন।

তাহাজ্জুদ নামাজের ফজীলত।

(১৯) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥

অর্থঃ "রাত্রি বেলায় তাঁহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা হইতে পৃথক হইয়া যায়। তাহারা আপন প্রভুকে ভয় এবং আশার মধ্যে ডাকিতে থাকে। আর আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান ছদকাও করিয়া থাকে। সুতরাং কোন মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না যে তাহাদের জন্য অদৃশ্য জগতে চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক কত সব বস্তুর ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছে এই সব শুভ পরিণাম একমাত্র তাহাদের নেক আমলের বরকতেই করা হইয়াছে।"

ফায়েদাঃ 'রাত্রি বেলায় তাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের শয্যা ত্যাগ করে" মোফাচ্ছেরীনগণ এই আয়াতের দুইটি অর্থ করিয়াছেন। প্রথমতঃ উহার অর্থ হইল মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়। হজরত আনাছ বলেন এই আয়াত আমাদের আনছারদের শানে নাজেল হইয়াছে, কারণ আমরা মাগরিবের পর হুজুর (ছঃ) এর সাথে এশা না পড়িয়া ঘরে ফিরিতাম না। অন্য হাদীছে হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, ইহা মোহাজেরদের এক জামাতের শানে নাজেল হইয়াছে কারণ তাঁহারা মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত নফলে কাটাইয়া দিতেন। হজরত বেলাল এবং আবদুল্লাহ বিন ঈছা হইতেও এইরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আয়াতের উদ্দেশ্য তাহাজ্জুদের নামাজ। হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলেন,

প্রিয় নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন উহার উদ্দেশ্য হইল রাত্রি বেলার নামাজ। মোজাহেদ (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) রাত্রি জাগরনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন ও হুজুরের চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল, তার পর হুজুর এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) বলেন, তৌরীত কিতাবে লিখিত আছে যাহাদের জন্য পরওয়ারদেগারে আলম এমন সব সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন লোকের অন্তরে উহার কল্পনাও পয়দা হয় নাই, না কোন নিকটবর্তী ফেরেশ্‌তা উহা জানে, না কোন নবী রাছুল উহার খবর রাখে। আয়াত শরীফে উহাই বর্ণিত হইয়াছে। রওজুর রাইয়াহীন ইত্যাদি গ্রন্থে শত শত ঘটনা এমন সব বুজুর্গানের উল্লেখ আছে যাহারা সারা রাত্রি মাওলার স্মরনে কান্নাকাটি করিয়া কাটাইয়া দিতেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) চল্লিশ বৎসর যাবত এশার অজু দ্বারা ফজর পড়ার রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রমজান মাসে প্রতি দিবা রাত্রির মধ্যে নাকি তিনি কোরান শরীফ দুই খতম করিতেন। হজরত ওছমান (রাঃ) সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া একই রাকাতে পুরা কোরান শরীফ পাঠ করিতেন। হজরত ওমর (রাঃ) অনেক সময় এশার নামাজ পড়িয়া ঘরে গিয়া নফলে দাঁড়াইয়া ফজর করিয়া দিতেন। বিখ্যাত ছাহাবী তামীমে দারী (রাঃ) কোন সময় এক রাকাতে পুরা কোরান পড়িতেন আবার কোন সময় একটি আয়াত রাতভর পড়িতে থাকিতেন। হজরত শাদ্দাদ বিন আওছ (রাঃ) বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন অবশেষে এই বলিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন যে হে খোদা! জাহান্নামের ভয় আমার নিদ্রাকে উড়াইয়া দিয়াছে, অতঃপর ফজর পর্য্যন্ত নামাজে লিপ্ত থাকিতেন। হজরত ওমায়ের (রাঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নফল ও একলক্ষ বার তাছবীহ পাঠ করিতেন। বিখ্যাত তাবেয়ী ওয়েছ করনী (রাঃ) স্বয়ং হুজুর (ছঃ) যাহার প্রশংসা করিতেন এবং যাহার নিকট হইতে দোয়া নিবার জন্য লোকদিগকে উৎসাহ দিতেন, তিনি বলিতেন অদ্য রুকু করার রাত্রি অতএব সারা রাত্রি রুকুতে কাটাইয়া

দিতেন। আবার কোন রাত্রে বলিতেন অদ্য ছেজদা করিবার রাত্রি, তাই সারারাত ছেজদায় কাটাইয়া দিতেন। আল্লাহর ঐ সব বান্দারা সারা রাত মালিকের স্মরণে ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়া দিতেন। কবির ভাষায়—

"আমাদের কাজই হইল সারা রাত্রি মাহবুবের স্মরণে কাটাইয়া দেওয়া, আর আমাদের নিদ্রা হইল বন্ধুর স্মরণে বিভোর হইয়া যাওয়া।

হায়! তাঁহাদের জয্‌বা ও উৎকণ্ঠার সামান্যতম অংশ ও যদি এই নাপাক অধমকে দান করা হইত।

(২০) قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَیَقْدِرُ لَهٗ وَمَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَیْرُ الرّٰزِقِیْنَ

অর্থঃ আপনি বলিয়া দিন আমার প্রভু আপন বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা রিজিকের প্রশস্ততা দিয়া দেন। আর যাকে ইচ্ছা অভাব গ্রস্থ বানাইয়া দেন, এবং তোমরা যাহা খরচ কর তিনি উহার প্রতিদান দিবেন, বস্তুতঃ তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ রিজিক দাতা। (ছাবা)

অর্থাৎ-সম্পদ এবং দরিদ্রতা আল্লাহর তরফ হইতে আসে। কার্পণ্য ধন সম্পদ বাড়ায় না বা অধিক দান করিলে দারিদ্র আসে না বরং আল্লাহর রাস্তায় দান করিলে উহার প্রতিদান আখেরাতে ত পাইবেই অনেক সময় দুনিয়াতে ও পাওয়া যায়। একটি হাদিছে আসিয়াছে হজরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহ্‌পাকের এরশাদ বর্ণনা করিতেছেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি স্বীয় মেহেরবানীতে তোমাদিগকে দান করিয়াছি এবং তোমাদের কাছে কর্জ চাহিয়াছি, সুতরাং যে সন্তুষ্ট চিত্তে দান করিবে আমি দুনিয়াতেও তাহাকে প্রতিদান দিব, পরন্তু আখেরাতে তার জন্য ভাণ্ডার ভরিয়া রাখিব। আর যে খুশী খুশী দান করিবে না বরং আমার দেওয়া ধন আমি ছিনাইয়া লই, তখন সে যদি ধৈর্য ধারণ করে ও ছওয়াবের আশা রাখে তার জন্য আমার রহমত অবশ্যম্ভাবী, তার নাম

হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে লিখিব আর আমার দীদার তার জন্য সহজ করিয়া দিব। অল্লাহ পাকের রহমতের কোন সীমারেখা নাই, স্বেচ্ছায় না দিলে জবরদস্তি কাড়িয়া নেওয়া হইলেও যদি ছবর করে তবুও উহার উপর প্রতিদান রাখিয়াছেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবীয়ে করিম (ছঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমরা অপব্যয় ও কৃপনতা না করিয়া যাহা তোমাদের পরিবার পরিজনের জন্য খরচ কর উহাই আল্লাহর রাস্তায় গণ্য হইবে। হজরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত, প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, মানুষ শরীয়ত সম্মত যাহাই ব্যয় করে আল্লাহর দরবারে উহার প্রতিদান সুনিশ্চিত, হাঁ অট্টালিকা নির্মাণে বা পাপের কাজে ব্যয় করিলে উহার প্রতিদান নাই। তিনি আরও এরশাদ করেন পরোপকার ছদকা, মানুষ নিজের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য, নিজ মান ইজ্জত রক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করে সবই ছদকা। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হুজুরে পাক (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণনা করেন—প্রতি দিন দুইজন ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, একজন বলেন হে খোদা! যে ব্যক্তি ছহি তরীকায় ব্যয় করে তাহাকে প্রতিদান দাও। অপরজন বলে হে খোদা! যে সম্পদ আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহার মাল ধ্বংস করিয়া দাও।

ইহা পরীক্ষিত সত্য যে, যাহারা অকাতরে ছাখাওয়াত বা দান করে আল্লাহর দানের দরওয়াজা তাহাদের জন্য খোলা হইয়া যায় আর যাহারা বখিলি করিয়া শুধু জমা করিতে থাকে আসমানী বালা, রোগ ব্যধি, মামলা মোকদ্দমা ও চুরি ইত্যাদিতে তাহাদের কয়েক বৎসরের সঞ্চিত ধন সম্পদ নিমেষে শেষ হইয়া যায়। আর যদি কাহার ও অনেক আমল বা নেক নিয়তির বরকতে আকস্মিক কোন বিপদ আসিয়া তাহার সম্পদ নষ্ট নাও করিয়া ফেলে তবু কিন্তু তাহার অথর্ব উত্তরাধীকারীরা পিতার সারা জীবনের ধনরাশী কয়েক মাসের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

হজরত আছমা (রাঃ) কে প্রিয়নবী (ছঃ) অছিয়ত করেন, হে আছমা! খুব খরচ কর, গুনিয়া গুনিয়া দান করিও না তবে আল্লাহ পাকও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দান করিবেন, এবং জমা করিয়া রাখিও না

তা হইলে তিনিও তোমার দান করাকে স্থগিত করিয়া দিবেন। তোমার সাধ্যমত দান করিতে থাক। একবার হুজুর (ছঃ) হজরত বেলালের ঘরে তাশরীফ নিয়া দেখিলেন তথায় খেজুরের স্তুপ পড়িয়া আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল ইহা কি? তিনি বলিলেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনের জন্য রাখিয়াছি। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন তুমি কি ভয় কর না যে, ইহার ধুঁয়া দোজখের আগুনে দেখিবে। বেলাল! বেশী করিয়া খরচ কর, আরশের মালিকের পক্ষ হইতে কম হওয়ার আশংকা করিও না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই হাদীছে আগাম জরুরতের জন্য সঞ্চয় করার উপরও নারাজী ও দোজখের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, অবশ্য ইহা হজরত বেলালের মত উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের বেলায় প্রযোজ্য, সাধারণ লোকদের জন্য নহে। ইহাকেই বলা হয় 'হাছানাতুল আবরারে ছায়্যেয়াতুল মোকাররাবীন" অর্থাৎ সাধারণ নেক বান্দাদের জন্য যাহা ছওয়াবের কাজ, আল্লাহর মাকবুল বান্দাদের জন্য উহাও দোষণীয়। যাহা হউক মাল জমা করার বস্তু নহে, উহার সৃষ্টিই হইল খরচ করার জন্য, নিজের উপর হউক বা অপরের উপর, নেক নিয়তে মাল আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করার শুভ পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, আর যেখানে বদনিয়ত, লোক দেখানো, বা দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য ব্যয় করা হয় সেখানে নেকী বরবাদ গোনাহ লাজেম, বরকতের ত প্রশ্নই নাই।

(২১) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ○

অর্থঃ "নিশ্চয় যাহারা কোরান তেলাওয়াত করে ও নামাজ কায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে

দান খয়রাত করে তাহারা এমন ব্যবসায়ের আশা করিতে পারে যাহার কোন ঘাট্‌তি নাই। ইহা এইজন্য যে আল্লাহ পাক তোমাদের বদলা পুরা পুরা দান করিবেন এবং স্বীয় মেহেরবানীর দ্বারা তাহাদিগকে আর ও অধিকতর দান করিবেন নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও কাজের মর্যাদা দানকারী।"

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন ঘাট্‌তিমুক্ত ব্যবসায়ের অর্থ হইল জান্নাত। যাহা ধ্বংসও হইবে না বিকৃতও হইবে না। "স্বীয় মেহেরবাণীতে আর ও অধিকতর দান করিবেন" মোফাচ্ছেরীনগণ ইহার অনেক ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে উঁচু বস্তু হইল আল্লাহর রেজামন্দীর ঘোষণা এবং বারংবার আল্লাহর দীদার নছীব হওয়া। এত বড় দৌলত কত সহজ পন্থায় লাভ করা যায়। বেশী বেশী ছদকা খয়রাত করিলে, নিয়মিত নামাজ আদায় করিলে ও বেশী বেশী তেলাওয়াত করিলে। এইসব আমল দুনিয়াতেও অপূর্ব লজ্জতের সামগ্রী। এ সম্পর্কে কতিপয় ঘটনা ফাজায়েলে কোরান নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হইয়াছে।

(২২) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ
اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

অর্থঃ "যাহারা আপন প্রভুর হুকুম মান্য করিয়াছে ও নামাজ কায়েম করিয়াছে আর তাহাদের যাবতীয় গুরুত্ব পূর্ণ কাজ আপোষ পরামর্শের সহিত হইয়া থাকে এবং আমার প্রদত্ত রিজিক হইতে তাহারা দান খয়রাত করে" (তাহাদের জন্য খোদার দরবারে যেই সব সামগ্রীর ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা দুনিয়ার নাজ নেয়ামত হইতে সহস্র গুণে উত্তম)।

এই আয়াতে খোলাফায়ে রাশেদীন বরং হযরত হাছান হোছায়েন পর্যন্ত সকলের বিশেষ বিশেষ আখলাক ও চরিত্রের প্রতি ধারাবাহিক ভাবে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। যদিও ইশারায় ইঙ্গিতে খোলাফাদের জন্য সংরক্ষিত নেয়ামতের বর্ণনা রহিয়াছে তবুও ঐ সমস্ত গুণাবলী যাহারা অর্জন করিবে তাহারাও উহার অধিকারী হইবে। আফছোছ! আমরা মুছলমানেরা যদি কোরান হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক চরিত্র গঠন করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের

আমল আখলাক এত নিম্নস্তরে পৌছিয়াছে যে অমুছলিমরা ইসলামকে ঘৃণা করে, তাহারা জানে না যে আজ ইছলামের সহিত মুছলমানদের সম্পর্ক খুব কমই রহিয়াছে, তাহারা মুছলমানের সেই চরিত্র দেখে উহাকেই ইসলামী আখলাক মনে করে। আল্লাহর দরবারেই যাবতীয় ফরিয়াদ !!

নফল ছদকা পাওয়ার উপযুক্ত কারা ?

(৩) وَفِىٓ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ○

অর্থঃ "এবং তাহাদের ধন সম্পদে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত সকলেরই হক রহিয়াছে।"

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন, তাহাদের মালের মধ্যে হক রহিয়াছে অর্থাৎ জাকাত ছাড়াও তাহারা ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে দান করে মেহমানদের মেহমানদারী করে আর নিঃস্ব বঞ্চিত লোকদের সাহায্য করে। হযরত মোজাহেদ এবং ইব্রাহিমও বলেন হক অর্থ জাকাত ছাড়া অন্য সব নফল ছদকা ! এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াকে চায় অথচ দুনিয়া তাহাকে চায় না আর লোকের নিকট সে সাওয়ালও করে না। অন্য হাদীছে আছে বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যার বায়তুল মালে কোন অংশ নাই। আয়েশা (রাঃ) বলেন বঞ্চিত ঐ ব্যক্তি যাহার উপার্জন তাহার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। হজরত আবু কোলাবা (রাঃ) বলেন ইয়ামামার মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বন্যায় সর্বহারা হইয়া গিয়াছিল, একজন ছাহাবী বলেন এই ব্যক্তিকেই বলা হয় মাহরুম, বঞ্চিত, উহার সাহায্য করা উচিৎ। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মিছকীন ঐ ব্যক্তি নয়, যে দুই একটি লোকমার জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিয়া ফিরে বরং মিছকিন ঐ ব্যক্তি যার নিকট প্রয়োজন মিটে পরিমাণ মাল নাই, তার অবস্থা লোকেও জানে না যে সাহায্য করিবে, এই ব্যক্তিই প্রকৃত মাহরুম বঞ্চিত। হজরত ফাতেমা বেন্তে কয়েছ (রাঃ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর বলেন মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও অন্যান্য হক রহিয়াছে। তারপর হুজুরে পাক (ছঃ) লাইছাল বেররা —এই আয়াত পাঠ করেন যার মধ্যে জাকাতের ভিন্ন বর্ণনা এবং মিছকীনদের সাহায্যের ভিন্ন বর্ণনা আসিয়াছে যাহার মধ্যে এইরূপ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে শুধু জাকাতের উপর নির্ভর করা উচিত নয় বরং বেশী বেশী করিয়া নফল ছদকাও করা উচিত! কিন্তু

বর্তমান জামানায় ত আমরা জাকাত কেও বিপদ মনে করিয়া থাকি অথচ বিয়ে শাদী খাত্‌না বা জন্ম তিথিতে বাড়ী বন্ধক রাখিয়াও খরচ করিতে পারি যেখানে দুনিয়াতে মাল বরবাদ আখেরাতে পাপের বোঝা।

উত্তরাধীকার সূত্রে পাওয়া মাল হইতে দান করার নির্দেশ

(২৪) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

অর্থঃ তোমরা আল্লাহর উপর এবং তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আন, এবং উত্তরাধীকার সূত্রে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে যাহাদের মালের উপর স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন সেখান হইতে দান কর।

বস্তুতঃ তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিয়াছে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে।

ফায়েদা ঃ স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন তাহার অর্থ হইল এই যে, ধন সম্পদ প্রথমে অন্য কাহারও নিকট ছিল, কিছু দিনের জন্য তোমাকে দান করা হইয়াছে, তোমার চক্ষু বন্ধ হইলে আবার অন্যের হাতে চলিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় উহাকে জমা করিয়া রাখা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিশ্বাস ঘাতক ধন দৌলত স্থায়ীভাবে না কাহারও হাতে রহিয়াছে না কাহারও হাতে থাকিবে। সুতরাং বড়ই ভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে উহাকে স্থায়ীভাবে নিজের কাজে লাগাইবার ফিকিরে লাগিয়াছে, অর্থাৎ আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দিয়াছে, যেখানে না ধ্বংস হইবার আশংকা রহিয়াছে না চুরি ডাকাতির ভয় রহিয়াছে। দুনিয়াতে থাকিলেই হাজার আশংকা। যার অসংখ্য প্রমাণ চোখের সামনে বিদ্যমান। অদ্য যার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বিরাট জমিদারী, অগণিত সাজ সরঞ্জাম রহিয়াছে নিমেষে উহা অন্যের হস্তগত হইয়া যায়। আফছোছ! তবুও উহা হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করি না।

(২৫) وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ

أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥

অর্থঃ এবং তোমাদের কী হইল যে তোমরা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করিতেছে না, অথচ আসমান জমিনের সবই ত আল্লাহর সম্পত্তি। যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে তাহারা কখনও সমান নহে ঐ সমস্ত লোকের যাহারা পরে খরচ করিয়াছে ও জেহাদ করিয়াছে। প্রথমোক্ত লোকেরা সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, এবং আল্লাহ তায়ালা উভয় দলের জন্যই ছওয়াবের ওয়াদা করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আল্লাহ পাক তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

আল্লাহ পাকের সম্পত্তি হওয়ার অর্থ হইল—এই দুনিয়ার সমস্ত লোক যখন একদিন ধ্বংস হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় ধনসম্পদের একমাত্র তিনিই মালিক থাকিয়া যাইবেন। কাজেই সবাইকে যখন সব কিছু ছাড়িয়াই যাইতে হইবে তখন নিজের হাতে থাকিতে কেন খরচ করিবে, না। আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে যাহারা মক্কা বিজয়ের আগে খরচ করিয়াছে ও যাহারা পরে খরচ করিয়াছে উভয়ে সমান নহে অর্থাৎ ইছলামের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন যখন অধিক ছিল তখন যাহারা জান ও মাল নিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমকক্ষ পরবর্তী কালে সাহায্যকারীরা হইতে পারে না।

(২৬) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ٥ (حديد)

অর্থঃ "কে আছে এমন যে আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছানা দিবে? অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার ছওয়াবকে বহুগুণে বর্ধিত করিবেন এবং তাহার জন্য সম্মানিত পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।" পঞ্চম আয়াতের মর্মও প্রায় ইহাই ছিল। বারংবার বলার উদ্দেশ্য হইল

আজই ব্যয় করার সময়। মৃত্যুর পর আফছোছ ব্যতীত আর কোন ফায়েদা নাই।

(২৭) إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا - يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ٥ (حديد)

অর্থঃ "নিশ্চয় ছদকা দাতা পুরুষ ও ছদকা দাতা নারীগণ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জে হাছানা দিয়া থাকে। তাহাদের ছওয়াব বহুগুণে বর্ধিত করিয়া দেওয়া হইবে, এবং তাহাদের জন্য সম্মান জনক পরিণামের ব্যবস্থা রহিয়াছে।"

অর্থাৎ যাহারা দান খয়রাত করে তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তায়ালাকেই কর্জ দিয়া থাকে। কেননা ইহাও কর্জের মতই দাতার হাতে আসিয়া পৌছে বরং ইহা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া দাতার ভীষণ প্রয়োজনের সময়ই তাহার কাজে আসিবে, মানুষ বিয়ে-শাদী, ছফর বা অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখে। ছেলে মেয়ের বিয়ের জন্য চিন্তা ফিকিরে লাগিয়া থাকে। সুযোগ সুবিধা মত কিছু কিছু কাপড় চোপড় সংগ্রহ করিতে থাকে এই আশায় যে সময় মত অধিক বেগ পাইতে না হয়। অথচ আখেরাত এত মহাসংকটপূর্ণ যে সেখানে না আছে কোন কেনা কাটা, না আছে ভিক্ষাবৃত্তি, না আছে কোন ধার কর্জ। এমন কঠিন দিনের জন্য যত বেশী সম্ভব সঞ্চয় করা বহু দূরদর্শিতার পরিচায়ক। এখানে অল্প অল্প করিয়া দান করিলেও টেরও পাওয়া যায় না অথচ সেখানে পর্বতাকার হইয়া দাঁড়াইবে।

পবিত্র কোরআনে আনছারদের প্রশংসা

(২৮) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ٥ (حشر)

অর্থ ঃ "যাহারা দারুল ইছলাম অর্থাৎ মদীনায়ে মোনাওয়ারায় মোহাজেরগণের আগমনের পূর্ব হইতে ঈমান নিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহারা এত ভাল লোক যে তাহাদের নিকট যাহারা হিজরত করিয়া আসে তাহাদিগকে মহব্বত করে। এবং মোহাজেরদিগকে কিছু দান করা হইলে তাহাদের মনে কোন সংকীর্ণতা আসে না বরং নিজেরা ভীষণ উপবাস থাকিয়াও মোজাহেরদিগকে অগ্রাধিকার দান করে। বস্তুতঃ লোভ লালসা হইতে যাহারা মুক্ত তাহারাই কামিয়াব। উপরের আয়াতে বায়তুল মালে যাহারা অংশীদার তাহাদের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তদুপরি আনছারদের আদর্শ চরিত্রাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথমতঃ আনছারগণ মাতৃভূমি মদিনায় থাকিয়া ঈমান ও সৎগুণাবলী সমুহ অর্জন করেন, যাহা স্বাভাবিকভাবে ঘরে বসিয়া সম্ভব হয় না, দ্বিতীয়তঃ আনছারগণ মোহাজেরদিগকে অপরিসীম ভালবাসিতেন, যাহার অনেক-গুলি ঘটনা হেকায়াতে ছাহাবা নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইাছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করা যাইতেছে।

যখন হুজুরে আকরাম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদিনায়ে মোনাওয়ারা তাশরীফ নিয়া গেলেন। তখন আনছার ও মোহাজেরদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব কায়েম করাইয়া দেন। কেননা মহাজেরগণ ছিলেন বিদেশী। আর আনছারগণ ছিলেন স্থানীয়। প্রিয় নবী (ছঃ) কি সুন্দর ব্যবস্থা করেন, যেহেতু একজনের জন্য একজনের খবরা খবর নেওয়া বড়ই সহজ। এই প্রসঙ্গে হজরত আবদুর রহমান বিন আওপ (রাঃ) আপন কেচ্ছা এই ভাবে বর্ণনা করেন—

আমরা যখন মদিনা শরীফে হিজরত করিয়া গেলাম তখন হুজুর (ছঃ) আমার সহিত হজরত ছায়াদ বিন বারীর (ছঃ) মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া দেন। ছায়াদ বিন বারী (রাঃ) বলেন আমি আনছারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী লোক, আমার সম্পত্তি হইতে অর্ধেক আপনি নিয়া নিন আর আমার দুই বিবি রহিয়াছে তম্মধ্যে আপনি যাহাকে পছন্দ করেন তাহাকে তালাক দিয়া দিব। ইদ্দত পুরা হইবার পর আপনি তাহাকে শাদী করিয়া লইবেন।

এজিদ বিন আছাম (রঃ) বর্ণনা করেন যে, আনছারগণ রাছুলে আকরাম (ছঃ)-এর খেদমতে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, আমাদের

যাবতীয় ভূসম্পত্তি মহাজের ভাইদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। প্রিয় নবী (ছঃ) এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন তাহাদেরকে ভূমি দেওয়া হইবে না বরং তাহারা তোমাদের সহিত ক্ষেতখামারে কাজ করিবে, কৃষি কর্মে তোমাদের সাহায্য করিবে এবং ফসলের মধ্যে তাহারা অংশ পাইবে। দ্বীনের নেছবতে এই ভাবে পরস্পর বন্ধুত্বের বন্ধন বর্তমান জমানায় কল্পনাও করা যায় না। খোদার কি মহিমা, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ যেই জাতির বৈশিষ্ট ছিল আজ তাহারা স্বার্থপরতার শৃংখলে আবদ্ধ। অন্যের গলা কাটিয়া হইলেও নিজের সুখ শান্তিই তাহাদের কাম্য।

জনৈক বুজুর্গের স্ত্রী অত্যন্ত বদমেজাজী ছিল। কেহ তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি বলেন আমার ভয় হইতেছে সে অন্য কাহারও স্ত্রী হইয়া সেই লোকটাকে কষ্ট দিবে। কত বড় সুক্ষ্মদর্শিতা? বর্তমান যুগে আমাদের কাহারও পক্ষে কি ইহা সম্ভব?

বর্ণিত আয়াতে আনছারদের তৃতীয় বৈশিষ্ট হইল এই যে, মোহাজের দিগকে গনিমতের মাল ইত্যাদিতে কোন অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে আনছারদের মনে কোন ঈর্ষা হইত না। হাছান বছরী (রঃ) বলেন মোহাজেরদের অগ্রাধিকারের ব্যাপারে আনছারদের মনে কোন হিংসা ছিল না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট তাঁহাদের এই ছিল যে তাঁহারা দারুণ অভাব অনটনের মধ্যে ও নিজেদের উপর অন্যদেরকে প্রধান্য দিতেন। এই সব ঘটনাবলী দ্বারা ইসলামের ইতিহাস ভর্তী। (হেকায়াতে ছাহাবা দ্রষ্টব্য) আয়াতের শানে নুজুলে এখানে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

মেহমানদারীর অপূর্ব ঘটনা

একবার জনৈক ক্ষুধার্থ ব্যক্তি আসিয়া প্রিয় নবীর খেদমতে স্বীয় ক্ষুৎপিপাসার অভিযোগ করিল। হুজুর (ছঃ) প্রথমে সমস্ত বিবিদের ঘরে সন্ধান লইলেন কিন্তু কোথাও কোন খাবার পাইলেন না, হুজুর (ছঃ) উপস্থিত ছাহাবাদেরকে লোকটার মেহমানদারী করার জন্য উৎসাহ দিলেন, তখন আবু তালহা নামীয় ছাহাবী সাড়া দিয়া তাহাকে ঘরে নিয়া গেলেন ও বিবিকে বলিলেন ইনি আমার প্রিয় নবীজীর মেহমান, কোন কিছু না লুকাইয়া তাহার উপযুক্ত মেহমানদারী করিও

বিবি বলিলেন ঘরেত ছেলেদের খাওয়ার মত কিছু, খাবার ছাড়া অন্য কিছুই নাই। হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন ছেলেদেরকে ফুসলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিও, তারপর আমরা যখন খাইতে বসিব, ঠিক করার ভান করিয়া তুমি চেরাগটা নিভাইয়া দিও এই ভাবে অন্ধকারে মেহমান খাইতে থাকিবেন ও আমরা শুধু মুখ নাড়া চাড়া করিব, ব্যাপারটা তাহাই হইল। ভোর বেলায় আবু তালহা যখন হুজুর (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইলেন সুসংবাদ শুনিলেন যে, আল্লাহ পাক মিয়া বিবির এই ভানকে খুবই পছন্দ করিয়াছেন ও তাঁহাদের শানে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তারপর আল্লাহ পাক বলেন যাহারা লোভ-লালসা হইতে মুক্ত, তাহারা কামিয়াব। شُحّ শোহ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বভাব জাত লোভ এবং কৃপণতা, উহা নিজের মালেও হইতে পারে অপরের মালেও হইতে পারে। আবদুল্লা বিন্ মাছউদের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন কি ব্যপার! লোকটি বলিল আল্লাহ পাক বলিতেছেন যাহারা শোহ্ হইতে মুক্ত তাহারা কামিয়াব, আমার মধ্যে কিন্তু সেই রোগ রহিয়াছে কারণ আমার দিল চায় না যে আমার নিকট হইতে কোন জিনিস চলিয়া যাক। হযরত এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) বলেন ইহা শোহ্ নহে বরং ইহা হইল কৃপণতা, কারণ শোহ্ হইল অন্যের সম্পদ অন্যায় ভাবে গ্রাস করা। এবনে ওমর (রাঃ) বলেন মালের উপর লোভ হওয়ার নামই হইল শোহ্। হজরত তালহা (রাঃ) বলেন কৃপণতা হইল যে নিজের মাল খরচ না করে, শোহ্ হইল যে অপরের মালেও কৃপণতা করে অর্থাৎ অপরের খরচ করাটাও তার মন বরদাশ্‌ত করিতে চায় না। একটি হাদীছে আছে যার মধ্যে তিনটি গুণ আছে সে শোহ্ হইতে মুক্ত, যে মালের জাকাত আদায় করে, মেহমানদারী করে এবং বিপদের সময় লোকের সাহায্য করে। একটি হাদীছে আছে শোহ্ ইছলামকে যেইরূপ ক্ষতি পৌঁছায় অন্য কোন বস্তু তা পারে না! হাদীছে আছে খোদার রাস্তার ধুলি ও দোজখের ধুঁয়া এক পেটে জমা হইতে পারে না আর ঈমান ও শোহ্ কাহার ও অন্তরে একত্রিত হইতে পারে না। হাদীছে আসিয়াছে তোমরা জুলুম হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা উহা রোজ কেয়ামতে ভীষণ অন্ধকারে

পরিণত হইবে এবং শোহ্ হইতে বাঁচ কেননা উহাই আগের উম্মত গণকে ধ্বংস করিয়াছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, মহররম নারীদের সহিত ব্যভিচার করাইয়াছে অন্যকে হত্যা করিতে বাধ্য করিয়াছে। হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তির এন্তেকাল হইলে কেহ বলিল সে-ত জান্নাতী। হুজুর (দঃ) ফরমাইলেন তাহার সব অবস্থা কি তোমাদের জানা আছে? হয়তঃ সে এমন বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে যাহা অনর্থক অথবা এমন বস্তু লইয়া বখিলী করিয়াছে যাহা তাহার কোন কাজে আসে নাই। কোন কোন হাদীছে ইহা অহুদ যুদ্ধের জনৈক শহীদ সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে সামান্যতম জিনিস দ্বারা কৃপণতা বা লোভ করাও মারাত্মক অপরাধ।

মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর দরবারে বান্দার আখেরী ফরিয়াদ

(২৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন সম্পদ, তোমাদের সন্তান সন্ততি তোমাদিকে যেন আল্লাহর জিকির হইতে গাফেল না করে, যাহারা এইরূপ করিবে তাহারাই নোকসান উঠাইবে। আর আমি যাহা দান করিয়াছি মৃত্যুর আগেই উহা হইতে দান করিয়া লও কারণ যখন মৃত্যু আসিয়া পড়িবে তখন বলিতে থাকিবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে একটুখানি সময় কেন দিলে না? তাহা হইলে আমি (আমার ধন দৌলত) ছদকা করিয়া দিতাম এবং নেক

লোকদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইতাম। অথচ আল্লাহ পাক কাহারও মৃত্যুর সময় আসিয়া গেলে কখনও উহাকে আর পিছাইয়া দেন না, তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। (ছুরে মোনাফেকুন)

ধন সম্পদ ও আওলাদ ফরজন্দের সম্পর্ক অনেক সময় মানুষকে আল্লাহর হুকুম পালন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে। অথচ মানুষের জানা নাই যে, কোন্ মুহূর্তে তাহাকে সর্বহারা করিয়া ছোঁ মারিয়া নিয়া যাওয়া হইবে, কাজেই সময় থাকিতে যাহা করিবার এখনই করিয়া লও।

প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন যাহার নিকট হজ্ব করিবার মত মাল আছে অথচ হজ্ব করিল না আর যাহার উপর জাকাত ফরজ হইয়াছে অথচ জাকাত দিল না সে মৃত্যুর সময় দুনিয়াতে ফিরিয়া আসার জন্য প্রার্থনা করিবে। কেহ হজরত এব্নে আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করিল দুনিয়াতে ফিরিয়া আসার আকাঙ্খা তো কাফের করিবে, তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করিয়া বলিলেন ইহাত মুসলমানের শানে নাজেল হইয়াছে। কোরানে পাকে বারংবার বলা হইয়াছে মৃত্যু মানুষের নির্দিষ্ট সময়ে আসিবেই, বিন্দু মাত্রও এদিক ওদিক হইবে না, অথচ মানুষ পরিকল্পনা করে যে অমুক জিনিস দান করিব, অমুক জমি ওয়াকফ করিব, অমুকের নামে অছিয়ত করিব, কিন্তু তার পরিকল্পনা শেষ হইতে না হইতেই সুইচ টিপিয়া দেওয়া হয় আর সে চলা অবস্থায় অথবা শোয়া অবস্থায় বিদায় হইয়া যায়। কাজেই পরিকল্পনা ও পরামর্শে সময় নষ্ট না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব খোদাই ব্যাঙ্কে জমা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

(৩০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ
مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করিয়া দেখে যে আগামী কালের জন্য সে অগ্রিম কি পাঠাইয়াছে। আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, নিশ্চয় তিনি তোমাদের আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর তোমরা ঐসব লোকের মত হইও না যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে যার ফলে আল্লাহ তায়ালা ও তাহাদিগকে আত্মভোলা করিয়া দিয়াছেন। তাহারাই ফাছেক। জাহান্নামী এবং জান্নাতীরা এক হইতে পারে না, কারণ জান্নাতীরাই এক মাত্র কামিয়াব।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আত্ম ভোলা করিয়া দিয়াছেন তার অর্থ হইল এই যে, তাহারা এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন হইয়া পড়ে যে, নিজের ভাল মন্দও বুঝিতে পারে না, আর যা ধংসকারী তাহাই অবলম্বন করে। হজরত জারীর (রাঃ) বলেন আমি দুপুর বেলায় প্রিয় নবী (ছঃ) এর খেদমতে হাজির ছিলাম। এমতাবস্থায় মোযার গোত্রের নগ্ন পদ, নগ্ন দেহ ও ও ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর একদল লোক হাজির হইল, তাহাদের মুখমণ্ডলে দুরাবস্থার লক্ষণ দেখিয়া দয়ার সাগর নবীজির চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বিবি ছাহেবানদের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। সেখানে কিছু না পাইয়া আবার মসজিদে আসিয়া হজরত বেলালকে বলিলেন আজান দাও। তারপর জোহরের নামাজ পড়িয়া মিম্বরে উঠিয়া আল্লাহ পাকের প্রশংসা করিলেন ও কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন তন্মধ্যে উপরের আয়াতটি ও ছিল। অতঃপর হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন তোমরা এমন সময় আসিবার আগে আগেই ছদকা কর যখন আর ছদকা করিতে সক্ষম হইবে না, যে যাহা পার চাই দীনার হউক; দেরহাম হউক কাপড় হউক, গম হউক বা যব হউক অথবা খেজুর হউক ছদকা করিতে থাক। এমনকি খেজুরের একটা টুকরা হইলেও ছদকা কর। জনৈক আনছারী খুব ভারী এক থলে খেজুর নিয়া হাজির হইলেন, হুজুরের চেহারায়ে আন্ওয়ার আনন্দে ঝল্মল করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন যে কেহ কোন নেক কাজ শুরু করিয়া দিবে তার ছওয়াবত সে পাইবে তদুপরি তার দেখাদেখি যত লোক দান করিবে সেই পরিমাণ ছওয়াব ও সে লাভ করিবে। অথচ তাহাদের ছওয়াব ও

কম হইবে না। তদ্রুপ যেহ পাপ কাজ আরম্ভ করিলেও তার পাপ ছাড়াও তার অনুগামীদের পাপও তার আমল নামায় লেখা যাইবে, অথচ তাদের পাপও কম হইবে না। তার পর সবাই চলিয়া গেল ও একে একে কেহ আশরাফী কেহ দেরহাম, কেহ খাদ্য আবার কেহ কাপড় চোপড় নিয়া হাজির হইল, এইভাবে দ্রব্য সামগ্রী দুই স্তুপ জমা হইয়া গেল। হুজুর (ছঃ) মোযার বংশীয় লোকদের মধ্যে সব বণ্টন করিয়া দিলেন।

অন্য এক হাদীছে প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন, হে মানুষ তোমরা নিজের জন্য আগাম কিছু পাঠাইয়া দাও। এমন এক দিন আসিবে যখন তোমাদের ও আল্লাহ্‌ তালায়ালার মাঝখানে কোন পর্দা থাকিবে না, কোন প্রকার দোভাষী থাকিবে না। তিনি বলিবেন তোমাদের নিকট কি আমার রাছুল এবং আহকাম আসে নাই? আমি কি তোমাদিগকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল দান করি নাই? তুমি অগ্রিম কি পাঠাইয়াছ? প্রশ্ন শুনিয়া সে এদিক ওদিক অসহায় অবস্থায় দেখিতে থাকিবে। কিছুই নজরে আসিবে না, চোখের সামনে শুধু ভয়ংকর দোজখই দৃষ্টি গোচর হইবে। সুতরাং তোমরা সেই দোজখ হইতে এক টুক্‌রা খেজুর ছদকা করিয়া হইলেও বাঁচিতে চেষ্টা কর।

ভয়ানক দৃশ্য, কঠিন জিজ্ঞাসা, প্রজ্জলিত অগ্নি, প্রতি মুহূর্তেই উহাতে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আশংকা। তখন আফছোছ করিবে হায়! দুনিয়াতে সর্বস্ব কেন আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া আসিলাম না। আজ খরচ করিতে হাত অগ্রসর হয় না, কিন্তু চক্ষু যখন বন্ধ হইয়া যাইবে তখন যাবতীয় প্রয়োজন খতম হইয়া একটি মাত্র প্রয়োজন থাকিবে। তাহা হইল জাহান্নামের ভীষণ আজাব হইতে আত্মরক্ষা করার প্রয়োজন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একদিন খোতবার মধ্যে এই আয়াত—

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّٰهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۝

পাঠ করিয়া বলিলেন কোথায় তোমাদের ঐসব ভাই সকল যাহাদিগকে তোমরা চিনিতে জানিতে, নিজ নিজ কাজ শেষ করিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছে। যদি তাহারা সৎকাজ করিয়া থাকে তবে তার

সুফল ও ভোগ করিতেছে। কোথায় সে অত্যাচারী রাজা বাদশারা যাহারা বড় বড় শহর ও আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছিল আজ তাহারা পাথরের তলায়, টিলার নীচে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহা আল্লাহ পাকের কালাম যাহার সৌন্দর্যের শেষ নাই, যাহার আলোর কোন অন্ত নাই, উহা হইতে আলো সংগ্রহ কর, আঁধার দিনে কাজে আসিবে, উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। আল্লাহ পাক কোন এক দলের প্রশংসায় বলিয়াছেন—

كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا

وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ○ (انبيا)

“তাহারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করিত, আশা ও ভয়ভীতি সহকারে আমাকে ডাকিত ও আমার সামনে জড়সড় হইয়া যাইত”। যেই কথায় আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে না এমন কথায় কোন সার্থকতা নাই। যে সম্পদ খোদার রাস্তায় ব্যয় হইবে না উহার কোন মূল্য নাই, যেই লোকের ধৈর্য তাহার রাগের উপর জয়যুক্ত নয় সে উত্তম লোক নয়, আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মোকাবেলায় কাহার ও অপবাদের পরওয়া করে সেও ভাল লোক নয়।

(৩১) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا

خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

অর্থঃ “তোমাদের ধন দৌলত এবং সন্তানগণ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। (যাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়াও আল্লাহকে স্মরণ রাখে) আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য বিরাট প্রতিদান রহিয়াছে। সুতরাং সাধ্যানুসারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁহার কথা স্মরণ কর তাঁহার আদেশ মানিয়া চল, তাঁহার পথে খরচ কর, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম।

যাহারা নফছের লোভ লালসা হইতে মুক্ত উহারাই একমাত্র কামিয়াব।"

কৃপনতার উচ্চস্তরের নাম শোহ্। মাল দৌলত পরীক্ষার বস্তু হওয়ার অর্থ হইল কাহারা উহাতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর হুকুম মত চলে ও তাঁহাকে স্মরণ করে, আর কাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া যায়। আমাদের সামনে প্রিয় নবীর জীবন্ত আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাঁহার নয় বিবি ও আওলাদ্ ফরজন্দ ছিল। ছাহাবাদের মধ্যে হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন আমার নাতি পোতার কথা ছাড়িয়া দিলেও আমি নিজ হস্তে ১২৫ জন সন্তান কবরস্ত করিয়াছি। জীবতরা-ত আছেই। এতসব সত্বেও সর্বাধিক হাদীছ রেওয়ায়েত কারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। জেহাদে শরীক হইতেন। এত বেশী আওলাদ তাঁহাকে না এলেম হইতে ফিরাইয়াছে না জেহাদ হইতে। হজরত যোবায়ের (রাঃ) শাহাদাত কালে নয় বেটা নয় বেটী চার বিবি বহু নাতি রাখিয়া যান' কোন চাকরী করেন নাই অন্য কোন ফিকির ছিল না, শুধু জেহাদেই জীবন কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের প্রশংসায় আল্লাহ্ পাক বলেন —

"তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে ব্যবসা বাণিজ্য আল্লাহর জিকির, নামাজ, জাকাত ইত্যাদি হইতে গাফেল করিতে পারে না, তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যেই দিন মানুষের দিল ও চক্ষু উলট পালট হইয়া যাইবে। উহার পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাহাদের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবেন এবং স্বীয় মেহেরবাণীতে অতিরিক্ত ও দান করিবেন।"

উক্ত আয়াত শরীফের তাফ্ছীরে বলা হইয়াছে যে ব্যবসায়ীদিগকে তাহাদের ব্যবসা আল্লাহর স্মরণ হইতে ফিরাইত না, নামাজের জন্য দৌড়াইতেন।

(৩২) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ - عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

অর্থ ঃ "যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে করজে হাছানা দাও তবে তিনি তোমাদের জন্য উহা বহুগুণে বাড়াইয়া দিবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন, বস্তুতঃ তিনি বান্দার কাজের বেশী বেশী

ক্বদর করেন এবং বহুত বড় ধৈর্য্যশীল, তিনি জাহের ও বাতেনের জ্ঞানি, জবরদস্ত প্রতাপশালীও হেকমতওয়ালা।"

পিছনে কয়েকটি আয়াতে এইরূপ বর্ণনা গিয়াছে, আল্লাহ পাকের বড়ই মেহেরবানী বান্দার জন্য গুরুত্ব পূর্ণ জিনিসকে তিনি বারং বার দোহরাইয়া থাকেন। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র কালাম পড়িয়া ছাওয়াব হাছেল করার জন্য পাঠান হয় নাই বরং উহা বোধগম্য করিয়া আমল করার জন্য পাঠান হইয়াছে। কেহ যদি বলেন যে, আমি আমার মহান প্রতিপালক, রাজাধিরাজ, মেহেরবান মাওলার কালাম পড়িয়া লইয়াছি তবে উহা কত বড় জুলুমের কথা।

(৩৩) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

অর্থ ঃ এবং তোমরা নামাজ কায়েম কর জাকাত আদায় কর ও আল্লাহ তায়ালাকে কর্জে হাছেনা দান কর, আর যেই সব সৎকর্ম তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিবে আল্লাহর নিকট উহা হইতে বর্ধিত ছাওয়াব সহকারে লাভ করিবে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

দুনিয়ার বদলার সহিত আখেরাতের বদলার কোন তুলনাই হইতে পারে না। এখানে তো এক টাকার পরিবর্তে সামান্য কিছু জিনিস পাওয়া যায় আর সেখানে এখলাছের সহিত একটা খেজুর দান করিলেও উহা অহুদ পাহাড় পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। এক একবার ছোবহানাল্লাহ, আল হামদুলিল্লাহ অথবা আল্লাহু আকবার এখলাছের সহিত পড়িলে অহুদ পাহাড় সমান ছাওয়াব পাইবে। সেখানেতো এখলাছ ছাড়া কোন আমলেরই মুল্য নাই। তবে সেই এখলাছ কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গের জুতা ঠিক করা ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাঁহাদের কদমতলেই এই দৌলত পাওয়া যায়।

বেহেশতীদের নাজ নেয়ামতের বর্ণনা

(৩৮) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ ... ... وَكَانَ

سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ○

অর্থঃ ‘‘নিশ্চয় সৎকর্মশীল লোকেরা কর্পূরের সংমিশ্রণ যুক্ত শরাবে ভর্তী পেয়ালা পান করিবে। ঐ সব পেয়ালা এমন ঝর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে যাহা হইতে আল্লাহর নেক বান্দারাই পান করিবে। তাহারা ঐ সব ঝর্ণাকে নিজ নিজ ইচ্ছামত যেখানে সেখানে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে। তাহারা কারা? যাহারা মানত পুরা করে এবং এমন একদিনকে ভয় করে যেদিনকার মছিবত ব্যাপক হইবে। আর তাহারা আল্লাহর মহব্বতে মিছকীন এতীম ও কয়েদী-দিগকে খানা খাওয়ায়। এবং বলে যে আমরা তোমাদিগকে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়াইতেছি আমরা তোমাদের নিকট উহার কোন প্রতিদান চাহি না অথবা একটু খানিক শুকরিয়া আদায় করিবে তাহাও চাই না। আমরা আল্লাহর তরফ হইতে এক ভয়ঙ্কর দিনকে ভয় করিতেছি। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাও তাহাদিগকে সেদিনকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন ও সন্তুষ্ট করিয়া দিবেন। যেহেতু এখানে তাহারা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল তাই তাহাদিগকে বদলা স্বরূপ বেহেস্ত দান করিবেন রেশমী কাপড় পরাইবেন। তাহারা জান্নাতে সোফায় হেলান দিয়া বসিবে। সেখানে না দেখিবে সূর্যের তাপ আর না অনুভব করিবে ভীষণ শীত। বৃক্ষের ছায়া সমূহ তাহাদের মাথার উপর ঝুলিয়া থাকিবে এবং ফলের থোকা সমূহ তাহাদের অনুগত হইবে। পান করিবার জন্য তাহাদের জন্য তাহাদের নিকট রৌপ্যের বরতন বরং কাঁচের পেয়ালা সমুহ পেশ করা হইবে। ঐ সব কাঁচ কিন্তু রূপার কাঁচ হইবে এবং উহাদিগকে পরিমাণ মত ভর্তী করা হইবে। কর্পূর মিশ্রিত শরাব ছাড়াও আর এক প্রকার শরাবের পেয়ালা পান করানো হইবে যাহাতে আদার সংমিশ্রণ থাকিবে। ছালছাবীল নামক ঝর্ণা হইতে ভর্তী করা হইবে। (কর্পূর ঠাণ্ডা হয় এবং আদা গরম হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন রকম শরাবের ব্যবস্থা থাকিবে)

ঐ সব পেয়ালা এমন সব ছেলেরা নিয়া আসিবে যাহারা অনন্তকাল ছেলেই থাকিয়া যাইবে। তোমরা যখন তাহাদিগকে দেখিবে তখন মনে করিবে যেন এলোমেলো মুক্তা সমূহ ছড়াইয়া আছে। শুধু মাত্র উপরে বর্ণিত বস্তুসমূহ নহে বরং ঐ সব ছাড়া আরও তুমি দেখিতে পাইবে যে সেখানে অসংখ্য নেয়ামত এবং এক বিরাট রাজত্ব। জান্নাতের অধিবাসীদের পোষাক হইবে ঝর ঝরে পাত্‌লা সবুজ রেশমের, আবার মোটা রেশমের ও হইবে। সেখানে তাহাদের কে ঝক্‌ঝকে রুপার বালাসমূহ পরানো হইবে। এবং তাহাদের প্রভু তাহাদিগকে পুত পবিত্র শারাবান তাহুরা পান করাইবেন। তাহাদিগকে বলা হইবে যে এই সব তোমাদিগকে তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে আর তোমাদের পরিশ্রমের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে"।

ফায়েদা ঃ উল্লেখিত আয়াতের তিন জায়গায় তিন প্রকার শরাবের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে তাহারা স্বয়ং পান করিবে, দ্বিতীয় স্থানে বলা হইয়াছে খাদেমগণ পান করাইবে, তৃতীয় স্থানে বলা হইয়াছে স্বয়ং রাব্বুল আলামীন পরিবেশন করাইবেন। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা জান্নাতীরা যে নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চ দরজার উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই আয়াতে নেককারদের যেই মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে আমাদের ঈমান যদি কামেল হইত তবে উহা অনুধাবন করিয়া হজরত আবু বকরের (রাঃ) মত ঘরে আল্লাহ রাছুল নাম ছাড়া সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। উল্লেখিত আয়াতে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়।

১। **প্রথমে ঝর্ণা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে জান্নাত বাসীরা উহাকে** যথা ইচ্ছা তথায় নিয়া যাইতে পারিবে। হজরত মোজাহেদ এবং কাতাদা ইহাই বলেন। এবনে শাওয়াব বলেন তাহাদের নিকট স্বর্ণের ছড়ি থাকিবে উহা দ্বারা যেদিকে ইশারা করিবে নহর সেদিকেই চলিতে থাকিবে।

২। **মানত পুরা সম্পর্কে** হজরত কাতাদা বলেন উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সমস্ত আহকামকে বুঝায়। মোজাহেদ বলেন আল্লাহর নামে যে সব মানত করা হয় যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদির মানত। একরামা (রাঃ) বলেন, মানত অর্থ শোকরানার মানত। আবদুল্লাহ বিন

আব্বাছ (রাঃ) বলেন জনৈক ছাহাবী হুজুরের খেদমতে আসিয়া বলিলেন আমি আল্লাহর নামে জবেহ হইয়া যাওয়ার মানত করিয়াছি। হুজুর (ছঃ) তখন অন্য মনস্ক ছিলেন! লোকটি হুজুরের মৌনতাকে এজাজত মনে করিয়া কিছু দূর গিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইল। হুজুর (ছঃ) টের পাইয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন ও উহার পরিবর্তে কাফ্ফারা স্বরূপ একশত উট জবেহ্ করিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেন, আল্লাহর শোকর তিনি আমার উম্মতের মধ্যে মানত আদায় করিতে এত বড় উৎসাহ ওয়ালা লোক পয়দা করিয়াছেন।

৩। আয়াত শরীফে কয়েদী দিগকে খাওয়ানোর অর্থ হইল মোশরেক কয়েদী, যেহেতু সেই জমানায় মুছলমান কয়েদী ছিল না। মোজাহেদ বলেন বদরের যুদ্ধে ধৃত কয়েদীদের উপর হজরত আবু বকর, ওমর, আলী, জোবায়ের, আবদুর রহমান বিন আউফ, ছায়াদ, আবু ওবায়দা (রাঃ) খুব খরচ করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া আনছার গণ বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিয়াছি এখন আপনারা তাহাদের উপর এত বেশী খরচ করেন ইহার উপর উল্লেখিত উনিশ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল কাফের কয়েদীর উপর খরচ করিলে যখন এত ছওয়াব মুছলমান কয়েদীর উপর ব্যয় করিলে তার চেয়ে অনেক বেশী ছওয়াব হইবে।

৪। দান করিয়া উহার প্রতিদান বা শোকরিয়া চাহিতেন না। মা আয়েশাও মা উম্মে ছালমার (রাঃ) অভ্যাস ছিল ফকীরের হাতে কিছু দিলে ফকীর যেই দোয়া করিত তাঁহারা ও ফীরেকে সেই দোয়া করিয়া দিতেন তবে যেন দানটা খালেছ আল্লাহর জন্য থাকিয়া যায়। হজরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) এইরূপ করিতেন।

হজরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দান করার জন্য প্রার্থীর অপেক্ষায় থাকে সে প্রকৃত দাতা নহে বরং যে ভিক্ষুক খুঁজিয়া খুঁজিয়া দান করে ও ফকীর হইতে দোয়ার আশাও করে না শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে সে-ই প্রকৃত দাতা।

৫। জান্নাতের ফল তাহাদের অনুগত হইবে। বর্ণিত আছে জান্নাতের মাটি হইবে রূপার, এবং মেশকের' গাছের সিকড় হইবে স্বর্ণের শাখা এবং পাতা হইবে জবরজদের, উহার মধ্য হইতে ফল লট্কিয়া থাকিবে।

দাঁড়ানো, বসায় এবং শোয়া অবস্থায় উহা নিকটেই ঝুলিয়া থাকিবে।

৬। চাঁদীর কাঁচ হইবে অর্থাৎ এব্‌নে আব্বাছ (রঃ) বলেন জান্নাতে চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যাইবে অথচ দুনিয়াতে মাছির পরের মত পাত্‌লা হইলে ও চাঁদীর পেয়ালায় পানি দেখা যায় না। কাতাদা (রাঃ) বলেন সারা দুনিয়ার লোক একত্রিত হইলেও সেই রকম পেয়ালা বানাইতে পারিবে না। এব্‌নে আব্বাছ বলেন উক্ত আয়াত হজরত আলী ও ফাতেমার (রাঃ) শানে নাজেল হইয়াছে। উক্ত ঘটনা এই কিতাবের শেষ দিকে বর্ণিত হইবে?

(৩৫) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى ۝

অর্থঃ "নিশ্চয় যে ব্যক্তি পাক হইয়াছে বা আত্মশুদ্ধি করিয়াছে। সে-ই কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। আর আপন প্রভুর নাম স্মরণ করিয়া নামাজ পরিয়াছে, তোমরা এই দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিতেছ অথচ আখেরাত সর্বোত্তম ও চিরস্থায়ী।

ওলামাগণ 'পাক হওয়ার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কেহ বলেন উহার অর্থ হইল ঈদল ফেতরের ছদকা, কেহ বলে উহার অর্থ হইল যে কোন প্রকারের পবিত্রতা। কাতাদা (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাল দ্বারা আল্লাহকে রাজী করিয়াছে। আবুল আহওয়াজ বলেন ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করেন যে নামাজ পড়ার আগে কিছু ছদকা করে। হযরত আরফাজা বলেন হযরত এব্‌নে মাছউদ (রাঃ) ছূরায়ে ছাব্বেহিছমা পড়ার সময় بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا যখন পড়েন তখন পড়া বন্ধ করিয়া উপস্থিত লোক জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন আমরা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়াছি। আমরা দুনিয়ার চাকচিক্য, নারী ও ভোগ্য বস্তু সমূহ দেখিতেছি আর আখেরাতের ওয়াদাকৃত বস্তুর প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যাদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করিয়াছেন তারা ব্যতীত সমস্ত মানুষ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া লইয়া ব্যস্ত। হযরত আনাছ হইতে বর্ণিত প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রধান্য না দেয় কালেমায়ে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ তাহাকে আল্লার না-রাজী হইতে

হেফাজত করে, আর যখনই দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয় তখন কালেমা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের প্রতি ফেরত দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, তুমি মিথ্যাবাদী। অন্য হাদীছে আছে যে কালেমায়ে শাহাদাত নিয়া আসিবে সে নিশ্চয়ই জান্নাতে প্রবেশ করিবে যতক্ষণ এই কালেমার সহিত অন্য কিছু ভেজাল না করে। প্রিয় নবী (ছঃ) এই কথা তিনবার বলেন। সবাই নিস্তব্ধ ছিল, দূর হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হউক ভেজাল অর্থ কি? প্রিয় হাবীব বলেন দুনিয়ার মহব্বত, দ্বীনের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া। ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখা, জালেমের মত ব্যবহার করা। হুজুর (ছঃ) আরও বলেন যে দুনিয়াকে ভালবাসিল সে আখেরাতের ক্ষতি করিল আর যে আখেরাতকে ভালবাসিল সে দুনিয়ার ক্ষতি করিল। তিনি আরও বলেন দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর যার আখেরাতে কোন ঘর নাই, ঐ ব্যক্তির মাল যার আখেরাতে কোন মাল নাই, উহার জন্য ঐ ব্যক্তি সঞ্চয় করে যার বিবেক বুদ্ধি কিছুই নাই।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগতের মধ্যে দুনিয়ার চেয়ে ঘৃণ্য বস্তু আল্লাহর নিকট আর কিছুই নাই। আর যেই দিন হইতে ইহাকে পয়দা করিয়াছেন সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উহার দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই। অন্য হাদীছে আছে দুনিয়ার মহব্বত যাবতীয় পাপের মূল। উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াতে ধন দৌলত অকাতরে দান করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। মালিক যদি সেই স্বীয় ভৃত্যকে কিছু টাকা দিয়া বলেন যে, ইহা নিজের প্রয়োজনে খরচ করিও তবে আমার কথামত যদি অমুক জায়গায় কিছু ব্যয় কর তা হইলে তার চেয়ে শতগুণ বেশী আমি তোমাকে আরও দিয়া দিব। এমতাবস্থায় বেশী পাওয়ার আশায় চাকর সেই স্থানে ব্যয় করিতে মোটেই ইতস্ততঃ করিবে না। আল্লাহ পাকের এতগুলি এরশাদের পর হাদীছের তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও হাদীছ যেহেতু কালামুল্লার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাই নিম্নে কয়েকটি হাদীছও বর্ণনা করা যাইতেছে।

১। হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার নিকট যদি অহুদ

পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ও থাকে তবু ও আমি ইহা পছন্দ করিব না যে উহার কিছু মাত্রও আমার নিকট তিন দিনের অধিক থাকে। হাঁ কর্জ্জ পরিশোধের জন্য হয়তঃ রাখা যাইতে পারে। (মেশকাত)

হাদীছে তিন দিন এই জন্য বলা হইয়াছে যে, অহুদ পাহাড় সমতুল্য এত বড় বস্তু বন্টন করিতে কিছু সময়েরওতো প্রয়োজন। এখানে দুইটা জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমতঃ অনেক বেশী বেশী ছদকা করার প্রতি উৎসাহ দান। দ্বিতীয়তঃ কর্জ্জ পরিশোধের গুরুত্ব। হুজুরের খাছ খাদেম হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন, হুজুরের খেদমতে যাহা কিছুই আসিত আগামী কালের জন্য উহা সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন না। তিনি আরও বলেন, হুজুর (ছঃ) এর খেদমতে একবার কোথা হইতে হাদিয়া স্বরূপ তিনটি পাখী আসিয়াছিল। হুজুর উহা নিজের খাদেমকে দিয়া দেন। পরের দিন খাদেম সেই পাখী নিয়া হাজির হইল। হুজুর এরশাদ করিলেন আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই যে আগামী কালের জন্য কিছুই জমা করিয়া রাখিবে না, কারণ রুজী আল্লাহর জিম্মায়।

হজরত ছামুরা বলেন হুজুর (ছঃ) ফরমাইতেন, আমি ভাণ্ডার ঘরে মাঝে মাঝে এই জন্য যাই যে তথায় কোন বস্তু যদি পড়িয়া থাকে আর ওদিকে আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করি। বিখ্যাত সংসার ত্যাগী ছাহাবী হজরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একবার হুজুরের সঙ্গে ছিলাম, তিনি অহুদ পর্বতের প্রতি ইশারা করিয়া ফরমাইলেন যদি এই পর্বত স্বর্ণে পরিণত হয় তবু আমি ইহাও পছন্দ করি না যে, তিন দিনের বেশী আমার নিকট উহার একটি স্বর্ণ মুদ্রাও থাকুক, তবে কর্জ্জ পরিশোধের জন্য হয়তঃ কিছু থাকিতে পারে। তারপর ফরমাইলেন; অধিক দৌলতওয়ালাই কম ছওয়াবের অধিকারী হইবে, হাঁ যাহারা এইরূপ করে অর্থাৎ ডান হাতে ডান দিক ওয়ালাদিগকে এবং বাম হাতে বাম দিক ওয়ালাদেরকে বিলাইয়া থাকে।

হজরত আবু জর একদিন হজরত ওছমানের নিকট উপস্থিত ছিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) হজরত কা'বকে জিজ্ঞাসা করেন হজরত আবদুর রহমান এন্তেকালের সময় কিছু মাল রাখিয়া গিয়াছেন কিছু অন্যায়ত করেন নাই। হজরত কা'ব বলেন যদি তিনি আল্লার হক আদায়

করিয়া থাকেন তবেত কোন ক্ষতি নাই। হজরত আবু জরের হাতে একটা ছড়ি ছিল। উহা দ্বারা তিনি হজরত কা'বকে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন কি বলিতেছ শুন; আমি স্বয়ং হুজুরের (ছঃ) নিকট শুনিয়াছি তিনি বলেন যদি এই পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হয় আর আমি উহা দান করিয়া দেই এবং উহা কবুল হইয়া যায় তবুও আমি ইহা পছন্দ করি না। যে আমার নিকট মাত্র ছয় রত্তি স্বর্ণও থাকিয়া যাক। তারপর হজরত ওছমানকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি নিজ কানে হুজুরের কাছে তিনবার এই হাদীছ শুনেন নাই? হজরত ওছমান (রাঃ) বলিলেন হাঁ শুনিয়াছি।

বোখারী শরীফে হজরত আহনাফ বিন্ কয়েছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি একদিন মদীনা শরীফে কোরায়েশ বংশী লোকের সংগে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় একব্যক্তি মোটা কেশ মোটা কাপড় পরিহিত, সাধারণ বেশে আসিয়া দাঁড়াইল, প্রথমে ছালাম করিয়া বলিতে লাগিল, যাহারা টাকা পয়সা জমা করে তাহাদিগকে ঐ পাথর খণ্ডের শুভ সংবাদ দাও যাহাকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া তাহার স্তনের উপর রাখিয়া দেওয়া হইবে ইহাতে তাহার মাংস সিদ্ধ হইয়া গলিয়া পড়িবে। ইহা বলিয়া তিনি মসজিদের একটি খুঁটির কাছে বসিয়া পড়িলেন। এই বুজুর্গকে আমি প্রথমে চিনিতাম না। তাঁহার কথা শুনিয়া আমিও তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলাম ও বলিলাম, এখানের লোকজন আপনার কথার তেমন কোন দাম দিল না, মনে হয় তাহারা কথাটা না পছন্দ করিয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন তাহারা বেওকুফ, কিছুই বুঝে না। আমি ইহা আমার মাহবুবের নিকট শুনিয়াছি। আহনাফ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার মাহবুব কে? তিনি বলিলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছঃ), আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন হে আবু জর! তুমি কি অহুদ পাহাড় দেখিতেছ? আমি ভাবিলাম হয়তঃ তিনি আমাকে সে দিকে কোন কাজে পাঠাইবেন। তাই বলিলাম জী হাঁ। দেখিতেছি। প্রিয় মাহবুব ফরমাইলেন, আমার নিকট যদি এই পর্বত পরিমাণ স্বর্ণ হইত তবে আমার দিল চায় উহার সব টুকু ব্যয় করিয়া দেই তবে কর্জ পরিশোধের জন্য হয়ত তিন দিনার রাখিতে

পারি। তারপর হজরত আবু জর (রাঃ) বলেন কিন্তু তবুও ইহারা বুঝে না শুধু মাল জমা করিয়া যাইতেছে। আল্লাহর কছম আমি ইহাদের কাছে না দুনিয়ার ভিখারী না দিনের কোন ফতুয়ার মোহ্‌তাজ, তাই পরিস্কার কথা বলিতে আমার ভয় কিসের।

দাতা ও বখিলের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া ও বদদোয়া

২। হজরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) বলেন ভোর বেলায় আছমান হইতে দুইজন ফেরেস্তা অবতরণ করে তন্মধ্যে একজন দোয়া করেন হে আল্লাহ্‌! যে তোমার পথে দান করে তাকে প্রতিদান দাও আর যে কৃপণতা করে তার মাল ধ্বংশ করিয়া দাও। (মেশকাত)

কোরান শরীফে আল্লাহ তায়ালা ফরমাইয়াছেন "তোমরা যাহা খরচ করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার বদলা দিবেন।" হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যখন সূর্য উদিত হয় উহার দুই পার্শ্বে দুইজন ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করিতে থাকে যাহা জ্বিন এবং ইনছান্‌ ব্যতীত সমস্ত মাখলুক শুনিতে পায়, বলে যে, হে লোক সকল আপন প্রভুর দিকে চল। প্রয়োজন মোতাবেক সামান্য বস্তু অনেক উত্তম ঐ প্রচুর ধন হইতে যাহা আল্লাহ হইতে গাফেল করিয়া দেয়। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় উহার দুই ধারে দুই ফেরেশ্‌তা জোরে জোরে দোয়া করিতে থাকে আয় আল্লাহ! যারা দান করে তাদের প্রতিদান দাও আর যারা বখিলি করে তাদের মাল ধ্বংস করিয়া দাও। অন্য হাদীছে আসিয়াছে আছমানে দুইজন ফেরস্তা শুধু এই কাজেই নিযুক্ত আছে যে এক জন বলে যে আল্লাহ্‌! দাতাকে দান কর অপরজন বলে কৃপণের মাল ধ্বংস কর।

অভিজ্ঞতাও দেখা যায় যাহারা মাল সঞ্চয় করিয়া রাখে তাহারা অনেক সময় মামলা মোকদ্দমায়, উশৃংখলতায় অথবা চোর ডাকাতের উপদ্রবে মাল ধ্বংস করিয়া দেয়। এব্‌নে হাজার বলেন কোন সময় মাল ধবংস হইয়া যায় এবং কোন সময় মাল ওয়ালা বিদায় লইয়া যায়। আবার কোন সময় মালে লিপ্ত হইয়া নেক আমল ধবংস করিয়া দেয়, পক্ষান্তরে মাল ব্যয় করিলে উহাতে বরকত দেখা যায়, উপযুক্ত নেক বখ্‌ত উত্তরাধিকারী পয়দা হয়।

আল্লামা নববী বলেন সৎকাজে ব্যয় করার নামই ছদকা। পরিবারের

ভরণ পোষণ, মেহমানদারী, অন্যান্য এবাদত ইহাতে শামিল। আল্লামা করতবী বলেন উদ্দেশ্য হইল ফরজ এবাদত, নফল ছদকা না করিলে ফেরেস্তার বদদোয়ার আওতায় পড়ে না। তবে ফরজ ছদকা করিতে যদি বোঝা মনে হয় তবে বিপদ হইতে মুক্ত নয়।

৩। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন হে আদম সন্তান তুমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল ব্যয় করিয়া দাও, ইহা তোমার জন্য মঙ্গল জনক, আর উহা জমা করিয়া রাখা তোমার পক্ষে অমঙ্গল জনক।

(মোছলেম, মেশকাত)

প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজনেয় অতিরিক্ত মাল জমা রাখার জন্য আসেই নাই উহাকে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করা উচিৎ যেখানে কোন ধ্বংস নাই, বিপদ নাই।

প্রয়োজন মোতাবেক শব্দের অর্থ হইল যাহা না হইলে চলা যায় না, অন্যের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হয় না। এই পরিমাণ রাখা কোন অন্যায় নয়। গৃহ পালিত পশু পক্ষীর খোরাকীও প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষের পাপের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, যাহার জীবিকা তাহার জিম্মায় আছে উহাকে ভুখা রাখিয়া ধ্বংস করিয়া দেওয়া। হজরত আবদুল্লাহ বিন্ ছামেত (রাঃ) বলেন, হজরত আবু জর (রাঃ) একদিন বায়তুল মাল হইতে তাঁহার ভাতা উঠাইয়া স্বীয় বাঁদীকে নিয়া বাজারে গেলেন। সদাই পত্র করিয়া আরও সাতটা আশরাফী বাঁচিয়া গেল। তিনি বাঁদীকে বলিলেন ঐগুলি দান করিবার জন্য ভাংতি করিয়া লও। আমি বলিলাম হুজুর এইগুলি এখন রাখিয়া দিলে মেহমানদারী ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজে আসিবে। তিনি বলিলেন আমাকে আমার হাবীব (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে টাকা পয়সা বাঁধিয়া রাখিবে উহা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত মালিকের জন্য আগুনের ফুল্‌কি হইয়া থাকিবে।

নবীয়ে করীম (ছঃ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ দান করার উপর এত জোর দিতেন যে, ছাহাবারা মনে করিতেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের মধ্যে তাহাদের যেন কোন অধিকারই নাই।

হজরত আবু ছায়ীদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন আমরা কোন এক ছফরে হুজুর (ছঃ) এর সাথে ছিলাম। কোন এক জায়গায় গিয়া হুজুর দেখিলেন

যে এক ব্যক্তি আপন ছওয়ারীকে এদিক ওদিক শুধু ঘুরাইতেছে। দেখিয়া হুজুর ফরমাইলেন যাহার কাছে অতিরিক্ত ছওয়ারী বা রসদ আছে সে যেন উহা ঐ ব্যক্তিকে দিয়া দেয় যাহার নিকট ছওয়ারী বা রসদ নাই। শুনিয়া আমরা ভাবিলাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালের উপর যেন আমাদের কোন হকই নাই।

উটকে এদিক সেদিক ঘুরাইবার উদ্দেশ্য যদি গর্ব বা অহংকার হয় তবে হুজুর (ছঃ) বলেন যে উহা অহংকারের জন্য নয় বরং যাহার নাই তাহাকে দান করা উচিত। আর যদি নিজের করুণ অবস্থা প্রকাশ করা মাকছুদ হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে তার এই ব্যক্তিকে দান করা উচিত।

(৪) হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন, আমি মদীনায়ে মোনাওয়ারায় হুজুর (ছঃ) এর পিছনে আছরের নামাজ পড়িয়াছিলাম, নামাজের ছালাম ফিরাইয়া একটু পরেই হুজুর খুব তাড়াতাড়ি মানুষের কাঁধের উপর দিয়া কোন এক বিবি ছাহেবার ঘরে তাশরীফ নিয়া গেলেন। হুজুরের এইরূপ তাড়াহুড়া দেখিয়া সকলেই বিচলিত হইয়া গেল। প্রিয় নবী (ছঃ) বাহিরে তাশরীফ আনিয়া মানুষের পেরেশান হাল দেখিয়া বলিলেন, একটা স্বর্ণের টুক্‌রার কথা মনে পড়িল যাহা ঘরে রক্ষিত ছিল। ভাবিলাম ইত্যবসারে যদি আমার মৃত্যু আসিয়া যায় আর উহা ঘরে থাকিয়া যায় তবে কাল ময়দানে হাশরে কি জওয়াব দিব। এই জন্য উহা বন্টন করিয়া দিবার জন্য বলিয়া আসিলাম। (বোখারী, মেশকাত)

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) এর অসুখের সময় তাঁহার নিকট ছয় সাতটা আশরাফী ছিল, হুজুর আমাকে নির্দেশ দিলেন তাড়াতাড়ি ঐগুলি বন্টন করিয়া দাও হুজুরের গুরুতর অসুস্থতার দরুণ আমি বন্টন করার সুযোগ ছিল না। পরে হুজুর ফরমাইলেন ঐগুলি আমার হাতে দাও, হুজুর (ছঃ) হাতে নিয়া বলিলেন, আল্লাহর নবীর জন্য কত বড় লজ্জার কথা এইগুলি ঘরে রাখিয়া যদি সে আল্লাহর সাথে মিলে। অন্য হাদীছে আছে, ঐগুলি রাত্রি বেলায় কোথা হইতে আসিয়াছিল উহাতে হুজুরের নিদ্রা উড়িয়া গেল, শেষ রাত্রে দান করিয়া দেওয়ার পর ঘুম আসে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে হুজুর (ছঃ) বলেন উহা আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও, তারপর হুজুর (ছঃ) বেহুঁশ হইয়া

যান। জ্ঞান ফিরার পর আবার বলেন আলীর নিকট পাঠাইয়া দাও

প্রিয় নবীজীর এন্তেকালের রাত্রে ঘরে বাতি জ্বালাইবার তৈল ছিল না

এইভাবে বারংবার বলার পর মা আয়েশা হজরত আলীর নিকট পাঠাইয়া দেন ও তিনি বণ্টন করিয়া দেন। ইহা দিনের বেলার ঘটনা ছিল, সন্ধ্যা বেলায় সোমবার রাত ছিল যাহা প্রিয় নবীজীর জীবনের শেষ রাত্র ছিল, হজরত আয়েশার ঘরে চেরাগে তৈল ছিল না, একজন মেয়েলোকের নিকট চেরাগ পাঠাইয়া দিয়া বলিলেন হুজুরের শরীর খুব বেশী অসুস্থ, সম্ভবতঃ সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে; বাতি জ্বালাইবার জন্য চেরাগটায় কিছু ঘি ঢালিয়া দাও। হজরত আম্মাজান উম্মে ছালমা (রাঃ) হইতেও এইরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে। মূলকথা প্রিয় নবীর দরবারে সব সময় হাদিয়া তোহ্‌ফা আসিতেই থাকিত, হুজুর যতক্ষণ পর্যন্ত ঐগুলি ছদকা করিয়া না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির থাকিতে পারিতেন না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও সাতটি স্বর্ণ মুদ্রা বিলাইয়া দিলেন অথচ মৃত্যু পথ যাত্রীর জন্য বাতি জ্বালাইবার প্রয়োজনে তৈলের পয়সাও রাখিলেন না আর বিবি সাহেবানও স্মরণ করাইয়া দিলেন না।

হজরত শায়খুল হাদীছ বলেন, আমার বাবাজানের খেদমতে দিনের বেলায় যাহা জমা হইত রাত্রে শয়নের পূর্বেই সব খরচ করিয়া দিতেন। তিনি করজদার ছিলেন, বেশীর ভাগ কর্জ আদায়ে ব্যয় করিতেন, কিছু পয়সা থাকিলে বাচ্চাদেরকে দিয়া দিতেন এবং বলিতেন মউতের কোন ঠিকানা নাই, কাজেই এই গান্দা বস্তুগুলি কাছে রাখিতে মন চায় না! হজরত শাহ আবদুর রহীম রায়পুরী (রঃ) দৈনন্দিন যাহা কিছু আসিত সব কিছুই বিলাইয়া দিতেন, আবার যখন আসিত তাঁহার ছেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইত আর বলিতেন এই দেখ আবার আসিয়া গিয়াছে। শেষ সময় তিনি পরণের কাপড় পর্যন্ত দান করিয়া দেন এবং তাঁহার খাছ খাদেম মাওলানা আবদুর কাদের ছাহেব হইতে ধার করিয়া কাপড় পরিধান করিলেন ও ঐ অবস্থায় এন্তেকাল করেন। আল্লাহর অলিদের আশ্চর্য শান, কী এক অত্যাচার্য্য জয্‌বা? যেই ভাবে দুনিয়াতে আসিয়াছিলেন সেইভাবে খালি খালি চলিয়া গেলেন।

(৫) عن ابى هريرة (رض) قال قال رجل يا رسول الله اى الصدقة اعظم اجرا ○ الحديث

এক ব্যক্তি আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ ! ছওয়াব হিসাবে কোন্ ছদকা সব চেয়ে বেশী উত্তম। হুজুর ফরমাইলেন যেই ছদক। তুমি এমন অবস্থায় আদায় কর যে তুমি সুস্থ আছ, মালের লোভ আছে, ফকীর হইবার ভয় আছে, মালদার হইবার আকাঙ্খা আছে। রুহ হলক পর্যন্ত পৌঁছা পর্যন্ত ছদকাকে পিছাইও না। অর্থাৎ মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিও না যে, আমার এত মাল মসজিদে, এত মাল মাদ্রাসায় বা অমুকের। কারণ এখনত মাল ওয়ারিশানেরই হইয়া গেল।"

ফায়েদা ঃ ওয়ারিশানের হইয়া গেল। অর্থাৎ ওয়ারিশের হক সাব্যস্ত হইয়া গেল। তাইত মৃত্যুর পূর্বক্ষণে এক তৃতীয়াংশের অধিক অছিয়ত করা যায় না। একটি হাদীছে আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ বলে যে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল হইল মাত্র তিনটি ; যাহা সে খাইয়াছে, যাহা সে পরিধান করিয়াছে আর যাহা সে ছদকা করিয়া আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিয়াছে। বাকী সব ওয়ারিশানের অন্য হাদিছে আসিয়াছে হায়াত থাকিতে এক টাকা খরচ করা মৃত্যুর সময় একশত টাকা খরচ করার চেয়ে উত্তম। কারণ এখনত মাল তাহার আর রহিল না, অন্যের মাল খরচ করিয়া লাভ কি ? প্রিয় রাছুল (ছঃ) আরও বলেন, মৃত্যু শয্যায় ছদকা করা যেমন কেহ খুব পেট ভরিয়া খাইয়া যাহা বাঁচিল উহা দান করিয়া দিল।

বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা হুজুরের এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য যে ছদকার আসল সময় হইল সুস্থাবস্থা, কারণ তখন দান করিবার কালে নফছের সহিত মোকাবেলা করিতে হয়, তবে উহার মতলব এই নয় যে, মৃত্যুর সময় ছদকা করা সম্পূর্ণ বৃথা, বরং উহাও আখেরাতের জন্য পুঁজি হইয়া দাড়াইবে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইতেছেন—

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ○

"তোমাদের কাহারও যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া যায় তাহার উপর মাতা-পিতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের জন্য ন্যায্য অংশের অছিয়ত করা ফরজ করা হইয়াছে। মোত্তাকীনদের জন্য

ইহা অবশ্য করণীয় কর্তব্য"।

মীরাছ সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। পরে মাতা-পিতার অংশ যখন নির্দিষ্ট হইয়া যায় তখন এই আয়াত মানছুখ বা রহিত হইয়া যায়। তবে যে সব আত্মীয়ের অংশ নির্দিষ্ট নয় তাদের বেলায় আছিয়তের এই আয়াত এখন ও প্রযোজ্য। তবে আগের মত ফরজ নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে, আল্লাহ পাক বলেন হে আদম সন্তান! হায়াত অবস্থায় তুমি ছিলে বখিল, মৃত্যুর সময় এখন তুমি খুব খরচ করিতেছ, দুই অন্যায় একত্র করিও না। প্রথম সুস্থাবস্থায় কৃপণতা, দ্বিতীয় মরণকলে অতিরিক্ত দান। যাহারা তোমার উত্তরাধীকারী নয় এইরূপ আত্মীয়দের জন্য কিছু অছিয়ত করিয়া যাও!' অন্য একটা হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর নারাজ যে জীবনকালে ছিল বখিল আর মরণকালে দাতা। এই জন্য মৃত্যুর সময় দান খয়রাত করিবে এই ভরসায় থাকা ঠিক নয়, কারণ মউতের কোন ঠিকানা নাই যে কখন আসিয়া পড়ে, তদুপরি অনেক সময় দেখা যায় মানুষ দান খয়রাত করার অনেক আশা ভরসা নিয়া থাকে কিন্তু গুরুতর কোন রোগ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, যেমন কাহারও প্যারালাইসিস হইয়া যায়, শরীর ও মুখ বন্ধ হইয়া যায়, অথবা অনেক সময় সেবা শুশ্রূষার নামে উত্তরাধী-কারীগণ দান খয়রাতের সামনে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, এত সব সত্ত্বেও যদি কিছুটা সুযোগ পাওয়া যায় তবুও যৌবনে ছদকা করার সমতুল্য ছওয়াব কখনও পাইবে না। হাঁ যদি কেহ আগে ত্রুটি করিয়া থাকে তবে সে এতটুকু সময়কেও গনিমত মনে করিয়া দান করিয়া যাইবে। কারণ মৃত্যুর পর আর কেহ কারো নয়, দু-চার দিন কান্নাকাটি করিয়া সকলেই ভুলিয়া যাইবে, কাজেই যাহা কিছু করার নিজের হাতে করিয়া যাওয়াই ভাল, কাজে আসিবে।

(৬) عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل ... ... o

অর্থঃ বণি ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি একদিন মনে মনে এরাদা করিল অদ্য রাতে আমি ছদকা করিব। সেই মতে সে রাত্রি বেলায় চুপে

চুপে এক ব্যক্তির হাতে কিছু মাল রাখিয়া আসিল। সকাল বেলা খবর হইয়া গেল যে, রাত্রে কোন এক ব্যক্তি চোরকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি শুনিয়া বলিল খোদা! তোমার প্রশংসা, চোরের চেয়ে অধমের হাতে দেওয়া হইলেও বা আমি কি করিতাম। আবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে অদ্য রাত্রে ও ছদকা করিব, রাত্রে এক মেয়ে লোককে ছদকা দিয়া আসিল, ভোর বেলায় প্রকাশ হইয়া গেল যে, কেহ একটা ফাহেশা নারীকে ছদকা দিয়া গিয়াছে। লোকটি এবারও আল্লাহর তা'রীফ করিয়া বলিল খোদা! আমার মাল তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকের হাতে যাওয়ার উপযুক্ত ছিল, তৃতীয় দিনও এরাদা করিল যে অদ্য রাত্রেও ছদকা করিব, সেই রাত্রে একজন ধনী লোকের হাতে ছদকা পড়িল, সকাল বেলায় বলাবলি হইতে লাগিল যে রাত্রে কেহ মালদারকে ছদকা দিয়া গেল, সে লোকটি বলিল হে খোদা! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য, আমার মাল পাইল চোরে, ফাহেশা মেয়েলোকে আর ধনী লোকে! রাত্রে সে স্বপ্নে দেখিল তোমার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে, কেননা হইতে পারে উহার বরকতে চোর চুরি হইতে তওবা করিবে, জিনাকার জিনা হইতে তওবা করিবে (কারণ সে চিন্তা করিবে যে বে-ইজ্জত না করিয়া আল্লাহ্ পাক দান করিতে পারেন) আর ধনী ব্যক্তিও মনে করিবে যে, আল্লাহর বান্দারা কিভাবে গোপনে ছদকা করিয়া থাকে, আমারও এই ভাবে দান করা উচিত।

হযরত তাউছ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি মানত করিয়াছিল যে প্রথমে ঐ বস্তিতে যার উপর নজর পড়িবে তাকে সে দান করিবে, ঘটনাচক্রে সে ছিল একটা জিনাকার মেয়েলোক। দ্বিতীয় দিনও এই ভাবে মানত করিয়াছিল, সে ছিল একটা ভীষণ খারাপ লোক, তৃতীয় দিন মানত করিয়া যাহাকে দিয়াছিল সে ছিল একজন বড় লোক, অবশেষে সে স্বপ্নে দেখে যে তার ছদকা কবুল হইয়া গিয়াছে। মেয়েলোকটা অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হইয়া ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিল। ছদকার টাকা পাইয়া সে উক্ত গর্হিত কাজ হইতে তওবা করিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অভাবের দরুণ চুরি করিত, দানের টাকা পাইয়া সেও চুরি হইতে তওবা করিল। তৃতীয় ব্যক্তি ছিল ভীষণ কৃপণ, ছদকার টাকা পাইয়া তার শিক্ষা হইয়া গেল যে আমারও এইভাবে দান খয়রাত করা

উচিত।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে দাতার নিয়তের এখলাছ দ্বারা ঐ বুজুর্গের ফজীলত সাব্যস্ত হইয়া গেল, কেননা সঠিক স্থানে পৌঁছে নাই বশতঃ মনক্ষুন্ন না হইয়া তিনি বার বার ছদকা করিতে থাকেন।

অবশেষে তার নেকনিয়তের দরুণ সব কয়টা ছদকাই কবুল হইয়া যায়। এবনে হাজার বলেন হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হইল ছদকা যথাস্থানে না পৌঁছিলে উহা আবার দেওয়া মোস্তাহাব, আল্লামা আইনী বলেন ইহা দ্বারা বুঝা গেল মানুষের নিয়ত ঠিক থাকিলে আল্লাহ তায়ালা উহার প্রতিদান নিশ্চয় দিয়া থাকেন।

(৭) عن علي (رض) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها ० مشكوة

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা দেয়ার ব্যাপারে তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ কর কেননা মছিবত ছদকাকে ফাড়িয়া অগ্রসর হইতে পারে না।

(মেশকাত)

একটি দুর্বল হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা মছিবতের সত্তরটা দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। অন্য হাদিছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন আপন মালকে জাকাতের দ্বারা পবিত্র কর, এবং ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, আর মছিবতের ঢেউ সমূহকে দোয়া দ্বারা অভ্যর্থনা কর। একটি হাদিছে বর্ণিত আছে ছদকা দ্বারা রুগীর চিকিৎসা কর, ছদকা ইজ্জতও রক্ষা করে রোগও দমন করে। নেকী বাড়াইয়া দেয় হায়াত বৃদ্ধি করে। একটি হাদিছে আসিয়াছে সত্তরটা বিপদ দূর করিয়া দেয় তন্মধ্যে ছোট বিপদ হইল কুষ্ঠ রোগ শ্বেত রোগ। আর একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে ছদকার দ্বারা নিজের চিন্তা ফিকিরের এলাজ কর, উহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বালা মছিবতও কাটাইয়া দিবেন আর শত্রুর মোকাবেলায় ও সাহায্য করিবেন। একটি ছহী হদিছে আসিয়াছে যখন কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাপড় পরায়, এই কাপড়ের একটা টুকরাও যতদিন পর্যন্ত তাহার শরীরে থাকিবে দাতা আল্লাহর হেফাজতে থাকিবে। বর্ণিত আছে ছদকা খারাবীর সত্তর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়। হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন ছদকা খোদাতায়ালার রাগকে দূর করিয়া

দেয় এবং অপমৃত্যুকে হটাইয়া দেয়।

ওলামাগণ লিখিয়াছেন ছদকা মৃত্যুর সময় শয়তানের ওয়াছওয়াছা হইতে হেফাজত করে, রোগের তাড়নায় মুখ হইতে নাশোকরীর শব্দ বাহির হওয়া হইতে বাঁচাইয়া রাখে, হঠাৎ মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। মূল কথা মরনকালে শুভ-পরিণামে সাহায্য করে। অন্য হাদীছে আছে ছদকা কবরের গরমকে দূর করিয়া দেয়, এবং মানুষ কেয়ামতের দিন স্বীয় ছদকার ছায়াতলে থাকিবে। অর্থাৎ ছদকা যত বেশী হইবে ছায়াও তত অধিক হইবে।

হজরত মোয়াজ (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! আমাকে এমন জিনিস বাত্‌লাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে এবং জাহান্নাম হইতে দুরে রাখিবে। হুজুর ফরমাইলেন তুমি বহুত বড় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেটা বড় সহজ বস্তু, অবশ্য যাহার জন্য আল্লাহ পাক সহজ করিয়া দেন। তাহা হইল এই যে—

'এখলাছের সহিত আল্লাহ পাকের এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিওনা, নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমজান শরীফের রোজা রাখ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব আদায় করিও। তারপর হুজুর (ছঃ) বলেন, আমি তোমাকে যাবতীয় নেক কাজের দরওয়াজা সমূহ বাত্‌লাইতেছি শুন তাহা হইল এই যে, রোজা শয়তানের হামলা হইতে বাঁচিবার জন্য ঢাল স্বরূপ; ছদকা গুনাহ সমূহকে এই ভাবে মিটাইয়া দেয় পানি যেই ভাবে আগুনকে নিভাইয়া দেয়। মধ্য রাত্রির নামাজ ও এইরূপ। অতঃপর প্রিয় নবী (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন— تتجافى جنوبهم

তারপর হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আমি তোমাকে যাবতীয় কাজের মাথা, উহার খুঁটি এবং উহার চুড়া বাত্‌লাইতেছি শুন, যাবতীয় কাজের মাথা হইল ইছলাম, যেহেতু উহা ব্যতীত কোন কাজই গ্রহণযোগ্য নয়। উহার খুঁটি হইল নামাজ। উহার চুড়া হইল জেহাদ, আর যাবতীয় কাজের শিকড় হইল জবান, হুজুর (ছঃ) জবান মোবারককে ধরিয়া বলিলেন ইহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবে। হজরত মোয়াজ বলিলেন আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ্! এই জবানের কারণে কি আমা-দিগকে পাকড়াও করা হইবে? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন হে মোয়াজ!

তোমার মা তোমার জন্য কান্নাকাটি করুক; মানুষকে উপুড় করিয়া জাহান্নামের মধ্যে জবান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু কি নিক্ষেপ করিবে ?

তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক বা শোক প্রকাশ করুক, আরবদের ব্যবহারে ইহা একটি সতর্কতা মূলক শব্দ, মোট কথা আমরা কাঁচির মত যেই ভাবে জিহ্বাকে চালনা করিয়া থাকি উহার সব কয়টাই আমলনামায় ওজন দেওয়া হইাব। এতসব অন্যায় ও বেহুদা কথাবার্তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হইবে।

একটি হাদীছে আছে মানুষ অলক্ষ্যে আল্লাহর সন্তোষ জনক এমন কথা বলিয়া ফেলে যদ্দ্বারা বেহেশ্‌তে তার মর্যাদা বাড়িয়া যায়, আবার মুখে এমন কথা বলিয়া ফেলে যাহাকে সে খুব সাধারণ মনে করিয়া থাকে অথচ উহার কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, মাশরিক মাগরিবের সমপরিমাণ দূরত্বে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে। অন্য একটি হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন "কোন ব্যক্তি যদি দুইটি জিনিসের জিম্মাদার হইতে পারে যেন অন্যায় পথে উহা ব্যবহার হইতে না পারে তবে আমিও তাহার জন্য বেহেশ্‌তের জিম্মাদার হইতে পারি। প্রথম যাহা দুই চোয়ালের মাঝখানে অর্থাৎ মুখ, দ্বিতীয় যাহা দুই রানের মধ্যখানে অর্থাৎ লজ্জা স্থান"। একটি হাদীছে আছে এই দুইটি অঙ্গই মানুষকে বেশী বেশী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে! অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে মানুষ অনেক সময় এমন কথা মুখে উচ্চারণ করে যদ্দ্বারা ফুর্তি করিয়া অন্যকে হাসানো উদ্দেশ্য হয় তবে সে জাহান্নামে আছমান হইতে জমীনের দূরত্ব বরাবর দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। হযরত ছুফিয়ান ছাকাফী হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর। আপনি উম্মতের জন্য সবচেয়ে অধিক ভয় কোন জিনিসের করিতেছেন ? হুজুর মুখে হাত রাখিয়া উত্তর করিলেন এই জিনিসের। বাস্তবিক মানুষের জন্য কথা বলার সময় এই কথার লক্ষ্য করা নিতান্ত প্রয়োজন যেন উহা দ্বারা কোন উপকার না হইলেও অন্ততঃ ক্ষতি না হয়।

বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ও ফকীহ্ হযরত ছুফিয়ান ছওরী বলেন, একবার একটি মাত্র পাপের দরুন তিনি পাঁচ মাস পর্য্যন্ত তাহাজ্জুদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যান। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর পাপটা কি ছিল? তিনি বলেন একটা লোক কাঁদিতেছিল আমি মনে মনে ভাবছিলাম লোকটা

রিয়াকার। ইহাত মনে মনে বলার বদ্‌বখ্‌তি আর আমরা প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে কত গুরুতর শব্দ বলিয়া ফেলি। আল্লাহ পাক আমাদিগকে হেফাজত করুণ।

(৮) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفوا لا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه ০ (رواه مسلم و مشكوة)

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ছদকা কখনও মালকে ঘাটাইয়া দেয় না। অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলে ক্ষমাকারীর মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিনয় এখতিয়ার করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছদকা দ্বারা যদিও সম্পদ ক্ষয় হইতে দেখা যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা দ্বারা আখেরাতে ত উত্তম বদলা আছেই দুনিয়াতে ও মাল বাড়িয়া যায়। যেমন আরও বর্ণিত হইয়াছে হে খোদা।

দাতাকে বদলা দাও। কৃপণকে ধ্বংস কর। হযরত আবু কাবশা রছুলে খোদার এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমি কছম করিয়া তিনটি কথা বলিতেছি এবং আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলিতেছি তোমরা উহার খুব হেফাজত করিবে। প্রথম, ছদকায় ধন কমে না, মাজলুম সহ্য করিলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন, তৃতীয় যে ভিক্ষার দ্বার খুলিয়া রাখিবে আল্লাহ পাক তার জন্য অভাবের দ্বার খুলিয়া রাখেন! আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এই যে, দুনিয়াতে মানুষ চার প্রকার হয়, ১ম, ঐ ব্যক্তি যাকে খোদা মালও দিয়াছেন এলেমও দিয়াছেন। সে আল্লাহর ওয়াস্তে মাল দ্বারা নেক কাজ করে তার মর্যাদা সবার উপরে। ২য়, যাকে মাল দেওয়া হয় নাই এলেম দেওয়া হইয়াছে তার নিয়ত বড় ঠিক, বলে যে আমার যদি মাল থাকিত তবে যাবতীয় নেক রাস্তায় খরচ করিতাম, নিয়তের বরকতে সে প্রথম ব্যক্তির মত ছওয়াব পাইবে। ৩য়, যাকে মাল দেওয়া হইয়াছে এলেম নয়, সে মালের হক আদায় করেনা অন্যায় পথে ব্যয় করে, আত্মীয়-স্বজনকে দেয় না কেয়ামতের দিন সে হইবে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। ৪র্থ, যে মাল এবং এলেম উভয় হইতে বঞ্চিত। কিন্তু সে আক্ষেপ করিয়া বলে মাল থাকিলে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত খরচ করিত, এ কারণে সে তৃতীয় ব্যক্তির মত

গুনাহগার হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন, ছদকা মালকে কখনও ঘাটায় না বরং কেহ ছদকা করিতে হাত বাড়াইলে উহা ফকীরের হাতে যাওয়ার আগে আল্লাহ তায়ালার পবিত্র হাতে পৌঁছিয়া যায় আর যে ব্যক্তি ছওয়াল না করিলেও চলিতে পারে এমতাবস্থায় ছাওয়াল করে তার জন্য হক তায়ালা অভাবের দ্বার খুলিয়া দেন। হযরত ছেলা আনছারী (রাঃ) বলেন, আমার ভাইয়েরা হুজুরের দরবারে আমার নামে অপব্যয়ের অভিযোগ করিল, আমি আরজ করিলাম হুজুর বাগান হইতে আমি আমার অংশ নিয়া নেই, উহা হইতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করি আমার সাথে যারা সাক্ষাত করিতে আসে তাদের উপর খরচ করি প্রিয় নবী আমার ছিনায় হাত রাখিয়া তিনবার বলিলেন তুমি খরচ করিতে থাক আল্লাহ পাকও তোমার উপর খরচ করিবেন। উহার কিছু দিন পর আমি এক ছফরে রওয়ানা হই তখন আমার নিকট নিজস্ব ছওয়ারীও ছিল এবং আমার নিকট পরিবারের সব চেয়ে বেশী সম্পদ ছিল।

হজরত জাবের বলেন একবার প্রিয়নবী (ছঃ) খোতবার মধ্যে ফরমাইলেন হে লোক সকল! মৃত্যু আসার আগে আগেই তওবা করিয়া লও, আজে বাজে কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই নেক কাজ করিয়া লও। বেশী বেশী জিকির করিয়া আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক পয়দা কর। প্রকাশ্যে এবং গোপনে অধিক পরিমাণ ছদকা কর যদদ্বারা তোমার রিজিক বর্ধিত হইবে, তোমার সাহায্য করা হইবে, এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে! আরও আসিয়াছে ছদকার সাহায্যে রিজিক তালাশ কর, ছদকার দ্বারা রিজিক নামাইয়া আন।

হযরত হাবীবে আজমী একজন বিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন, একবার তাঁহার বিবি আটার খামীর বানাইয়া আগুনের জন্য পার্শ্ববর্তী বাসায় যান, ইতিমধ্যে কোন ভিক্ষুক আসিলে হযরত হাবীব খামীরগুলি ভিক্ষুককে দিয়া দেন। বিবি আগুন লইয়া আসিয়া দেখেন যে আটা নাই, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আটা রুটি তৈরীর জন্য গিয়াছে। বিবি সাহেবার বিশ্বাস না হওয়ায় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। অবশেষে তিনি বলেন উহা আমি ছদকা করিয়া দিয়াছি, বিবি বলিল ছোবহানাল্লাহ! সবটুকু আটা দিয়া দিলে? এতজন লোক কি দিয়া পেট

পুরিবে ? কথা শেষ না হইতেই জনৈক ব্যক্তি বড় এক পেয়ালার মধ্যে গোশ্‌ত রুটি নিয়া হাজির, এবার বিবি অবাক হইয়া বলিয়া উঠিল কত তাড়াতাড়ি পাকাইয়া আসিয়াছে ? দান স্বরূপ ছালুণ ও সাথে আসিয়াছে। এরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায় আল্লাহর সাথে যেহেতু আমাদের সম্পর্ক নাই তাই মনে করিয়া থাকি যে এইরূপ ঘটনা হঠাৎ করিয়া হইয়া গিয়াছে অথচ চিন্তা করিনা যে খরচ করার দরুণই উহা আসিয়াছে।

মেঘের মধ্যে দাতার নাম শুনা গেল

(৯) عن ابى هريرة (رض) عن النبى (ص) قال بينا رجل بفلاة من الارض ... ٥

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করমাইয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি মাঠের মধ্যে থাকিয়া একটি মেঘের মধ্যে এই আওয়াজ শুনিতে পাইল যে, অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি দিয়া দাও। ইহার পরেই সেই মেঘ হইতে একটি প্রস্তরময় জমিতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইল এবং সেই পানি একটি নালায় ভর্তি হইয়া একদিকে চলিতে লাগিল, লোকটিও পানির পিছনে পিছনে চলিল, অবশেষে পানি যেখানে পৌঁছিল সেখানে এক ব্যক্তিকে দেখিল বেলচা হাতে আপন জমিতে পানি দিতেছে। লোকটি বাগান ওয়ালার সেই নাম বাতলাইল যাহা সে মেঘের মধ্যে শুনিয়াছিল। ক্ষেত ওয়ালা বলিল আপনি আমার নাম কেন জানতে চাইলেন ? লোকটি পূর্বেকার সব কথা বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ভাই ! আমি কি জানিতে পারি ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল ? কৃষক বলিল আপনার মজবুরীতে না বলিয়া পারিলাম না। আমি এই ক্ষেতের ফসলকে তিন ভাগে ভাগ করি, এক ভাগ ছদকা করি, এক ভাগ পারিবারিক খরচে ব্যয় করি, আরেক ভাগ উৎপাদনের কাজে লাগাই। (মোছলেম)

আল্লাহ পাকের কুদরতের অপার মহিমা, ফসলের এক তৃতীয়াংশ দান করার বরকতে গায়েব হইতে ক্ষেতের যাবতীয় ব্যবস্থাদি হইতেছে। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দানের জন্য মওজুদ রাখা উচিত। তাহা হইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দানের সময় নফ্‌স কার্পন্য করিতে পারে না ; কারণ তখন মনে হইবে যে এই পরিমাণত আমাকে দান করিতেই হইবে। মাসিক বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ বা ব্যবসায়ের দৈনিক আয় হইতে নির্দিষ্ট অংশ কোন বাক্‌সে সঞ্চিত

করিয়া রাখা যায়! ইচ্ছা হয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে উহা কত সুন্দর এবং লাভজনক ব্যবস্থা। হযরত আবুওয়ায়েল (রাঃ) বলেন হযরত এবনে মাছউদ (রাঃ) আমাকে বনি কোরায়জা প্রেরণ কালে নছীহত করেন যে, তুমি সেখানে বনি ইছরাইলের ঐ পাক বান্দার ন্যায় কাজ করিও। অর্থাৎ একভাগ ছদকা করিও একভাগ সেখানে রাখিয়া আসিও আর একভাগ আমার কাছে পেশ করিও। ছাহাবায়ে কেরাম এই নোছখা মতে আমল করিতেন।

(১০) عن ابی هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر لامرأة مومسة ٥

ছদকার দরুণ ফাহেশা নারীও মাফ পাইল

হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, কোন এক কূঁয়ার ধারে ভীষণ তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়া একটি কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া হাঁপাইতে ছিল, জনৈকা পতিতা নারী ইহা দেখিয়া পায়ের মুজা খুলিয়া উড়নায় বাঁধিয়া কুঁয়া হইতে পানি উঠাইয়া কুকুরকে পান করায়। ইহাতে তাহার যাবতীয় গুণাহ মাফ হইয়া যায়। কেহ জিজ্ঞাসা করিল হুজুর? চতুষ্পদ জন্তুর ব্যাপারেও কি আমরা ছওয়াব পাইব? হুজুর বলেন জান ওয়ালা যে কোন মাখলুকের উপর এহছান করিলে (চাই মানুষ হউক চাই জীবজন্তু হউক) ছওয়াব রহিয়াছে।

ইহা বনি ইস্রাঈলের কোন ফাহেশা মেয়েলোকের ঘটনা। বোখারী শরীফে একজন পুরুষের ঘটনাও এই ভাবে বর্ণিত আছে। হুজুর (ছঃ) বলেন ভীষণ পিপাসায় কাতর এক ব্যক্তি কুয়া হইতে পানি পান করিয়া দেখে যে একটা কুকুর কুঁয়ার ধারে মাথা ঠোক্‌রাইতেছে। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সে আবার কুপে নামিয়া মুজায় পানি ভরিয়া কুকুরকে পানি পান করায়। ইহার বদৌলতে আল্লাহ পাক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেন। কিতাবের শেষ ভাগে এক জালেমের কিচ্ছা বর্ণিত আছে, সে পাঁচড়া ওয়ালা একটা কুকুরকে আশ্রয় দিয়া নাজাত পায়। উভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল নিকৃষ্টতম জন্তু কুকুরের প্রতি সদয় হইলে যখন এই অবস্থা তখন সৃষ্টির সেরা মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে কি ফল

দাড়াইবে তা কল্পনাও করা যায় না। কোন কোন আলেমদের মতে হিংস্র জন্তু এই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নহে ? তবে যাহাদের হত্যা করার হুকুম আসিয়াছে তাহাদের বিষয় ও জানা হইলে ক্ষুৎ পিপাসা মিটাইতে হইবে এবং কতলের ব্যাপারেও সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, যেমন তাহাদের হাত পা কাটিতে পারিবে না।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন আমল আল্লাহর পছন্দ হইলে উহা দ্বারা সারা জীবনের গুনাহও মাফ হইয়া যাইতে পারে। তবে প্রত্যেক কাজে চাই এখলাছ। এখলাছের সহিত মামুলী আমল হইলেও উহা পাহাড়ের মত ওজন ওয়ালা হইতে পারে। হজরত লোকমান হেকীম স্বীয় ছেলেকে নছীহত করেন, বেটা ! যখনই কোন পাপ সংঘঠিত হইয়া যায় তখনই কিছু ছদকা করিয়া দাও। যেহেতু উহা গুনাহকে ধুইয়া ফেলে এবং আল্লাহ তায়ালার রাগকে দূর করিয়া দেয়।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত. প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন.

(১১) عن على (رض) قال قال رسول الله (ص) ان فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن هى قال لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ٥ ترمذى

বেহেস্তের মধ্যে এমন সব বালাখানা রহিয়াছে যাহার ভিতর হইতে বাহিরের সব জিনিস এবং বাহির হইতে ভিতরের সব জিনিস দেখা যায়। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করেন হুজুর ! ঐ সব বালাখানা কাহাদের জন্য ? প্রিয় হাবীব এরশাদ করেন যাহারা মিষ্টি কথা বলে এবং মানুষকে খাওয়ায়, প্রায় সময় রোজা রাখে, আর মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন রাত্রি বেলায় তারা নামাজে দাঁড়ায়। (তিরমীজ)

হযরত আবদুল্লাহ বিন ছালাম তখনও মুসলমান হন নাই বরং ইহুদী ছিলেন, তিনি বলেন হুজুরে পাক (ছঃ) যখন মদিনায়ে মোনাওয়ার তাশরীফ আনেন খবর পাইয়া আমি তাঁহার দরবারে হাজির হই, এবং তাঁহার চেহারা মোবারকে নজর করিয়াই আমি মন্তব্য করিলাম ইহা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হইতে পারে না। সেখানে গিয়া আমি সর্ব প্রথম হুজুরের জবান মোবারক হইতে এই কথা শুনিতে পাই, তিনি বলেন হে লোক সকল। আপোষে ছালাম দেওয়া নেওয়ার প্রচলন কর মানুষকে

খানা খাওয়াও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখ, রাত্রি বেলায় মানুষ যখন নিদ্রায় মগ্ন থাকে তখন তুমি উঠিয়া নামাজ পড়। তার পর সুখে শান্তিতে বেহেস্তে ঢুকিয়া পড়।

একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি আপন ভাইকে পেট ভরিয়া খানা খাওয়ায় এবং পিপাসা মিটাইয়া পান করায় আল্লাহ পাক তাহার এবং জাহান্নামের মধ্য ভাগে সাত খন্দক দূরত্ব পয়দা করিয়া দেন। এক একটা খন্দকের পরিধি হইল সাতশত বৎসরের রাস্তা। একটি হাদীছে আছে সমস্ত মাখলুক আল্লাহর একটি পরিবার, সুতরাং যে আল্লাহর পরিবারের উপকার করিল সে-ই তাঁহার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, অন্য হাদীছে আসিয়াছে, যে কোন নেক কাজই ছদকার মধ্যে গণ্য, কোন ব্যক্তি আপন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত বা নিজের বাল্‌তি হইতে কিছু পানি অন্যের বাল্‌তিতে ঢালিয়া দেয় ইহাও ছদকার মধ্যে গণ্য। একটি হাদীছে আসিয়াছে, উপকারের কোন অংশ্যই নগণ্য নয়। একটি হাদীছে আসিয়াছে উপকারের কোন অংশ্যই নগণ্য নয় চাই সেটা কাহারও সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, নেক কাজের আদেশ দেওয়া খারাপ কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা, পাথহারাকে সঠিক পথ দেখানো রাস্তা হইতে কণ্ঠকময় বস্তু হাটানে নিজের বাল্‌তি হইতে অন্যের বরতনে কিছু পানি দেওয়া ছদকার মধ্যে গণ্য।

একটি হাদীছে বর্ণিত আছে কেয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে লাইনে খাঁড়া করান হইবে তাদের সামনে দিয়া একজন জান্নাতী যাইতে থাকিবে এমন সময় লাইনের মধ্য হইতে জনৈক ব্যক্তি তাহাকে বলিবে ভাই তুমি আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কর, সে বলিবে তুমি কে ভাই? জাহান্নামী বলিবে তুমি আমাকে পানি পান করাইয়াছিলে ইহার উপর সে সুপারিশ করিবে ও তাহার সুপারিশ কবুল হইবে এই ভাবে দুনিয়াতে যে কেহ কাহারও উপর এহছান করিয়া থাকিলে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে তাহার জন্য সুপারিশ করিবে। প্রিয় নবী এরশাদ করেন ফকীরদের সাথে বেশী সম্পর্ক রাখিও, কেননা তাহাদের নিকট বহুত বড় দৌলত রহিয়াছে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল সেই দৌলত কি জিনিস? হুজুর এরশাদ করেন তাহাদিগকে যে কেহ দুনিয়াতে খানা

খাওয়াইয়া থাকুক বা পানি পান করাইয়া থাকুক বা কাপড় পরাইয়া থাকুক তাহাকে সে হাত ধরিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক ফকীরদের নিকট এইভাবে ওজর পেশ করিবে যেই ভাবে মানুষ মানুষের নিকট ওজর পেশ করে, বলিবেন আমার ইজ্জত এবং বুজুর্গীর কছম, আমি দুনিয়াকে তোমা হইতে এই জন্য দুরে রাখি নাই যে তুমি আমার নিকট অপদস্ত ছিলে বরং এই জন্য হটাইয়াছি যে অদ্য তোমাকে সম্মানিত করিব। আমার প্রিয় বান্দা! মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবন্ত জাহান্নামিদের কাতারে গিয়া দেখ তাহাদের মধ্যে কেহ হয়তঃ তোমাকে খানা খাওয়াইয়াছে বা কাপড় পরাইয়াছে অবশেষে তাহাদিগকে চিনিয়া জান্নাতে প্রবেশ করাইয়া দিবে। একটি হাদীছে আসিয়ায়াছে যে ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্থ প্রাণীকে খাওয়াইয়াছে হক তায়ালা তাহাকে জান্নাতে উৎকৃষ্ট খানা খাওয়াইবেন। অন্য হাদীছে আছে যেই ঘর হইতে লোকের খাবারের ব্যবস্থা করা হয় বরকত সেই ঘরের দিকে এত দ্রুত অগ্রসর হয় যেমন উটের কুজের দিকে তীক্ষ্ম ছুরি অগ্রসর হয়।

হযরত অবদুল্লাহ্ বিন্ মোবারক ভাল ভাল খেজুর লোকদিগকে খাওয়াইতেন আর বলিতেন, যে বেশী খাইতে পারিবে তাহাকে প্রত্যেক খেজুরের বিনিময়ে এক দেহরাম করিয়া দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন কেহ ঘোষণা করিয়া দিবে যাহরা ফকীর মিছকিনকে সম্মান করিত তাহারা যেন নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করিয়া যায়। অন্য ঘোষণাকারী বলিবে যাহারা অসুস্থ গরীব দুঃখিদের দেখা শুনা করিয়াছে আজ যেন তাহারা নূরের মিম্বারে বসে ও খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন অন্যান্য লোক কড়া হিসাব কিতাবে ব্যতিব্যস্ত থাকিবে। একটি হাদীছে আছে এই রকম অসংখ্য হুর রহিয়াছে যাহাদের মোহর হইল এক মুষ্টি খেজুর অথবা সম পরিমাণ অন্য কোন জিনিস দান করা। একটি হদীছে আছে ক্ষুধিতকে অন্ন দান করার চেয়ে উত্তম ছদকা আর কিছুই নাই, একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ তায়ালার নিকট সবচেয়ে উত্তম আমল হইল কোন মুছলমানকে সন্তুষ্ট করা, অথবা তাহাকে চিন্তা মুক্ত করা, অথবা তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা ক্ষুধার সময় তাহাকে অন্ন দান

করা। এইসব অর্থের উপর আরও অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হইয়াছে :

একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি হাজত পুরা করিয়া দেয় আল্লাহ তায়ালা তাহার তেহাত্তরটি হাজত পুরা করিয়া দিবেন। তম্মেধ্যে সবচেয়ে হালকা বস্তু হইল তাহার গুনাহ সমুহ ক্ষমা করিয়া দেওয়া।

(১২) عن اسماء (رض) قالت قال رسول الله (ص) انفقى ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ارضخى ما استطعت متفق عليه ০ مشكوة

হজরত আছমা (রাঃ) বলেন নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন (আল্লাহর রাস্তায়) বেশী বেশী করিয়া ব্যয় করিবে গুনিয়া গুনিয়া খরচ করিবে না, কারণ এইরূপ করিলে, আল্লাহ তায়ালাও তোমাকে গুনিয়া গুনিয়া দিবেন। আর হেফাজত করিয়াও রাখিও না এই রকম করিলে আল্লাহ পাকও তোমার জন্য হেফাজত করিয়া রাখিবেন, অর্থাৎ কম দিবেন। যতটুকু সম্ভব দান করিতে থাক।

ফায়েদা ঃ হযরত আছমা হইলেন আম্মাজান হযরত আয়েশার বোন, জনাবে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এই হাদীছে পাকে কয়েক তরীকায় বেশী বেশী খরচ করার জন্য উৎসাহ দান করিয়াছে। প্রথম হইল শরীয়ত মোতাবেক অধিক পরিমাণে খরচ করা। দ্বিতীয় গুনিয়া গুনিয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন, ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে। ১নং গণনা করার অর্থ গুনিয়া গুনিয়া জমা করা, এই ছুরতে আল্লাহর তরফ হইতে তোমার জন্য দানের দরওয়াজাও সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। ২নং ফকীরদের হাতে সংখ্যা নিদৃষ্ট করিয়া দিও না তাহা হইলে তুমি খোদা তায়ালার তরফ হইতে অগণিত ছওয়াব পাইতে থাকিবে। হযরত আছমা একদিন হুজুর (ছঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর! আমারত কিছুই নাই, যাহা কিছু সব জোবায়েরের হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তবু ও তুমি ছদকা করিতে থাক বাঁধিয়া রাখিও না।

জোবায়েরের হওয়া সত্বেও এই জন্য দান করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, জোবায়ের হয়তঃ হজরত আছমাকে মালের মালিক বানাইয়া দিতেন, অথবা হুজুরের জানা ছিল যে জোবায়োরের স্ত্রী দান করিলে জোবায়ের অসন্তুষ্ট হইবেন না।

হজরত জোবায়ের (রাঃ) বলেন একদা আমি প্রিয় নবীর দরবারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসি, রাছুলে খোদা (ছঃ) সতর্ক করনার্থে আমার পাগড়ীর লেজুড় ধরিয়া এরশাদ করেন যে জোবায়ের আমি আল্লাহ তায়ালার বার্তাবাহক বিশেষ করিয়া তোমার জন্য ও সাধারণ ভাবে সারা বিশ্ব মানবতার জন্য, তুমি কি জান ? আল্লাহ তায়ালা কি ফরমাইতেছেন ? আমি বলিলাম আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলই সবচেয়ে বেশী জানেন, অতপর হুজুর (ছঃ) আরম্ভ করিলেন—আল্লাহ তায়ালা যখন আরশে বিরাজমান তখন সৃষ্ট জগতের প্রতি এক নজর দেখিয়া বলেন—বান্দাগণ! তোমরা আমার মাখলুখ, আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের রিজিক আমার হাতে; সুতরাং তোমাদের যে দায়িত্ব আমি নিজ হাতে গ্রহণ করিয়াছি সে সম্পর্কে তোমরা মাথা ঘামাইও না। তোমরা আমার নিকট রিজিক ভিক্ষা কর, হুজুর (ছঃ) আরও বলেন তোমাদের রব আর কি বলেন জান ? তিনি বলেন হে বান্দা! তুমি মানুষের উপকারার্থে ব্যয় করিতে থাক আমিও তোমাদের জন্য ব্যয় করিতে থাকিব, মুক্ত হস্তে দান কর আমি ও মুক্ত হস্তে দান করিব। তুমি জমা করিয়া রাখিও না আমিও রাখিব না, তুমি সংকোচ করিও না, আমিও সংকোচ করিব না। রিজিকের দরওয়াজা আরশ সংলগ্ন সপ্ত আছমানে সর্বদা খোলা থাকে। আল্লাহ প্রত্যেক লোকের জন্য নিয়মানুসারে দানের ও ব্যয়ের পরিমাণের দরওয়াজা দিয়া রিজিক প্রেরণ করেন। যে অধিক ব্যয় করে তার জন্য অধিক আর যে কম ব্যয় করে তার জন্য কম হিসাবে নাজিল হয়। যে মোটেই খরচ করে না তার জন্য মোটেই আসে না। জোবায়ের নিজেও খাইবে অন্যকেও খাওয়াইবে। বাঁচাইয়া রাখিও না তা না হইলে তোমার তরেও বন্ধ হইয়া যাইবে। গুনিয়া দিওনা, তবে তোমাকেও সেই হিসাবে দেওয়া হইবে। কৃপণতা করিও না নচেৎ তোমাকেও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। জোবায়ের! আল্লাহ পাক খরচ করাকে পছন্দ করেন এবং কৃপণতাকে নাপছন্দ করেন। আল্লাহর উপর গভীর আস্থা থাকিলেই দানশিলতা আসে, আর অনাস্থার ফলে আসে কৃপণতা! যে আল্লাহর উপর আস্থাশীল সে জাহান্নামে যাইবে না আর যে সন্দিহান সে জাহান্নামী। জোবায়ের আল্লাহ পাক ছাখাওয়াতকে ভালবাসেন যদিও উহা এক টুকরা খেজুরই হউক না কেন, সাপ বা বিচ্ছু মারিতেও যদি বাহাদুরী

প্রকাশ পায় খোদা তায়ালা উহাকেও পছন্দ করেন, জোয়ায়ের! দুর্যোগের সময় ছবর করাকে তিনি বড় পছন্দ করেন, এবং কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময় এমন একীনকে তিনি পছন্দ করেন যাহা সর্বদিকে বিস্তার হইয়া যায় এবং রিপুকে দমন করিয়া দেয়। সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সময় তিনি পরিপূর্ণ বিবেক বুদ্ধিকে পছন্দ করেন, অবৈধ এবং অপকর্মের সম্মুখে তাকওয়া ও পরহেজগারীকে পছন্দ করেন। হে জোবায়ের! ভাইদের সম্মান করিবে, নেক লোকদের ইজ্জত করিবে, ভদ্রলোকদের একরাম করিবে, প্রতিবেশীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, পাপীদের সহিত পথও চলিবে না। যেই ব্যক্তি এই সব বস্তুর এহতেমাম করিবে সে আজাব এবং হিসাব কিতাব ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। এইসব নছীহত আল্লাহ পাক করিয়াছেন আমাকে, আর আমি করিতেছি তোমাকে। এই সব কথার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রিয় নবী (ছঃ) হযরত আছমাকে জোবায়েরের মাল নিঃসঙ্কোচে খরচ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

হজরত জোবায়ের হুজুর (ছঃ)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। এছাবা নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে হজরত জোবায়েরের দানের কোন সীমারেখা ছিল না। নিজস্ব এক হাজার গোলাম তাঁহার খাজনা যোগাইত উহার এক কপর্দকও ঘরে পৌঁছিত না। সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দিতেন, তার পরও দেখা যায় এন্তেকালের সময় তিনি বাইশ লক্ষ্য টাকা ঋণী ছিলেন। বোখারী শরীফে হযরত জোবায়েরের কর্জের ব্যাপার এইভাবে বর্ণিত আছে যে তিনি একজন জবরদস্ত আমানতদার ছিলেন, লোকে আমানত রাখিলে তিনি বলিতেন আমার নিকট আমানত রাখিবার জায়গা নাই! কর্জ হিসাবে রাখিয়া যাইতে পার, আমি খরচ করিয়া ফেলিব, প্রয়োজনের সময় নিয়া যাইও। এইভাবে অজস্র টাকা তিনি অকাতরে দান করিয়া দিতেন। শুধু তিনি কেন অধিকাংশ ছাহাবাদের ঐরূপ অভ্যাস ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) একদিন চারি শত দীনারের একটি থলিয়া গোলামকে দিয়া বলিলেন যাও ইহা আবু ওবায়দাকে দিয়া আস এবং সেখানেই অন্য কোন কাজে লিপ্ত হইয়া ইশারায় দেখিতে থাকিবা তিনি কি করিতেছেন। দীনার পাইয়া হজরত আবু ওবায়দা ওমরকে খুব দোয়া করিলেন ও থলিয়টা গোলামের হাতে দিয়া বলিলেন, অমুককে সাত দীনার অমুককে পাঁচ দীনার দিয়া

গোলাম আসিয়া হযরত ওমরকে খুব কেচ্ছা শুনাইলেন তিনি আবার সেই পরিমাণ টাকা হযরত মোয়াজের নিকট পাঠাইলেন এবং গোলামকে সেই ভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন। তিনি ও দীনার পাইয়া বাঁদীর মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌছাইয়া শেষ করিয়া দেন, অবশেষে তাঁহার বিবি আসিয়া বলিলেন আমিও ত মিছকিন আমাকেও কিছু দাও। তিনি বিবির দিকে থলিয়টা ছুড়িয়া মারিলেন, বিবি দেখিলেন মাত্র দুই দীনার বাকী আছে। অবশিষ্ট সব বণ্টন হইয়া গিয়াছে। গোলাম আসিয়া হযরত ওমরের নিকট সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন ইহারা সবই একই নমুনার ভাই ভাই।

(৩) عن ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله (ص) ايما مسلم كسا مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خضر الجنة وايما مسلم اطعم مسلما على اجوع اطعمه الله من ثمار الجنة وايما مسلم سقى مسلما على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ٥ (ابوداؤد . ترمذى)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করে আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের সবুজ বস্ত্র পরাইবেন আর যদি কেহ কোন ক্ষুধার্থকে খানা খাওয়ায় আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের ফল খাওয়াইবেন। আর যদি কেহ কোন পিপাসিতকে পানি পান করায় আল্লাহ পাক তাহাকে জান্নাতের মোহরযুক্ত শরাব পান করাইবেন। (আবু দাউদ, তিরমিজি)

মোহর যুক্ত শরাব দ্বারা ঐ পবিত্র শরাব বুঝায় যাহা কোরআনে মজীদে বেহেশতীদের জন্য সুরক্ষিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ছুরায়ে তাতফীফে আছে—

"নিশ্চয় নেককারগণ আরাম আয়েশে থাকিয়া তখতের উপর আরোহন করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জান্নাতের আজায়েব সমূহ দেখিতে থাকিবে। তুমি তাহাদের চেহারায় আনন্দের আভা প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইবে। তাহাদিগকে মেশকের মোহরযুক্ত শরাব পরিবেশন করান হইবে। লোভী ব্যক্তিদের এমন বস্তুর প্রতিই লোভ করা উচিত।

হযরত মোজাহেদ বলেন, বর্ণিত রাহীক জান্নাতের বিশেষ শরাবের

নাম তাহাতে তাছনীমের আমেজ থাকিবে। তাছনীম হইতেছে বেহেশতীদের জন্য পরিবেশিত সর্বোত্তম শরাব। আল্লাহর নিকটতম বান্দারা উহা পান করিবে, আর নিম্নস্তরের বেহেশতীদের শরাবে তাছনীমের কিছুটা সংমিশ্রণ থাকিবে।

উল্লেখিত আয়াতের দুইটা অর্থ হইতে পারে। প্রথমতঃ দাতা দুরাবস্থায় থাকিয়া ও দান করে অর্থাৎ দাতার কাপড় না থাকা সত্বেও অপরকে কাপড় পরায় দাতা ভূকা পেয়াছা থাকিয়াও অপরকে খাওয়ায় এবং পান করায়। এই ছুরতে এই হাদীছ ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ দাঁড়ায়, আল্লাহ পাক সেখানে ফরমাইয়াছেন—

"আর তাহারা নিজেদের ভীষণ অভাব থাকা সত্বেও অন্যকে অগ্রাধিকার দান করেন"।

দ্বিতীয় অর্থ হইল ফকীরের দুরাবস্থার উপর তাহাকে দান করে। এই ছুরতে অধিক মোহতাজকে দান করা স্বভাবিক ফকীরদেরকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যেমন ১০ নং হাদীছে গিয়াছে একটা মৃতপায় কুকুরকে পান করাইবার দরুণ একটা পতিতা নারীর যাবতীয় পাপ মাফ হইয়া যায়। হযরত এবনে ওমর বর্ণনা করেন, যে নিজের ভাইয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা করে আল্লাহ তায়ালা তাহার অভাব ঘুচাইয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কোন মুছলমানকে বিপদ মুক্ত করেন হক তায়ালা তাহাকে দ্বীনের কোন মুছিবত হইতে মূক্ত করেন। আবার যে ব্যক্তি মুছলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে হক তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহার দোষের উপর পর্দা ঢাকিয়া দিবেন। (মেশকাত)

একটি হাদীছে আছে যদি কেহ গোপন রাখিবার যোগ্য কোন বস্তু লক্ষ্য করার পর উহাকে গোপন করিয়া ফেলে তার ছাওয়াব ঐ ব্যক্তির ছওয়াবের সমতুল্য যে জীবিত কবরস্থ ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠাইয়া তার প্রাণ রক্ষা করিল। আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন "তোমাদের মধ্যে যাহারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে খরচ করিয়াছে আর যাহারা পরে করিয়াছে তাহারা কখনও সমান হইতে পারে না। "তার কারণ হইল এই যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে মুসলমানগণ দুর্বল ছিল বিধায় তাহাদের প্রয়োজন ছিল বেশী। ঐসব আনছার মোহাজেরদের শানে হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা অহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করিলেও তাহাদের এক 'মুদ'

অথবা আধা মুদ পরিমাণ দানের সমান ছওয়াব লাভ করিতে পারিবে না। এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে নবীয়ে করীম (ছঃ) মোহতাজ ফকীরদের দানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, হুজুর আরও এরশাদ করেন, ওয়ালিমার দাওয়াতে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং ফকীরদেরকে বাদ দেওয়া হয় তাই ওয়ালিমার খানা হইল নিকৃষ্টতম খানা। একটি হাদীছে আসিয়াছে কেহ যদি কোন মুছলমানকে এমন জায়গায় পানি পান করায় যেখানে পানি পাওয়া যায় সে একটা গোলাম আজাদ করার ছওয়াব পায়, আর যেখানে পানি পাওয়া না যায় যেখানে পান করাইলে সে যেন মৃত ব্যক্তির জীবন দান করিল। অন্য হাদিছে আছে আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ পছন্দনীয় আমল হইল ক্ষুধাতুরকে খাবার দান করা অথবা তাহার কর্জ পরিশোধ করিয়া দেওয়া অথবা তাহার কোন দুর্দশা মোচন করা।

ওবায়েদ বিন ওমায়ের বলেন কেয়ামতের দিন মানুষ ভীষণ ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া উলঙ্গাবস্থায় উঠিবে। অতএব যেছু নিয়াতে কাহাকেও আহার করাইয়াছিল আল্লাহ পাক সেদিন তাহার পেট ভরিয়া দিবেন আর যে আল্লাহর ওয়াস্তে পানি পান কারাইয়াছিল আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সেদিন পিপাসামুক্ত করিয়া দিবেন, আবার যে কাহাকেও কাপড় পরাইয়াছিল আল্লহ পাক তাহাকে কাপড় পরাইবেন।

(১৪) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه قال كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر ه (مشكوة)

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি বিধবা নারীর ও মিসকীনের জরুরত পুরা করার চেষ্টা করে সে যেন জেহাদে লিপ্ত। আমার মনে হয় আরও ফরমাইয়াছেন, সে ঐ নামাজীর সমতুল্য যে নামাজে কোন আলসতা করে না, আর ঐ রোজাদারের সমতুল্য যে কখনও রোজা ভঙ্গ করে না। (মেশকাত)

"আরমেলা' শব্দের অর্থ হইল যে স্বামী হারা হইয়া গিয়াছে বা যে এখনও স্বামী গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই; এই উভয় প্রকার নারীর উপকারের চেষ্টার একই ফজীলত, চেষ্টার ফল হউক বা না হউক। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুছলমান ভাইয়ের উপকারের জন্য চলে সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। আর একটি

হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন বিপর্য্যস্থ ভাইয়ের সাহায্য করে আল্লাহ্ পাক এমন দিনে তাহার পদদ্বয়কে মজবুত রাখিবেন যেদিন পাহাড় পর্যন্ত আপন স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে।

একটি হাদীছে এরশাদ হইতেছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের দুনিয়াবী কোন হাজত পূর্ণ করে আল্লাহ পাক তাহার সত্তরটি হাজত পূর্ণ করেন উহার মধ্যে সর্ব নিম্ন হইল তাহার গোনাহ মাফ করা, (কানজ) আরও এরশাদ হইতেছে যে ব্যক্তি সরকারের নিকট কাহারও প্রয়োজন পেশ করায় সাহায্য করে যদ্দ্বারা সে উপকৃত হয় বা তার কোন সমস্যা দূর হয় কেয়ামতের দিন পুলছেরাত পার হওয়ার সময় যখন বহু লোকের পা পিছলাইয়া যাইবে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন।

সুতরাং সরকারী কর্মকর্তাদের উপর যাহাদের প্রভাব রহিয়াছে বা মুনিবের নিকট যেসব নওকরের প্রতিপত্তি রহিয়াছে তাহারা যেন অধীনস্তদের প্রয়োজনাদী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করে। অন্যদের ঝামেলায় আমি কেন লিপ্ত হইব এই ধরনের চিন্তা না করা উচিত, কারণ পুলছেরাত পার হওয়া বড়ই কঠিন সমস্যা, অতএব এই সামান্য চেষ্টায় যদি উক্ত কঠিন সমস্যার সমাধান হয় তবে কতইনা সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু যাবতীয় কাজ যশ ও খ্যাতির জন্য না হইয়া শুধু আল্লাহ্র জন্য হইতে হইবে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাজ হইলে সম্মান ও খ্যাতি আপনা আপনি হাসিল হইয়া যাইবে, যাহা ইচ্ছা সত্ত্বেও হয় না।

(১৫) عن ابى ذر (رض) قال قال رسول الله (ص) ثلثة يحبهم الله وثلثة يبغضهم الله ٥ (الحديث)

"প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ভালবাসেন আর তিন ব্যক্তিকে খুব বেশী না পছন্দ করেন, যেই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তাহারা হইল এই (১) জনৈক ভিক্ষুক কোন এক দলের নিকট আসিয়া আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু ভিক্ষা চাহিল, সে কোন আত্মীয়তার দোহাই দেয় নাই। উক্ত দলের লোকেরা তাহাকে কিছুই দিল না, কিন্তু এক ব্যক্তি গোপনে ভিক্ষুকের হাতে কিছু দিল যাহা ফকীর ব্যতীত বা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানিল না, এই ব্যক্তিকে খোদা তায়ালা ভালবাসেন। (২) একটি কাফেলা

রাত্রি বেলায় পথ চলিতে চলিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে ঘুমই তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হয়, অতঃপর তাহারা নিদ্রা মগ্ন হইয়া পড়ে কিন্তু তখন এক ব্যক্তি নামাজে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহর দরবারে অনুনয় বিনয় করে ও কোরান তেলাওয়াত করিতে শুরু করে। (৩) এক ব্যক্তি কোন মুজাহেদ বাহিনীতে শরীক হয়। শত্রুর মোকাবেলায় উক্ত বাহিনী পরাজয় বরণ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তি দৃঢ় পদে বুক পাতিয়া দাঁড়ায় অতঃপর হয় শহীদ হইয়া যায়, না হয় বিজয়ী হয়, আর যাদেরকে আল্লাহ পাক না পছন্দ করেন সেই তিন শ্রেণী হইল---(১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) অহংকারী ভিক্ষুক, (৩) অত্যাচারী ধনী।

একটি হাদীছে আসিয়াছে তিনটি খাচ ওয়াক্তে দোয়া অবশ্যই কবুল হইয়া থাকে, ১নং যে ব্যক্তি এমন জনমানব শুন্য জঙ্গলে নামাজ পড়ে যে তাকে কেহই দেখে না, ২নং যে ব্যক্তি কোন জমাতের সহিত জেহাদে শরীক হয়, কিন্তু তার সঙ্গীরা সকলেই পলায়ন করিলে সে একাই বুক পাতিয়া যুদ্ধ করিতে থাকে এবং এক ব্যক্তি সে রাত্রে উঠিয়া আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন কোন কথা বলিবেন না, তাহাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন না, আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। ১ম বৃদ্ধ জিনাকার ২য় মিথ্যাবাদী বাদশাহ, ৩য় অহঙ্কারী ফকীর, তাহাদেরকে পবিত্র করার অর্থ হইল তাহাদিগকে পাপমুক্ত করিবেন না বা তাহাদের প্রশংসা করিবেন না। অন্য হাদীছে আসিয়াছে তিন ব্যক্তির এক ব্যক্তি হইল কছমখোর ব্যবসায়ী, অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের সময় কথায় কথায় শুধু কছম খায়। অন্য হাদীছে আছে আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি হইল সেই ব্যক্তি যাহাকে প্রতিবেশীরা কষ্ট দেয় কিন্তু সে ছবর করে ও এই অবস্থায় হয় মৃত্যু না হয় ছফর করিয়া তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আর অপ্রিয়জনের একজন হইল কছমখোর ব্যবসায়ী দ্বিতীয়জন অহংকারী ফকীর, তৃতীয় জন যে কৃপণ ব্যক্তি দান করিয়া পরে খোঁটা দেয়।

(১৬) عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله (ص)
ان فى المال لحقا سوى الزكواة ثم تلا ليس البر ان
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الاية ٥

ফাতেমা বিন্তে কয়েছ বর্ণনা করেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন ধন সম্পদের মধ্যে জাকাত ব্যতীত আরও কিছু হক রহিয়াছে, তারপর হুজুর এই আয়াত তেলাওয়াত করেন লাইছাল বের্‌রা---

এই আয়াত দ্বারা হুজুর (ছঃ) প্রমাণ করিয়াছেন যে, জাকাত ব্যতীত মালের মধ্যে অন্যান্য হকও রহিয়াছে, যেহেতু মালকে আত্মীয়স্বজন এতীম গরীব মিসকীন, মোছাফের এবং গোলাম আজাদ করার মধ্যে খরচ করার উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে, তারপর ভিন্ন ভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোছলেম বিন ইয়াছার বলেন. নামাজ দুই প্রকার ফরজ ও নফল, জাকাতও দুই প্রকার ফরজ ও নফল। উভয় প্রকারের কথা কোরানে উল্লেখ রহিয়াছে, তারপর তিনি কোরানের আয়াত পাঠ করিয়া প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। আল্লামা তীবি বলেন হাদিছে বর্ণিত 'হক শব্দের অর্থ হইল ভিক্ষুককে, কর্জ প্রার্থীকে, ঘরের মামুলী সাজ সরঞ্জাম যেমন হাড়ি বাটি, দা, কুড়াল, পানি লবণ আগুণ ইত্যাদি চাহিলে বঞ্চিত না করা। মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন হাদীছে জাকাত ছাড়া আর যে সব দানের কথা উল্লেখ আছে উহার উদ্দেশ্য হইল আত্মীয়তা রক্ষা করা এতীম মিসকীন মোছাফের ও ভিক্ষুককে দান করা এবং মানুষের ঘাড়কে দাসত্ব মুক্ত করা। (মেশকাত)

মাজাহেরে হক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লাহ তায়ালা প্রথমে মোমেনদের এই মর্মে প্রশংসা করেন যে তাহারা আত্মীয় স্বজনও এতীম ইত্যাদিকে দান করে, তারপর নামাজ ও জাকাত আদায় করার উল্লেখ করিয়া তাহাদের প্রশংসা করেন, ইহা দ্বারা পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন খাতে মাল দান করা ভিন্ন জিনিস আর জাকাত আদায় করা ভিন্ন জিনিস।

আল্লামা জাচ্ছাছ রাজী বলেন কোন কোন ওলামাদের মতে আয়াত শরীফে ওয়াজেব হক্‌ক সমূহ বুঝান হইয়াছে, যেমন সংকটাপন্ন আত্মীয়-দের সাহায্য করা অথবা বিপদ গ্রস্থ মানুষের সাহায্য করা। তারপর আল্লামা হুজুরের বাণী "মালের মধ্যে জাকাত ছাড়াও হক রহিয়াছে" ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহা দ্বারা অবশ্য করণীয় হক সমূহও হইতে পারে আর নফল হুক্কও হইতে পারে।

ফৎওয়ায়ে আলমগিরীতে আছে যখন কোন দরিদ্র বাহিরে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতে অক্ষম হয় তখন যাহাদের তাহার হালত জানা আছে তাহাদের উপর এই পরিমাণ খানা তাহাকে দেওয়া জরুরী যদ্দ্বারা সে বাহিরে গিয়া ফরজ আদায় করিতে সক্ষম হয়। আর যদি তাহার সামর্থ না থাকে তবে যাদের সামর্থ আছে তাহাদেরকে জানাইতে হইবে। যদি সেই অভাব গ্রস্থ ক্ষুধায় মারা যায় তবে আশেপাশের সবাই গোণাহগার হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে যদি সেই অভাবী ব্যক্তি বাহির হইবার সামর্থ রাখে কিন্তু উপার্জনে সক্ষম নয়; তখন জ্ঞাত ব্যক্তিদের ছদকা করিয়া তাহাকে সাহায্য করা জরুরী, আর যদি সে উপার্জন করিতে সক্ষম হয় তবে তার পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম। তৃতীয় কথা হইল ফকীর যদি বাহির হইতে সক্ষম হয় অথচ উপার্জন করিতে অক্ষম তখন তার জন্য ভিক্ষা করা জরুরী এবং ভিক্ষা না করিলে গোনাহ্গার হইবে।

(আলমগিরী)

কোন বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ

(১৭) عن بهيسة عن ابيها قالت قال يا رسول الله (ص) ما الشيء الذى لا يحل منعه قال الماء قال يا نبى الله ما الشيء الذى لا يحل منعه قال الملح قال يا نبى الله ما الشيء الذى لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خير لك مشكوة ٥

হজরত বোহায়ছা (রাঃ) বলেন আমার বাবাজান নবীয়ে করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর! কোন্ বস্তু কেহ চাহিলে নিষেধ করা নাজায়েজ? হুজুর ফরমাইলেন পানি। আবার জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর ফরমাইলেন লবণ, আবার প্রশ্ন করিলে বলেন যে কোন নেক কাজ করাই তোমার জন্য মঙ্গল। (মেশকাত)

পানির দ্বারা উদ্দেশ্য যদি কুয়ার পানি হয় আর লবনের উদ্দেশ্য খনির লবণ হয় তবে সত্যই কাহাকেও উহা হইতে ফিরান শরীয়তে নাজায়েজ, আর যদি উহা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন হয় তবে হুজুরের উদ্দেশ্য হইল এত সাধারণ জিনিস হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করার কোন কারণ নাই যেহেতু ইহাতে দাতার কোন ক্ষতি হয় না অথচ গ্রহিতার

বড় উপকার হয়?

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন তিন বস্তুতে বাধা প্রদান করা জায়েজ নাই; পানি, লবণ, আগুন; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম হুজুর! পানির ব্যাপারটাত বুঝে আসিল, কিন্তু লবণ এবং অগুনের ব্যাপার বুঝে আসিল না. হুজুর ফরমাইলেন 'হোমায়রা" (আয়েশার স্নেহ প্রসুত নাম) আগুন দান করিলে যেমন নাকি সেই আগুন দ্বারা পাকানো যাবতীয় খাদ্য দান করিল, আর লবণ দান করিলে যেমন নাকি লবণ দ্বারা স্বাদযুক্ত যাবতীয় খাদ্য দান করিল. অতঃপর হুজুর (ছঃ) একটা বিধি বিধান ফরমাইলেন, "যতটুকু ভাল কাজ করিবে উহাই তোমার জন্য মঙ্গল" বাস্তবিক পক্ষে কাহারেও সহিত এহছান করার অর্থই হইল নিজের উপর এহছান করা।

(১৮) عن سعد بن عبادة (رض) قال يارسول الله (ص) ان ام سعد ماتت فاى الصدقة افضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لام سعد ० (مشكوة)

হজরত ছায়াদ (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! ছায়াদের মাতা এন্তেকাল করিয়াছেন, তাহার জন্য কিরূপ ছদকা উত্তম হইবে? হজরত (ছঃ) ফরমাইলেন 'পানি, তদনুসারে ছায়াদ তাহার নামে একটি কূপ খনন করিয়া দেন। (মেশকাত)

পানিকে সর্বোত্তম বলা হইয়াছে, কেননা সকলের জন্য পানির প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, তদুপরি তখনকার দিনে মদিনায়ে মোনাওয়ারায় পানির প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি পানির ব্যবস্থা করিবে এবং উহা হইতে মানুষ, জিন, পশুপক্ষী যত প্রাণী পান করিবে, কেয়ামত পর্যন্ত তার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করিবে।

হজরত আবদুল্লাহ বিন মোবারকের খেদমতে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া আরজ করিল, হুজুর! আমার হাঁটুতে সাত বৎসরের পুরাতন একটা জখম আছে বহু ডাক্তার ও ঔষধের আশ্রয় লইয়াছি কিন্তু সব ব্যর্থ। হজরত এবনে মোবারক বলেন, যেখানে পানির অভাব সেখানে একটা কূপ খনন করিয়া দাও আমি আল্লাহর দরবারে আশা করি কূপ হইতে পানি

বাহির হইবার সাথে সাথে তোমার জখমের রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। বাস্তবিকই লোকটি যখন কূপ খনন করিল তখন তাহার গায়ের জখমও ভাল হইয়া গেল, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবদুল্লাহ হাকেমের মুখ মণ্ডলে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তিনি ওস্তাদ আবু ওছমান ছাবুনীর নিকট দোয়ার অনুরোধ জানাইলেন। জুমার দিন ছিল তিনি দোয়া করিতে লাগিলেন ও লোকজন আমীন বলিতে লাগিল, পরের জুমার দিন জনৈকা নারী তাঁহার দরবারে এক টুক্‌রা কাগজ পেশ করিল, তাহাতে লেখা ছিল— আমি ঘরে গিয়া হজরত হাকেমের জন্য খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করিতে ছিলাম। রাত্রি বেলায় হুজুরে পাক (ছঃ) এর জিয়ারত নছীব হয়। হুজুর এরশাদ করেন হাকেমকে বল সে যেন মুছলমানদের জন্য পানির ব্যবস্থা করিয়া দেয়। হাকেম এই কথা শুনিয়া ঘরের সামনে একটা পানির ট্যাঙ্কি নির্মাণ করিয়া দেন উহার মধ্যে বরফ ঢালারও ব্যবস্থা করেন, ফলে একসপ্তাহের মধ্যে তাহার চেহারা ভাল হইয়া আগের চেয়ে উজ্জ্বল হইয়া যায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে হজরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন হুজুর আমার আম্মা জীবিত থাকিতে আমার মাল দ্বারা হজ্জ করিতেন ও ছদকা খয়রাত করিতেন, এখন আমি যদি তাঁহার তরফ হইতে এইসব আদায় করি তিনি কি ছওয়াব পাইবেন? হুজুর বলেন নিশ্চয় পাইবে। এই প্রকার জনৈক মেয়েলোককেও হুজুর (ছঃ) তাহার মায়ের তরফ থেকে ছদকা করিতে হুকুম করেন। আপন মাতা-পিতা ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের কোন সম্পদ তোমাদের হাতে আসিয়াছে অথবা কোন লোকের যদি তোমাদের উপর বিশেষ কোন দান থাকে, এবং ওস্তাদ পীর-মাশায়েখ প্রভৃতির উপর ছওয়াব রেছানী করা তোমাদের উপর নেহায়েত জরুরী, ইহা বড়ই লজ্জার ব্যাপার যে, একটা লোক জীবিতাবস্থায় তুমি তাহার দ্বারা উপকৃত হইবে অথবা ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করিবে অথচ মৃত্যুর পর তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। মানুষ মরণের পর যাবতীয় আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়, শুধু মাত্র ছদকায়ে জারিয়ার ছওয়াব পায়, আর অন্যান্যেরা ছওয়াব রেছানী এবং দোয়ার এন্তেজার করিতে থাকে।

হাদীছে আসিয়াছে মৃত ব্যক্তি কবরে সেই ডুবন্ত ব্যক্তি [illegible]

অবস্থায় পতিত হয় যে চারি দিক থেকে শুধু সাহায্যের আশাই করিয়া থাকে আর বাপ ভাই বা কোন বন্ধুর তরফ হইতে কিছুটা দোয়ার হাদিয়া পৌঁছিবে এই এন্তেজারে থাকে। কোন প্রকার সাহায্য পাইলে উহা তাহার নিকট তামাম দুনিয়ার চেয়ে অধিকতর প্রিয় বলিয়া মনে হয়।

বাশার বিন মানছুর বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি প্লেগের জামানায় জানাজায় বেশী বেশী করিয়া শরীক হইত ও সন্ধ্যা বেলায় কবরস্থানের গেইটে দাঁড়াইয়া এই দোয়া পড়িত—

آنَسَ اللهُ وَحْشَتَكُمْ وَرَحِمَ غُرْبَتَكُمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَقَبِلَ اللهُ حَسَنَاتِكُمْ ۝

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গ দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিন এবং তোমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি রহম করুণ, তোমাদের গুণাহ সমূহ মাফ করুন এবং নেকী সমূহ কবুল করুন।

এ দোয়া পড়িয়া সে প্রতিদিন চলিয়া যাইত। ঘটনাক্রমে সে এক দিন পড়িতে পারে নাই, রাত্রি বেলায় স্বপ্নে দেখে যে বিরাট এক জমাত তাহার নিকট হাজির, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কে? তাহারা বলিল আমরা কবরস্থানের বাসিন্দা, প্রতিদিন আপনার তরফ হইতে হাদিয়া পৌঁছিত। তিনি বলিলেন কেমন হাদিয়া? তাহারা বলিল আপনি যে প্রতিদিন সন্ধা বেলা দোয়া করিতেন উহা হাদিয়া স্বরূপ আমাদের নিকট পৌছিত। হজরত বাশার বলেন তার পর হইতে সে আর কখনও দোয়া তরক করে নাই।

ইছালে ছওয়াব

বাশ্‌শার বিন গালেব নজরানী বলেন আমি হজরত রাবেয়া বছরীর জন্য খুব দোয়া করিতাম। একদিন স্বপ্ন যোগে তিনি আমাকে বলিলেন বাশ্‌শার তোমার হাদিয়া আমার নিকট নূরের তস্তরীতে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় পৌছিয়া থাকে। আমি বলিলাম সেটা কি

জিনিস ? তিনি বলিলেন মুর্দাদের জন্য মুছলমানের যে সব দোয়া কবুল হইয়া থাকে উহা নূরের বরতনে করিয়া রেশমী গেলাফে ঢাকা অবস্থায় তাহার নিকট পৌছে ও বলা হয় ইহা অমুকের তরফ হইতে তোমার জন্য হাদিয়া আসিয়াছে।

আল্লামা নব্বী (রঃ) লিখিয়াছেন মুর্দার নিকট ছদকার ছওয়াব পৌছার ব্যাপারে মুছলমানের মধ্যে কোন এখতেলাফ নাই। ইহাই সঠিক মত। যাহারা লিখিয়াছে মওতের পর মুর্দার নিকট আর কোন ছওয়াব পৌছেনা উহা সম্পূর্ণ বাতেল মতবাদ। উহা কোরান হাদীছ ও এজমায়ে উম্মতের খেলাফ।

শায়েখ তকিউদ্দিন বলেন যাহারা মনে করে যে মৃত ব্যক্তি শুধুমাত্র নিজের আমলেরই ছওয়াব পায় তাহারা উম্মতের একটা সর্বসম্মত মতবাদের বিরোধিতা করে। কারণ এজমায়ে উম্মত হইল যে, মানুষের দোয়া মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছে। হুজুরে আকরাম (ছঃ) ও আম্বিয়ায়ে কেরাম ময়দানে হাশরে সুপারিশ করিবেন। বুজুর্গানে দ্বীন ও সুপারিশ করিবেন! তদুপরি ফেরেশতাগণ মোমেনদের জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করেন এই সবইত অন্যের আমল দ্বারা লাভবান হওয়া। তাছাড়া আল্লাহ পাক স্বীয় মেহেরবাণীতে অনেকের গুনাহ মাফ করিবেন। মোমেনদের আওলাদ পিতা মাতাকে সাথে করিয়া জান্নাতে গমন করিবে। বদলী হজ্ব করিলে মৃত ব্যক্তির জিম্মা হইতে ফরজ আদায় হইয়া যায়। এই সবই অন্যের আমলের দ্বারা লাভবান হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

জনৈক বুজুর্গ বলেন আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাহার হালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে আমার দিকে একটা আগুণের শিখা আসিতেছিল, কোন এক ব্যক্তির দোয়ার বরকতে উহা আমার নিকট আসিতে পারে নাই। দোয়া না হইলে আমার উপায় ছিল না।

আলী বিন মুছা হাদ্দাদ (রঃ) বলেন আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে কোন এক জানাজায় শরীক ছিলাম। মোহাম্মদ বিন কোদামা জওহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই লাশ দাফন হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পার্শে বসিয়া কোরআন পড়িতে লাগিল। ইমাম সাহেব বলেন এইরূপ তেলাওয়াত করা বেদআত। ফিরিয়া আসিয়া মোহাম্মদ বিন কোদামা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মোবাশ্বের বিন ইছমাইল আপনার মতে কেমন লোক ? ইমাম সাহেব বলেন তিনি

খুব বিশ্বস্থ লোক। এব্‌নে কোদামা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিখিয়াছেন? তিনি বলেন হঁ্যা শিখিয়াছি। তারপর মোহাম্মদ বিন কোদামা বলেন মোবাশ্বের আমাকে বলিয়াছেন আবদুর রহমান বিন আলা বিন জাল্লাজ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার এন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার কবরের পার্শ্বে ছুরায়ে বাকারার প্রথমাংশ তেলাওয়াত করার অছিয়ত করিয়া গিয়াছেন সাথে সাথে তিনি ইহাও বলেন যে; আমি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমরকে এইরূপ অছিয়ত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম সাহেব এই ঘটনা শুনিয়া এব্‌নে কোদামাকে বলেন যাও তুমি অন্ধকে কোরআন তেলাওয়াত করিতে বল।

মোহাম্মদ বিন আহমদ মারওয়াজী বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে (রঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যখন তোমরা কবরস্থানে যাও তখন ছুরায়ে ফাতেহা, কুলহুয়াল্লাহ, কুল আউজু বিরাব্বিল্ ফালাকে, কুল আউজু বিরাব্বিন্নাছে পড়িয়া মুর্দাদের জন্য বখ্‌শিশ করিয়া দিও। ইহার ছওয়াব তাহারা পাইয়া যাইবে। ফজলুল মাজহুদ গ্রন্থে লিখিত আছে কেহ রোজা নামাজ বা ছদকা করিয়া অন্য কাহাকেও বখশিয়া দিলে সে পাইয়া যাইবে, চাই সে জীবিত হউক বা মৃত হউক। হজরত আবু হোরায়রা রাঃ) বলেন এমন কোন ব্যক্তি কি আছেযে এই কথার জিম্মাদারী নিতে পারে যে, সে বসরার নিকটবর্তী মসজিদে আশ্‌শারে গিয়া দুই রাকাত বা চার রাকাত নামাজ পড়িয়া বলে ইহার ছওয়াব আবু হোরায়রার জন্য দান করা হইল। মূল কথা আপন প্রিয় মুর্দাদের জন্য ছওয়াব রেছানী করা খুবই জরুরী, তাহাদের হক ছাড়াও অতিসত্বর মৃত্যুর পর তাহাদের সহিত মিলিতে হইবে তখন কত বড় লজ্জা হইবে। কত বড় অন্যায় কথা তাহাদের মাল ও এহছান দ্বারা উপকৃত হওয়া সত্বেও তাহাদেরকে ভুলিয়া যাওয়া।

মৃত্যুর পর তিনটি ব্যতীত যাবতীয় আমল বন্ধ হইয়া যায়

(১৯) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلثة الا من صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعوله ٥

"নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করেন মানুষ যখন মরিয়া যায় তখন

তাহার সমস্ত আমল বন্ধ হইয়া যায়, তবে তিনটা আমলের ছওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পাইতে থাকে। ১ম ছদকায়ে জারিয়া, ২য় যেই এলেমের দ্বারা লোকে উপকৃত হয়, ৩য় ঐ নেক সন্তান যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকে।"

আল্লাহ পাকের কত বড় মেহেরবানী যে, মানুষ যদি চায় যে মৃত্যুর পরেও সে কবরে শুইয়া শুইয়া আরাম করিবে ও তাহার নেক আমল বাড়িতে থাকিবে তাহার ও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম হইল ছদকায়ে জারিয়া, যেমন মসজিদ মাদ্রাসা মুছাফেরখানা, বা পুল অথবা পানির ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া, যতদিন পর্যন্ত মসজিদে নামাজ হইবে, মাদ্রাসায় এলেমের চর্চা হইবে ও দান করা জিনিস দ্বারা মানুষ উপকৃত হইতে থাকিবে ততদিন সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে। এই ভাবে যদি কোন তালেবে এলেমের সাহায্য করিল বা কাহাকেও কোরান শরীফ ও কিতাব দান করিল অথবা কাহাকেও হাফেজ বানাইয়া গেল তাহারা এলেম শিখিয়া আবার অন্যকে পড়াইল, এইভাবে যতদিন এলেমের ছিলছিলা চলিতে থাকিবে ততদিন তার আমল নামায় ছওয়াব লেখা হইতে থাকিবে। তাই তাহারা সাহায্যকারীর রুহের উপর ছওয়াব রেছানী করুক বা না-ই করুক, আল্লাহ ও রাছুলের বিধান মোতাবেক সে ছওয়াব পাইতে থাকিবে।

বড়ই ভাগ্যবান ঐ সব লোক যাহারা দ্বীনকে জিন্দা রাখার ব্যপারে নিজেদের অর্থ সম্পদকে সর্বশক্তি দিয়া নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দুনিয়ার জিন্দেগী স্বপ্নের চেয়ে অধিক কিছু নয়, কাহারো জানা নাই যে কখন হঠাৎ করিয়া এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, সুতরাং যাহা কিছুই মূলধন নিজের জন্য রাখিয়া যাইবে উহাই চিরস্থায়ী এবং চির উপকারী। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব স্ত্রী পুত্র সকলেই দু-চার দিন কান্না কাটি করিয়া নিজ নিজ কাজে কর্মে লাগিয়া যাইবে। প্রকৃত কাজে আসিবে ঐসব বস্তু যাহা মানুষ নিজের জীবন থাকিতেই কখনও ধ্বংস হইবার নয় এমন এক সুরক্ষিত ব্যাঙ্কে জমা করিয়া রাখিবে, যাহার ফায়েদা সে কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করিতে থাকিবে।

হাদীছে উল্লেখিত আরেক বস্তু হইল নেক আওলাদ, যে মৃত্যুর পর তাহার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে। প্রথমতঃ নেক সন্তান বানাইয়া

যাওয়াই একটা ছদকায়ে জারিয়া, কেননা নেক সন্তান যত প্রকার নেক কাজ করিবে মাতা পিতার আমল নামায় উহার একটা অংশ স্বাভাবিক ভাবেই পৌছিয়া যাইবে। তদুপরি সন্তান যদি দোয়া করে উহা ত পৌছিতেই থাকিবে।

জনৈকা মহিলার কেচ্ছা

বাহিয়া নামক জনৈকা পূন্যবতী মহিলা এন্তেকালের সময় আছমানের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিল হে জাতে পাক ! তুমিই একমাত্র আমার আশা ভরসা ও আশ্রয়স্থল, আমাকে মৃত্যুর সময় বে-ইজ্জত করিও না এবং কবরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ফেলিও না। যখন তাহার এন্তেকাল হইয়া গেল তখন তাহার ছেলে প্রতি জুমার দিন তাহার কবরের ধারে গিয়া কোরান শরীফ পড়িয়া তাহাকে ছওয়াব বখশিশ করিয়া দিত এবং তার জন্য ও সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করিত। একদিন সেই ছেলে তাহার মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল আম্মা ! তোমার কি অবস্থা ; সে উত্তর করিল মওতের কষ্ট ভীষণ কষ্ট, আমি আল্লাহর মেহেরবাণীতে কবরে বড় শান্তিতে আছি। আমার নীচে রাইহানের বিছানা আছে ও রেশমের তাকিয়া লাগানো আছে। কেয়ামত পর্যন্ত আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইবে। ছেলে বলিল আম্মা আমি কি আপনার কোন খেদমত করিতে পারি ? সে বলিল তুমি প্রতি শুক্রবার আমার কবরের পার্শ্বে আসিয়া কোরান পড়াকে কখনও ত্যাগ করিবে না। তুমি যখন আস তখন সমস্ত কবরস্থান ওয়ালা আমার নিকট সন্তুষ্ট চিত্তে আসিয়া ভিড় জমায় ও আমাকে খবর দেয় তোমার ছেলে আসিয়া গিয়াছে। তোমার আগমনে তাহারা খুবই সন্তুষ্ট হয়। ছেলে বলে যে তার পর হইতে আমি আরও বেশী এহ্তেমামের সহিত প্রতি জুমায় সেই কবরস্থানে যাইতাম ; একদিন আমি স্বপ্ন যোগে দেখিতে পাইলাম যে, নারী পুরুষের এ বিরাট দল আমার নিকট হাজির। আমি তাহাদিগকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল আমরা তোমার শোকরিয়া আদায় করিতে আসিয়াছি। যেহেতু প্রতি শুক্রবার তুমি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিতে থাক ; ইহাতে

আমরা বড় আনন্দিত হই, এই ছিলছিলাকে তুমি বন্ধ করিও না।

অন্য একজন আলেম বলিতেছিল জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইল যে হঠাৎ একটি কবরস্থান ফাটিয়া গেল এবং সেখান হইতে অনেক গুলি মুর্দা বাহির হইয়া আসিয়া আশপাশ হইতে কি যেন সংগ্রহ করিতে লাগিল, আর এক ব্যক্তি দিব্যি আরামে বসিয়া আছে। আমি তার নিকট গিয়া ছালাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ভাই ইহারা কি তালাস করিতেছে আর তুমিইবা নিশ্চিন্তে কেন বসিয়া আছ। সে বলিল এই কবরস্থান ওয়ালাদের জন্য যে সব ছদকা, দোয়া দুরূদ ইত্যাদি আসিয়া থাকে ইহারা উহার বরকত সমূহ সংগ্রহ করিতেছে। আর আমি এই জন্য নিশ্চিন্তে বসিয়া আছি যে, আমার এক ছেলে অমুক বাজারে জিলাবী বিক্রয় করিয়া থাকে। সে দৈনিক এক খতম কোরআন শরীফের ছওয়াব আমার জন্য পাঠাইয়া থাকে। লোকটি বলিল আমি ভোর বেলায় উঠিয়া বাজারে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে বাস্তবিকই সেই যুবক জিলাবী বিক্রয় করিতেছে আর তাহার ঠোঁট নড়িতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি পড়িতেছ? সে উত্তর করিল আমি দৈনিক এক খতম কোরান শরীফ পড়িয়া আমার বাবার রুহের উপর বখশাইয়া থাকি। এই ঘটনার বেশ কিছু দিন পর আমি আবার স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, সেই কবরস্থানের লোকজন আগের মত কি যেন সংগ্রহ করিতেছে, আর তাদের সাথে সাথে সেই লোকটিকেও সংগ্রহ করিতে দেখিলাম, যার সাথে আগে কথাবার্তা হইয়াছিল। এই স্বপ্নে আমি আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া ভোর বেলা উঠিয়া সেই বাজারে গেলাম এবং খবর নিয়া জানিতে পারিলাম সেই যুবকটির এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।

হজরত ছালেহ মুররী (রাঃ) ফরমাইতেছেন আমি একবার খুব প্রত্যুষে জামে মসজিদে ফজর নামাজ আদায় করিতে রওয়ানা হইয়াছিলাম। পথিমধ্যে জমাতের এখনও বিলম্ব আছে মনে করিয়া একটি কবর স্থানের খানিকটা পাশে বসিয়া পড়িলাম, আমার নিদ্রা আসিয়া গেল ও আমি স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, সেই কবরস্থান হইতে বহুলোক হাসি খুশি বাহির হইয়া আসিল, আপোসে কথা বার্তা বলিতে লাগিল,

আর একজন যুবক কবর হইতে বাহির হইয়া ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় বিষন্ন মনে বসিয়া রহিল। একটু পরেই আছমান হইতে অনেক ফেরেশ্‌তা অবতরণ করিল, প্রত্যেকের হাতে নূরের ঢাকনায় আবৃত খাঞ্চা সমূহ দেখিতে পাইলাম। তাহারা প্রত্যেকের হাতে একটা খাঞ্চা দিতে লাগিল ও মুর্দাগণ আপন আপন কবরে চলিয়া যাইতে লাগিল, পরিশেষে সেই যুবকটি খালী হাতেই কবরে প্রবেশ করিতে লাগিল আমি দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কেন ভাই তুমি এত চিন্তিত আর এইসব খাঞ্চাইবা কি, যুবক উত্তর করিল ভাই এই সব খাঞ্চা তাহাদের জীবিত আত্মীয়দের প্রেরিত হাদিয়া, আমাকে [illegible] কেহ নাই, তবে মাত্র এক মা আছেন তিনি বাবা ইন্তেকালের পর অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমি তাহার মায়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম ও ভোর বেলায় তার মায়ের কাছে গিয়া পর্দার আড়ালে থাকিয়া স্বপ্নে দেখা তার ছেলের বৃত্তান্ত বলিলাম। মহিলাটি বলিল নিশ্চয় আমার ছেলে ছিল, আমার কলিজার টুক্‌রা ছিল। সে আমাকে এক হাজার দেরহাম দান করিয়া বলিল আপনি ইহা আমার চক্ষের পুতলী ছেলের জন্য ছদকা করিয়া দিবেন, অতঃপর আমিও সর্বদা তাহাকে ছদকা এবং দোয়ার দ্বারা স্মরণ করিতে থাকিব। হযরত ছালেহ বলেন আমি পুনরায় যেই কবরস্থান ওয়ালাদের স্বপ্নে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে সেই নওজওয়ানকে অপূর্ব পোষাক পরিহিত খুব আনন্দিত দেখিতে পাই। সে আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল ছালেহ! তোমার হাদিয়া আমার নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছে। এইরূপ বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি চায় যে, আমার সন্তানগণ মৃত্যুর পরেও আমার কাজে আসুক তবে যেন সাধ্যমত তাহাদিগকে নেক বানাইবার জন্য চেষ্টা করে ইহাতে প্রকৃত পক্ষে নিজের উপকার ছাড়াও তাহাদের ও বিরাট উপকার করা হইল। আল্লাহ পাক ফরমাইতেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ٥

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের নফছকে এবং আপন পরিবার

পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

জায়েদ বিন আছলাম বলেন নবীয়ে করীম (ছঃ) যখন এই আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন তখন ছাহাবারা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ! পরিবার পরিজনকে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে? হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তাহাদিগকে এমন কাজের হুকুম করিবে যদ্দ্বারা আল্লাহ পাক রাজী হয় আর এমন কাজ হইতে নিষেধ করিবে যাহাতে আল্লাহ পাক নারাজ হয়। প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন অল্লাহ পাক ঐ পিতার উপর রহম করুণ যে সন্তানকে এমন কাজে সাহায্য করে যদ্দ্বারা সন্তান পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করে। নাফরমানী না করে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সন্তানের জন্মের সপ্তম দিবসে আকীকা করিয়া তাহার নাম রাখিতে হইবে। ছয় বৎসর বয়সে তাহাকে আদব কায়েদা শিখাইবে। নয় বছরের সময় তাহাকে ভিন্ন বিছানায় শোয়াইবে। তের বছরের সময় নামাজ না পড়িলে তাহাকে মারধর করিতে হইবে! ষোল বৎসর বয়স হইলে তাহাকে বিবাহ করাইতে হইবে। অতঃপর পিতা তাহার হাত ধরিয়া বলিবে আমি তোমাকে আদব শিখাইয়াছি। এলেম শিখাইয়াছি, শাদী করাইয়াছি। এখন আমি দুনিয়াতে তোমার ফেত্না হইতে আখেরাতে তোমার কারণে আজাব ভোগ করা হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাহিতেছি।

তোমার কারণে আজাব ভোগ করার অর্থ হইল পিতার অসাবধানতার কারণে পুত্র যদি গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় তবে শুধু পুত্রকে নয় পিতাকেও আজাব ভোগ করিতে হইবে। অতএব ছোটদের সম্মুখে অন্যায় করা হইতে বিশেষভাবে বিরত থাকিবে। এই হাদীছে নামাজের হুকুমের জন্য তের বৎসরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য হাদীছে আসিয়াছে সাত বৎসরের সময় নামাজের হুকুম করিবে, দশ বৎসরের সময় না পড়িলে মারধর করিবে। রেওয়ায়েত হিসাবে এই হাদিছটিই অধিক মজবুত।

এবনে মালেক বলেন আওলাদ নেককার হওয়ার শর্ত এই জন্য যে, বদকার সন্তানের ছওয়াব পৌঁছায় না। আর দোয়ার শর্ত সন্তানদের উৎসাহিত করার জন্য করা হইয়াছে, নতুবা সন্তান দোয়া করুক বা না-ই করুক নেক আওলাদের ছওয়াব পৌঁছিয়াই যায়। যেমন কেহ বৃক্ষ

লাগাইয়া গেলে উহার ফল ভক্ষণকারী দোয়া না করিলেও উহার ছওয়াব তার রুহে পৌঁছিয়া যায়।

আল্লামা মনাভী বলেন আওলাদের সহিত দোয়ার শর্ত এই জন্য করা হইয়াছে যেন তাহারা দোয়া করিতে না ভুলে, নচেৎ যে কোন লোকের দোয়াই উপকারে আসে, এ ব্যাপারে আওলাদের কোন বৈশিষ্ট নাই। আরও অনেক বস্তুর স্থায়ীত্বের কথা বর্ণিত আছে। যেমন আসিয়াছে কেহ যদি কোন সৎপ্রথা চালু করে, সে নিজের আমলের ছওয়াব ছাড়াও যাহারা তাহার অনুসরণ করিবে তাহার ছওয়াব ও সে লাভ করিবে, ইহাতে তাহার ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কম হইবে না। এই ভাবে কেহ কুপ্রথা চালু করিয়া গেলে নিজেই উহার সাজা ভোগ করিবে তার অনুসরণ কারীদের সাজাও সে ভোগ করিবে। আরও আসিয়াছে সিমান্ত পাহারার ছওয়াব, বৃক্ষ রোপণের ছওয়াব, নহর খননের ছওয়াব মৃত্যুর পরে পেঁীছিয়া থাকে। আল্লামা ছুয়ুতী এই সব আমল এগার ও এবনে এমাদ তের পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। কিন্তু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এই সবই প্রথম তিন বস্তুর মধ্যে শামিল।

(২০) عن عائشة انهم ذبحوا شاة فقال النبى (ص) ما بقى منها قالت ما بقى منها الا كتفها قال بقى كلها الا كتفها ० (مشكوة)

"আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) বলেন এক সময় তাঁহারা একটা বকরী জবেহ করেন ও উহা হইতে বণ্টন করিয়া দেন। প্রিয় নবী (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কি? হজরত আয়েশা বলেন, মাত্র একটা বাহু বাকী আছে। হুজুর ফরমাইলেন, না সবই আছে শুধু ঐ বাহুটাই নাই।

মতলব হইল যাহা লিল্লাহ ব্যয় হইয়াছে আসলে উহার সবই আছে আর যাহা বাকী রহিয়াছে উহার বিষয় জানা নাই যে কোথায় ব্যয় হইবে। আল্লাহর পথে না অন্য পথে। মাজাহেরে হকে উল্লেখ আছে এই হাদীছে এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ०

অর্থাৎ "যাহা কিছু দুনিয়াতে তোমাদের নিকট থাকে সব নিঃশেষ হইয়া যাইবে, আর যাহা আল্লাহর নিকট থাকে তাহাই চিরস্থায়ী" নাহাল

একটি হাদিছে বর্ণিত আছে রাছুলে আকরাম (ছঃ) বলেন লোকে বলে আমার মাল-আমার মাল, প্রকৃত পক্ষে তাহার মাল অতটুকু যতটুকু সে খাইয়াছে অথবা পরিয়াছে অথবা আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া নিজের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। ইহা ছাড়া বাকী সব সে অন্যের জন্য ছাড়িয়া যাইবে। একবার প্রিয় নবী (ছঃ) ছাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে নিজের মালের চেয়ে ওয়ারিশানের মালকে বেশী প্রিয় মনে করে? ছাহাবারা বলিলেন হুজুর! এমনত কেহ নাই বরং প্রত্যেকে নিজের সম্পদকে বেশী ভালবাসেন। হুজুর ফরমাইলেন মানুষের জন্য নিজের মাল অতটুকু যতটুকু সে আগে পাঠাইয়াছে, আর যাহা ত্যাগ করিয়া যায় উহা ওয়ারিশানের মাল।

জনৈক ছাহাবী এরশাদ করেন আমি এক সময় হুজুরের খেদমতে হাজির ছিলাম, হুজুর আল হা কুমুত্তাকাছুর পাঠ করিয়া এরশাদ ফরমাইলেন মানুষ বলে আমার মাল-আমার মাল! হে মানুষ! তুমি যাহা খাইয়া শেষ করিয়া দিয়াছ, অথবা পরিধান করিয়াছ অথবা ছদকা করিয়া আগে পাঠাইয়া দিয়াছ উহা ছাড়া তোমার আর কোন মাল নাই।

মানুষ সাধারণতঃ দুনিয়ার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে গুরুত্ব দিয়া থাকে কিন্তু উহা তাহার সাথী হইতে পারে? তার জীবদ্দশায় যদি গচ্ছিত টাকার উপর কোন বিপদ নাও আসে তবু মৃত্যুর পরে ত তার কোন কাজে আসিবে না! কিন্তু যে আল্লাহর ব্যাঙ্কে জমা করিল উহা অনন্তকাল তাহার কাজে আসিবে, উহার উপর বিপদের কোন আশঙ্কা নাই হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ তছতরী বেশী বেশী করিয়া দান খয়রাত করিতেন। তাঁহার মা ও ভাইগণ হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারকের খেদমতে অভিযোগ করিয়া বলিলেন, সে ত অল্পদিনের মধ্যে ফকীর হইয়া যাইবে। হজরত এবনে মোবারক হযরত তছতরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি বলেন, আপনিই বলুন দেখি, কোন মদিনাবাসী পারস্যের রোস্তাক শহরের কিছু জমি খরিদ করিয়া সেখানে চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, তবে কি সে মদিনায় কোন সম্পত্তি ছাড়িয়া যাইবে? এবনে মোবারক বলেন না, হযরত তছতুরী বলেন আসল ব্যাপার হইল এটাই! ওনার বক্তব্য

দ্বারা লোকে মনে করিয়াছিল যে, হযরত ছহল তছতুরী দেশ ত্যাগ করিতে চাহেন. কাজেই সব খরচ করিয়া ফেলিতেছেন, অথচ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এই জগত ত্যাগ করিয়া অন্য জগতে যাওয়া। (তাম্বিহুছ ছালেকীন)

বর্তমান জামানায় ও দেখা যায় যদি কোন ব্যক্তি এক দেশ হইতে অন্য দেশে স্থানান্তর হইতে চায় তবে প্রথমেই নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি সেই দেশে স্থানান্তর করার জন্য উদগ্রীব হইয়া পড়ে তদ্রূপ প্রকৃত জ্ঞানী যারা তারা জীবন থাকিতেই আপন ধনসম্পদকে পরকালের পাথেয় করার জন্য পেরেশান হইয়া পড়ে।

প্রতিবেশীর হক

(২১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت وفى رواية بدل الجار ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ۵
(متفق عليه)

"হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়, এবং জবান দ্বারা ভাল কথা বলে তা না হইলে চুপ থাকে। অন্য রেওয়ায়েতে 'প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়' ইহার পরিবর্তে আসিয়াছে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম রাখে।

(বোখারী মোসলেম)

আলোচ্য হাদীছে চারিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, প্রথমে মেহমানের সমাদর, দ্বিতীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া, তৃতীয় জবানকে সাবধানে চালনা করা নচেৎ চুপ থাকা, চতুর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক। প্রতিবেশীদের বিষয় বিভিন্ন রেওয়ায়েত আসিয়াছে, 'প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেনা প্রতিবেশীকে সমাদর করিবে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। একটি হাদীছে আসিয়াছে তোমরা কি জান

প্রতিবেশীর হক কি ? সে যদি সাহায্য চায়, তাহার সাহায্য করিবে। কর্জ চাহেত কর্জ দিবে, মোহ্‌তাজ হইলে সাহায্য করিবে, রুগ্ন হইলে সেবা শুশ্রূষা করিবে মারা গেলে জানাজার সহিত গমন করিবে, খুশীর হালতে মোবারকবাদ দিবে, দুঃখের হালতে সহানুভূতি দেখাইবে; তার ঘরের পাশে এত বড় উঁচু ঘর বানাইবেনা যদ্দারা তার ঘরে আলো বাতাস না লাগে। তুমি ফল খরিদ করিলে তাকেও কিছু হাদিয়া দিবে, হাদিয়া দেওয়া সম্ভব না হইলে, ঘরে চুপে চুপে খাইবে তোমার সন্তান গণ ও যেন ফলসহ ঘরের বাহির না হয়, তা না হইলে প্রতিবেশীর বাচ্চাদের মনে দুঃখ হইবে। ঘরের ধুয়া দ্বারা প্রতিবেশীর মনে কষ্ট দিও না, হ্যাঁ পাক করিয়া তাহাকে কিছুটা দিতে পারিলে সেটা হইল স্বতন্ত্র কথা। হুজুর (ছঃ) আরও বলেন, তোমরা কি জান প্রতিবেশীর হক কত বিরাট, যেই খোদার কুদরতী হাতে আমার জান তাঁহার কছম খাইয়া বলিতেছি, প্রতিবেশীর হক্ব ঐ ব্যক্তি বুঝিতে সক্ষম যাহার উপর আল্লাহ পাক রহম করেন। (ফতহুল বারী) (আরবাঈনে ইমাম গাজ্জালী)।

অন্য একটি হাদীছে আছে হুজুরে আকরাম (ছঃ) তিনবার বলেন—খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, খোদার কছম ঐ ব্যক্তি মোমেন নয়, কেহ আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ ! কোন ব্যক্তি ? হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন যার জুলুম অত্যাচার হইতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়। আর একটি হাদীছে আছে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিবে না যার উৎপীড়ন হইতে তার প্রতিবেশীরা নিরাপদ নয়।

এবনে ওমর ও হজরত আয়েশা (রাঃ) হুজুরের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হজরত জিব্রাইল প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমাকে এতবেশী তাকীদ করেন যে, আমার সন্দেহ হইতেছিল যে প্রতিবেশীদিগকে ওয়ারিশ বানাইয়া ছাড়ে নাকি। রাব্বুল আলামীন এরশাদ ফরমাইতেছেন—

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ

وَابْنِ السَّبِيلِ ۝ (نساء)

"এবং তোমরা আল্লাহর এবাদত কর তাঁহার সাথে কাহাকেও শরীক করিও না, এবং মাতা পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, অনুরূপ আত্মীয়দের সাথে, এতীম ও মিছকীনদের সাথে, ও নিকটতম প্রতিবেশী-দের সাথে, দূর প্রতিবেশীদের সাথে, আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে, এবং মোছাফেরদের সাথেও। (ছূরা নেছা ৬ রুকু)

নিকটতম প্রতিবেশী অর্থ যাহাদের ঘর কাছে রহিয়াছে তাদেরকে ও দূর প্রতিবেশী বলিতে যাদের ঘর দূরে রহিয়াছে তাদেরকে বুঝায়। হজরত হাছানবছরী পড়শীর সীমানা বলেন যে, সামনে চল্লিশ, পিছনে চল্লিশ, ডানে চল্লিশ ও বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত। মা আয়েশা হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন হুজুর আমার দুই পড়শী আছে আমি প্রথমে কোন্‌টির খবর গিরী করিব? হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন যাহার দরজা তোমার ঘরের দরজার নিকটে হয়। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত আছে প্রতিবেশী বলিতে আত্মীয়, দূর প্রতিবেশী বলিতে অনাত্মীয়কে বুঝায় নওফে শামী হইতে বর্ণিত, নিকট প্রতিবেশী অর্থ মুসলিম প্রতিবেশী ও দূর প্রতিবেশী অর্থ অমুসলিম প্রতিবেশী। (দুররে মানছুর) মছনদে বাজ্জাজ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত আছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন প্রতি-বেশী তিন প্রকার, ১ম ঐ পড়শী যাহার তিন প্রকার হক রহিয়াছে, প্রতিবেশী হওয়ার হক, আত্মীয়তার হক ও ইছলামের হক। ২য় ঐ পড়শী যাহার হক দুই প্রকার, পড়শী হওয়ার হক, ইসলামের হক। ৩য় যাহার একটি মাত্র হক, উহা হইল অমুসলিম পড়শী। ইমাম গাজ্জালী এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন দেখ শুধু পড়শী হওয়ার কারণে কাফেরের হকও মুছলমানের উপর সাব্যস্ত করা হইয়াছে। একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথ দুইজন প্রতিবেশীর মধ্যে ফয়ছালা

করা হইবে।

জনৈক ব্যক্তি এবনে মাছউদের নিকট প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে খুব বেশী অভিযোগ করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন যাও সে যদিও তোমার ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানী করে, তুমি কিন্তু তার বেলায় খোদার নাফরমানী করিও না। একটি ছহী হাদীছে কোন এক নারীর ঘটনা বর্ণিত আছে যে, সে খুব রোজাদার ও তাহাজ্জুদ গুজার ছিল কিন্তু প্রতিবেশীদের খুব কষ্ট দিত, হুজুর (ছঃ) তাহাকে জাহান্নামী বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ইমাম গাজালী (রাঃ) বলেন পড়শীদের হক শুধু তাহাদিগকে কষ্ট না দেওয়া নয়, বরং তাহাদের কষ্ট সহ্য করাও হকের মধ্যে শামিল। এবনুল মোকাফ্‌ফা সর্বদা তাঁর প্রতিবেশীর দেওয়ালের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন। পরে তিনি জানিতে পারিলেন লোকটি কর্জের চাপে ঘর বিক্রি করিতেছে এবনুল মোকাফ্‌ফা বলেন আমরা সর্বদা তার ঘরের ছায়াতলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু তার কোন হক আদায় করি নাই। তারপর তিনি ঘরের মূল্য তার হাতে দিয়া বলিলেন ঘরের মূল্যত পাইয়াছ, ঘর আর বিক্রি করিও না।

হজরত এবনে ওমরের গোলাম একবার একটা বকরী যবেহ করেন। তিনি বলিলেন দেখ, যখন ইহার চামড়া আলাদা করিবে তখনই সর্ব প্রথম আমার ইহুদী প্রতিবেশীকে কিছু গোশ্‌ত দিয়া দিবে। তিনি এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। গোলাম বলিল এই কথাটা এতবার বলার কি প্রয়োজন? এবনে ওমর বলিলেন আমি প্রিয় নবীকে বলিতে শুনিয়াছি হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুরকে প্রতিবেশী সম্পর্কে বেশী বেশী তাকীদ করিতেন তাই আমি তাঁহার অনুসরণ করিতেছি।

আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন মহৎগুন দশটি অনেক সময় এগুলি ছেলের মধ্যে দেখা যায় অথচ বাপের মধ্যে থাকে না, গোলামের মধ্যে দেখা যায় অথচ মনিবের মধ্যে হয় না। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই দান করিয়া থাকেন, (১) সত্য কথা বলা (২) মানুষের সহিত সততা পূর্ণ ব্যবহার করা ধোকা না দেওয়া। (৩) ভিক্ষুককে দান করা (৪) এহছানের বদলা দেওয়া (৫) আত্মীয়তা রক্ষা করা (৬) আমানতের হেফাজত করা (৭) প্রতিবেশীর হক আদায় করা (৮) সাথীদের হক আদায় করা (৯) মেহমানের হক আদায় করা (১০) আর

উল্লেখিত হাদীছে তৃতীয় বস্তু হইল, যে আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ঈমান রাখে সে যেন মুখে ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে। এবনে হাজার বলেন হুজুরের এই বানী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ! যেহেতু কথা দুই প্রকার, ভাল ও মন্দ, ভাল বলিতে ফরজ ওয়াজেব, মোস্তাহাব সব রকম ভালকেই বুঝায়, বাকী সবকিছুই মন্দ। আর যে কথার ভাল ও মন্দ কিছুই জানা নাই উহাও মন্দের মধ্যে শামিল।

হজরত মা উম্মে হাবীবা হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষের প্রত্যেক কথাই তার জন্য বিপদ ও কোন লাভজনক নয়, কিন্তু হ্যাঁ, যদি নেক কাজের হুকুম করে বা অন্যায় কাজে বাধা দেয় অথবা আল্লাহর জিকির করে। জনৈক ব্যক্তি এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া বলেন বড় সাংঘাতিক ব্যাপার তো, হজরত ছুফিয়ান বলেন এটা আবার সাংঘাতিক কিশের? স্বয়ং কোরানে মজীদে বর্ণিত আছে—

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ○ (نساء)

"মানুষের অধিকাংশ শলা-পরামর্শের মধ্যেই কোন ফায়েদা নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি ছদকাহ ও কোন সৎ কাজের হুকুম করে বা মানুষের মধ্যে পরস্পর এছলাহের কথা বলে, তার কথায় অবশ্য ফায়েদা রহিয়াছে। আর যে ব্যক্তি এইসব আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করে আমি তাহাকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করিব।"

হযরত আবু জর (রাঃ)-বলেন আমি প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরজ করি যে, হুজুর! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুজুর এরশাদ ফরমাইলেন, আমি তোমাকে খোদা ভীতির উপদেশ দিতেছি কারণ ইহা তোমার যাবতীয় কাজের অলঙ্কার স্বরূপ! আমি বলিলাম আরও কিছু বলুন, নবীয়ে পাক ফরমাইলেন কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকিরের প্রতি

অধিক মনোযোগী হও। কারণ ইহা আছমানে তোমার স্মরণের কারণ ও জমীনে তোমার জন্য নূর হইবে। আমি আরও কিছু চাহিলে হুজুর ফরমাইলেন অধিকাংশ সময় নীরব থাকিও ইহাতে শয়তান দূরে সরিয়া যায় ও দ্বীনী কাজে সাহায্য হয়। আমি আরও কিছু চাহিলে হুজুর বলেন অধিক হাসি হইতে বাঁচিয়া থাকিও, কারণ উহা দ্বারা অন্তর মরিয়া যায় এবং মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়। আমি আরজ করিলাম আরও কিছু, তিনি ফরমাইলেন, না পছন্দ হইলেও হক কথা বলিতে থাকিও। আমি আরও চাহিলে বলিলেন আল্লাহর বিষয়ে কাহাকেও ভয় করিও না। আমি আবার আরজ করিলাম পর প্রিয়নবী (ছঃ) ফরমাইলেন, নিজের দোষ অন্যের দোষ দেখা হইতে তোমাকে যেন ফিরাইয়া রাখে। (দুররে মানছুর)

জবান সম্পর্কে ইমাম গাজালীর অভিমত

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, জবান আল্লাহ তায়ালার বড় বড় নেয়ামত সমূহের অন্যতম, এবং তাঁহার নিপুন কারিগরীর একটা নমূনা, উহা আকারে ক্ষুদ্র অথচ উহার ছওয়াব ও গোনাহের আকার বৃহৎ। এমনকি ইছলাম ও কুফুর যাহা ছওয়াব ও পাপের শেষ প্রান্ত এই জবানের সহিতই সম্পর্কযুক্ত। অতঃপর তিনি জবানের বিপর্যয়গুলি বর্ণনা করেন অনর্থক কথাবার্তা, বাজে বাক্যালাপ ঝগড়া ফাছাদ, মুখ চেপ্টা করিয়া কথা বলা, কবিতার ভাব ভঙ্গীমায় কথা বলা, অশ্লিল কথা বলা, গালি-গালাজ, লা'নত, কবিতার ছড়াছড়ি, কাহারও সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ, কাহারও গুপ্তভেদ প্রকাশ করা, মিথ্যা ওয়াদা করা' মিথ্যা বলা, মিথ্যা কছম খাওয়া, কাহারও প্রতি কটাক্ষ করা, মিথ্যা অপবাদ রটানো, অথবা কাহারও প্রশংসা করা বা অযথা ছাওয়াল করা, ইত্যাদি ইত্যাদি বড় বড় পাপসমূহ এই ক্ষুদ্র জবানের সহিত সম্পর্কযুক্ত। তাই প্রিয় রাছুল (ছঃ) মানুষকে নীরব থাকার প্রতি উৎসাহ দিয়াছেন। এবং ফরমাইয়াছেন' যে নীরব থাকিল সে-ই নাজাত পাইল।

জনৈক ছাহাবী প্রিয় নবীজীর খেদমতে আরজ করিলেন হুজুর ! আমাকে ইছলাম সম্পর্কে এমন উপদেশ দান করুন যাহাতে আপনার পর আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়, হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং উহার উপর অটল থাক। তিনি বলিলেন

আমি কোন্ জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকিব ? বলিলেন নিজের জবান হইতে। অন্য ছাহাবী আরজ করিলেন কিসে নাজাত পাইব, এরশাদ হইল আপন জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখ, বিনা প্রয়োজনে ঘর হইতে বাহির হইওনা, স্বীয় পাপের উপর কাঁদিতে থাক। একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি দুইটি জিনিসের জিম্মাদার হইবে আমি তাহার জন্য বেহেশ্তের জিম্মাদার হইব, প্রথম জবান, দ্বিতীয় লজ্জাস্থান, কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, যে সব বস্তু মানুষকে জান্নাতে দাখিল করিবে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কোনটি ? এরশাদ হইল আল্লাহর ভয় ও পবিত্র আদত সমুহ। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, জাহন্নামে প্রবেশ কারী আমলের মধ্যে জঘন্য কোন্টি ? উত্তর হইল মুখ এবং শরমগাহ!

হজরত অবদুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) ছাপা মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ের সময় স্বীয় জবানকে খেতাব করিয়া বলিতেছিলেন, হে জবান ভাল কথা বল, লাভবান হইবে. মন্দ হইতে নীরব থাকিও অপমানিত হওয়ার পুর্বেই রক্ষা পাইয়া যাইবে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল এইসব আপনি নিজের তরফ হইতে বলিতেছেন নাকি হুজুরের তরফ হইতে ও কিছু শুনিয়াছেন ? তিনি বলিলেন আমি হুজুরের নিকট হইতে শুনিয়াছি, মানুষের বেশীর ভাগ গোনাহ জবান হইতে প্রকাশ পায়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি জবানকে কাবু করিয়াছে আল্লাহ পাক তার দোষ ঢাকিয়া রাখেন, যে রাগকে হজম করে তাহাকে আজাব হইতে মাহফুজ রাখেন আর যে দরবারে এলাহিতে ওজর পেশ করে খোদাতায়ালা তার ওজর কবুল করেন।

হজরত মোয়াজ (রাঃ) আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ ! আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, ফরমাইলেন, আল্লাহর এবাদত এইভাবে কর যেমন তুমি তাহাকে দেখিতেছ, নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর, আর যদি তুমি চাও তবে আমি ঐ জিনিস বাত্লাইয়া দিব যদ্দারা এইসব বস্তুর উপর শক্তি অর্জন করিতে পার, এই বলিয়া হুজুর স্বীয় জিহ্বার দিকে ইশারা করিলেন। হজরত সোলায়মান (আঃ) বলেন, কালাম যদি হয় রৌপ্য তবে চুপ থাকা হইবে স্বর্ণ।

হজরত লোকমান হাকীম, হেকমত ও জ্ঞানী হিসাবে যাঁহার বিশ্ব জোড়া খ্যাতি। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম দেখিতে খুব

কুশ্রী। কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে তিনি জগদ্বিখ্যাত হন। কেহ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল আপনি কি অমুকের গোলাম নন? অমুক পাহাড়ের পাদদেশে কি আপনি ছাগল চরাইতেন না? তিনি বলিলেন নিশ্চয়, লোকটি বলিল তবে আপনি এতবড় মর্যাদা কি করিয়া হাছেল করিলেন, তিনি উত্তর করিলেন চার বস্তুর সাহায্যে, আল্লাহর ভয়, কথার সততা, আমানতের পুরাপুরি হেফাজত, অনর্থক কথা হইতে চুপ থাকা। হজরত বরা (রাঃ) বলেন জনৈক বেদুইন আসিয়া আরজ করিল ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল বাত্‌লাইয়া দিন যাহা আমাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে, হুজুর ফরমাইলেন ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়াইও, পিপাসিতকে পানি পান করাইও, সৎপথে আদেশ কর ও অসৎ কাজে নিষেধ কর, আর এত কিছু সম্ভব না হইলে স্বীয় জিহ্বাকে ভালকথা ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করিও না। ইহা দ্বারা শয়তানের উপর জয়ী থাকিবে। জবান সম্পর্কে এই কয়েকটি হাদীছ ছাড়া আরও বহু হাদীছ বর্ণিত আছে, প্রকৃত পক্ষে জবানের সমস্যা বড় সঙ্গীন সমস্যা কিন্তু আমরা গাফেল বিধায় উহা দ্বারা বিনা দ্বিধায় যা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া ফেলি। অথচ আল্লাহর তরফ হইতে দুইজন পাহারাদার দিবারাত্রি আমাদের কাঁধে নিযুক্ত রহিয়াছে যাহাদের একমাত্র কাজ হইল আমাদের প্রতিটি ভালমন্দ কাজ লিপিবদ্ধ করা। তদুপরি আল্লাহ ও রাছুলের আমাদের উপর কত বড় এহ্‌ছান, আমরা কত অলক্ষ্যে কত বেহুদা কথা বলিয়া ফেলি, তাই প্রিয় মাহ্‌বুব নবী (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে কোন মজলিশ ত্যাগ করার আগে তিন বার নীচের দোয়া পাঠ করিবে, মজলিসের কাফ্‌ফারা স্বরূপ—

سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك -

অন্য রেওয়ায়েতে আছে শেষ বয়সে হুজুর (ছঃ) এই দোয়াটি পাঠ করিতেন। অন্য হাদীছে আছে, কয়েকটি শব্দ এমন আছে যাহা মজলিস ত্যাগের পূর্বে পড়িলে মজলিসের কাফ্‌ফারা হইয়া যায়, উক্ত মজলিস ভাল হইলে এই শব্দগুলি মজলিসের মোহর হইয়া যায় যেই ভাবে পত্রের শেষে শীল মোহর লাগে।

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

استغفرك و اتوب اليك - (ابو داؤد)

আলোচ্য হাদীছের চতুর্থ বিষয় হইল আত্মীয়তা রক্ষার সম্পর্কে। এ বিষয়ে আগামী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

মেহমানের মেহমানদারী কিভাবে করিতে হয়

(২২) عن ابى شريح الكعبى ان رسول الله (ص) قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلثة ايام فما بعد ذالك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوى عنده حتى يحرجه - (متفق عليه)

"প্রিয় রাছুল (ছঃ) এরশাদ করেন, যে আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানের সম্মান করে। মেহমানের বিশেষ আতিথেয়তা একদিন, মেহমানদারী তিনদিন, তারপর যাহা হইবে উহা হইবে ছদকাহ্ মেজবানের কষ্ট হইবে পর্যন্ত মেহমানের অবস্থান করা হারাম।

এই হাদীছে প্রিয় নবী (ছঃ) দুইটা আদব শিক্ষা দিয়াছেন একটা মেজবানের, অপরটা মেহমানের। মেহমানের সম্মান বলিতে হাসিমুখে ভদ্রতার সহিত তাহার সহিত মিলিত হওয়া। হাদীছে আসিয়াছে বিদায়ের সময় ঘরের দরজা পর্যন্ত মেহমানের সহিত গমন করা সুন্নত, আরও বর্ণিত আছে যে মেহমানের একরাম করিল না তার মধ্যে কোন গুণ নাই জনৈক ব্যক্তি দেখিল যে, হজরত আলী কাঁদিতেছেন, কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন সাত দিন পর্যন্ত কোন মেহমান আসিতেছে না, আমার ভয় হইতেছে আল্লাহ পাক আমাকে বেইজ্জত করার ইচ্ছা করিয়াছেন নাকি। (এহইয়াউল উলুম)

মেহমানের বিষয় হুজুর (ছঃ) ফরমাইয়াছেন যে, মেহমানের বিশেষ মেহমানদারী হইল একদিন এক রাত। ইমাম মালেক বলেন প্রথম দিন তার সম্মানার্থে বিশেষ খানা পিনার ব্যবস্থা করিবে। আর অন্যান্য দিন নিয়মানুযায়ী মেহমানদারী করিবে। কেহ কেহ বলেন বিশেষ একদিন সহ আরও তিন দিন মিলাইয়া মোট চার দিন মেহমানদারী করা ওয়াজিব। আবার কেহ বলেন সেই এক দিন সহ মোট তিন দিন মেহমানদারী করিবে। কাহারও মতে তিনদিনের মেহমানদারী ছাড়াও বিদায় কালে একদিনের নাস্তা দিতে হইবে। আবার কাহারও মতে সাক্ষাত

করিতে আসিলে থাকিবার হক তিন দিন আর অন্য দিকে যাওয়ার পথে বিশ্রাম করিতে হইলে থাকার হক একদিক।

মূল কথা হইল মেহমানের এক্‌রাম করা জরুরী, একদিন ভাল খানার ব্যবস্থা করিবে, বিদায় কালে নাস্তা দিয়া দিবে, বিশেষ করিয়া যেখানে কিছু পাওয়া খাওয়ার সম্ভাবনা কম।

আলোচ্য হাদীছে আর একটি কানুন মেহমানের জন্য ইহা রাখা হইয়াছে যে, সে যেন বেশী দিন অবস্থান করিয়া মেজবানকে কষ্ট না দেয়। অথবা মেজবান তাহার কারণে যেন গোনাহে গ্রেপ্তার না হয়, যেমন মেজবান তার গীবত শুরু করিয়া দিল, অথবা এমন কোন কাজ করিয়া বসে যদ্দারা মেহমানের কষ্ট হয় অথবা মেহমান সম্পর্কে খারাপ ধারণা করিতে আরম্ভ করে, মেজবানের কিসে কষ্ট হয়, জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করাতে হুজুর ফরমাইলেন মেহমান যদি মেজবানকে সমাদর করিবার সামর্থ না রাখে। এখানে হযরত সালমান ও তাঁর মেহমান সম্পর্কীয় একটা কেচ্ছা প্রনিধান যোগ্য। হাফেজ এবনে হাজার ও ইমাম গাজালী উহা বর্ণনা করেন, কেচ্ছা এইরূপ—

হযরত আবু ওয়ায়েল বলেন, আমিও আমার এক সাথী হযরত ছালমানের (রাঃ) খেদমতে হাজির হই, তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি ও আধা পিষা লবন পেশ করেন। আমার সাথী বলিয়া উঠিল ইহার সাথে যদি কিছুটা পুদিনা হইত তবে কতই না স্বাদ হইত। হযরত ছালমান (রাঃ) ইহা শ্রবন করিয়া তাড়াতাড়ি কোথায় গমন করিয়া অজুর লোটা বন্দক রাখিয়া কিছু পুদিনা ক্রয় করিয়া আনিলেন। আমাদের আহার শেষে আমার সাথী দোয়া পড়িতে লাগিলেন, সেই আল্লাহর তারিফ যিনি আমাদিগকে তাহার প্রদত্ত রিজিকের উপর সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত ছালমান বলিয়া উঠিলেন, যদি তাহাই হইতে তবে আমার অজুর লোটা বন্দক রাখিতে হইত না। (এহইয়াউল উলুম)

মোট কথা মেজবান যাহাই পেশ করে উহার উপর পরিতৃপ্ত থাকা খুবই জরুরী, আজে বাজে ফরমায়েশ করিলে অনেক সময় মেজবানের খুবই কষ্ট হয়, হ্যাঁ অবস্থা দৃষ্টে যদি মনে হয় যে, ফরমায়েশ করিলে মেজবান খুশী হইবে তবে ফরমায়েশ করিতে কোন আপত্তি নাই।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বাগদাদে জনৈক জাফরানী ব্যবসায়ীর মেহমান ছিলেন। সে প্রতিদিন ইমাম সাহেবের খাবারের লিষ্ট স্বীয় বাঁদীর হাতে দিত এবং সে তদনুযায়ী পাক করিত। একদিন ইমাম সাহেব বাঁদীর হাত হইতে লিষ্ট লইয়া স্বহস্তে উহাতে একটি পদ লিখিয়া দেন, আহারের সময় ব্যবসায়ী সেই নতুন জিনিসটা দেখিয়া বাঁদীর নিকট কৈফিয়ত চাহিলে বাঁদী লিষ্ট আনিয়া মনিবকে দেখাইয়া বলিল ইহা ইমাম সাহেব স্বহস্তে লিখিয়াছেন। ব্যবসায়ী ইহাতে আনন্দে আত্মহারা হইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঁদীকে আজাদ করিয়া দিল। অতএব মেহমান ও মেজবান যদি এ পর্যায়ের হয় তবে ফরমায়েশ বড়ই আনন্দদায়ক হয়।

(২৩) عن ابى سعيد انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مومنا ولا يا كل طعامك الا تقى ٥ (ترمذى)

হুজুর আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন, মোমেন ব্যতীত অন্য কাহার ও সংশ্রবে থাকিও না আর তোমার খানা যেন পরহেজগার ব্যতীত অন্য কেহ না খায়।

এই হাদীছে দুইটি আদবের বর্ণনা আসিয়াছে, প্রথমতঃ অমুসলিমের সংশ্রব ত্যাগ করা। এখানে অর্থ সাধারণ মোমেনও হইতে পারে কামেল মোমেনও হইতে পারে। যেমন অন্য হাদীছে আসিয়াছে, তোমার ঘরে যেন পরহেজগার ব্যতীত অন্য লোক প্রবেশ না করে। আসল উদ্দেশ্য হইল মানুষ যেন সৎসঙ্গ এখতিয়ার করে ও অসৎ সঙ্গ বর্জন করে। অন্য হাদীছে আসিয়াছে সৎলোকের সংশ্রবের দৃষ্টান্ত হইল যেমন কস্তুরী বিক্রেতার নিকট বসা। সে হয়ত তোমাকে কিছু কস্তুরী হদীয়া দিবে, না হয় তুমি ক্রয় করিবে, তা না হয় অন্ততঃ উহার সুগন্ধীতে তোমার মন প্রফুল্ল হইয়া যাইবে। আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হইল কামারের ন্যায়। পার্শ্বে থাকিলে হয় তার ভাটি হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আসিয়া তোমার কাপড় জ্বালাইয়া দিবে না হয় অন্ততঃ দুর্গন্ধ এবং ধোঁয়াত আসিবেই। অন্য হাদীছে আসিয়াছে মানুষ তাহার বন্ধুর মজহাবেরই অনুসারী হইয়া থাকে অতএব তোমার চিন্তা করা

উচিত কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতেছ। (মেশকাত)

অর্থাৎ দ্বীনদারী হউক বা বদদ্বীনী হউক ছোহবতের কারণে ক্রমশঃ উহার সঙ্গীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অভিজ্ঞতায়ও দেখা যায় শিকারী ও জুয়ারীর সহিত উঠাবসা করিলেও সেই সব বদ অভ্যাস মানুষের মধ্যে সংক্রমিত হয়। হযরত আবু রজীনকে নবীয়ে করিম (ছঃ) ফরমাইয়াছেন, আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলিব যদ্দারা দুনিয়া ও আখেরাতের ভালাইর শক্তি তোমার মধ্যে পয়দা হয়, আল্লাহর ওয়াস্তে জাকেরীনদের ছোহবতে থাকিও এবং একাকী থাকিলে যথাসাধ্য আল্লাহর জিকিরে জবান চালু রাখিও এবং শত্রুতা শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে রাখিও। (মেশকাত)

অর্থাৎ কাহারও সঙ্গে তোমার শত্রুতা এবং মিত্রতা তোমার নফছের সন্তুষ্টির জন্য না হইয়া যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন সঙ্গী নির্বাচনের পুর্বে তার মধ্যে পাঁচটি গুণ তালাশ কর, ১ম আকল, কারণ আকলই মানুষের মুলধন। বেওকুফের সংশ্রবের পরিণাম দ্বন্ধ ও বিচেছদ ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত ছুফিয়ান ছওরী বলেন আহমকের ছুরত দেখাও পাপ। ২য় সঙ্গী চরিত্রবান হওয়া চাই। কারণ চরিত্রহীনতা অনেক সময় বিবেক বুদ্ধিকে হার মানাইয়া দেয়। যেমন এক ব্যক্তি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান কিন্তু রাগ, খায়েশ, কৃপণতা ইত্যাদি বদ আখলাক তার বিবেক বুদ্ধিকে অকেজো করিয়া দেয়। ৩য় সে যেন ফাছেক না হয়, কেননা যে আল্লাহকে ভয় করে না তার বন্ধুত্বের কোন বিশ্বাস নাই, হয়তঃ কোন বিপদেও ফেলিয়া দিতে পারে। ৪র্থ সে যেন বেদাতী না হয়, কেননা উহা দ্বারা তোমার মধ্যে বেদাত ঢুকিয়া যাইতে পারে, ৫ম সে যেন দুনিয়ার লোভী না হয়, কেননা বন্ধুর অনুসরণে তোমার মধ্যেও দুনিয়ার লোভ আসিয়া যাইতে পারে।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের অছিয়ত

হজরত ইমাম বাকের (রঃ) বলেন আমার অব্বাজান হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) আমাকে অছিয়ত করেন যে, পাঁচ ব্যক্তির ছোহবত

হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিও। তাদের সহিত কথাও বলিও না, এমন কি পথ চলিতেও তাহাদের সাথে চলিবে না। ১নং ফাছেক ব্যক্তি কেননা সে তোমাকে এক লোকমার বিনিময়ে বরং তার চেয়ে কমেও বিক্রি করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম এক লোকমার বিনিময়ে বিক্রি করার অর্থ কি? তিনি বলিলেন এক লোকমার আশায় তোমাকে বিক্রি করিয়া দিল, পরে উহাও তাহার ভাগ্যে জুটিল না। শুধু আশার উপরই বিক্রি করিল। ২নং কৃপণ ব্যক্তির ধারে কাছেও যাইওনা, কেননা সে তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে যখন তার খুব প্রয়োজন ছিল। ৩নং মিথ্যা বাদীর নিকটবর্তী হইওনা, কারণ সে মিথ্যা ধোকা দিয়া নিকটকে দুরে ও দূরকে নিকটবর্তী করিয়া দিবে। ৪নং বেওকুফের নিকট দিয়া চলিওনা, কারণ সে তোমার উপকার করিতে গিয়া অপকার করিয়া বসিবে। ৫নং আত্মীয়তার সম্পর্কচেছদ কারীদের ধারেও যাইওনা, কারণ কোরআন শরীফে তিন জায়গায় আমি তাহাদের উপর লা'নত আসিতে দেখিয়াছি। শুধু মানুষ নয় অন্যান্য বস্তুর প্রভাব ও মানুষের মধ্যে প্রতি ফলিত হয়। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন যারা বকরী চরায় তারা হয় নিরীহ। ঘোড়া ওয়ালাদের মধ্যে পাওয়া যায় অহঙ্কার। উট এবং গরু ওয়ালাদের মধ্যে দেখা যায় অন্তরের কাঠিন্য, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে চিতাবাঘের ছামড়ায় আরোহন করা নিষেধ আসিয়াছে, কারণ উহার কারণে মানুষের মধ্যে জানোয়ারের খাছলত পয়দা হয়।

উল্লেখিত হাদীছে দ্বিতীয় আদব হইল তোমার খানা যেন পরহেজগার লোখে খায়। একটি হাদীছে আসিয়াছে আপন খানা মোত্তাকীনদেরকে খাওয়াও এবং মোমেনদের উপরই এহ্ছান কর। ওলামাগণ লিখিয়াছেন ইহার উদ্দেশ্য হইল দাওয়াতের খানা, প্রয়োজনের খানা নয়। অন্য হাদীছে আসিয়াছে ঐ ব্যক্তিকে জেয়াফতের খানা খাওয়াইবে যার সহিত আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রহিয়াছে। প্রয়োজনের খানার মধ্যে কাফেরদিগকে খাওয়াইলেও আল্লাহ পাক প্রশংসা করিয়াছেন, কারণ সেই জমানায় কয়েদী ছিল একমাত্র কাফের। আবার অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে জনৈকা ফাহেশা নারীর ক্ষমা হইয়াছে একমাত্র একটা পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করার কারণে। হুজুর (ছঃ) এরশাদ

করেন, যে কোন জানওয়ালা প্রাণীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব পাওয়া যায়। উহার মধ্যে নেক, বদ, মুছলিম কাফের মানুষ জীব জন্তু সবই শামেল। প্রয়োজনের মাত্রা বেশী হইলে ছওয়াব ও তত বেশী হইবে। তবে প্রয়োজনের অধিক না হইলে বা কোন দ্বীনী ফায়েদা না থাকিলে পরহেজগার মোত্তাকীকে খাওয়াইলেই ছওয়াব বেশী হইবে। ইমাম গাজালী লিখিয়াছেন মোত্তাকীনকে খাওয়াইলে নেক কাজে সহায়তা হয় আর কাফেরকে খাওয়াইলে বদ কাজে সহায়তা হয়। জনৈক বুজুর্গ শুধু বুজুর্গদিগকে খাওয়াইতেন, কেহ প্রশ্ন করিল সাধারণ গরীব মিছকীনদেরকে খাওয়াইলে কতই না ভাল হইত। তিনি বলেন বুজুর্গদের অভাব থাকিলে খোদার ধ্যানে ক্রুটি আসে তাই বুজুর্গেরাই খাওয়ার ও পাওয়ার যোগ্য, কাজেই একজন পরহেজগরেকে খাওয়ান এমন হাজার খাওয়ানের চেয়ে উত্তম যাদের সমস্ত ধ্যান ধারণা দুনিয়ার প্রতি থাকে। এই কথা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) শুনিয়া খুব পছন্দ করিয়াছিলেন।

জনৈক দরজী হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারককে জিজ্ঞাসা করিলেন আমি জালেম বাদশাদের কাপড় শিলাই করিতেছি। আপনার খেয়াল মতে আমি কি জালেমের সাহায্য করিলাম? এবনে মোবারক বলেন এ ক্ষেত্রে ত তুমি স্বয়ং জালেম। জালেমের সাহায্য কারীত ঐ ব্যক্তি যে তোমার সুই সুতা বিক্রি করে! একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি শরীফ ব্যক্তির উপর এহছান করিল সে তাহাকে গোলাম বানাইয়া লইল, আর যে অভদ্রলোকের উপকার করিল সে তার শত্রুতা নিজের দিকে টানিয়া লইল। অন্য হাদীছে আসিয়াছে তুমি পরহেজগারদেরকে খানা খাওয়াও এবং মোমেনের সাহায্য কর। (মেশকাত)

উল্লেখিত কারণ সমূহ ব্যতীত আরও একটি বড় কথা এই যে ইহাতে মোত্তাকী মোমেনদের প্রতি সম্মানই করা হয় আর ফাছেকদের দাওয়াত কবুলের নিষিদ্ধতা সম্পর্কীয় হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যতম কারণ বলা হইয়াছে উহাতে ফাছেকের সম্মান বৃদ্ধি হয়।

(২৪) عن ابى هريرة (رض) قال يا رسول الله اى الصدقة

افضل قال جهد المقل وابدأ بمن تعول - (ابو داؤد - مشكوة)

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রিয় নবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন হুজুর উত্তম ছদকা কোনটা? হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন গরীবের শেষ চেষ্টা, আর যাহাদের ভরণ পোষণ তোমার উপর ন্যস্ত তাহাকে দিয়াই শুরু কর। (মশকাত)

অর্থাৎ দুঃখ কষ্টের ভিতর থাকিয়াও গরীব যাহা দান করে উহাই উত্তম। হজরত বশর (রঃ) বলেন তিনটি আমল বড়ই কঠিন। ১ম অভাবের মধ্যে থাকিয়াও দান করা, ২য় নির্জনে থাকা অবস্থায় পরহেজগারী ও আল্লাহর ভয়, ৩য়. যাহাকে ভয় করে অথবা যাহার নিকট কোন কিছুর আশা রাখে তাহার সামনে সত্য কথা বলা। অর্থাৎ যাহার সহিত স্বার্থ জড়িত আছে সত্য কথা বলিলে স্বার্থের ব্যাঘাত হইতে পারে তাহার সম্মুখে সত্য কথা বলা। কোরানে পাকেও বর্ণিত আছে "তাহারা দারুণ অভাবগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি প্রিয় নবীর খেদমতে হাজির হইল। তন্মধ্যে একজন বলিল আমি আমার একশত দীনার হইতে দশ দীনার ছদকা করিয়া দিয়াছি, দ্বিতীয়জন বলিল আমি আমার দশ দীনারের মধ্যে এক দীনার দান করিয়াছি। তৃতীয় জন বলিল আমার কাছে ছিল মাত্র একটি দীনার উহার এক দশমাংশ আমি দান করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া হুজুর (ছঃ) এরশাদ ফরমাইলেন ছওয়াব হিসাবে তোমরা তিন জনই সমান, যেহেতু প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালের এক দশমাংশ দান করিয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ হুজুর (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -

অর্থাৎ ধনী তার সাধ্যানুসারে আর গরীবও তার সাধ্যানুসারে ব্যয় করিবে। আল্লাহ তায়ালা কাহারও উপর তার সাধ্যের বাহিরে বোঝা চাপাইয়া দেন না, তিনি দারিদ্রের পর সমৃদ্ধিদান করেন।"

অন্যত্র একটি হাদীছে হজরত (ছঃ) বলেন কাহারও নিকট মাত্র দুই

দেরহাম আছে উহা হইতে সে একটি দান করিলে সে এক লাখের ও অধিক ছওয়াব পাইল। অন্য জনের নিকট অসংখ্য সম্পদ রহিয়াছে সে এক লাখ দান করিলেও প্রথম ব্যক্তির এক দেরহামের ছওয়াব বেশী। (জামেউস্ ছগীর)

ইহারই নাম দরিদ্রের শেষ চেষ্টা, বোখারী শরীফে হজরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন হজরত (ছঃ) আমাদেরকে ছদকা করার হুকুম দান করেন, তখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বাজারে গমন করিত ও মজুরী করিয়া পিঠে বোঝা বহন করিয়া এক সের শস্য উপার্জন করিত উহাই আবার আল্লাহর রাস্তায় দান করিয়া দিত।

আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে ষ্টেশনে গিয়া মুঠোগিরী করিয়া দুচার আনা জোগাড় করিয়া উহা ছদকা করার আগ্রহ করে। আমরা অস্থায়ী জীবনের হাজত পুরা করার জন্য যতটুকু পেরেশান ছাহাবারা পরকালের পাথেয় সঞ্চিত করার জন্য তার চেয়ে বেশী পেরেশান ছিল। এই সব মহৎ ব্যক্তিদের দারিদ্রাবস্থায় ছদকা করার ব্যাপারে মোনাফেকগণ কটাক্ষ করিত, তাই পরওয়ারদেগার বলেন—

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون - سخر الله منهم ولهم عذاب اليم - توبه ০

অর্থাৎ "মোনাফেকগণ এমন যে তাহারা নফল ছদকাকারী মুছলমানদের প্রতি কটাক্ষ করে। বিশেষতঃ ঐ সব মুছলমানের প্রতি যাহারা কষ্ট স্বীকার ব্যতীত দিতে অক্ষম। এই সব মোনাফেকগণত এখন বিদ্রূপ করে, কিন্তু পরকালে আল্লাহ তাদের প্রতি বিদ্রূপ করিবেন ও তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মোফাচ্ছেরীনগণ লিখিয়াছেন ছাহাবারা মুজুরী করিয়া দান করিতেন, খুব বেশী মজবুরীতে নিজের প্রয়োজনে ও কিছু ব্যয় করিতেন।

হজরত আলী ও ফাতেমার (রাঃ) ঘটনা

একদিন হজরত আলীর নিকট জনৈক ভিখারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিল হজরত আলী (রাঃ) হাছান কি হোছাইনকে পাঠাইয়া বলিল তোমার আম্মার নিকট যে কয়টি দেহরাম আছে উহা হইতে একটি দান করিতে

বল, ছাহেবজাদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল আপনি উহা আটা খরিদ করিতে নাকি রাখিয়াছেন। হজরত আলী (রাঃ) বলেন মানুষ ঐ পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হয় নাই যেই পর্যন্ত তাহার নিকটস্থ বস্তু হইতে আল্লাহর নিকট-ওয়ালা বস্তুর উপর অধিক আস্থা না থাকে, তোমার আম্মাকে বল সেই ছয়টি দেহরাম সবটা দান করিয়া দিতে।" আসলে হজরত ফাতেমা (রাঃ) না দেওয়ার নিয়তে বলেন নাই বরং হজরত আলীকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালনার্থে এই খবর পাঠাইয়াছেন। অতএব হজরত ফাতেমা (রাঃ) সব কয়টা দেহরাম দান করিয়া দিলেন। হযরত আলী তখনও সেই বসায় ছিলেন হঠাৎ এক ব্যক্তি তাহার উট বিক্রয় করিতে আসিল। হজরত আলী উহার দাম জিজ্ঞাসা করিল, লোকটি বলিল, একশত চল্লিশ দেহরাম। হজরত আলী উহা ধারে খরিদ করিয়া লইলেন ও দাম পরে পরিশোধ করিবে বলিয়া ওয়াদা করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই অন্য এক ব্যক্তি সেখান দিয়া যাইতে সে উট টা দেখিয়া বলিল ইহা কার উট? বিক্রি করিবে নাকি জিজ্ঞাসা করিল, হজরত আলী (রাঃ) বলিলেন ইহা আমারউট, হ্যাঁ বিক্রয় করিব। লোকটি দাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন দুইশত দেহরাম। ঐ ব্যক্তি উক্ত দাম দিয়া উহা খরিদ করিয়া লইল। একশত চল্লিশ দেহরাম কর্জদারকে দিয়া বাকী ৬০ দেহরাম ফাতেমার হাতে অর্পন করিলেন। হজরত এই সব কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিলে আলী (রাঃ) বলিলেন আল্লাহ তায়ালা তাঁহার প্রিয় নবীর মারফত ওয়াদা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে সে উহার দশগুণ বদলা লাভ করে।

ইহাকেই বলে দারিদ্রের শেষ চেষ্টা, আটার জন্য রাখা ছয়টি দেহরাম দান করিয়া দিলেন। আর দুনিয়াতেই হাতে হাতে দশগুণ উসুল করিয়া লইলেন। এইভাবে হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তবুকের যুদ্ধে সর্বস্ব হুজুরকে দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন আমি ঘরে আল্লাহ ও আল্লাহর রাছুলের সন্তুষ্টিকে রাখিয়া আসিয়াছি, অথচ প্রথম মুছলমান হওয়ার সময় তিনি চল্লিশ হাজার স্বর্ণ মুদ্রার মালিক ছিলেন।

মোহাম্মদ বিন আব্বাস মেহাল্লেবী বলেন আমার আব্বাজান মামুনুর রশীদের দরবারে গিয়াছিলেন। তিনি আব্বাকে একলাখ দেহরাম

হাদিয়া দেন। আব্বা বাড়ী আসিয়া সমস্ত দেরহাম দান করিয়া দেন। দ্বিতীয়বার খলিফা মামুনের সহিত আব্বার সাক্ষাত হইলে তিনি কিছুটা নারাজী প্রকাশ করেন। আব্বা বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! উপস্থিত বস্তুকে জমা করিয়া রাখা মা'বুদের সহিত বদগুমানীর শামীল। অর্থাৎ এই ভয়ে ব্যয় না করা যে আগামীকাল কোথা হইতে আসিবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেই খোদা আজ দিল কাল দিতে তিনি অপারগ। তবে দুরাবস্থার মধ্যে থাকিয়া ছদকা করার ব্যাপার অন্য হাদীছেও আসিয়াছে, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন উত্তম ছদকা হইল নিজেকে অন্যের মোহতাজ না বানাইয়া যে ছদকা দেওয়া হয়। মূলকথা দাতার অবস্থা ভেদে বিভিন্ন রকম হুকুম হয়।

হজরত জাবের (রাঃ) বলেন আমরা প্রিয় নবী (ছঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি আসিয়া হুজুরের খেদমতে ডিমের মত একটা স্বর্ণের টুক্‌রা পেশ করিয়া বলিল ইহা ছদকা করিতেছি, আমার নিকট ছদকা করার আর কিছুই নাই। আমি ইহা কোন একখান হইতে পাইয়াছি। হুজুর (ছঃ) তার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। লোকটি অন্য দিক দিয়া আবার পূর্বের কথা আরম্ভ করিল, হুজুর এবারও মুখ ফিরাইলেন, এইভাবে কয়েক দফা হইয়া গেল। অবশেষে হুজুর (ছঃ) সেই স্বর্ণের টুক্‌রাটা লইয়া এত জোরে নিক্ষেপ করিলেন যে, তার গায়ে লাগিলে জখম হইয়া যাইত। তারপর হুজুর (ছঃ) বলিলেন, কোন কোন লোক নিজের সর্বস্ব ছদকা করিয়া দেয় ও পরে লোকের কাছে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়ায়। নিজেকে মোহতাজ না বানাইয়া যে ছদকা করা হয় উহাই সর্বোত্তম ছদকা। অপর এক ব্যক্তিকে মসজিদের মধ্যে দুরাবস্থায় দেখিয়া প্রিয়নবী (ছঃ) কিছু কাপড় উসুল করিয়া তাহাকে দুইটা কাপড় দিয়া দেন। পরে অন্য ব্যক্তির জন্য কাপড় দান করিতে বলায় সেই লোকটি তার দুইটা কাপড় হইতে একটা কাপড় দান করিয়া দেয়। হুজুর (ছঃ) তাহাকে সাবধান করিয়া দেন ও তার কাপড় ফেরত দেন। আসল কথা হইল যাহারা সব কিছু দান করিয়াও অন্যের মালের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না তাহাদের জন্য সব কিছু দান করা জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নাই? তবে তাহাদের মত হইবার চেষ্টা করা উচিত। জনৈক বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা

করিয়াছিল মালের মধ্যে কতটুকু জাকাত দেওয়া ওয়াজেব। বুজুর্গ বলেন সাধারণ মানুষের জন্যত দুইশত দেরহামে পাঁচ দেহরাম, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ, আর আমাদের জন্য সমস্ত মাল ছদকা করিয়া দেওয়া ওয়াজেব।

ইমাম বোখারী (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি স্বয়ং অভাব গ্রস্থ বা তাহার আওলাদ ফরজন্দ অভাবী, অথবা সে ঋণী, এমতাবস্থায় ছদকা না দিয়া তাহাকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। এমন ব্যক্তি ছদকা করিলে ছদকা তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। হাঁ যাহারা অসাধারণ ধৈর্যশীল তাহাদের জন্য জায়েজ। ওলামাগণ এ বিষয়ে একমত, যে ব্যক্তির কোন কর্জ নাই ও পরিবার পরিজন নাই আর ভীষণ অভাবেও সে চরম ধৈর্যশীল, তার জন্য সমস্ত সম্পদ ছদকা করিয়া দেওয়া জায়েজ। অন্য হাদীছে আসিয়াছে মাল বেশী হওয়াটাকে গনী বলা হয় না বরং দিলের গনী হওয়াই বড় গনী। মূল কথা আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইলে যাহা ইচ্ছা খরচ করিতে কোন আপত্তি নাই। তা না হইলে পরিবার পরিজনের প্রতি লক্ষ্য রাখাই অগ্রগণ্য। আল্লাহ পাক যদি এই অধম লিখককেও সেই কামেল তাওয়াক্কুলের কিছুটা অংশ দান করিতেন।

মহিলাদের স্বামীর মাল ছদকা করার হুকুম

(২৫) عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذالك لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا۔ (كذا فى المشكوة)

অর্থ: হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, মেয়ে লোক যদি ঘরের খাবার হইতে এছরাফ না করিয়া ব্যয় করে তবে সে উহার ছওয়াব পাইবে, আর স্বামীও ছওয়াব পাইবে যেহেতু সে মাল উপার্জন করিয়াছে আর যে খানা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করিয়াছে সেও ছওয়াব পাইবে, আর তাহাদের ছওয়াবের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার কম করা হইবে না। (মেশকাত)

এই হাদীছে দুইটা প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে, ১ম বিবির খরচ করা

প্রসঙ্গ, ২য় যারা খাবার তৈয়ার করে তাদের প্রসঙ্গ। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার মাল হইতে ব্যয় করিলে সে অর্ধেক ছওয়াব পাইবে। হজরত ছায়াদ (রাঃ) বলেন হুজুর (ছঃ) এর নিকট মহিলাদের জমাত যখন বয়াত করে তখন সম্ভবতঃ মোজার গোত্রের জনৈকা মহিলা দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করে হুজুর! আমরা নারী জাতি; পিতা পুত্র এবং স্বামীর উপর বোঝা স্বরূপ, তাদের মালের মধ্যে, আমাদের জন্য কতটুকু ভোগ করার অধিকার রহিয়াছে, হুজুর ফরমাইলেন টাটকা তাজা ফলমুল হইতে তোমরা খাইতেও পার দানও করিতে পার। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে একটা রুটির টুকরা অথবা এক মুষ্টি খেজুরের বদৌলতে তিন ব্যক্তি জান্নাতবাসী হইবে, ১ম ঘরের মালিক ২য় স্ত্রী যে খানা পাকাইল, ৩য় ঐ খাদেম যে দরজা পর্যন্ত মিছকিনের হাতে পৌঁছাইল। হজরত আয়েশার বোন আছমা আরজ করিলেন ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমার হাতে কিছুই নাই যাহা কিছু আছে সব কিছু আমার স্বামী জোবায়েরের, আমি উহা হইতে কতটুকু খরচ করিতে পারি? হুজুর বলেন খুব বেশী খরচ করিতে থাক, বাঁধিয়া রাখিও না, তা-না হইলে তোমার জন্যও বন্ধ করিয়া রাখা হইবে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য স্বামী যদি নিজের উপার্জিত মালের স্ত্রীকে মালিক বানাইয়া দেয় তবে দান করিলে স্ত্রী পাইবে পুরা ছওয়াব আর স্বামী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। যেমন নাকি স্ত্রী দান করিল আপন মাল, তাই পুরা ছওয়াব, আর স্বামী মুল উপার্জনকারী হিসাবে অর্ধেকের মালিক হইল। আবার স্বামী স্ত্রীকে মালিক না বানাইলে স্বামী পাইবে পুরা ছওয়াব আর স্ত্রী পাইবে অর্ধেক ছওয়াব। আর বিভিন্ন তরিকায় ইহাও উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে যে সাধারণ টুকিটাকি জিনিস সমূহ দান করার জন্য স্বামীর এজাজতের প্রয়োজন হয় না, তবে এমন কোন কঠিন দিলওয়ালা স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মাল দান করিতে অনুমতি না দেয় তবে স্ত্রীর জন্য দান করা আদৌ জায়েজ নাই। জনৈক ব্যক্তি বলে হুজুর আমার অনুমতি ছাড়াই আমার স্ত্রী আমার মাল দান করে, হুজুর বলিলেন উভয়ে ছওয়াব পাইবে। সে বলিল হুজুর আমি তাকে দান করিতে নিষেধ করি। হুজুর বলেন তবেত সে দানের ছওয়াব পাইবে তুমি কৃপণতার ফল ভোগ করিবে।

আল্লামা আয়নী বলেন প্রকৃত পক্ষে দান করার ব্যাপারটা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধারার উপর নির্ভর করে, স্ত্রী স্বাধীনভাবে স্বামীর মাল খরচ করুক কেহ ইহা পছন্দ করে আবার কেহ পছন্দ করে না, তবে ব্যয় করার উৎসাহ হেজাজবাসীর প্রথা অনুসারে দেওয়া হইয়াছে। মিছকীন প্রতিবেশী মেহমান ও ভিক্ষুককে দান করার জন্য স্ত্রী লোকদের প্রতি সাধারণ অনুমতি ছিল। হুজুর (ছঃ) এর উদ্দেশ্য হইল তাঁহার উম্মত যেন আরবদের এই নেক অভ্যাসের অনুসরণ করে।

আমাদের দেশেও দেখা যায় অনেক ভদ্র পরিবারের মহিলাগণ স্বামীর অনুমতি ছাড়া গরীব মিছকীন বা প্রতিবেশী গরীব মেয়েদেরকে দান করিলে স্বামী ইহাতে নারাজ না হইয়া বরং খুশী হইয়া থাকে।

হাদীছে উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় কথা হইল এই যে, অনেক আমীর কবীর বা বড় লোকেরা অধিনস্থ কর্মকর্তাদের দান করার জন্য নির্দেশ দিয়া থাকে, কিন্তু কর্মকর্তা খাজাঞ্চীরা নানারূপ টাল বাহানা করিয়া দান করা হইতে বিরত থাকে, ঐসব আমলা ও কর্মকর্তারা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনিবের হুকুম পালন করে তবে তাহারাও পূর্ণ ছওয়াবের অংশীদার হইবে, একটি হাদীছে আসিয়াছে, মনে কর ছদকা যদি সাত কোটি লোকের হাত হইয়াও পৌছে, তবু শেষ ব্যক্তি অতটুক ছওয়াব পাইবে যতটুকু পাইয়াছে প্রথম ব্যক্তি, অর্থাৎ যত লোকের হাত হইয়া উহা ফকীরের হাতে পৌছিবে প্রত্যেক ছওয়াবের ব্যবধান হবে, কর্মচারী ছদকা পৌছাইতে যদি মাল উপার্জনের চেয়েও অধিক কষ্ট করিতে হয় তবে কর্মচারীর ছওয়াব নিশ্চয় অধিক হইবে, এই জন্যই বলা হইয়াছে "আল আজরো আল্ কাদরিন্নছব" অর্থাৎ কষ্ট অনুসারে ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। ইহাই শরীয়তের বিধান।

(২৬) عن ابن عباس (رض) مرفوعا فى حديث لفظه

كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثة اللهفان ০ (جامع صغير)

ছদকা বলিতে কোন্ কোন্ জিনিসকে বুঝায়

প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক নেক কাজই ছদকা আর কাহাকেও নেক কাজে উৎসাহ দান করার ছওয়াব স্বয়ং যে নেক কাজ করে উহার সমতুল্য। আর বিপদ গ্রস্থ লোকদের সাহায্য করাকে আল্লাহ্ পাক খুব পছন্দ করেন।

এই হাদীছে তিনটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, ১ম প্রত্যেক সৎকাজই ছদকাহ! অর্থাৎ ছদকা শুধু মাল দান করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং কাহারও সহিত যে কোন প্রকার সদাচরনই ছদকার শামিল।

হাদীছে আসিয়াছে মানুষের শরীরে তিনশ ষাটটি জোড়া আছে কাজেই প্রতিদিন প্রত্যেক জোড়ার পক্ষ হইতে ছদকা করা উচিত ছাহাবারা আরজ করিলেন এমন শক্তি কাহার আছে? হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন মসজিদ হইতে থুথু পরিষ্কার করা ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু দূর করিয়া দেওয়া ছদকা, এই সব না পাইলে অন্ততঃ চাশতের দুই রাকাত নামাজ পড়িলে সব কিছুর দায়িত্ব আদায় হইবে। কেননা নামাজের মধ্যে শরীরের যাবতীয় জোড়া নাড়া চাড়া করে।

অন্য হাদীছে আছে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মানুষের প্রতি জোড়ার উপর ছদকা জরুরী হইয়া পড়ে। দুই বিবদমান ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি করিয়া দেওয়া ছদকা, কাহাকেও ছওয়ারীতে উঠিতে সাহায্য করা ছদকা, তাহার ছামানা উঠাইয়া দেওয়া ছদকা, কালেমায়ে তাইয়্যেবা পড়া পথিককে পথ দেখাইয়া দেওয়া ছদকা, রাস্তা হইতে কষ্ট দায়ক বস্তু দূর করিয়া দেওয়া ছদকা। আরও আসিয়াছে, প্রত্যেক নামাজ ছদকা রোজা ছদকা, হজ্ব ছদকা, ছোবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়া ছদকা, কাহাকেও ছালাম করা ছদকা, নেক কাজের হুকুম করা ছদকা, অন্যায়কাজ হইতে ফিরানো ছদকা এইসব কিছুই ছদকা সমতুল্য, তবে উহা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। আল্লাহ তায়ালার দানের কোন সীমা রেখা নাই, কেহ কোন নেক কাজ বা নফল নামাজ পড়িতে পারে না অথচ অন্যকে উৎসাহ দিলে সে ছওয়াব পাইয়া যাইবে, আবার কেহ গরীব বশতঃ দান করিতে অক্ষম, নিজে রোজা রাখিতে পারে না, হজ্ব করিতে পারে না, জেহাদ করিতে পারে না বা অন্য কোন এবাদত করিতে পারে না, এই ভাবে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন এবাদতের জন্য যদি শত

লোককে উৎসাহ দেয় বা হাজার হাজার লোককে উৎসাহ দেয় তবে সকলের এবাদতের মধ্যে সে শরীক হইয়া যাইবে। আরও মজার কথা তাহার মৃত্যুর পরও যদি ঐসব এবাদতের ছিলছিলা চলিতে থাকে তবুও সে কবরে থাকিয়া ঐসব এবাদতের ছওয়াবের অংশীদার হইবে। কত বড় ভাগ্যবান ঐসব বুজুর্গানে দ্বীন যাহারা লক্ষ লক্ষ লোককে দ্বীনের কাজে লাগাইয়া গিয়াছেন ও আজ কবরে থাকিয়া সমস্ত লোকের নেক আমলের ছওয়াব ভোগ করিতেছেন।

আমার চাচাজান হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রঃ) অতীব আনন্দ সহকারে বলিতেন মানুষ দুনিয়াতে মানুষ রাখিয়া যায় আর আমি রাখিয়া যাইতেছি মুলুক। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল মেওয়াতের মত বিরাট ভূখণ্ডে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে লক্ষ লক্ষ লোক নামাজী হইয়াছেন। হাজার হাজার লোক তাহাজ্জুদ গোজার ও হাফেজে কোরান হইয়াছেন ঐসব লোকের যাবতীয় নেক আমলের তিনিও অংশীদার হইতেছে। বর্তমানে ত সেই ভাগ্যবান জমাত আরব আজম তথা সারা বিশ্বে তাবলীগ করিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাদের চেষ্টায় শত শত লোক দ্বীনের উপর আমল করিবে ঐসবের ছওয়াব সেই মহামানব চাচাজান ও লাভ করিবেন যিনি আনন্দচিত্তে বলিতেন আমি মুলুক ছ ড়িয়া যাইতেছি। এই জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে মহামূল্যবান মনে করিয়া সাধ্যানুযায়ী অগ্রিম প্রেরণে কোনরূপে ত্রুটি করা উচিত নয়। মৃত্যুর পর না মা-বাপ জিজ্ঞাসা করিবে, না সন্তান সন্ততী, দুই একদিন কান্নাকাটি করিয়া সব চুপ চাপ হইয়া যাইবে, হ্যাঁ ছদকায়ে জারিয়াই কাজে আসিবে।

হাদীছের মধ্যে তৃতীয় লক্ষ্যণীয় বস্তু হইল আল্লাহ পাক বিপদগ্রস্থ লোকদের সাহায্য করাকে ভালবাসেন। অন্য হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না। অন্যত্র আসিয়াছে যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ নারীর সাহায্য করে সে যেন জেহাদ করিতেছে, সারা রাত নফল পড়িতেছে, আর বিরতী হীন ভাবে রোজা রাখিতেছে। আর এক হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন মছিবতগ্রস্থের মছিবত দূর করিতে সাহায্য করিবে খোদাতায়ালা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতে মুশকিল আছান করিয়া

দিবেন, আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ ঢাকিয়া রাখিবে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ ঢাকিয়া রাখিবেন। আর একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের অভাব দুর করিয়া দিল সে যেন জীবন ভর আল্লার এবাদতে কাটাইল। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইয়ের হাজত কোন কর্ম কর্তার নিকট পৌঁছাইলে সে ঐ দিন পুলছেরাত অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে যেদিন পুলছেরাতে অনেকেরই পা পিছলাইয়া যাইবে। আর একটি হাদীছে আসিয়াছে আল্লাহ পাকের এমন অনেক বান্দা রহিয়াছে যাহাদিগকে শুধু মানুষের সাহায্য করার জন্যই পয়দা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন তাহারা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে থাকিবে। আরও আসিয়াছে বিপদগ্রস্থ ভাইকে সাহায্য করিলে আল্লাহ পাক তাহাকে এমন দিন সাহায্য করিবেন যে দিন পাহাড় ও আপন স্থানে ঠিক থাকিতে পারিবে না। অন্য একটি হাদীছে আসিয়াছে যে ব্যক্তি সামান্য একটু কথা দ্বারা কাহাকেও সাহায্য করিল বা সাহায্যের জন্য পায়দল রওয়ানা হইল আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি তিহাত্তর রহমত নাজেল করিবেন যাহার মধ্য হইতে একটি মাত্র তাহার দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় সমস্যার জন্য যথেষ্ট। আর অবশিষ্ট বাহাত্তরটি আখেরাতে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সঞ্চিত থাকিবে (কানজুল)

একটি হাদীছে আসিয়াছে মায়া মহব্বত ও পরস্পর সহযোগিতার ব্যাপারে সমস্ত মুসলমান এক দেহের সমতুল্য যখন এক অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন বাকী সব অঙ্গ অনিদ্রা ও কষ্ট ভোগ করার ব্যাপারে তার সঙ্গী হয়। (মেশকাত)

হুজুর (ছঃ) বলেন যাহারা দয়ালু আল্লাহ ও তাদের উপর দয়া করেন। দুনিয়াবাসীদের উপর তোমরা দয়া কর আছমান ওয়ালারাও তোমাদের উপর দয়া করিবেন। অন্য একটি হাদীছে আছে মুসলমানদের মধ্যে ঐ পরিবার সবচেয়ে উত্তম যে পরিবারে এতিম থাকে ও তার সহিত সদ্ব্যবহার করা হয়, আর ঐ পরিবার নিকৃষ্টতম যেখানে এতিমের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হয়। প্রিয় নবী (ছঃ) আরও বলেন আমার উম্মতের মধ্যে কাহারও সাহায্যে যদি কেহ কোন বিপদগ্রস্থকে সন্তুষ্ট করিল সে যেন আমাকে সাহায্য করিল আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করিল

সে যেন খোদাকে সন্তুষ্ট করিল. আর যে খোদাকে খোশ করিল তিনি তাহাকে বেহেশতে দাখিল করাইয়া দিবেন। আর একটি হাদীছে আছে যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করিল তার জন্য মাগফিরাতের ৭৩ দরজা লেখা হয়, তন্মধ্যে একটি তার গোনাহ মাফের জন্য অবশিষ্ট ৭২টি তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

একটি হাদীছে আসিয়াছে সমস্ত সৃষ্ট জগত আল্লাহর পরিবারভূক্ত মানুষের মধ্যে সে-ই আল্লাহর অধিক প্রিয় যে তাঁহার পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে। (মেশকাত)

"সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবার ভূক্ত" বহু ছাহাবায়ে কেরাম ইহাতে বর্ণিত আছে তাই ইহা মশহুর হাদীছ, ওলামাগণ বলেন মানুষ স্ব স্ব পরিবারের যেরূপ ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, ইহাতে মুছলমানের কোন বিশেষত্ব নাই, মুছলিম কাফের বরং সমস্ত প্রাণী জগতই অন্তর্ভূক্ত, কাজেই যে সবাইর সাথে সদ্ব্যবহার করে সে খোদাতায়ালার সর্বাধিক প্রিয়।

প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেন, যে লোক দেখানো এবাদত করিল সে শেরেক করিল, যে লোক দেখানো রোজা রাখিল শেরেক করিল যে লোক দেখানো ছদকা করিল সে-ও শেরেক করিল, (মেশকাত)

একটি হাদীছে কুদছীতে আসিয়াছে আমি যাবতীয় অংশী স্থাপন হইতে পুত পবিত্র, যে কেহ অন্যকে আমার এবাদতের সহিত শরীক করিবে তাহাকে আমি সেই শরীকের সর্পদ করিব, অর্থাৎ আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই, বাস্তবিক পক্ষে ইহা বড় গুরুতর বিষয়। বিভিন্ন হাদীছে রিয়া সম্পর্কে কঠিন সাবধান বাণী ও ধমকি উচ্চারিত হইয়াছে. অন্য একটি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে অন্য কাহাকেও আল্লাহর সহিত শরীক করিয়াছে সে যেন তার আমলের বদলা সেই শরীক হইতে উসুল করিয়া লয়। কারণ খোদাতায়ালা যাবতীয় অংশী স্থাপন হইতে বেপরোয়া।

হযরত আবু ছায়ীদ (রাঃ) বলেন, একবার প্রিয় হাবিব (ছঃ) আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা দাজ্জালের আলোচনা করিতে-ছিলাম, হুজুর (ছঃ) বলেন আমি তোমাদিগকে এমন জিনিসের কথা

বলিব যাহা দাজ্জাল হইতেও ভয়াবহ, আমরা বলিলাম নিশ্চয় বলুন, হুজুর ফরমাইলেন তাহা হইল শেরকে খফী, যেমন এক ব্যক্তি এখলাছের সহিত নামাজ পড়িতে লাগিল, অন্য এক ব্যক্তি তাহার এই নামাজকে দেখিতে লাগিল সে ইহা অনুভব করিয়া নামাজকে লম্বা করিয়া দিল, ইহাই শেরেকে খফী! অন্য হাদীছে হুজুর ফরমাইতেছেন ছোট শেরেক সম্পর্কে আমি তোমাদের জন্য বেশী ভয় করিতেছি, উহা হইল রিয়া। কোরানে পাকে এরশাদ হইতেছে—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا -

"যাহারা স্বীয় প্রভুর সহিত মিলিত হইবার আকাংখা রাখে তাহারা যেন নেক কাজ করিতে থাকে ও আপন প্রভুর এবাদতে অন্য কাহাকেও শরীক না করে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন জনৈক ব্যক্তি হুজুরের খেদমতে জিজ্ঞাসা করিল হুজুর! কোন কোন দ্বীনী কাজে আমি আল্লাহর রেজামন্দী হাছেলের জন্য দণ্ডায়মান হই, কিন্তু আমার দিল চায় যে আমার এই চেষ্টাকে লোকেও যেন দেখে, হুজুর ইহার কোন উত্তর দিলেন না অবশেষে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হজরত মুজাহেদ বলেন জনৈক ব্যক্তি আসিয়া বলিল হুজুর আমি আল্লাহর খুশীর জন্য ছদকা করিয়া থাকি কিন্তু আমার অন্তর চায় যে ইহাতে লোকে আমাকে ভাল বলুক এই ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই হাদীছে আছে জাহান্নামের মধ্যে একটা ময়দান রহিয়াছে যাহা হইতে স্বয়ং জাহান্নাম দৈনিক চারিশত বার পানাহ চাহিতেছে, সেই ভয়ানক ময়দান রিয়াকার কারীদের জন্য। অন্য হাদীছে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তোমরা "জুব্বুল হোজন" হইতে পানাহ্ চাও অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে চিন্তার কুপ নামক স্থান হইতে পানাহ্ চাও। ছাহাবারা আরজ করিলেন উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? হুজুর উত্তর করিলেন যাহারা লোক দেখানো এবাদত করে। জনৈক ছাহাবা বলেন নিম্নের আয়াত কোরান পাকে সব শেষে অবতীর্ণ হয়—

يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رياء الناس -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা খোঁটা দিয়া অথবা কষ্ট দিয়া আপন আপন দান খয়রাতকে বরবাদ করিয়া দিও না। যেমন বরবাদ করিয়া দেয় ঐ ব্যক্তি যে লোক দেখানোর জন্য ছদকা করিয়া থাকে আর সে আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর ঈমান ও রাখে না। তাদের দৃষ্টান্ত হইল এইরূপ যেমন প্লেন পরিস্কার পাথরের উপর কিছু মাটি জমা হইয়া উহাতে কিছু ঘাস ও জন্মাইল, অতঃপর ভীষণ বৃষ্টি হইয়া সব পরিস্কার হইয়া গেল। এই ভাবে যাহারা দান করিয়া খোঁটা দেয় বা গ্রহিতাকে কষ্ট দেয় অথবা মানুষকে দেখাইবার জন্য দান করে তাহাদের আমল সব বরবাদ হইয়া যায়। কেয়ামতের দিন তাহাদের আমল ও দান খয়রাত কোনই কাজে আসিবে না।

কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ব্যক্তির বিচার হইবে

একটি হাদীছে আসিয়াছে কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যাহাদের বিচার হইবে তন্মধ্যে একজন হইবে শহীদ। তাহাকে ডাকিয়া বলা হইবে তোমার উপর দুনিয়াতে অমুক অমুক নেয়ামত দান করা হইয়াছিল তুমি ইহার শুকরিয়া কি আদায় করিয়াছ? সে বলিবে ইলাহী! তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার রাস্তায় শহীদ হইয়া জান উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি। উত্তর হইবে মিথ্যা বলিয়াছ তুমি এই জন্য জেহাদ করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে বাহাদুর বলিবে তাহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইবে আলেম, তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামত প্রকাশ করিয়া বলা হইবে তুমি ইহার কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ? সে বলিবে আমি এলেম শিখিয়াছি শিখাইয়াছি ও তোমার সন্তুষ্টির জন্য কোরান তেলাওয়াত করিয়াছি। এরশাদ হইবে এইসব মিথ্যা তুমি এই সব করিয়াছ এই জন্য যে লোকে যেন তোমাকে আলেম ও কারী বলে তাহাত বলা হইয়াছে অতঃপর তাহাকে অধোঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি হইবে একজন দাতা, তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের উল্লেখ করিয়া বলা হইবে যে তুমি ইহার

মোকাবেলায় কি শোক্‌রিয়া আদায় করিয়াছ ? সে বলিবে এমন কোন পুণ্যের কাজ ছিল না যেখানে আমার সম্পদ আপনার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা হয় নাই। এরশাদ হইবে যে, মিথ্যা কথা, তুমি এইসব এই জন্য করিয়াছিলে যে লোকে তোমাকে দুখী বলিবে, উহাত বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে। হাদীছের উদ্দেশ্য তিন জন লোক নয় বরং তিন প্রকারের লোক। এই ভাবে বহু রেওয়ায়েত দ্বারা হুশিয়ার করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন আমলের মধ্যে রিয়া বা নেকনামী ইত্যাদি ঘুনাক্ষরেও না থাকে, তবে শয়তান বড় চতুর ; সে অনেক সময় এখলাছ নাই এই ভয় দেখাইয়া নেক কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখে। এই সব আজে বাজে খেয়ালে নেক কাজ হইতে বঞ্চিত না হওয়া উচিত, বরং এখলাছ পয়দা হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত, ও আল্লাহর নিকট উহা হাছেল হওয়ার জন্য দোয়া করিতে থাকিবে, তাহা হইলে আল্লাহর মেহেরবানীতে দ্বীনী কাজ সমূহ বরবাদ হইবার আশংকা আর থাকিবে না।

وما ذالك على الله بعزيز-

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃপণতার নিন্দা সম্পর্কে

প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করার ফজীলত সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। উহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় খরচ যতই কম হইবে লাভের মাত্রাও তত কমিয়া যাইবে। বরং কৃপনতা নিন্দনীয় হওয়া সম্পর্কে উহাই যথেষ্ট, তবু মেহেরবান পরওয়ারদেগার ও দয়ার সাগর রাছুলে আকরাম (ছঃ) কৃপণতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, তাই উদাহরণ স্বরূপ এ প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত ও হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

(১) وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ٥ (بقره)

"তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিওনা"।

এই আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করাকে আত্মহত্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এমন কে আছে যে সে নিজের ধ্বংস কামনা করিয়া থাকে? কিন্তু এমন কয়জন লোক আছে যাহারা কৃপণতাকে নিজের ধ্বংসের কারণ জানা সত্বেও উহা হইতে বাঁচিয়া চলে এবং ধন সম্পদ সঞ্চয় করে না। তার কারণ ইহা ছাড়া আর কিছু নয় যে আমাদের অন্তরে গাফলতের পর্দা পড়িয়া রহিয়াছে এবং স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।

(২) الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ○ (بقره)

"শয়তান তোমাদিগকে অভাবের ভয় দেখাইয়া খারাপ কাজ করিবার নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তায়ালা দান করার বিনিময়ে ক্ষমা করা ও মালবৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার ওয়াদা করেন বস্তুতঃ আল্লাহ পাক সমৃদ্ধিশালী, সর্বজ্ঞানী।

ফায়েদা ঃ নবীয়ে করিম (ছঃ) এরশাদ করেন প্রত্যেক মানুষের জন্য একটা শয়তান ও একটা ফেরেস্তা নিযুক্ত রহিয়াছে। শয়তানের কাজ অকল্যাণের ভয় দেখানো যেমন ছদকা করিলে অভাবে পড়িবে ইত্যাদি আর সত্যকে মিথ্যা করিয়া দেখানো। আর শয়তানদের কাজ হইল যতসব ভাল কাজের নির্দেশ করা। অতএব যাহার অন্তরে খারাপ কাজের খেয়াল আসে সে শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে আর যাহার অন্তরে ভাল কাজের উদ্রেক হইবে উহা আল্লাহ পাক হইতে মনে করিবে শোকরিয়া আদায় করিবে। অতঃপর হুজুরে আকরাম (ছঃ) অত্র আয়াত তেলাওয়াত করেন—(মেশকাত) উহাতে রহিয়াছে শয়তান কর্তৃক অভাবের ভয় দেখানো আর অন্যায় কাজের পরামর্শের কথা, আর ইহাই হইল সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা।

হজরত এবনে আব্বাছ বলেন আয়াতে দুইকাজ দেখানো হইয়াছে শয়তানের, আর দুইটি আল্লাহ পাকের। শয়তান অভাবের ভয় দেখায় ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। সে বলে যে সাবধানে খরচ করিও

আগামীতে তোমার প্রয়োজন আছে। আর আল্লাহ পাক গোনাহ মাফের ও রিজিক বৃদ্ধির ওয়াদা করেন। (দুররে মানছুর)

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন আল্লাহ তায়ালা রিজিকের জিম্মাদার উহার উপর পূর্ণ আস্থা রাখিবে আর আগামী কাল কি হইবে এইসব কল্পিত দারিদ্রের ভয় শয়তানি প্ররোচনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে। যেমন এই আয়াত শরীফে এরশাদ হইয়াছে যে মানুষের মনে মনে এই ভয় সৃষ্টি করে যে যদি তুমি মাল সঞ্চয় না কর তবে যখন অসুস্থ হইয়া পড়িবে বা উপার্জন ক্ষমতা তোমার না থাকিবে বা আকস্মিক বিপদ আসিয়া পড়িবে তখন তোমার কি উপায় হইবে? এই সব কল্পিত চিন্তা ভাবনায় তাহাকে অসময়ে পেরেশান করিয়া রাখে এবং সাথে সাথে এই বলিয়া উপহাস করে যে আহমক কোথাকার; আগামীকালের কল্পিত দুরাবস্থার ভয়ে আজ নিশ্চিত কষ্টে নিপতিত হইয়াছে। (এহ্‌ইয়া)

অর্থাৎ ভবিষ্যত চিন্তা তার উপর ছওয়ার হইয়া মাল সঞ্চয় করার ফিকিরে দিবারাত্রি পেরেশান থাকিতেছে।

(৩) ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرلهم بل هو شرلهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير ٥ (ال عمران)

অর্থঃ "আল্লাহ তালার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ হইতে যাহারা ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তাহারা মনে করে না যে, উহা তাহাদের জন্য মঙ্গল জনক, বরং উহা তাহাদের জন্য ভীষণ ক্ষতি কারক। কারণ অতিসত্বর রোজ কেয়ামতে যেই সব মাল দ্বারা তাহারা কার্পণ্য করিতেছে উহা তাহাদের গলায় বেড়ী স্বরূপ পরান হইবে! অর্থাৎ সর্পাকারে তাহাদের গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে। এবং আছমান ও জমীনের একমাত্র আল্লাহ পাকই স্বত্বাধিকারী, আর আল্লাহ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী।

হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যাহাকে আল্লাহ পাক অর্থ সম্পদ দান করিয়াছেন আর সে উহার জাকাত আদায় না করে। কেয়ামতের দিন সেই মাল টাক পড়া সর্পের আকার ধারণ করিয়া (উহা দ্বারা অধিক

বিষাক্ত বুঝায়) উহার গালের নীচে বিষের আধিক্যের দরুন দুইটি বিন্দু থাকিবে। সেই সর্প তার গলায় জড়াইয়া দেওয়া হইবে। উহা তাহার গালের উভয় পাশ চাপিয়া ধরিয়া বলিবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার কোষাগার।"

অতঃপর হুজুর (ছঃ) উক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করেন।

হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন এই আয়াত কাফেরও ঐসব মোমেনের শানে নাজেল হইয়াছে যাহারা যাকাত আদায় করিতে কার্পণ্য করে।

হজরত একরামা (রাঃ) বলেন, যেই মাল হইতে আল্লাহর হক আদায় করা হয় নাই উহা কেয়ামতের দিন টাক পড়া সর্পের আকার ধারণ করিয়া তাহার পিছনে তাড়া করিতে থাকিবে আর ঐ ব্যক্তি সর্প হইতে পানাহ চাহিয়া পলায়ন করিতে থাকিবে।

হজরত হাজার বিন বায়ান ও হজরত মাছরুক হইতে বর্ণিত আছে যেই মাল দ্বারা আত্মীয় স্বজনের হক আদায় হয় নাই উহা কেয়ামতের দিন সর্পাকারে তাহার গলার বেড়ী রূপে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবে।

ইমাম রাজী বলেন এই আয়াতের পূর্বেকার আয়াতে জেহাদে শশরীরে অংশ গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে আর এই আয়াতে অর্থ ব্যয় করিয়া জেহাদে অংশ গ্রহণ করার তাগিদ করা হইয়াছে, যাহারা জেহাদে অর্থ ব্যয় করে না তাহাদের জন্য মাল সর্পাকারে গলার বেড়ী হইবে অতঃপর ইমাম রাজী বলেন আজাবের কঠোরতায় বুঝা যায় ইহা ওয়াজেব ছদকার ব্যাপারে প্রযোজ্য। ওয়াজেব ছদকা কয়েক প্রকার হইতে পারে (১) নিজের জন্য বা ঐসব আত্মীয়ের জন্য যাহাদের ভরণ পোষণ তাহাদের উপর ন্যস্ত। (২) জাকাত (৩) কাফেরগণ যখন মুছলমানদের উপর হমেলা চালাইয়া তাহাদের জান মাল ধ্বংস করিতে চায় তখন প্রত্যেক বিত্তশালী মুসলমানের উপর সাধ্যানুযায়ী ব্যয় করা ওয়াজেব, কারণ ইহা প্রকৃত পক্ষে নিজ জান মালেরই হেফাজত।

(তাফছীরে কবীর)

কৃপণ ও অহঙ্কারীদের সাজা

(৪) ان الله لا يحب من كان مختا لا فخورا - الذ ين

يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتهم

اللہ من فضلہ و اعتدنا للکافرین عذابا مہینا - (نساء)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক এমন ব্যক্তিদেরকে পছন্দ করেন না যে (অন্তরে) নিজেকে বড় মনে করে ও (মুখে) অহঙ্কার করে। যাহারা নিজেরাও কৃপণ এবং অন্যদেরকে ও কৃপণতার উপদেশ দেয়, আর খোদার মেহেরবাণীতে প্রাপ্ত সম্পদ সমূহকে গোপন করিয়া রাখে, এহেন অকৃতজ্ঞদের জন্য আমি লজ্জা জনক শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি।

ফায়েদা ঃ অন্যকে কৃপণতার উৎসাহ দেওয়ার অর্থ কথায়ও হইতে পারে কাজেও হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার কৃপণতা দেখিয়া অন্যেরাও কৃপণ বনিয়া যায়। একাধিক হাদীছে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোন অবৈধ প্রথা প্রচলন করে তাহাকে উহার অশুভ পরিণাম ভোগ করিতে হইবে, উপরন্ত যাহারা তাহার দেখাদেখি সেই কাজ করিবে তাহাদের পাপের বোঝাও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু ইহাতে কাহারও শাস্তির পরিমাণ কম হইবে না।

"মোখতালান ফাখুরা" ইহার অর্থ হজরত মুজাহেদ বলেন যে এমন সব অহঙ্কারী ব্যক্তি যাহারা খোদা প্রদত্ত নেয়ামত সমূহকে গুনিয়া গুনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে। হজরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) প্রিয়নবীর এরশাদ বর্ণনা করেন, রোজ কেয়ামতে যখন আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে একত্রিত করিবেন তখন দোজখের আগুন ধাপে ধাপে দ্রুত গতিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যেসব ফেরেশতা সেখানে নিযুক্ত থাকিবে তাহারা উহাকে ফিরাইতে চাহিবে কিন্তু আগুণ বলিবে আমার প্রভুর ইজ্জতের কছম, হয় আমার বন্ধুদের সহিত মিলিতে দাও, না হয় আমি সবাইকে গ্রাস করিয়া ফেলিব। ফেরেশতারা বলিবে তোমার বন্ধু কাহারা? উত্তরে বলিবে প্রত্যেক অহঙ্কারী জালেম। অতঃপর জাহান্নাম স্বীয় জিহ্বা লম্বা করিয়া প্রত্যেক জালেম অহঙ্কারকে চতুস্পদ জন্তু যেরূপ বছিয়া বাছিয়া ঘাস খায়, তদ্রুপ বাছিয়া বাছিয়া নিজের পেটের ভিতর ফেলিয়া দিবে। তারপর সে পিছনে হাটিয়া আবার ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া বন্ধুদেরকে চাহিবে! বন্ধু কাহারা জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিবে প্রত্যেক নাশোকর জালেম, অতঃপর সে নিজের জবান দ্বারা তাহাদিগকে উদরে ফেলিবে। তৃতীয়বার সে আবার দ্রুতবেগে আসিয়া সঙ্গীদের তালাশ করিবে, জিজ্ঞাসা করা

হইলে বলিবে প্রত্যেক দাম্ভিক অত্যাচারী, তখন তাহাদিগকেও বাছিয়া বাছিয়া উদরস্ত করিয়া লইবে। তারপর সমস্ত মানুষের হিসাব নিকাশ শুরু হইবে।

হজরত জাবের বিন হোজায়েম ছোলামী (রাঃ) বলেন, একদিন মদীনায়ে মোনাওয়ারার গলীতে চলার পথে প্রিয় নবীর (ছঃ) সহিত আমার সাক্ষাত হয়। আমি হুজুরকে ছালাম করিয়া লুঙ্গির ব্যাপারে মাছআলা জিজ্ঞাসা করিলাম। হুজুর ফরমাইলেন হাটুর নীচে পায়ের মোটা অংশ বরাবর হওয়া উচিত। উহা যদি তোমার নাপছন্দ হয় তবে উহার খানিকটা নীচে পরিবে, তুমি যদি উহাকেও নাপছন্দ কর তবে টাখ্‌নু গিরার উপরে অবশ্যই থাকিতে হইবে উহার নীচে যাওয়ার আর অধিকার নাই। কারণ টাখ্‌নুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরা অহঙ্কারের মধ্যে শামিল। তারপর আমি পরোপকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুর বলিলেন কোন পরোপকারকেই তুচ্ছ মনে করিওনা, চাই উহা এক টুক্‌রা রসি হউক বা জুতার একটা ফিতা হউক বা তৃষ্ণাতুরকে সামান্য পানি পান করান হউক, অথবা রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক বস্তু দুর করা হউক, এমন কি ভাইয়ের সহিত হাসি মুখে সাক্ষাত করা পথিককে ছালাম করা, কোন পেরেশান হালকে কিছুটা শান্তনা দেওয়া সবই এহছান বা পরোপকারের মধ্যে শামিল, কেহ যদি তোমার দোষ প্রকাশ করিয়া দেয় আর তুমি তাহার মধ্যে অন্য দোষ আছে জান তবে তুমি উহা প্রকাশ না করিলে ছওয়াব পাইবে আর সে প্রকাশ করায় গোনাহগার হইবে। কোন কাজ করিতে যদি মনে কর যে, লোকে ইহা দেখিলে কোন ক্ষতি নাই তবে উহা করিলেও কোন ক্ষতি নাই। আর যদি দেখ যে লোকে দেখিলে খারাপ মনে করিবে তবে উহা করিও না।

হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাছ (রাঃ) বলেন, কারদম বিন ইয়াজীদ প্রমুখ লোক আনছারদের নিকট আসিয়া বলিল যে, এত বেশী খরচ করিও না, সব শেষ হইয়া যাইবে ফকীর হইয়া যাইবে, একটু বুঝিয়া শুনিয়া খরচ করিবে ইত্যাদি, তাহাদের শানে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে!

জাকাত আদায় না করার ভীষণ শাস্তি

(৫) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ○

অর্থ ঃ যাহারা সোনা চাঁদী সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, হে রাছুল ! আপনি তাহাদিগকে ভয়ানক শাস্তির খোশখবরী দিন। ঐ সব স্বর্ণ চাঁদীকে জাহান্নামের অগ্নীতে উত্তপ্ত করিয়া উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হইবে (বলা হইবে যে) এই সব তোমাদের রক্ষিত ধন সম্পদ যাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে উহার স্বাদ ভোগ কর।

কপাল পাঁজর ইত্যাদিকে দাগ দেওয়ার অর্থ হইল শরীরকেই দাগ দেওয়া যেমন অন্য হাদীসে মুখ হইতে পা পর্যন্ত দাগ দেওয়ার কথা আসিয়াছে। কোন কোন আলেমের মতে এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যে এই গুলিতে দাগ দিলে অধিক কষ্ট অনুভব হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যেহেতু ফকিরকে দেখিলে মানুষ কপাল বাঁকা করিয়া পাঁজর ফিরিয়া পিঠ দিয়া বসে বা চলিয়া যায় কাজেই এই সব অঙ্গে দাগ দেওয়া হইবে।

এই হাদীসে দাগ দেওয়া ও অন্য হাদীছে সাপে দংশনের কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উভয় হাদীছে কোন বিরোধ নাই। কেননা উভয় আজাব পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়া হইবে।

হযরত এবনে আব্বাছ ও অন্যান্য ছাহাবারা বলেন উক্ত আয়াতে সঞ্চিত সম্পদ অর্থ যাহার জাকাত আদায় করা না হয়। আর যাহার জাকাত আদায় করা হইয়াছে উহা কোন সঞ্চিত সম্পদই নয়। জনৈক ছাহাবী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর : স্বর্ণ চাঁদীরত এই দুরবস্থা! আমরা বুঝিলাম তবে এমন কোন সম্পদ রহিয়াছে কি যাহা আমরা

সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি। প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ করেন উৎকৃষ্ট সম্পদ হইল জিকির করনেওয়ালা জিহ্বা, শোকর গোজার অন্তর, আর ধর্ম পরায়নাস্ত্রী যে সৎকাজে স্বামীর সাহায্য করে। হজরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক এই আয়াতের দ্বারা জাকাত ফরজ করিয়াছেন বাকী মাল নিখুত করার জন্য। জাকাত আদায়ের পর অবশিষ্ট মালেই উত্তরাধিকারীদের হক রহিয়াছে। আর সর্বোৎকৃষ্ট সঞ্চিত সম্পদ হইল নেক বিবি যাহাকে দেখিলে মন সন্তুষ্ট হইয়া যায়, কোন আদেশ করিলে সে পালন করে আর স্বামীর অবর্তমানে নিজের ও স্বামীর মালের হেফাজত করে।

হজরত আবু জর ও আবু উমামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ চাঁদীর হক আদায় না করিয়া জমা রাখিয়াছে ঐগুলি দ্বারা তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ধনীদের উপর ঐ পরিমাণ সম্পদ গরীবদের দুঃখ কষ্ট মোচন হয়। ধনীরা মালের হক পুরাপুরি আদায় করে না, তাই গরীবদের দুঃখ কষ্ট উঠাইতে হয়!

হজরত বেলালকে হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন ধনী হইয়া নয় বরং গরীবী অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাত করিও। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর উহা কিরূপ! হুজুর (ছঃ) উত্তর দিলেন, যখনই কোথা হইতে কোন কিছু আসে উহাকে গোপন রাখিও না, ভিখারীকে নৈরাশ করিওনা, হযরত বেলাল বলিলেন উহা কেমন করিয়া হয়? এরশাদ হইল, হ্যাঁ তাহাই হইতে হইবে নচেৎ মনে রাখিও জাহান্নাম ছাড়া উপায় নাই। (দোররে মানছুর)

হযরত আবু জর গেফারী (রাঃ) বলিতেন টাকা পয়সা কোন সঞ্চিত রাখার বস্তুই নয়, আর বলিতেন একটি সঞ্চিত দেরহাম একটি দাগ, দুইটি দেরহাম দুইটি দাগ স্বরূপ। একদা মূলকে শামের আমীর হাবীব বিন ছালমা তাঁহার খেদমতে তিনশত দীনার পাঠান তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়া বলিলেন খোদার ব্যাপারে আমার মত প্রতারিত ব্যক্তি হয়ত সারা দুনিয়াতে আর কেহ নাই, অর্থাৎ এত বড় অংকের সম্পদ জমা করার অর্থই হইল আল্লাহ হইতে গাফেল হওয়া ও খোদার ব্যাপারে ধোকা খাওয়া যাহাতে মানুষ আল্লাহর আজাব হইতে বে ফিকির হইয়া যায়। এই কথাই কোরানে পাকের

অন্যত্র এরশাদ হইতেছে "তোমরা যেন খোদার ব্যাপারে চক্রান্তকারী শয়তানের চক্রান্তে না পড়।"

অতঃপর হজরত আবুজর বলেন আমার জন্যত সামান্য একটু ছায়ার প্রয়োজন যেখানে আমি আশ্রয় নিতে পারি। আর তিনটি বকরীর প্রয়োজন যাহার দুধ দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, আর খেদমতের জন্য একজন দাসীর প্রয়োজন, ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছু হইলে আমার মনে বড় ভয় লাগে। তিনি আরও বলিলেন কেয়ামতের দিন দুই দেরহাম ওয়ালা এক দেরহাম ওয়ালার অনুপাতে অধিক বিপদ গ্রস্থ হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ছামেত বলেন আমি একদা হজরত আবুজর গেফারীর খেদমতে হাজির ছিলাম। ইত্যবসরে বায়তুল মাল হইতে তাঁহার ভাতা আসিল। যদ্দারা তাঁহার দাসী বাজার হইতে কিছু সদাই আনিল, কিন্তু আরও সাত দেরহাম বাঁচিয়া গেল। তিনি দেরহামগুলি ফকীরদের মধ্যে বণ্টণ করার জন্য খুচরা করিয়া আনিতে বলিলেন। আমি বলিলাম হুজুর কোন প্রয়োজন বা অতিথি আসিতে পারে তাই দেরহামগুলি আপনার কাছে জমা থাকিলে কেমন হয়। তিনি বলিলেন প্রিয় নবী (ছঃ) এরশাদ ফরমাইয়াছেন সঞ্চিত মাল আল্লাহর রাহে ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত ভয়াবহ।

হযরত সাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, হজরত আবু জর (রাঃ) প্রিয় নবীর কোন কঠোর নির্দেশ পাইলে জঙ্গলের দিকে চলিয়া যাইতেন ইত্যবসরে হয়তঃ হুকুমের মধ্যে কোন শিথিলতা আসিয়া যাইত তিনি তাহা না জানিয়া প্রথম হুকুমের উপরই মজবুত থাকিতেন। তবে ইহাও সত্য যে তিনি যে কঠোর পন্থী ছিলেন ইহাও প্রকৃত পরহেজগারী, যাহা আমাদের পূর্ব পুরুষগণেরও পছন্দনীয় ছিল। তবে ইহার উপর কাহাকেও মজবুর করা ঠিক নয় বা ইহা না করিলে জাহান্নামী হইবে এমনও কোন কথা নয়। ইহা নিজ নিজ রুচির ব্যাপারে। আল্লাহ পাক যদি এই অধম দুনিয়ার কুকুরকেও সেইসব বুজুর্গানের কিছু আখলাক দান করিতেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশক্তি মান।

দান খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ

(৬) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا
يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ
أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ○ (توبه)

অর্থ ঃ "তাহাদের ছাদকা খয়রাত কবুল না হওয়ার একমাত্র কারণ হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর ও তাঁর রাছুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে না। আর তাহারা খুব অলসতা সহকারে নামাজ আদায় করে এবং অসন্তুষ্ট চিত্তে তাহারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। হে নবী! তাহাদের ধন সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা, তাহারা যেন ধন-দৌলতের ও আওলাদের ফিকিরে দুনিয়াতে শাস্তি ভোগ করে ও মৃত্যুর সময় কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।"

ফায়েদা ঃ আয়াতের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের দান খয়রাত কবুল না হওয়ার কারণ শুধু আল্লাহ ও রাছুলের প্রতি অবিশ্বাসই নয় বরং শৈথিল্যভাবে নমাজ পড়া ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দান করা ও উহার অন্যতম কারণ। নামাজের বিস্তারিত বর্ণনা এই অধমের রচিত ফাজায়েলে নামাজ নামক গ্রন্থে করা হইয়াছে। সেখানে হুজুর (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যাহার নামাজ নাই দ্বীনের মধ্যে তাহার কোন স্থান নাই, তাহার দ্বীন নাই যাহার নামাজ নাই। দ্বীনের জন্য নামাজ এমন শরীরের জন্য মাথা যেমন।

হুজুর (ছঃ) আরও এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ভয় ও নম্রতার সহিত নামাজ পড়িবে তাহার নামাজ উজ্জল রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে দোয়া করিতে করিতে খোদার দরবারে পৌছিবে আর যে বিকৃত ভাবে নামাজ

আদায় করিবে তাহার নামাজ বিশ্রী রূপ ধারণ করতঃ তাহাকে বদ দোয়া দিতে দিতে যাইবে ও বলিবে তুমি আমাকে যেই ভাবে বরবাদ করিয়াছ আল্লাহ তায়ালা তোমাকেও সেইভাবে বরবাদ করুন। অতঃপর এই ধরনের নামাজকে পুরাতন বস্ত্রের মত গুটাইয়া নামাজীর মুখে নিক্ষেপ করা হইবে।

একটি হাদীছে আসিয়াছে রোজ কেয়ামতে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হইবে, যার নামাজ ভাল হইবে, তার অন্যান্য আমল ও ভাল হইবে। আর যার নামাজ মন্দ হইবে তার অন্যান্য আমল ও মন্দ হইবে। অন্যত্র বর্ণিত আছে যার নামজ কবুল হইবে তার অন্য আমল ও কবুল, আর যার নামাজ মাকবুল হইবে না তার অন্যান্য আমল ও মাকবুল হইবে না। (ফাজায়েলে নামাজ)

অতঃপর আয়াত শরীফে ক্ষুন্ন মনে ছদকা করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। অসন্তুষ্ট মনে দান করিলে উহা কি করিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে, তবে ফরজ ছদকা যেমন জাকাত উহা আদায় হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এই জন্যই জাকাতের বিষয় প্রিয় রাছূল (ছঃ) বিভিন্ন রেওয়ায়েতে বলিয়াছেন সন্তুষ্ট চিত্তে আদায় করিবে যেন ফরজ আদায়ের সাথে সাথে ছওয়াব এবং পুরস্কার ও পাওয়া যায়।

প্রিয় হাবীব (ছঃ) আরও বলেন যে ব্যক্তি প্রশান্ত মনে দান করিবে সে ছওয়াব লাভ করিবে, আর যে অশান্ত মনে দান করিবে অবশ্য তাহাও আমি উসুল করিয়া লইব।

হজরত জাফর বিন মোহাম্মদ (রাঃ) বলেন তিনি কোন এক সময় আমিরুল মোমেনীন আবু জাফর মানছুরের নিকট গিয়াছিলেন। সেখানে দেখিতে পান যে হজরত জোবায়েরের বংশের জনৈক ব্যক্তি খলিফার খেদমতে কোন বিষয় একটা দরখাস্ত করিয়াছেন। দরখাস্ত অনুসারে মানছুর তাহাকে কিছু দান করেন, দানের পরিমাণ লোকটির নিকট খুব কম মনে হওয়ায় সে আপত্তি করিল। মানছুর ইহাতে রাগ হইয়া গেলেন। হজরত জাফর (রাঃ) বলেন আমি আমার বাবা ও দাদার নিকট হইতে প্রিয় নবীর এই হাদীছ শুনিয়াছি যে, যেই দান খুশী খুশী প্রদান করা হয় সেই দানের মধ্যে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের কল্যাণে নিহিত থাকে।

মানছুর এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া বলিয়া উঠিল কছম খো[illegible]র, দানের

সময় আমার মনে আনন্দ ছিল না কিন্তু তোমার এই হাদীছ শ্রবণ করিয়া আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল, অতঃপর হজরত জাফর (রাঃ) হজরত জোবায়েরের বংশের লোকটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন আমার বাবা ও দাদার মাধ্যমে হুজুর (ছঃ) এর এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি অল্প দানকে কম মনে করে আল্লাহ পাক তাহাকে প্রাচুর্য হইতে বঞ্চিত রাখেন, লোকটি সাথে সাথে বলিয়া উঠিল কছম খোদার, প্রথমেত আমি এই দান অতি ক্ষুদ্রই মনে করিতাম, হাদীছ শুনার পর এখন ইহা অমার নিকট অনেক বেশী মনে হইতে লাগিল। হযরত ছুফিয়ান বলেন আমি জোবায়রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম খলিফার দান যাহাকে আপনি কম মনে করিয়াছিলেন ইহার পরিমাণ কত ছিল, তিনি বলিলেন প্রথমে উহা খুব কমই ছিল তবে আমার কাছে আসার পর উহাতে বরকত হইয়া পঞ্চাশ হাজারে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। হজরত ছুফিয়ান বলেন ইহারা আহলে বায়তের লোক যেখানে যায় বারী ধারার ন্যায় মানুষের উপকার করিয়া আসে। উদ্দেশ্য এখানে দুইটা হাদীছ বর্ণনা করিয়া উভয়কে সন্তুষ্ট করিয় দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহা ও লক্ষণীয় যে, সেই জমানার বাদশাদের কার্যক্রমও ঈর্ষার যোগ্য, তাইত খলিফা মানছুর হুজুরের হাদীস শুনা মাত্রই মাথা নত করিয়া দিলেন। আয়াত শরীফের শেষাংশে আওলাদ ফরজন্দ ও ধন দৌলতকে দুনিয়াতে অশান্তির কারণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এইসব অশান্তিকর হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন সন্তান সন্ততি রোগাক্রান্ত হওয়া অথবা বিভিন্ন সূত্রে বিপদ গ্রস্থ হওয়া আবার কখনও মৃত্যুর ভয়। এই সব দুনিয়াতে মুছলমানদের উপর ও আসিয়া থাকে, তবে যেহেতু পরকালে তাহারা উহার প্রতিদান ও ছওয়াব লাভ করিবে তাই তাহাদের জন্য কষ্ট হইলেও উহা আনন্দের কারণ। আর কাফেরদের জন্য উভয় জাহানেই অশান্তি আর অশান্তির কারণ।

কৃপণতা এবং অপব্যয় দুটাই সমান অপরাধ

(৭) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ
الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا - إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

অর্থ ঃ কৃপণতার কারণে নিজের হাত ঘাড়ের সহিত আবদ্ধ করিওনা এবং খুব বেশী খুলিয়াও দিওনা (যাহাতে অপব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়) ইহাতে বিপদাপন্ন হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। শুধু মাত্র কাহারও দারিদ্রের কারণে নিজেকে উদ্বিগ্ন করা সমীচীন নহে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যাহাকে ইচ্ছা অধিক রিজিক প্রদান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা রিজিক কমাইয়া দেন। বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সবকিছু অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ পবিত্র কোরআনের এই স্থানে সমাজের অনেক রীতি নীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে আলোকপাত করা হইয়াছে। বিশেষত এই আয়াতে কৃপণতা এবং অপব্যয় সম্পর্কে সাবধান করিয়া মধ্যমাবস্থা ও মিতব্যয়িতার প্রতি তাগিদ দেওয়া হইয়াছে যে, নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি কিছু সাহায্য চাহিলে তিনি বলিলেন, এখনতো দিবার মতো কিছু নাই। লোকটি বলিল আপনার পরিধানে যে জামা রহিয়াছে তাহা দিন। নবীজী জামাটি খুলিয়া ভিক্ষুকের হাতে দিলেন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হইল।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এই আয়াত পারিবারিক ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কিত। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে খুব বেশী কৃপণতাও করা যাইবে না অপব্যয়ও করা যাইবে না বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতেও বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণনা রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি মাঝামাঝি অবস্থার অনুসরণ করে সে কখনো দরিদ্র হয় না। আয়াতের শেষাংশে সকল মানুষের অর্থনৈতিক সমতার নিবুদ্ধিতামূলক চিন্তার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক ব্যাপার সমুহ আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। তিনি যাহাকে ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন যাহাকে ইচ্ছা অভাব অনটনের মধ্যে নিপতিত রাখেন। তিনি তাহাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং তাহাদের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবগত রহিয়াছেন। হজরত হাছান (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি যাহার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা কল্যাণকর মনে করেন তাহাকে স্বচ্ছলতা প্রদান করেন, আর যাহার জন্য দারিদ্রবস্থা কল্যাণকর মনে করেন তাহাকে দরিদ্র করিয়া রাখেন। পবিত্র কোরআনে অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন।

কাহাকেও ধনী কাহাকেও গরীব কেন করা হইল

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۗ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌ ۢ بَصِيْرٌ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহার সকল বান্দাদের রিজিক প্রশস্ত করিয়া দিতেন তাহা হইলে তাহারা পৃথিবীতে গোলযোগ বাঁধাইত আল্লাহ তায়ালা যোগ্যতা অনুযায়ী রিজিক নাজিল করেন। বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবগত আছেন এবং প্রত্যক্ষ করিতেছেন।
(সূরা শূরা রুকু ৩)

এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে পাইকারীভাবে সবাইকে স্বচ্ছলতা প্রদান করা হইলে তাহা পৃথিবীতে দাঙ্গা হাঙ্গামার কারণ হইবে স্পষ্টত ইহা ধারণা করা যায় এবং অভিজ্ঞতা হইতেও জানা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা সকল মানুষকে বিত্তশালী করিয়া দেন তাহা হইলে বিশ্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অচলাবস্থা সৃষ্টি হইবে। যদি সবাই মনিব হইয়া যায় তবে শ্রমজীবি কাহারা হইবে? ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেন আরব দেশে যেই বছর অধিক ফসল উৎপন্ন হইত সেই বছর জনসাধারণ পরস্পর পরস্পরকে বন্দী করিত ও হত্যা করিতে শুরু করিত। দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদেরকে ছাড়িয়া দিত। (দুররে মনছুর)

হজরত আলী (রাঃ) এবং অন্যান্য ছাহাবাগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আছহাবে ছোফ্ফা কর্তৃক দুনিয়াদারী প্রত্যাশা করার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাজিল হইয়াছে। হজরত কাতাদা (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যেই রিজিক তোমার মধ্যে হটকারিতা সৃষ্টি করিবে না এবং তোমাকে আত্মমগ্ন করিয়া দিবে না [illegible]হাই উত্তম রিজিক। একবার নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন আমার উম্মতের ব্যাপারে দুনিয়াবী চাকচিক্য তথা জাঁকজমক সম্প[illegible] মি আশঙ্কা করিতেছি। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল মালামালও কি অকল্যাণের কারণ হইয়া থ[illegible]? অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল।

হাদীছে [illegible]তে নবীজী হইতে আল্লাহর বাণী বর্ণনা করা [illegible] যে [illegible] আমার সহিত লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হয়,

আমি আমার বন্ধুর সহায়তায় ক্রুদ্ধ বাঘের মত ক্রোধান্বিত হইয়া পড়ি। আমার আদিষ্ট ফরজ সমূহ পালন করা ব্যতীত কোন কিছুর দ্বারাই বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করিতে পারিবে না অর্থাৎ আল্লাহর ফরজ বিধান সমূহের অনুস্মরণ না করিয়া তাঁহার নৈকট্য লাভ করা সম্ভব নয়। ফরজ পালনের পর নফল দ্বারাও তাঁহার নৈকট্য লাভ করা যায়।) নফল সমূহ পালন করিয়া বান্দা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে। (নফল সমূহ পালন যত বৃদ্ধি পাইবে আল্লাহর নৈকট্যের পথে ততই অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে।) পরিশেষে সেই বান্দা আমার বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বন্ধু হওয়ার পর আমি সেই বান্দার চোখ, কান, হাত এবং সাহায্যকারী হইয়া যাই। যদি সে আমাকে আহ্বান করে,এবং আমার নিকট কিছু চায় আমি তাহাকে তাহা দান করি। আমি যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করি তাহার মধ্যে মোমেন বান্দার রূহ কবজ করাকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকি, এমন না হয় যে কোন কারণে সেই বান্দা মৃত্যুকে অপছন্দ করে; সে অবস্থায় আমি তাহার মনে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার আমার কোন বান্দা বিশেষ প্রকৃতির ইবাদত করিতে পছন্দ করে কিন্তু আমি তাহাকে সেই সুযোগ এই কারণেই দেই না যে ইহাতে তাহার মধ্যে আত্মতৃপ্তিবোধ গড়িয়া উঠিবে। আমার কোন কোন বান্দা এমন রহিয়াছে যে শারীরিক সুস্থতাই তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে পারে। যদি আমি তাহাদের অসুস্থ করি তবে তাহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া যায়। কোন কোন বান্দা এমন রহিয়াছে যাহাদের অসুস্থাবস্থায় তাহাদের ঈমান সঠিক রাখিতে পারে। যদি আমি তাহাদের সুস্থতা প্রদান করি তবে তাহারা বিগড়াইয়া যাইতে পারে। বান্দাদের অবস্থা অনুযায়ী আমি তাহাদের কার্যাবলীর আয়োজন করি। কেননা আমি তাহাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত (দুররে মনছুর)।

এই হাদীছটি বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য। ইহার অর্থ এই নয় যে কেহ গরীব হইলে সাহায্য করার প্রয়োজন নাই কেহ অসুস্থ হইলে তাহার চিকিৎসা করার প্রয়োজন নাই। যদি তাহা হইত তবে সদকা খয়রাতের সব আয়াত ও বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িবে, যেই সকল বর্ণনায় চিকিৎসা করার নির্দেশ রহিয়াছে তাহাও অপ্রাসঙ্গিক হইয়া

পড়িবে! বরং অর্থ হইতেছে এই যে, চিকিৎসক যতই চাহিবে যে কেহ অসুস্থ না হোক তাহা ফলপ্রসু হইবে না। সরকার যতই চাহিবে যে কেহ অসুস্থ না হোক তাহা ফলপ্রসু হইবে না। সাধ্যমত তাহাদের সুস্থতা ও দারিদ্রাবস্থা দূর করা আমাদের কর্তব্য। যাহারা এইরূপ চেষ্টা করিবে তাহারা ইহকাল ও পরকালে তাহার বিনিময় লাভ করিবে। তবে যদি চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন রুগ্ন ব্যক্তি আরোগ্য লাভ না করে এবং কোন দরিদ্র ব্যক্তির দারিদ্র মোচন না হয় তবে মনে করিতে হইবে যে ইহাতেই আমার কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। ইহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার বা শঙ্কিত হওয়ার কিছুই নাই যেহেতু আমরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানিনা এবং অবাস্তব বিষয় সম্পর্কে আমল করার জন্য আমাদের আদেশ করা হয় নাই এই কারণে চিকিৎসা ও অর্থ সাহায্যের ক্ষেত্রে সাহায্য সহানুভূতি অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(৮) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ○

অর্থাৎ—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যাহা কিছু প্রদান করিয়াছেন তাহার মধ্যে পরকালও অন্বেষণ কর এবং দুনিয়াতে নিজের প্রাপ্য অংশকে ভুলিয়া যাইও না। আল্লহ তায়ালা তোমার প্রতি যেইরূপ অনুগ্রহ করিয়াছে তুমি সেইরূপ অনুগ্রহশীলতার পরিচয় দাও। পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। নিঃসন্দেহ আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না! (সুরা কাছাছ, রুকু ৮)

ফায়েদা ঃ এখানে মুসলমানদের পক্ষ হইতে কারুনকে নসিহত করার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কিত পুরো কাহিনী যাকাত আদায় না করা বিষয়ক বর্ণনায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে কোরানের আয়াত উল্লেখ প্রসঙ্গে লেখা হইবে। ছুদ্দী (রহঃ) বলেন, পরকালে অন্বেষণের অর্থ এই যে সদকা করিয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ কর এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য পালন কর। হযরত ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলেন দুনিয়াতে নিজের অংশকে ভুলিয়া যাইও না, ইহার অর্থ হইতেছে দুনি-

য়াতে আল্লাহর জন্য আমল পরিত্যাগ করিও না। মোজাহেদ (রঃ) বলেন দুনিয়াতে নিজের অংশ, ইহার বিনিময় পরকালে পাওয়া যায়। হাছান বছরী (রহঃ) বলেন, নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী রাখিয়া অবশিষ্টাংশ খরচ করা এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এক বছরের প্রয়োজনীয় অর্থ সম্পদ সঞ্চয় রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সদকা করিবে। (দুররে মনছুর)।

ইহ কালীন জীবনে পারলৌকিক অংশ বিস্মৃত হওয়ার অর্থ হইতেছে নিজের উপর অশেষ অত্যাচার করা। নবী করিম (ছঃ) বলেন, কেয়া-মতের দিন মানুষকে আল্লাহর সামনে এমনভাবে হাজির করা হইবে যে তাহার অবস্থা হইবে ভেড়ার শাবকের মত। আল্লাহ তখন বলিবেন, আমি তোমাকে অর্থ সম্পদ দান করিয়াছি, তোমার উপর বড় বড় অনুগ্রহ করিয়াছি কিন্তু তুমি আমার এইসব নিয়ামতের কি শুকরিয়া আদায় করিয়াছ? বান্দা বলিবে, হে আল্লাহ! আমি অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি। সে সব বৃদ্ধি করিয়াছি পুর্বে যাহা ছিল তাহার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণে রাখিয়া আসিয়াছি। আপনি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠাইলে সেই সব আমি সঙ্গে লইয়া আসিব।

আল্লাহ বলিবেন, আখেরাতের জন্য সেই সময় যাহা প্রেরণ করিয়াছ তাহা দেখাও। বান্দা পুনরায় বলিবে, অর্থ সম্পদ যাহা ছিল আমি তাহা বৃদ্ধি করিয়া আসিয়াছি পুনরায় আমাকে পাঠাইয়া দিন আমি সব-কিছু লইয়া আসিব। অবশেষে পরকালের জন্য প্রেরিত কোন সঞ্চয় তাহার নিকট না পাইয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

(মেশকাত)

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার প্রিয় রাছুলের এই সব বাণী বিশেষ প্রনিধানযোগ্য এবং এইসব বাণী মনযোগ সহকারে আমল করা কর্তব্য। শুধু ভাসা ভাসা ভাবে পড়িয়া রাখিয়া দেওয়ার জন্য এই সব বলা হয় নাই, পার্থিব জীবন পুরোপুরিই স্বপ্নের মত। এই জীবনকালকে পার-লৌকিক জীবনের প্রস্তুতির জন্য সম্পদ স্বরূপ মনে করিবে এবং যতোটা সম্ভব পরকালের জন্য উপার্জন করিবে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও তাওফিক দিন।

(৯) ها نتم هـؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم

مَن يَبخَلُ وَمَن يَبخَلْ فَإِنَّمَا يَبخَلُ عَن نَفسِهِ - وَاللهُ الغَنِيُّ وَأَنتُمُ الفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوا يَستَبدِل قَومًا غَيرَكُم ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمثَالَكُم ٥

অর্থাৎ "দেখ তোমরা এমন লোক যে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্য আহবান করা হয় তখন তোমাদেরই মধ্যে কেহ কেহ কৃপণতা করে। এবং আল্লাহ পাক ধনী, এবং তোমরাই অভাবগ্রস্ত; এবং যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তবে তিনি তোমাদের স্থলে অপর সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করিবেন এবং তাহারা তোমাদের মতো আদেশ অমান্যকারী হইবে না। (মোহাম্মদ, রুকু ৪)

ফায়েদা ঃ আমাদের দান খয়রাতের প্রতি আল্লাহর উদ্দেশ্য যে সম্পৃক্ত নাই তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়। কোরানে কারীমে এবং নিজের প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেসব তাকীদ দিয়াছেন তাহা আমাদের কল্যাণের জন্যই দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিচেছদে দান-খয়রাতের দ্বীনী দুনিয়াবী অনেক উপকারিতার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একজন বিচারক, মনিব, সৃষ্টিকর্তা কোন ব্যক্তিকে যদি এমন আদেশ করেন যাহাতে আদেশকারীর কোন লাভ নাই বরং যাহাকে আদেশ করা হইয়াছে তাহারই লাভ হইবে এমতাবস্থায় যদি আদেশ লংঘন করা হয় তবে লংঘনকারীকে যতো বেশী অপদস্থ ও নাজেহাল করা হয় তাহা যে বাড়াবাড়ি হইবে না তাহাতো স্পষ্ট বোঝা যায়। একটি হাদীছে আছে আল্লাহ তায়ালা পরোপকারের জন্যই অনেককে নেয়ামত প্রদান করেন, যতোদিন তাহারা পরোপকারের কাজে লিপ্ত থাকে ততোদিন সেই নেয়ামত তাহাদের নিকট থাকে। অবাধ্যতা প্রদর্শন করিলে আল্লাহ তায়ালা সেই নেয়ামত অন্যদেরকে প্রদান করেন। (কানজ) আল্লাহর এই নেয়ামত শুধু অর্থ সম্পদের সহিত সীমাবদ্ধ নয়, সম্মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদিও তাহার সহিত সম্পর্কিত।

হাদীছে উল্লেখ আছে যে এই আয়াত তখন নাজিল হইল যখন সাহাবাদের কেহ কেহ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা অবাধ্যতা করিলে যে কওম সৃষ্টি করিবেন বলিয়া আল্লাহ পাক উল্লেখ করিয়াছেন

তাহারা কে ? নবীজী তখন হযরত সালমান ফারছীর (রাঃ) কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন, ইনি এবং তাঁহার জাতি। যাহার নিকট আমার প্রাণ রহিয়াছে সেই মহান জাতের কছম, দ্বীন যদি সুরাইয়াতেও থাকিত (কয়েকটি নক্ষত্রের নাম) তবু ও পারস্যের কিছু কিছু লোক সেখান হইতে দ্বীনকে লইয়া আসিত। বিভিন্ন বর্ণনায় এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)। অর্থাৎ পারস্যের কিছু কিছু লোককে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনের বিষয়ে এতো বেশী অনুসন্ধিৎসা দান করিয়াছেন যে, দ্বীনের জ্ঞান যদি সুরাইয়া নক্ষত্র দেশেও থাকিত তবু তাহারা সেই স্থান হইতে দ্বীনের জ্ঞান আহরণ করিত। মেশকাত শরীফে এ বর্ণনা তিরমিজি হইতে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য এক বর্ণনায় নবীজীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে নবীজীর সামনে অনারবদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন, তাহাদের প্রতি অথবা তাহাদের মধ্যেকার কাহারো কাহারো প্রতি তোমাদের প্রতি অথবা তোমাদের কাহারো প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার চাইতে অধিক বিশ্বাস ও নির্ভরতা রহিয়াছে।

(মেশকাত)

প্রকাশ থাকে যে, অনারবদের মধ্যে এমন কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তি জন্মলাভ করিয়াছেন যাহারা ছাহাবা হওয়ার গৌরব ছাড়াও অন্যান্য গৌরব বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত ও বিশিষ্ট ছিলেন। হাদীছ শরীফে হজরত ছালমান ফারসীর (রাঃ) বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রহিয়াছে। উল্লেখ থাকাই স্বাভাবিক, কেননা সত্য দ্বীনের সন্ধানে তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল অনেক। আড়াই শত বছর আয়ুস্কাল সম্পর্কে কোন মতভেদ নাই। কেহ কেহ সাড়ে তিন শত বছর বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহার চেয়ে অধিক বলিয়াছেন। কাহারো মতে তিনি হজরত ঈসার (আঃ) যমানা পাইয়াছিলেন। নবী করিম (ছঃ) এবং হযরত ঈসার (আঃ) যমানার মধ্যে ছয়শত বছর দুরত্ব ছিল। (রাঃ) আখেরী নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে খবর পাইয়াছিলেন এবং তদবধি নবীর অম্বেষণে বাহির হইয়া পাদ্রী এবং তৎকালীন পণ্ডিতদের নিকট এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। পাদ্রী পণ্ডিতগণ আখেরী নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে

জানান যে, তিনি অল্পকাল মধ্যেই আবির্ভূত হইবেন। নবীজীর আবির্ভাবের বিভিন্ন লক্ষণ ও তাঁহারা উল্লেখ করেন। ছালমান ফারছী (রাঃ) ছিলেন পারস্যের অন্যতম শাহজাদা। মহানবীর সন্ধানে তিনি দেশ হইতে অন্যদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় বন্দী হইয়া দাসত্বের জীবনও যাপন করিতে হইয়াছিল। বোখারী শরীফে সঙ্কলিত এক বর্ণনায় ছালমান (রাঃ) নিজেই বলেন যে, আমাকে দশজনের অধিক মনিব ক্রয় বিক্রয় করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত মদীনার এক ইহুদী তাঁহাকে ক্রয় করে। সেই সময় নবী করিম (ছঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় অবস্থান করিতেছিলেন। ছালমান ফারছী (রাঃ) ইহা জানিতে পারিয়া নবীজীর দরবারে হাজির হইলেন। ইতিপূর্বে নবীজীর আবির্ভাব সম্পর্কে যেই সব নিদর্শন সম্পর্কে তিনি অবহিত হইয়াছিলেন সেই সব পরীক্ষা করিয়া সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় হজরত ছালমান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ফিদিয়া পরিশোধ করিয়া ইহুদী মনিবের দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা চারজন লোককে বন্ধু মনে করেন তাহাদের মধ্যে সালমান (রাঃ) অন্যতম। (এছাবা)

ইহার অর্থ এই নয় যে, অন্য কাহাকেও বন্ধু মনে করেন না বরং অর্থ এই যে, এই চারজনও আল্লাহর বন্ধুদের অন্তর্ভূক্ত। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহ তায়ালা সাত জন নুজুবা তৈরী করিয়াছেন। (বিশিষ্ট ব্যক্তি-দের সমন্বয়ে গঠিত দল, তাঁহারা সংশ্লিষ্ট নবীর জাহেরী ও বাতেনী বিষয়ে তদারক করেন এবং নবীকে সাহায্য করেন)। কিন্তু আমার জন্য আল্লাহ চৌদ্দজন নুজুবা নির্ধারণ করিয়াছেন। জনৈক ছাহাবী তাঁহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী বলিলেন হজরত আলী (রাঃ) ও তাহার দুই পুত্র (হাছান হোছেন) জাফর-হামজা, আবু বকর, ওমর, মছআব এবনে ওমায়ের, বেলাল, সালমান, আম্মার, আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ আবুজর গেফারী ও মেকদাদ (রাঃ)। (মেশকাত)

উল্লিখিত সাহাবাদের জীবন কথা পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, দ্বীনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে।

বোখারী শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে যে, সুরা জুমার আয়াত—

وَآخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۝

নাজিল হওয়ার পর সাহাবাগণ জানিতে চাহিলেন যে তাহারা কে ? নবীজী নীরব রহিলেন, সাহাবাগণ তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর নবীজী জবাবে ছালমান ফারেছীর (রাঃ) উপরে হাত রাখিয়া বলিলেন, ঈমান যদি সুরাইয়ার উপর থাকিত তাহা হইলেও উহাদের কতিপয় লোক সেখান হইতেও ঈমানকে লইয়া আসিত। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে জ্ঞান যদি ছুরাইয়ার উপর থাকিত অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে দ্বীন যদি সুরাইয়ার উপরও থাকিত তবু পারস্যের কিছু লোক সেখান হইতে লইয়া আসিত। (ফতহুল বারী)

শাফেয়ী মজহাবের বিশিষ্ট ভাষ্যকার আল্লামা সুয়ুতী বলেন, এই হাদীছটি হজরত ইমাম আবু হানিফার (রঃ) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী হিসাবে এতো নির্ভুল যে তাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়।

(মোকাদ্দমা উজেয)

(১৫) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অথবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদ আপতিত হয় আমি সৃষ্টি করিবার পূর্বেই উহা লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছি। উহা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ। ইহা এই জন্য যে, যাহা তোমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, তজন্য দুঃখ করিও না, এবং আল্লাহ ঐ সব দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না যাহারা কৃপণতা করে, এবং মানবগণকে কৃপণতা উদ্দীপক আদেশ করে। যে বিমুখ হয় নিশ্চয় আল্লাহ তো কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন—তিনি অতীব প্রসংশনীয় ধনী। (হাদীদ রুকু, ৩)

ফায়েদা ঃ বিপদে পতিত হওয়ার পর মনোকষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সেই মনোকষ্ট যেন এমন পর্যায়ে না পৌছে যে দ্বীন দুনিয়ার যাবতীয় কার্যকলাপ হইতে বিরত রাখে। ইহাও স্বাভাবিক ব্যাপার যে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি জানা যায় যে ইহা হইবেই, কোন চেষ্টাতেই তাহাকে মুলতবী করা যাইবে না তবে সে বিষয়ে মনোকষ্ট অনেকটা হালকা হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন বিষয় যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে সংগঠিত হয় তবে তাহাতে মনোকষ্ট অধিক হইয়া থাকে। এ কারণেই এ আয়াতে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, মৃত্যু জীবন, দুঃখ আনন্দ শান্তি বিপদ সব কিছুই আমি পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। কাজেই যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অবধারিত বিষয়ে অহেতুক কথাবার্তা, শোক দুঃখ প্রকাশ বা নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? আয়াতে মোখতালুন ফাখুর শব্দ দু'টির অর্থ দাম্ভিক অহংকারী করা হইয়াছে। প্রথমটি নিজের মধ্যে অন্যটি অপরের সামনে প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তিগত উপলব্ধি সঞ্জাত বিষয়েই দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় আর অহংকার বাহিরের বিষয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন প্রভাব প্রতিপত্তি ইত্যাদি। (বয়ানুল কোরান)

হজরত কাজআ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে (রাঃ) মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখিয়া বলিলাম, আমি খোরাসানের তৈরী কোমল কাপড় সঙ্গে আনিয়াছি আপনি ইহা পরিধান করিলে তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল হইবে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আশংকা করিতেছি যে, এ পোযাক পরিয়া আমি দাম্ভিক অহংকারীতে পরিণত না হইয়া যাই। (দুররে মনছুর)

(১১) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝

অর্থাৎ তাহারা হইতেছে এমন সব যাহারা আনসারগণকে বলে আল্লাহর রাসুলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করিও না, তবেই ইহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। অথচ আসমান জমিনের সমস্ত সম্পদ আল্লাহরই কিন্তু

মোনাফেকেরা তাহা বোঝে না। (মোনাফেকুন রুকু ১)

ফায়েদা ঃ বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার অনুসারীরা বলিল যে, মোহাম্মদ (ছঃ)-এর সন্নিকটে যেই সব লোক সমবেত হইয়াছে তাহাদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দিলে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া তাহারা আপনা আপনি ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। তখন এই আয়াত নাজিল হইল। এটা স্বীকৃত সত্য দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার এবং অভিজ্ঞতা যে, কোন আল্লাহর দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে শত্রুতামূলক ভাবে সাহায্যদান যাহারা বন্ধ করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে অন্য পথ খুলিয়াছেন। সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত প্রত্যেককে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন হাতে বান্দার রিজিক রাখিয়া দিয়াছেন, কাহারো বাবার ক্ষমতা নাই যে, সেই রিজিক বন্ধ রাখিতে পারে অথবা পারিবে। তবে এই ধরনের অপচেষ্টা করিয়া আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া পরকালে জবাব দিহির জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া যায়। সেই সময় কোন প্রকার মিথ্যা অজুহাত খাটিবে না টালবাহানা চলিবে না প্রবঞ্চনামুলক বর্ণনা কোন কাজে আসিবে না। কোন উকিল, ব্যারিষ্টার কাজে আসিবে না। আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া আল্লাহর শত্রুরা নিজেদের পরকাল বিপর্যস্ত করা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে লাভবান হইতে পারিবে না। ব্যক্তিগত শত্রুতা বা দুনিয়াবী হঠকারী উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহর দ্বীনের পথে বাধা সৃষ্টি করা অথবা যাহারা দ্বীনের কাজ করে তাহাদের সাহায্যদানে বিরত থাকা অথবা অন্যদের বাধা দান করিলে, পরিণামে নিজেরই ক্ষতি করা হইবে, অন্য কাহারো ক্ষতি হইবে না।

নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্মানহানির সময় তাহাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাহায্য না করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কাহারো সাহায্য পাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা করিয়াও আল্লাহর সাহায্য পাইবে না। (মেশকাত)

আমাদের প্রিয় নবীর কার্যকলাপ উম্মতের জন্য রাজ পথের মত উন্মুক্ত। সকল ক্ষেত্রে নবীজীর কার্যকলাপের অনুসরণ প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। নবী করিম (ছঃ) শত্রুকেও সাহায্য করিতে কুণ্ঠাবোধ

করিতেন না। হাদীছের কিতাবসমূহ ও ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে অসংখ্য এ ধরনের ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবীজীকে কতভাবে কষ্ট দিয়াছে, সেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেই বলিয়াছে মদীনায় পৌঁছিয়া সম্মানীয় লোকেরা 'অর্থাৎ আমরা ঐসব অসম্মানীয় লোকদের 'অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মদীনা হইতে বাহির করিয়া দিব। এই সফরেই উপরোক্ত আয়াত নাজিল হইয়াছিল। এই সফর হইতে ফিরিবার কয়েকদিন পর মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ অসুখে পড়িলে নিজের পুত্রকে (তাহার পুত্র ছিল খাঁটি মুসলমান) বলিল তুমি যাইয়া নবীজীকে আমার নিকট ডাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আসিবেন। মোনাফেক আবদুল্লাহর পুত্র নবীজীর নিকটে গিয়া পিতার ইচছার কথা ব্যক্ত করিলে নবীজী জুতা মোবারক পরিধান করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোনাফেক নেতার গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নবীজীকে দেখিয়া আবদুল্লাহ এবনে উবাই কাঁদিতে লাগিল। নবীজী বলিলেন, ওহে আল্লাহর দুশমন তুমি কি ভয় পাইয়া গেলে? সে বলিল, আমাকে দয়া করুন। এই কথা শুনিয়া নবীজীর চোখ জলে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? সে বলিল, আমার মৃত্যুকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমার মৃত্যুর পর গোসলের সময়ে আপনি উপস্থিত থাকিবেন এবং আপনার পোশাক দিয়া আমার কাফনের ব্যবস্থা করিবেন, আমার জানাজার সহিত কবর পর্যন্ত গমন করিবেন এবং আমার জানাজার নামাজ পড়াইবেন। নবী করিম (ছঃ) তাহার সকল আবেদন মঞ্জর করিলেন। ইহাতে لا تصل على احد منهم الخ সূরা বারাতের এই আয়াত নাজিল হইল। (দুররে মনছুর)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকদের জানাজার নামাজ পড়াইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। প্রাণঘাতী দুশমনদের সহিত নবীজী এইরূপ ব্যবহার করিতেন। যাহারা কোন প্রকার শত্রুতা গালি গালাজ এবং কুৎসা রটনা হইতে বিরত থাকিত না। প্রাণের দুশমনের কষ্ট দেখিয়া নবীজীর দু'চোখ যেমন অশ্রু সজল হইয়া উঠিয়াছিল, আমরা কি নিজেদের প্রাণের দুশমনের সহিত এইরূপ আচরণ করিতে সক্ষম হইব? নবীজী সেই কপট মুসলমানের যে সকল আবেদন রক্ষা করিয়াছিলেন

আমরা কি অনুরূপ ঔদার্যের পরিচয়ের কথা ভাবিতে পারি? নবীজী যদিও তাহাকে এতো বেশী দয়া করিয়াছেন কিন্তু কুফুরীর কারণে সেইসব তাহার কোন কাজে আসে নাই? ভবিষ্যতে কাফের মোনাফেকদের প্রতি এধরনের অনুগ্রহ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

(২:) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا

لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ - فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ ০

অর্থাৎ "আমি তাহাদের" পরীক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, যেমন আমি বাগান ওয়ালাদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম। যখন তাহারা পরস্পর কসম করিল যে, ভোরে উঠিয়া উহার ফল কাটিয়া আনিবে। আর ইনশাআল্লা পর্যন্ত বলিল না, তখন প্রবাহিত হইয়া গেল উহার উপর দিয়া চলন্ত আজাব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে--অথচ তাহারা ছিল ঘুমন্ত। ফলে বাগানটি ভোর বেলায় রহিয়া গেল শস্যকাটা ক্ষেতের মত। আর এদিকে তাহারা সকালে উঠিয়া পরস্পরকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিল যে, ভোর থাকিতেই তোমাদের ক্ষেতে পৌঁছিতে হইবে যদি ফল কাটিতে চাও। অতঃপর তাহারা চুপে চুপে এই বলিয়া চলিল যে, নিশ্চয়ই আজ প্রবেশ করিতে পারিবে না তোমাদের কাছে কোন মিছকীন। আর তাহারা না দেওয়ার উপর নিজেকে সক্ষম ভাবিয়া চলিল। যখন উহাকে দেখিল তখন তাহারা বলিল, নিশ্চয়ই আমরা ভুল করিয়াছি। বরং আমরা বঞ্চিতই হইয়াছি। তাহাদের মধ্যেকার নেককার ব্যক্তি বলিল, কিহে আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই? গরীবদেরকে না দেওয়ার জন্য বদ নিয়ত করিও না, এখনও তাছবীহ পাঠ করিতেছ না কেন? তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী। আবার একে অপরকে দোষারোপ করিতে লাগিল। সমবেতভাবে বলিতে লাগিল, হায় আফসোস, আমরা সবাই ছিলাম সীমা অতিক্রমকারী। হয়ত আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে দান করিবেন তদপেক্ষা উত্তম বাগান। আমরা এখন আমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি। আল্লাহর হুকুম অমান্যের ফলে এমনই আজাব হইয়া থাকে। আর আখেরাতের আজাব কঠোর। যদি ইহারা জানিত।

(সূরা কালাম রুকু ১)

ফায়েদা ঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত ঘটনাটি বড়ই তাৎপর্য পূর্ণ যাহারা গরীব মিছকীনকে না দেওয়ার ব্যাপারে কৃত সংকল্প হয় এবং কসম করিয়া অঙ্গীকারবদ্ধ হয় যে ঐসব মুখাপেক্ষীদের এক পয়সাও প্রদান করিবে না এক বেলা খানাও প্রদান করিবে না, ওরা পাওয়ার যোগ্য নহে, তাহাদের দান করা অনর্থক। এইরূপ যাহারা মনে করে তাহারা একই সময়ে সমূদয় মালামাল হইতে হঠাৎ বঞ্চিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে যেসব পূণ্য প্রাণ এই ধরনের কর্মপদ্ধিতি পছন্দ করে না কিন্তু ঘটনাক্রমে উহাদের সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া যায় তাহারাও আল্লাহর আজাব হইতে নিস্কৃতি পায় না। হজরত আবদুল্লা (রাঃ) বলেন, এই সব আয়াতে যে ঘটনার কথা বলা হইয়াছে তাহা হাবসার অধিবাসীদের সঙ্গে ঘটিয়াছে তাহাদের পিতার একটি বড় বাগান ছিল, উহা হইতে তাহাদের পিতা ভিক্ষুকদের দান করিতেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার সন্তানেরা বলিতে লাগিল যে, আব্বাজানত ছিলেন নির্বোধ, তিনি গরীব মিছকীনদের মধ্যে সব বন্টন করিয়া দিতেন। তারপর তাহারা কসম করিয়া বলিতে লাগিল যে; আমরা কাল সকালে বাগানের সকল ফল কর্ত্তন করিয়া কোন ভিক্ষুককে এক কনাও দিব না। হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন বাগানের বড় মিয়ার রীতি ছিল যে তিনি এক বছরের প্রয়োজনীয় খরচ রাখিয়া অবশিষ্ট ফলাফল গরীব দুঃখীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন। তাহার সন্তানেরা এভাবে আল্লাহর পথে দান করিতে পিতাকে বাধা দিত। কিন্তু তাহাদের পিতা তাহাদের বাধা মানিত না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানেরা বাগানের সমুদয় উৎপন্ন কুক্ষিগত করিয়া রাখার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। গরীব দুঃখীদের না দেওয়ার জন্যই তাহারা এইরূপ সংকল্প করিয়াছিল। সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, এই বাগানটি ছিল ইয়ামনে, জায়গার নাম ছিল দেরওয়ান। তাহা ছিল ইয়ামনের বিখ্যাত শহর সনআ হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। ইবনে জোরায়েজ (রাঃ) বলেন, জাহান্নামের আগুনের একটি হুলকা সেই বাগানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। মোজাহেদ (রাঃ) বলেন, এটি ছিল আঙ্গুরের বাগান। হজরত আবদুল্লা ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবীজীর পবিত্র বানী উদৃত করিয়া বলেন, নিজেকে পাপের পঙ্কিলতা হইতে রক্ষা কর। মানুষ

কিছু কিছু পাপ এমন করে যে, সেই পাপের কদর্যতায় জ্ঞানের একাংশ ভুলিয়া যায়। অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি খারাপ হইয়া যায় এবং যাহা পাঠ করে তাহা ভুলিয়া যায়। কোন কোন পাপ এমন রহিয়াছে যে পাপ করিলে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম হইতে জাগিতে পারে না। কোন কোন পাপ এমন রহিয়াছে যে পাপ করিলে ন্যায্য উপার্জন ও তাহার হাতছাড়া হইয়া যায়। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করেন فطاف عليها طائف من ربك তারপর বলেন ঐ লোকেরা তাহাদের পাপের কারণে বাগানের উৎপন্ন ফল হইতে বঞ্চিত হইয়া গেল।

(দুররে মনছুর)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরানের অন্যত্র বলিয়াছেন।

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ

وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ○

অর্থাৎ তোমাদের যেই সব বিপদ আপদ আসে তাহা তোমাদের আমলের কারণেই আসিয়া থাকে। আবার অনেক পাপ আল্লাহ তায়ালা মার্জনা করিয়া দেন। (সূরা শূরা রুকু ৪)

হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমাকে নবী করিম (ছঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যা তোমাকে কি বলিব, হে আলী ? যাহা কিছুই তোমাদের পৌছে, রোগ হোক বা কোন প্রকার আজাব হউক বা দুনিয়াবী কোন বিপদ হোক এইসব তোমাদের নিজের হাতের উপার্জন। এ বিষয়টি আমি এ'তেদাল গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

(১৩) واما من اوتى كتابه بشماله - فيقول يليتنى لم اوت كتابيه - ولم ادر ما حسابيه - يليتها كانت القاضية - ما اغنى عنى ماليه - هلك عنى سلطانيه - خذوه فغلوه - ثم الجحيم صلوه - ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه - انه كان لا يؤمن بالله العظيم - ولا يحض على طعام المسكين - فليس له اليوم ههنا حميم - ولا طعام الا من غسلين - لا ياكله الا الخاطئون ○

অর্থাৎ "কিন্তু যাহার আমলনামা বাম হাতে প্রদত্ত হইবে সে বলিবে

হায় আফসোস, যদি আমি আমলনামা প্রাপ্ত না হইতাম। আর আমার হিসাব কি হইবে তা মোটেই না জানিতাম। হায় যদি উহাই হইত সমাপ্তি, আমার ধন-সম্পত্তি আমার কোন কাজে আসিল না। আমার প্রভাব প্রতিপত্তিও বিনষ্ট হইয়া গেল। বলা হইবে তাহাকে ধর তাহার গলায় রশি লাগাও। অতঃপর তাহাকে দোজখের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তারপর তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর ৭০ গজী শিকলে। নিশ্চয়ই সে মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনিত না। গরীবকে খাওয়ানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিত না। তাই তাহার জন্য আজ এখানে কোন হিতৈষী নাই। এবং কোন খাবার নাই নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। যাহা গোনাহগারগণ ব্যতীত আর কেহ ভক্ষণ করিবে না। (হাক্কাত রুকু ১)

ফায়েদা ঃ গিসলীন অর্থাৎ ক্ষতস্থান ইত্যাদি ধৌত করার পর যেই পানি সঞ্চিত হয় তাহাকে গিসলীন বলা হয়। হজরত ইবনে্ আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ক্ষতস্থানের ভিতর হইতে যেসব রক্ত পূঁজ ইত্যাদি বাহির হয় তাহাই গিসলীন।

হজরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উদ্বৃত করিয়াছেন যে গিসলীনের এক পাত্র যদি পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয় তাহা হইলে তাহার দুর্গন্ধে সমগ্র পৃথিবী দুর্গন্ধময় হইয়া যাইবে। নওফে শামী (রাঃ) হইতে উদৃত হইয়াছে যে, ৭০ গজ লম্বা যেই শিকলের কথা বলা হইয়াছে তাহার প্রতি গজ ৭০ বাম বিশিষ্ট, এবং প্রতিটি বাম মক্কা হইতে কুফার দুরত্ব পর্যন্ত দীর্ঘ।

হজরত ইবনে্ আব্বাছ (রাঃ) হইতে অন্যান্য তাফসীর কারগণ নকল করিয়াছেন যে, এই শিকল গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইয়া নাসিকার ভিতর দিয়া বাহির করা হইবে। (দুররে মনছুর)

এই আয়াতে গরীব দুঃখীদের খাদ্য দ্রব্য খাওয়ানের জন্য উৎসাহিত না করিলে ও শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই নিজের আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদেরকে অভ্যাগতদেরকে দরিদ্র পালন, গরীব মিসকীনকে আহার্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দেওয়া উচিৎ। অন্যদেরকে তাকিদ দিতে থাকিলে নিজের মধ্যকার কৃপণতার মনোভাবও কমিয়া যাইবে।

(১৪) ويل لكل همزة لمزة - الذى جمع مالا وعدده -
يحسب ان ماله اخلده - كلا لينبذن فى الحطمة - وما
ادرك ما الحطمة - نار الله الموقدة - التى تطلع
على الافئدة انها عليهم مؤصدة فى عمد ممددة ০

অর্থাৎ ঃ মহা অকল্যাণ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও বিদ্রূপকারীর জন্য যে মালকে সঞ্চয় করে এবং উহাকে গণনা করিতে থাকে। সে মনে করে যে তাহার মাল তাহার নিকট চিরকাল থাকিবে। না না নিশ্চয় সে হোতামায় নিক্ষিপ্ত হইবে। আর আপনি জানেন কি যে হোতামা কি? উহা আল্লাহর এমন এক প্রজ্জলিত অগ্নি যাহা হৃদয় সমূহেরও খবর লইয়া ছাড়িবে নিশ্চয়ই উহাকে তাহাদের উপর পরিবেষ্টিত করা হইবে। দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহের মধ্যে। (হোমাজাত রুকু১)

ফায়েদা ঃ হোমাজাহ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরা-মের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হোমাজাহ অর্থ হইতেছে খোঁটাদানকারী। হোমাজাহ অর্থ হইতেছে পরনিন্দাকারী। ইবনে জোরায়েজ (রাঃ) বলেন হোমাজাহ ইঙ্গিত দ্বারা হইয়া থাকে, চোখ, মুখ ও হাতের ইশারা যে কোন কিছুর দ্বারাই এই ইশারা হইতে পারে। লোমাজাহ জিহবা দ্বারা হইয়া থাকে।

একবার নবী করিম (ছঃ) তাঁহার মে'রাজের অবস্থা বর্ণনাকালে বলেন যে, আমি পুরুষদের একটি দল দেখিয়াছি, তাহাদের অঙ্গ প্রতঙ্গ কাঁচি দিয়া কর্তন করা হইতেছিল। আমি জিব্রাঈল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাদের পরিচয় কি? তিনি বলিলেন, উহারা সেই লোক যাহারা অপকর্মের জন্য সাজসজ্জা করিত।

অর্থাৎ হারাম কাজের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজ্জিত করিত। অতঃ পর আমি একটি কূপ দেখিলাম সেই কুপ হইতে বিশ্রী রকমের দুর্গন্ধ আসিতেছিল এবং ভিতর হইতে চীৎকার শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল আমি জিব্রাইলকে (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাদের পরিচয় কি। তিনি বলিলেন, ইহারা ঐসব স্ত্রীলোক যাহারা (ব্যভিচারের জন্য) সাজসজ্জা করিত এবং অবৈধ কাজ করিত।

অতঃপর আমি কিছু নারী পুরুষ একত্রিত অবস্থায় দেখিলাম, তাহাদেরকে স্তনে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, তাহারা খোঁটাদানকারী ছিল এবং চোগলখুরী করিত! (দুররে মনছুর)

আল্লাহ পাক তাঁহার অপার করুণায় আমাদেরকে এইসব পাপ হইতে দূরে রাখুন! এই কৃপণতা ও লোভের বিশেষভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃপণতার কারণে মানুষ মালামাল সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং লোভের কারণে বারবার গণনা করে যেন কম না হইয়া যায়। সেই সব অর্থ সম্পদ ও মালামালের ভালোবাসা এত গভীর যে বারবার এইসব করিয়াও তৃপ্তি অনুভব করে। এই বদ-অভ্যাস তাহাদের মধ্যে অহংকার জন্ম দেয় এবং অন্যদের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং খোঁটা দেয়। এই কারণে এ ছুরার শুরুতে ঐ সব দোষের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে। অতঃপর ঐসব মন্দ অভ্যাসের নিন্দা করা হইয়াছে। প্রত্যেকে এইরূপ ধারণা করি-তেছে যে, অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে সেইসব তাদেরকে বিপদ আপদ ও দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা যেন মনে করিতেছে যে, বিত্তশালীদের মৃত্যু হয় না। এই কারণে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে।

বহু ঘটনা এমন রহিয়াছে যে, বিপদ আসিলে অর্থ সম্পদ বিপ-দাপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক সময় অর্থ সম্পদের আধিক্য হেতু বিপদ আসিয়া পড়ে। কেহ বিত্তবান ব্যক্তিকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে চায়, কেহ হত্যা করার পাঁয়তারা করে। লুটতরাজ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাকার বিপদ আপদ এই অর্থ সম্পর্কের কারণে মানুষের উপর আসিয়া পতিত হয়। অর্থ সম্পদ বেশী হইলে স্ত্রী পুত্র, কন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাই মনে মনে কামনা করে যে বৃদ্ধ মরেনা কেন, কবে মরিবে, মরিলে সমুদয় অর্থ সম্পদ আমাদের হস্তগত হইবে।

এতিমের সহিত অসদ্ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণাম

(৫১) ارءيت الذى يكذب بالدين - فذالك
الذى يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين -
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون - الذين هم

يراؤن و يمنعون الماعون ٥

অর্থাৎ ওহে, যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে তাহাকে দেখিয়াছ কি ? তবে সে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে হাঁকাইয়া দেয় এবং মিছকীনকে আহার্যদানে উৎসাহিত করে না। সুতরাং সেই নামাজীর জন্য ধ্বংস যাহারা তাহাদের নামাজকে ভুলিয়া থাকে। যাহারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে এবং জাকাত আদায় করিতে বিরত থাকে। (মাউন)

ফায়েদা ঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এতিমকে হাঁকাইয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে তাহার অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা। কাদাতা (রাঃ) বলেন, হাঁকাইয়া দেয়া মানে অত্যাচার করা বুঝায় এবং ইহা কেয়ামতের দিনকে ভুল বোঝার কারণে হইয়া থাকে। যেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিনের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল হইবে, সেই দিনের শাস্তি ও পুরুস্কারের প্রতি বিশ্বাসী হইবে সে কাহারো প্রতি অত্যাচার করিবে না, নিজের অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখিবে না বরং আল্লাহর পথে অব্যাহত ভাবে দান করিবে। কেননা যেই ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে যে আমি এ ব্যবসায়ে আজ দশ টাকা বিনিয়োগ করিলে কেয়ামতের দিন অবশ্য বৈধ উপায়ে এক হাজার টাকা লাভ করিব সে কখনো দান করিতে গড়িমসি করিবে না। যেইসব নামাজীর কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা হইতেছে মোনাফেক। তাহারা লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে কিন্তু একাকী থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ে না। হযরত সাদ (রাঃ) সহ বিভিন্ন জনের নিকট হইতে নকল করা হইয়াছে যে, নামাজ ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে দেরীতে পড়া এবং অসময়ে পড়া। মাউন শব্দের ব্যাখ্যায় ওলামাদের একাধিক বক্তব্য রহিয়াছে। কেহ কেহ মাউন অর্থ যাকাত বলিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ওলামা হইতে যেই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে তাহাতে মাউন অর্থ দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলা হইয়াছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করিম এর সময়ে মাউন বলিতে এইসব জিনিস বুঝিতাম ঃ বালতি হাঁড়ি কুঠার, দাঁড়ি পাল্লা এবং এধরণের অন্যান্য জিনিস, যাহা কিছুক্ষণের

জন্য ধার নিয়া কাজ শেষে ফিরাইয়া দেওয়া হয়।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, মাউন মানে ঐসব জিনিস যাহা দ্বারা লোকেরা পরস্পরের সাহায্য করে। যেমন কুঠার, ডেকচি, ভিস্তি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আরো অনেক বক্তব্য উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইকরামা (রাঃ) এর নিকট কেহ মাউন শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার মূল হইতেছে, যাকাত। সাধারণ অর্থ হইতেছে চালুনি, ভিস্তি সুই ইত্যাদি প্রদান করা। (দুররে মনছুর)

এই ছূরায় কয়েকটি বিষয়ে হুঁসিয়ারী উচ্চারিত হইয়াছে। সেই সবের মধ্যে এতিমের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক করা হইয়াছে যে এতিমকে হাঁকাইয়া দেওয়া ধ্বংসের অন্যতম উপকরণ। বহুলোক এমন রহিয়াছে যাহারা এতিমের অভিভাবক হইয়া অবশেষে তাহার মালামাল আত্মসাৎ করিয়া লয়। সেই এতিম নিজে বা তাহার পক্ষ হইতে কেহ অধিকার দাবী করিলে তাহাদেরকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই ধরনের কাজ যাহারা করে তাহাদের ধ্বংস ও ভয়াবহ শাস্তির ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। এই ছূরার শানে নযুলেও এই ধরনের একটি ঘটনা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে এতিমদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া বহু আয়াত নাজিল হইয়াছে। কয়েকটি আয়াতের প্রতি ইশারা করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো হইতেছে।

(১) ছূরা বাকারার দশম রুকুতে আল্লাহ বলেন, "এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও এবং আত্মীয় স্বজন, এতিমদের ও অভাব গ্রস্তদের প্রতি। (২) ছূরা বাকারার ২২তম রুকুতে আল্লাহর ভালোবাসার্থ ধনসম্পদ আত্মীয়স্বজনে, এতিম মিছকিন মুছাফির ও যোগ্য দানপ্রার্থীকে (৩) বাকারার ২৬তম রুকুতে বলেন—বলিয়া দাও, সৎকাজে যাহাই ব্যয় কর, তোমাদের পিতামাতা নিকটাত্মীয় এতিম ও অভাবগ্রস্ত মোছাফিরদের প্রাপ্য। (৫) বাকারার ২৭তম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং আরো তোমাদের এতিমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বল তাহাদের উপকার করা উত্তম। (৫) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং এতিমদেরকে তাহাদের মাল প্রদান কর। (৬) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ পাক বলেন, এবং যদি এ বিষয়ে আশঙ্কা কর যে,

ন্যায় বিচার করিতে পারিবে না পিতৃহীনদের প্রতি। (৭) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং এতিমদেরকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করিবে যে বিবাহের বয়সে পৌছে, তখন যদি তাহাদের মধ্যে কিছুটা যোগ্যতা অনুভব কর (৮) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ, বলেন এবং তখন বণ্টনকালে স্বজন, এতিম এবং মিছকিন আসিয়া উপস্থিত হয়। (৯) ছূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই যাহারা এতিমদের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে। (১০) ছূরা নেছার ষষ্ঠ রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং পিতামাতা আত্মীয়স্বজন, এতিম অভাবগ্রস্ত নিকট প্রতিবেশী। ছূরা নেছার উনিশতম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং তাহাদেরকে বিবাহ করিতে পছন্দ করনা সেই এতিম দরিদ্রদের সম্বন্ধে (১১) ছূরা আনয়ামের উনিশতম আয়াতে আল্লাহ বলেন, এবং তোমরা এতিমদের মালামালের নিকটবর্তী হইও না। (১৪) বনি ইসরাইলের চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ পাক বলেন, এ পর্যন্ত যে এতিম তাহার সাবালকত্বে পৌছায় (১৫) ছূরা হাশরের প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের এতিমগণের (১৬) ছূরা হাশরের প্রথম রুকুতে আল্লাহ বলেন, এবং তাহারা আল্লাহর মহব্বতে খানা খাওয়ায় মিসকিন, এতিম ও বন্দীদেরকে। (১৭) ছূরা ফাজরে আল্লাহ পাক বলেন, বরং তোমরা এতিমকে আদর কর না। (১৮) ছূরা বালাদে আল্লাহ বলেন, এতিম আত্মীয় বা ধুলায়িত কাঙ্গালকে অন্ন দান কর। (১৯) ছূরা দোহায় আল্লাহ বলেন, তিনি কি তোমাকে এতিম পান নাই? (২০) ছূরা দোহায় আল্লাহ বলেন, সুতরাং এতিম দিগকে কখনও ধমক দিওনা! এই আয়াতে এতিমদের ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন। এমনকি এতিম মেয়ের বিয়ের সময় মোহরানা যেন কম না রাখা হয় সে বিষয়েও সতর্ক করা হইয়াছে।

নবী করিম (ছঃ) বিভিন্ন হাদীছে বলিয়াছেন এতিমের প্রতিপালন কারী আমার সহিত বেহেশতে দুই আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি অবস্থান করিবে। নবী করিম (ছঃ) এ হাদীছে শাহাদাত আঙ্গুল এবং মধ্যবর্তী আঙ্গুলের সমন্বয় করিয়া দেখাইয়াছেন। কোন কোন ওলামা মধ্যবর্তী আঙ্গুলের চাইতে শাহাদাত আঙ্গুলের কিছুটা সামনে থাকার কারণ

প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এ ক্ষেত্রে অর্থ হইতেছে যে, নবীজী বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, নবুয়ত লাভের কারণে আমার স্থান বেহেশ্‌তে কিছুটা সামনে থাকিবে।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি এতিমের মাথায় স্বস্নেহে হাত বুলাইয়া দিবে সেই হাতের নীচে যতো চুল পড়িবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তত সংখ্যক নেকী প্রদান করিবেন। নবীজী আরও বলিয়াছেন এতিম ছেলে বা মেয়ের প্রতি যে ব্যক্তি স্নেহ প্রদর্শন করিবে আমি এবং সেই ব্যক্তি বেহেশতে দুই আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি অবস্থান করিব। একথা বলিয়া নবীজী দুইটি আঙ্গুল দেখাইয়া ইশারা করিলেন। এই হাদীছটি উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য হাদীছে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এতিমদের প্রসঙ্গে নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন। (দুররে মনছুর)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক এমন ভাবে উঠিবে যে, তাহাদের মুখে আগুন জ্বলিতে থাকিবে। একজন ছাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাদের পরিচয় কি ? নবীজী তখন ছূরা নেছার প্রথম রুকুর একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, যাহাতে বলা হইয়াছে নিশ্চয় যাহারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাহারা নিজেদের পেটে আগুণ ভক্ষণ করে।

শবে মে'রাজে নবী করিম (ছঃ) একটি কাওমকে দেখিলেন তাহাদের ঠোঁট উটের ঠোঁটের মতো বড় বড় এবং তাহাদের উপর ফেরেশতারা নিয়োজিত রহিয়াছেন। ফেরেশতারা তাহাদের ঠোঁট চিরিয়া মুখের ভিতর অগ্নিময় বড় বড় পাথর ঠেলিয়া দিতেছিল। সেই পাথর তাহাদের মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া গুহ্যদার দিয়া বাহির হইতেছিল, এবং তাহারা হৃদয় বিদারক কণ্ঠে চিৎকার দিতেছিল। নবী করিম (ছঃ) জিব্রাঈলকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জিব্রাঈল বলিলেন, ইহারা জুলুম করিয়া এতিমদের মালামাল ভক্ষণ করিত। এখানে তাহাদেরকে আগুন ভক্ষণ করানো হইতেছে।

একটি হাদীছে রহিয়াছে চার প্রকারের লোক এমন রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন না এবং বেহেশতের

নেয়ামত ও তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না। তাহারা হইতেছে মদ্য পানকারী, সুদখোর, অন্যায়ভাবে এতিমের মালামাল ভক্ষণকারী এবং পিতামাতার অবাধ্যতাকারী। (দুররে মানছুর)

শাহ আবদুল আজিজ (রঃ) স্বীয় তাফছীরে লিখিয়াছেন, এতিমের প্রতি অনুগ্রহ দুই প্রকারের, প্রথম প্রকার হইতেছে যাহা ওয়ারিশদের প্রতি ওয়াজিব। যেমন তাহাদের মালামালের হেফাজত। সেই মালামাল কৃষিকাজ. ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা। যাহাতে উপার্জিত অর্থ দ্বারা এতিমদের প্রয়োজন পুরণ হইতে পারে, পানাহার পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহ এমনকি লেখাপড়া ইত্যাদি বিষয়ে কল্যাণ সাধন সম্ভব হয়। দ্বিতীয় প্রকার হইতেছে সর্ব সাধারণের প্রতি ওয়াজিব। ইহা হইতেছে তাহাদিগকে কোন রকম কষ্ট না দেওয়া এবং তাহাদের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করা। সভা সমিতিতে তাহাদেরকে নিকটে বসানো, তাহাদের মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া দেয়া নিজের সন্তানের মতো কোলে তুলে নেয়া এবং তাহাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা। কেননা তাহারা এতিম হওয়ার পর পিতৃহীন হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা সব বান্দাকে আদেশ দিয়াছেন যেন তাহাদের সহিত পিতৃসুলভ ব্যবহার করা হয় তাহাদেরকে সন্তানের মতো মনে করে। যাহাতে পিতৃহীন হওয়ার শূন্যতা ও মনোবেদনা তাহারা অনুভব করিতে না পারে। কাজেই এতিমও শরীয়তের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি সঙ্গত ব্যবহারের জন্য যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তেমনি এতিমদের প্রতিও সঙ্গত ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

উল্লেখিত আয়াতে মিছকিনকে আহার্য দানে উৎসাহিত না করার ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা নিজেদের মালামালতো খরচ করেই না বরং অন্য কেহ মিছকিনদের প্রতি গরীবদের প্রতি খরচ করুক ইহাও তাহারা পছন্দ করে না। মিছকিনকে আহার্য্য প্রদানের জন্য কোরানের বহু আয়াতে তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। ছূরা ফাজরে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, বরং তোমরা এতিমকে আদর কর না, মিছকিনকে ভোজনে উৎসাহ দাও না।

তৃতীয় বলা হইয়াছে যে, যাহারা যাকাত আদায় করিতে বিরত থাকে, পূর্বাহ্নে ইহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। হজরত শাহ আবদুল আজিজ (রাঃ) লিখিয়াছেন, এই ছূরার নাম মাউন এই কারণেই রাখা হইয়াছে যেহেতু ইহা অনুগ্রহের ক্ষুদ্র বিষয়। ক্ষুদ্র ব্যাপারেও অনুগ্রহ না করার কারণে যদি এতো কঠিন শাস্তির কথা বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে আল্লাহর হুকুম এবং হক্কুল এবাদ পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে আরো অধিক ভয় করা উচিত। উল্লেখিত ক্ষুদ্র বিষয়েও কোরানের অনেক গুলি আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি হাদীছ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, যাহাতে বুঝা যাইবে যে, কৃপণতা এবং ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করিয়া রাখা কতো মারাত্মক অপরাধ।

হাদীছ

(১) عن ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله (ص) خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق ٥ (رواه الترمذى - كذا فى المشكوة)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দুইটি অভ্যাস মোমেন বান্দার মধ্যে একত্রিত হইতে পারে না, একটি কৃপণতা অন্যটি দুসচরিত্রতা।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি মোমেন হইয়া কৃপণ হইবে এবং অসৎ চরিত্র হইবে ইহা কিছুতেই মোমেন বান্দার জন্য শোভনীয় নহে। এই ধরনের লোকের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্থ থাকা উচিত। খোদা না করুন এমন হয় যে, তাহারা ঈমানহীন হইয়া পড়িতে পারে। একটি সৌন্দর্য যেমন অন্য সৌন্দর্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে তেমনি একটি দোষ অন্য দোষকে আকর্ষণ করিয়া থকে।

অন্য একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, শোহ্ (কৃপণতার চুড়ান্ত পর্যায়) ঈমানের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। এই দুইটির সম্মিলন পরস্পরবিরোধী দুইটি বস্তুর সম্মিলনের মতো। যেমন আগুন ও পানির সম্মিলন। যাহা শক্তিশালী হইবে তাহা অন্যটিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। যদি পানি শক্তিশালী হয় তবে আগুনকে গ্রাস করিবে আর যদি আগুন শক্তিশালী হয়; তবে পানিকে জ্বালাইয়া ফেলিবে। এমনিভাবে ঈমান ও কৃপণতা পরস্পর বিরোধী যাহা শক্তিশালী

হইবে তাহা অন্যটিকে ধীরে ধীরে বিলীন করিয়া দিবে।

একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, এমন একজন গুণী হন নাই যাহার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা দুইটি অভ্যাস সৃষ্টি করেন নাই। তাহা হইতেছে দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতা। (কানজ)

আরেকটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহর কোন এমন অলী নাই যাহাকে দানশীলতায় অভ্যস্ত করা হয় নাই। (কানজ)

ইহা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত যদি সম্পর্ক এবং ভালবাসা থাকে তবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ব্যয় করিতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই মন চাহিবে। প্রেমাস্পদের আত্মীয় স্বজনের প্রতি অন্তরের টান ভালবাসার উপকরনের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র সৃষ্টি যখন আল্লাহর পরিবারভুক্ত, এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য ব্যয় করিতে অলীর অন্তঃকরণ অবশ্যই চাহিবে। যদি আল্লাহর পরিবারের প্রতি মনের টান গভীর হয় তবে তাহাদের জন্য খরচ করিতে মনের তাকীদ বোধ করিতে থাকিবে, যদি তাকীদ বোধ না করে তবে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।

(২) عن ابي بكر صديق (رض) قال قال رسول الله (ص)
لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ۝
(رواه الترمذي - كذا في المشكوة)

অর্থাৎ হজরত 'আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) নবী করীম (ছঃ)-এর বাণী নকল করিয়াছেন যে, ধোকাবাজ, কৃপণ এবং সদকা করিয়া অনুগ্রহের বড়াই করে এমন লোক বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।

ফায়েদা ঃ ওলামাগণ বলিয়াছেন যে উপরোক্ত অভ্যাস সম্পৃক্ত কোন লোকই বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। যদি কোন মোমেন ব্যক্তির মধ্যে উপরোক্ত কোন বদঅভ্যাস খোদা না খাস্তা থাকিয়া থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে এই দুনিয়াতেই তওবার তওফীক দান করিবেন। যদি তাহা না হয় তবে প্রথমে দোজখে প্রবেশ করিয়া এসব অভ্যাস হইতে পরিশুদ্ধ হওয়ার পর বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু দোজখে প্রবেশ করিতেই হইবে। অল্পসময়ের জন্য হইলেও প্রবেশ করিতে হইবে। অল্প সময়ের জন্য প্রবেশ করাও সহজ ব্যাপার নহে। এমনতো নয় যে দুনিয়ার আগুনে অল্প সময়ের জন্য পোড়ানো হইল, ইহা এমন কি ব্যাপার। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, জাহান্নামের আগু-

নের তুলনায় দুনিয়ার আগুন সত্তর ভাগের এক ভাগ উত্তপ্ত। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, দুনিয়ার আগুনই বা কম কিসের; এই আগুনইতো যথেষ্ট যন্ত্রণাদায়ক। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, দোযখের আগুন ইহার চাইতে উনসত্তর গুণ অধিক উত্তপ্ত। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তিভোগ কারী সেই ব্যক্তি হইবে যাহাকে শুধু জাহান্নামী আগুনের একজোড়া জুতা পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই আগুনের কারণে তাহার মগজ এমন জোশ মারিবে যেমন নাকি উনুনে হাঁড়ি জোশ মারিয়া থাকে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, আল্লাহ পাক আদন নামক বেহেশতকে নিজ কুদরতী হাতে তৈরী করিয়াছেন অতঃপর তাহাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। অতঃপর ফেরেশতাদের আদেশ দিয়াছেন যে উহাতে নহর প্রবাহিত করো এবং ফল ঝুলাইয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর সুসজ্জিত বেহেশত প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আমার ইজ্জতের কছম আমার শান শওকতের কছম, আমার আরশের উচ্চতার কছম তোমার মধ্যে কৃপণ প্রবেশ করিতে পারিবে না। (কান্‌জ)

(২) عن ابى ذر (رض) قال انتهيت الى النبى (ص) وهو جالس فى ظل الكعبة فلما رانى قال هم الا خسرون ورب الكعبة فقلت فداك ابى وامى من هم قال هم الا كثرون مالا الا من قال هكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه عن شماله وقليل ما هم ○
(متفق عليه - كذا فى المشكوة)

অর্থাৎ হজরত আবুজর (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইলাম। নবীজী তখন কাবা শরীফের দেয়ালের ছায়ায় ছিলেন। আমাকে দেখিয়া নবীজী বলিলেন, ঐ সব লোক ক্ষতিগ্রস্থ। আমি আরজ করিলাম, আপনার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গীত হউন, তাহারা কে? নবীজী বলিলেন, যাদের নিকট অধিক মালামাল রহিয়াছে। (তবে তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ নয় যাহারা) এভাবে (খরচ করে) ডান দিক হইতে বাম দিকে, বামদিক হইতে ডান দিকে। তবে এই ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম।

ফায়েদা ঃ হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ) ছিলেন অন্যতম মোজাহেদ

সাহাবী। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া এই ধরনের কথা বলিয়া প্রকৃতপক্ষে নবী করিম (ছঃ) তাঁহাকে শান্তনা দিয়াছিলেন যে তিনি যেন নিজের দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার কথা কখনো মনে না করেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মালামালের আধিক্য প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাপারই নহে। ইহারা বরং ক্ষতিকর জিনিস। ইহা আল্লাহ তায়ালাকে ভুলাইয়া দেয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, দারিদ্রাবস্থা ব্যতিত মানুষ খুব কমই আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে। তবে যাহাদেরকে আল্লাহ পাক তওফীক প্রদান করিয়াছেন তাহারা প্রয়োজনের প্রকৃতি অনুযায়ী চারিদিকে দানের হাত প্রসারিত করিয়া থাকেন। তাহাদের জন্য অর্থ কোন প্রকার ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় না। কিন্তু নবী করিম (ছঃ) নিজেই বলিয়াছেন যে এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত দেখা যায়, যাহাদের অধিক অর্থসম্পদ রহিয়াছে তাহারা অন্যায় অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করে, অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য কাজে অর্থ ব্যয় করে, নাম যশ অর্জনের জন্য অর্থ ব্যয় করে। বিয়ে শাদী, এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অহেতুক হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু এইসব অর্থ ব্যয় কারীই আল্লাহর পথে খুদাতুর অভাব গ্রস্থদের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। একটি হাদীছে আছে যে, যেইসব লোক পৃথিবীতে অধিক অর্থ সম্পদের অধীকারী, কেয়ামতের দিন তাহারা স্বল্প মূলধনের অধিকারী হইবে, তবে যাহারা বৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া এইভাবে এইভাবে খরচ করিবে। প্রথম হাদীছের মতোই এইভাবে এইভাবের দ্বারা এদিক সেদিক খরচের কথা দেখানো হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে যেই ব্যক্তি এদিক সেদিক খরচ করে অর্থ সম্পদ তাহার জন্য সৌন্দর্য বাহক। যাহারা কুক্ষিগত করিয়া রাখে অর্থ সম্পদ তাহাদের জন্য সকল প্রকার আপদ ডাকিয়া আনে। অর্থ বিত্তে অধিকারী সেই ব্যক্তিকে অর্থ বিত্ত ধবংসও করিয়া দেয়, নিজেও তাহার নিকট হইতে দুরে সরিয়া যায়। অর্থসম্পদ নিজে এমন অভদ্র অসৌজন্যতা প্রদর্শনকারী যে, কোন লোকেই তাহার নিকট হইতে বিদায় না লইয়া কোন প্রকার উপকার করে না।

দাতাও কৃপণের প্রকৃত পরিচয়

(৪) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) السخى قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النار والجاهل السخى احب الى الله من عابد بخيل ○ (رواه الترمذى)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী ও দোজখ হইতে দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ হইতে দূরে বেহেশত হইতে দূরে মানুষ হইতে দূরে এবং দোজখের নিকটবর্তী। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট মূর্খ দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারীর চাইতে উত্তম।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ যেই ব্যক্তি অনেক ইবাদত করে দীর্ঘ সময় নফল আদায় করে তাহার চাইতে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি প্রিয় যে কিনা নফল কম পড়ে কিন্তু দানশীল। আবেদ অর্থ হইতেছে যে ব্যক্তি অধিক নফল আদায় করে। ফরজ আদায় করাতো প্রত্যেকের জন্যই অবশ্য কর্তব্য, দানশীল হোক বা না হোক। ইমাম গাজালী (রহঃ) নফল করিয়াছেন যে, একবার হজরত ইয়াহিয়া ইবনে জাকারিয়া (আঃ) শয়তানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় লোক কে এবং সবচেয়ে ঘৃণিত লোক কে? সে বলিল কৃপণ মোমেন ব্যক্তি আমার নিকট অধিক প্রিয়, আর ফাছেক দানশীল সবচেয়ে ঘৃণিত। কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শয়তান ব্যক্তি বলিল, কৃপণ তাহার কৃপণতার কারণেই আমাকে নিশ্চিন্ত রাখে, অর্থাৎ তাহার কৃপণতাই তাহাকে দোজখে লইয়া যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ফাছেক দানশীল ব্যক্তি সব সময় আমাকে চিন্তা যুক্ত রাখে। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, দানশীলতার কারণে আল্লাহ ক্ষমা করিয়া না দেন। অর্থাৎ দানশীলতার কারণে আল্লাহ যদি তাহার উপর কখনো সন্তুষ্ট হইয়া পড়েন তাহা হইলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহের সমুদ্রে লোকটির জীবন ভর কৃত ফেছক ফুজুর কতোটা মারাত্মক হইবে? তিনি ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন এমতাবস্থায় তাহাকে সমগ্র জীবনের পাপ কাজ করানোর জন্য আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

একটি হাদিছে রহিয়াছে যে, যেই ব্যক্তি দান করে সে আল্লাহর

প্রতি পূর্ণ নেক ধারণার কারণেই তাহা করিয়া থাকে আর যেই ব্যক্তি কৃপণতা করে সে আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহা করে নেক ধারণা এই যে, সে মনে করে যেই মালিক ইহা দান করিয়াছিলেন তিনি পুনরায় দান করার ক্ষমতা রাখেন। এমন লোক আল্লাহর নিকটতর হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কোথায়? মন্দ ধারণার অর্থ এই যে, সেই লোক মনে করে ইহা যদি শেষ হইয়া যায় তবে পুনরায় কোথা হইতে আসিবে? এ ধরণের লোকের যে আল্লাহর নিকট হইতে দূরে তাহা স্পষ্টতই বোঝা যায়। আল্লাহর ভাণ্ডারকে সীমিত মনে করে। অথচ আল্লাহ তায়লাই তাহার উপার্জনের উপকরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং সেই উপকরণের দ্বারা উপার্জন না হওয়ার ব্যবস্থাও তিনি করিতে সক্ষম। তিনি যদি না চান তবে দোকানদার হাতে হাত রাখিয়া বসিয়া থাকিবে কৃষক বীজ বপন করিবে কিন্তু ফসল উৎপন্ন হইবে না। এইসব কিছু আল্লাহর দান হওয়া সত্বেও কোথা হইতে আসিবে এ কথার অর্থ কি? কিন্তু মুখে বলিলেও মনে মনে আমরা ইহা বুঝিতে চাই না যে এসব আল্লাহর দান ইহাতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নাই। সাহাবাগণ মনে মনে বিশ্বাস করিতেন যে, এইসব আল্লাহর দান, যিনি আজ দিয়াছেন তিনি কালও দিবেন। এ কারণেই সবকিছু খরচ করিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করিতেন না।

(৫) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) السخاء شجرة فى الجنة فمن كان سخيا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة فى النار فمن كان شحيحا اخذ بغصن منها فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار ○ (مشكوة)

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দানশীলতা বেহেশতের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি দানশীল হইবে সে সেই বৃক্ষের একটি শাখা ধরিবে, সেই শাখার মাধ্যমে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর কৃপণতা দোজখের একটি বৃক্ষ, যে ব্যক্তি কৃপণ হইবে সে উক্ত বৃক্ষের একটি শাখা ধরিবে, সেই শাখা তাহাকে দোজখে পৌছাইয়া দিবে।

ফায়েদা ঃ শোহ্ হইতেছে কৃপণতার চূড়ান্ত পর্যায়। ইতিপূর্বে

এই সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। কৃপণতা যেহেতু দোজখের একটি বৃক্ষ, কাজেই যে ব্যক্তি উক্ত বৃক্ষের শাখা ধরিবে সে দোজখে পৌঁছিবে। একটি হাদীছে আছে যে বেহেশতে একটি বৃক্ষ আছে তাহার নাম ছাখা, ছাখাওয়াত (দানশীলতা) তাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে এবং দোজখে একটি বৃক্ষ আছে তাহার নাম শোহ্। তাহা হইতেই বখীল সৃষ্টি হইয়াছে, বখীল বেহেশতে প্রবেশ করিবে না। ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে যে শোহ্ হইতেছে কৃপণতার চূড়ান্ত পর্যায়ের নাম। অন্য এক হাদীছে আছে যে, ছাখাওয়াত বেহেশতের বৃক্ষ সমূহের অন্যতম বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পৃথিবীতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি সেই বৃক্ষের একটি শাখা ধারণ করে সেই শাখা তাহাকে বেহেশতে পৌঁছাইয়া দেয়। কৃপণতা অর্থাৎ বোখল দোজখের একটি বৃক্ষ, সেই বৃক্ষের শাখা পৃথিবীতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার একটি শাখা ধারণ করে সেই শাখা তাহাকে দোজখে পৌঁছাইয়া দেয়। ষ্টেশনগামী সড়ক ধরিয়া চলিতে থাকিলে সেই সড়ক পথচারীকে অবশ্যই ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবে ইহাতো স্বতসিদ্ধ ব্যাপার। এইভাবে উল্লিখিত বৃক্ষের মূল অবস্থানেই পৌঁছাইয়া দিবে।

(৬) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص)
شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خالع ○

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট বদঅভ্যাস হইল দুইটি, ধৈর্যহীন কৃপণতা ও প্রাণ উষ্ঠাগতকারী কাপুরুষতা ও ভয়।

ফায়েদা ঃ এই দুইটি বদঅভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরানে সতর্ক করিয়াছেন আল্লাহ পাক বলেন।

ان الانسان خلق هلوعا - اذا مسه الشر جزوعا ... ...
اولئك فى جنت مكرمون ○

অর্থাৎ নিশ্চিতই মানুষ সৃষ্টি হইয়াছে দুর্বল মনা। যখন তাহার অমঙ্গল ঘটে সে অস্থির হইয়া পড়ে। আর যখন তাহার মঙ্গল হয় সে কার্পন্য করিতে থাকে। কিন্তু যে নামাজী স্বীয় নামাজের উপর স্থায়ীভাবে রত থাকে। আর যাহাদের ধন সম্পত্তির মধ্যে হক নির্দিষ্ট আছে যাচক

উপযাচক সকলের জন্য। যাহারা কেয়ামতের সত্যতা স্বীকার করে যাহারা তাহাদের প্রতিপালকের আজাব হইতে ভীত। নিশ্চয় তাহাদের প্রতিপালকের আজাব অভয়ের বস্তু নহে। এবং যাহারা স্বীয় লজ্জাস্থানকে বাঁচাইয়া রাখে। আপন বিবি বা ধর্ম-সম্মত বাঁদীর উপর ব্যতীত, কেননা ইহা নিন্দনীয় নহে আর যে অভিলাসী হইবে ইহার ব্যতীক্রমের তাহারাই সীমা লংঘনকারী ; যাহারা তাহাদের নিকট রক্ষিত আমানত ও অংগীকার পালনের খেয়াল রাখে, যাহারা স্বীয় নামাজের প্রতি লক্ষ্য রাখে, উহারা বেহেশতের মধ্যে সম্মানিত হইবে। (মায়ারেজ, রুকু ১)

ছূরা মোমেনুনে ও প্রায় একই ধরনের বক্তব্য রহিয়াছে। হজরত এমরান ইবনে হোছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলে করীম (ছঃ) আমার পাগড়ির কিনারা ধরিয়া বলিলেন, এমরান আল্লাহ তায়ালা খরচ করাকে খুবই পছন্দ করেন আর কুক্ষিগত করিয়া রাখা অপছন্দ করেন। তুমি খরচ কর এবং লোকদেরকে আহার্য প্রদান করো। কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দিয়োনা, যাহাতে তোমার ব্যাপার হইলে কষ্ট দেওয়া হইবে। মনযোগের সহিত শ্রবণ কর, সন্দেহমূলক বিষয়ে বিচক্ষণতাকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন এবং খাহেশাতের সময় পূর্ণ বিবেক পছন্দ করেন, কয়েকটি খেজুর হইলেও দানশীলতা পছন্দ করেন, সাপ বিচ্ছু মারিয়াও যদি সাহসিকতা প্রদর্শন করা হয় সেই সাহসিকতা পছন্দ করেন।

কাজেই সাধারণ ভয়ের বিষয়ে ভয় পাওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। যদি মনে ভয় জাগে তবু তাহা দমন করা উচিত।

নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে যেইসব দোয়া নকল করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কাপুরুষতা হইতে মুক্ত থাকার জন্যও আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। (বোখারী)

(৭) عن ابن عباس (رض) قال سمعت رسول الله (ص)
ليس المؤمن بالذى يشبع وجاره جائع الى جنبه ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজে পেট ভরিয়া আহার করে অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় থাকে।

ফায়েদা ঃ যেই ব্যক্তির নিকট পেট ভর্তি করিয়া আহার করার

মতো খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে অথচ তাহার প্রতিবেশী ক্ষুদায় ছটফট করিতেছে, এমতাবস্থায় তাহার পেট ভরিয়া আহার করা উচিৎ নয় বরং নিজে কম খাইয়া ক্ষুদার্ত প্রতিবেশীকে কিছু আহার্য প্রদান করা উচিত। একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমার উপর ঈমান আনয়ন করে নাই যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরিয়া খাইয়া রাত্রি যাপন করে অথচ সে জানে যে তাহার প্রতিবেশী তাহার পাশাপাশি অবস্থানে ক্ষুদার্ত অবস্থায় রহিয়াছে। (তারগীব)

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন বহু মানুষ নিজের প্রতিবেশীর আঁচল ধরিয়া আল্লাহর নিকট আরজ করিবে যে, হে খোদা! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর সে নিজের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল অথচ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসও আমাকে প্রদান করে নাই। (তারগীব)

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমরা সদকা কর, আমি কেয়ামতের দিন সেই ছদকা প্রদানের সাক্ষ্য দিব। সম্ভবত তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও হইবে যাহারা রাত্রিকালে তৃপ্তির সহিত আহার করার পর খাদ্যদ্রব্য উদ্ধৃত্ত থাকে অথচ তাহার চাচাতো ভাই ক্ষুদার্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। তোমাদের মধ্যে সম্ভবত কিছু লোক এমন থাকিবে যাহারা নিজেদের মালামাল বৃদ্ধি করিতে থাকিবে অথচ তাহার মিসকিন প্রতিবেশী কিছুই উপার্জন করিতে পারিবে না। (কানজ)

অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, একজন লোকের কৃপণতার জন্য এটা বলাই যথেষ্ট আমি আমার অংশ পুরাপুরি লইব তাহা হইতে কিছু মাত্র ছাড়িব না। (কানজ)

অর্থাৎ কোন জিনিসের বন্টনের সময়ে আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীর নিকট হইতে নিজের অংশ ষোল আনা তুলিয়া লওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে, সামান্য সামান্য বিষয়েও একগুয়েমী মনোভাব প্রকাশ করে— ইহাও কৃপণতার নিদর্শন। যদি অল্প স্বল্প অন্যের নিকট চলিয়া যায় তবে কি যাহার নিকট হইতে গেল সে ইহাতে মরিয়া যাইবে?

একটি বিড়ালকে অনাহারে রাখার পরিণাম

(৮) عن ابی عمر (رض) وابی هريرة (رض) قال قال رسول

الله (ص) عذبت امراة فى هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشاش الارض ٥

অর্থাৎ ইবনে ওমর (রাঃ) আবু হোরায়রা (রাঃ) উভয়ে নবীজীর বানী নকল করিয়াছেন যে, একজন নারীকে এই কারণে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল যে সে একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ইহাতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া বিড়ালটি মরিয়া গেল। সেই নারী বিড়ালটিকে ছাড়িয়াও দেয় নাই, তাহাকে কিছু খাইতেও দেয় নাই। ছাড়িয়া দিলে ভূ-পৃষ্ঠের অন্য প্রাণী দ্বারা সে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করিত।

ফায়েদা ঃ যাহারা জীবজন্তু পালন করে তাহাদের দায়িত্ব বড়ই কঠিন। কেননা জীবজন্তু কথা বলিতে পারে না, নিজেদের প্রয়োজনের বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না। এমতাবস্থায় তাহাদের পানাহারের বিষয়ে খোজ খবর নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে কৃপণতা করার অর্থ হইতেছে নিজেকে আল্লাহর দেয়া আজাবের উপযুক্ত করা। অনেক মানুষের জীবজন্তু পালনের আগ্রহ প্রবল কিন্তু তাহাদের খাদ্য পানীয়ের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে তাহাদের প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হয়। নবী করিম (ছঃ) বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন যে, এইসব জীবের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।

একদা নবী করিম (ছঃ) কোথাও যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে একটি উট দেখিতে পাইলেন। ক্ষুধায় উটটির পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। নবীজী বলিলেন, তোমরা এইসব ভাষাহীন জীবদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। উহাদের ভালো অবস্থায় উহাদের উপর সওয়ার হইবে এবং ভালো অবস্থায় উহাদিগকে আহার করিবে। নবীজীর অভ্যাস ছিল যে, তিনি এস্তেনজার (পেশাব) জন্য জঙ্গলে গমন করিতেন। কোন বাগান বা টীলা ইত্যাদির আড়ালে প্রয়োজন পুরণ করিতেন। একবার এইরূপ প্রয়োজনে একটি বাগানে গিয়াছিলেন, সেখানে একটি উট ছিল, উটটি নবীজীকে দেখিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং তাহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। নবীজী উটটির নিকটে গিয়া তাহার কানের গোড়ায় আদর করিলেন। ইহাতে উটটি শান্ত হইল। নবীজী তখন বলিলেন, এই উটটির মালিক কে ? একজন আনসারী আগাইয়া আসিয়া বলিল এটি আমার উট। নবীজী বলিলেন, যেই আল্লাহ

তোমাকে এই উটটির মালিক করিয়াছেন তুমি তাঁহাকে ভয় করিতেছ না? এই উট তোমার নামে নালিশ করিতেছে। তুমি তাহাকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাখ এবং তাহার দ্বারা অধিক কাজ করাও।

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, একবার নবী করিম (ছঃ) একটি গাধা দেখিলেন, তাহার মুখে দাগ দেওয়া হইয়াছিল, নবীজী (গাধার মালিককে) বলিলেন, তুমি এখনো কি জানিতে পারো নাই যে, আমি সেই লোককে লানত করিয়াছি যে কিনা জানোয়ারের মুখে দাগ দেয় অথবা মুখে প্রহার করে। আবু দাউদে এই হাদীছ সঙ্কলন করা হইয়াছে অন্যান্য হাদীছেও জানোয়ারদের দেখাশোনার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন না করার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। জীব জানোয়ারদের ব্যাপারে এতো তাগিদ দেওয়া হইয়াছে, সতর্ক করা হইয়াছে এমতাবস্থায় সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ সম্পর্কে সতর্কতাতো স্পষ্ট ব্যাপার। তাহা যে আরো বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ সে কথা না বলিলেও চলে।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছিলেন, মানুষের পাপের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাহার জিম্মায় যাহার রুজী রহিয়াছে তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া। এই কারণে যদি কোন জানোয়ারকে তাহার প্রয়োজন হইতে বিরত রাখা হয় এবং তাহার আহার্যের ব্যাপারে কৃপণতা করা হয় এবং ইহা মনে করা যে কে জানিতে পারিবে কে দেখিবে? এইরূপ করা নিজের উপর মারাত্মক জুলুম বটে। যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি সব কিছুই জানেন। লেখক সব কিছুরই রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন যতোই গোপন করা হোক না কেন কিছুই অজানা এবং অলিখিত থাকে না। নিজের প্রয়োজনে সওয়ারীর জন্য, কৃষিকাজের জন্য দুধের জন্য বা কোন কাজের জন্য জীবজানোয়ার পালন করিয়া তাহাদের জন্য অর্থব্যয় করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া উচিত নহে।

(৯) عن انس (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يجاء بابن ادم يوم القيمة كانه نرج فيوقف بين يدى الله فيقول له واعطيتك وخولتك وانعمت عليك فما صنعت فيقول يارب جمعته وثمرته وتركته اكثر ما كان فارجعنى اتك به كله فيقول ارنى ما قدمت فيقول

رب جمعته و ثمرته و تركته اكثر ما كان فارجعني اتك به
كله فاذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به الى النار - ترمذى

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে ভেড়ার শাবকের মতো নিরীহ অবস্থায় আল্লাহর সামনে হাজির করা হইবে। আল্লাহ পাক বলিবেন,

তোমাকে নেয়ামত দিয়াছি তুমি কী শোকর গুজারী করিয়াছ? বান্দা বলিবে আমি সেই সব অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি, অনেক বাড়াইয়াছি প্রথমে আমার নিকট যতোটা পরিমাণ ছিল তাহার চাইতে অনেক বাড়াইয়াছি এবং রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দিলে আমি সেই সব আপনার কাছে আনিয়া হাজির করিব। আল্লাহ পাক বলিবেন, জীবিতাবস্থায় পরকালের জন্য যাহা প্রেরণ করিয়াছ তাঁহা দেখাও। বান্দা পুনরায় বলিবে, হে প্রতিপালক! আপনি যতো মালামাল আমাকে দিয়াছিলেন, আমি তাহা অনেক বৃদ্ধি করিয়াছি এবং দুনিয়ায় রাখিয়া আসিয়াছি, আপনি যদি আমাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন তবে আমি সেই সব লইয়া আসিব। যেহেতু তাহার নিকট ইহলৌকিক জীবনে পরকালের জন্য প্রেরীত কোন কিছুই থাকিবে না একারণে তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে।

ফায়েদা ঃ আমরা কৃষিকাজ ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য উপায়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া একারণেই অর্থোপার্জন করি যাহাতে সেই অর্থ সম্পদ প্রয়োজনের সময় কাজে আসে। তখন কি প্রয়োজন দেখা দিবে কে জানে? যখন সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনের সময় আসিবে তখন অর্থের তীব্র প্রয়োজন দেখা দিবে, সেই প্রয়োজনের সময় শুধু দুনিয়ার জীবনে খোদায়ী ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ পুরাপুরি নিরাপদ থাকিবে এবং যথাবিহিত ফেরততো দেওয়া হইবেই উপরন্তু 'আল্লাহ তায়ালা সেই সঞ্চয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু খুব কম লোকেই সে দিকে মনোযোগ দিয়া থাকে অথচ দুনিয়ার এ জীবন যতো দীর্ঘই হোক না কেন একদিন তাহা শেষ হইয়া যাইবে সেটা অবধারিত সত্য। দুনিয়াবী জীবনে নিজের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকিলেও শ্রমের সাহায্যে কম বেশী অর্থোপার্জন করা যায় কিন্তু আখে-

রাতের জীবনে তো অর্থ উপার্জনের কোনই উপায় নাই সেখানে ইহকালে প্রেরিত অর্থ সম্পদ শুধু কাজে আসিবে। একটি হাদিছে নবীজী (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়া উহার দুই পাশে সোনালী অক্ষরে তিনটি পংতি লিখিত দেখিলাম, একটি পংতিতে লেখা ছিল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই মোহাম্মদ (ছঃ) আল্লাহর রাছূল)। অন্য পংতিতে লেখা ছিল মা কাদ্দামনা অজাদনা অমা আকালনা রাবেহনা, অমা খালাফনা খাছার না (যাহা কিছু আমরা সামনে পাঠাইয়াছি তাহা পাইয়াছি, পৃথিবীতে যাহা খাইয়াছি তাহা ছিল লভ্যাংশের অন্তর্ভূক্ত, যাহা কিছু রাখিয়া আসিয়াছি তাহা ছিল ক্ষতির অন্তর্ভূক্ত)। তৃতীয় পংতিতে লেখা ছিল উম্মাতুন মোজনেবাতুন অরাব্বুন গাফুর (উম্মত গুনাহগার এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল)।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখিত কোরানের আয়াতে বলা হইয়াছে সেদিন ব্যবসা বাণিজ্য, বন্ধুত্ব সুপারিশ করিবে না। সেই অধ্যায়ের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া লউক, আগামী-কালের জন্য সে কি প্রেরণ করিয়াছে।

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি নিজের আমলনামায় কি সঞ্চয় করিয়াছ? আগামী কালের জন্য কি পাঠাইয়াছ ? অথচ মানুষ বলাবলী করে যে কি কি মালামাহ রাখিয়া গিয়াছে। (মেশকাত)

নিজের মাল ও ওয়ারিশানের মালের প্রকৃত পরিচয়

একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমা-দের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছে, যে ওয়ারিশের মালামাল তাহার কাছে নিজের চাইতে অধিক প্রিয় ? সাহাবাগণ আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল ; আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার কাছে নিজের চাইতে ওয়ারিশের মালামাল অধিক প্রিয়! অর্থাৎ নিজের মালামালই অধিক প্রিয়! নবীজী তখন বলিলেন, তাহাই হইতেছে একজন লোকের নিজের মাল যাহা সে সামনে পাঠাইয়াছে। আর যাহা কিছু ইহলৌকিক জীবনে রাখিয়া আসিয়াছে তাহা তাহার মাল নয়, সেই সব তাহার ওয়ারিশদের মাল। (মেশকাত)

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মালামালের মধ্য হইতে তাহার জন্য শুধু তিনটি জিনিস রহিয়াছে যাহা খাইয়া শেষ করিয়াছে, যাহা পরিধান করিয়া পুরনো করিয়াছে আর যাহা আল্লাহর নিকটে নিজের জন্য জমা করিয়াছে। ইহা ছাড়া যাহা রহিয়াছে সেইসব মালামাল ও অর্থ সম্পদ তাহার সেইসব ওয়ারিশের জন্য যাহাদের জন্য উহা ছাড়িয়া যাইবে। (মেশকাত)

মজার ব্যাপার হইতেছে মানুষ প্রায়ই এমন লোকদের জন্য সঞ্চয় করে, পরিশ্রম করে, বিপদ সহ্য করে, দুঃখকষ্ট ভোগ করে যাহাদেরকে স্বেচ্ছায় সে এক পয়সাও দিতে চায় না অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাওয়ার পর তাহার মৃত্যু হইলে তাহারাই সেই মালামালের ওয়ারিশ হইয়া যায়। আরতাত ইবনে ছাহিয়া (রাঃ) ইন্তেকালের সময়ে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন সেই কবিতার তরজমা এই যে,

মানুষ বলিতেছে আমি অনেক মালামাল সঞ্চয় করিয়াছি কিন্তু অধিকাংশ উপার্জনকারী অন্যাদের জন্য আর্থাৎ ওয়ারিশদের জন্য সঞ্চয় করে। জীবদ্দশায় সে পুঙ্খ্যানুপুঙ্খরূপে তন্ন তন্ন করিয়া খরছের হিসাব নেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে এমন লোকদের ভোগ ব্যবহারের জন্য সেই সব মালামাল রাখিয়া যায় যাহাদের নিকট হইতে হিসাবও নিতে পারে না যে কোথায় কোথায় কিভাবে তাহার এতো শ্রমের ও এতো সাধের অর্থ বিত্ত—মালামাল খরচ হইল। নিজের জীবদ্দশায় খাও, খাওয়াও অন্যর কৃপণ ওয়ারিশদের নিকট হইতে কাড়িয়া লও। মানুষ নিজে তো মৃত্যুর পর বেকার হইয়া যায়, তাহার উত্তরাধিকারীরা নিজেদের প্রাপ্ত ধনসম্পদের ক্ষেত্রে তাহাকে মনে রাখে না, অন্য লোক তাহারই অর্থসম্পদ খরচ করে ভোগ ব্যবহার করে। নিজে বঞ্চিত থাকিয়া অন্য লোকদের ইচ্ছানুযায়ী খরচ করিবার সুযোগ করিয়া দেয়। (এতহাফ)

একটি হাদীছে উপরের হাদীছে উল্লেখিত কিস্‌সা অন্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নবী করিম (ছঃ) একবার সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে যাহার নিকট নিজের মাল নিজের ওয়ারিশের মালের চাইতেও অধিক প্রিয় ? সাহাবাগণ আরজ করিলেন যে, হুজুর, প্রত্যেক লোকইতো এরূপ, প্রত্যেকের কাছেই ওয়ারিশের মালের চাইতে নিজের মাল অধিক প্রিয়। নবীজী তখন বলিলেন

ভাবিয়া বল, দেখ কি বলিতেছ! সাহাবাগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল আমরাতো এরূপই মনে করি যে নিজের মালই আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। নবীজী বলিলেন; তোমাদের মধ্যে একজনও এমন নাই যাহার কাছে ওয়ারিশের মাল নিজের মালের চাইতে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবাগণ বলিলেন, তাহা কিভাবে?

নবী করিম (ছ:) বলিলেন, তোমাদের মাল তাঁহাই যাহা তোমরা পর কালের জন্য প্রেরণ করিয়া থাক, আর ওয়ারিশদের মাল তাহা যাহা তোমরা পশ্চাতে রাখিয়া যাও। (কান্‌জ)

এখানে প্রনিধানযোগ্য যে ওয়ারিশদের বঞ্চিত করিবার জন্য এইসব বর্ননা উল্লেখ করা হইতেছে না। নবী করিম (ছ:) নিজেও এব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন। হযরত সাদ এব্‌নে আবি ওকাছ (রা:) মক্কা বিজয়ের সময় এতো মারাত্মক অসুখে পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না। নবীজী তাহাকে দেখিবার জন্য রোগ শয্যার কাছে গেলে সা'দ (রা:) বলিলেন, হুজুর আমার নিকট অনেক মালামাল রহিয়াছে অথচ আমার ওয়ারিশ শুধু আমার একমাত্র কন্যা। আমার ইচ্ছা হয় আমি সব মালামাল সম্পর্কে অছিয়ত করিয়া যাই। (অর্থাৎ একমাত্র কন্যার ভরণ পোষনের দায়িত্ব তো তাহার স্বামীর উপর ন্যাস্ত, এমতাবস্থায় আমি অন্য ভাবে মালামাল খরচের অছিয়ত করিতে চাই। নবী করিম (ছ:) সা'দকে (রা:) নিষেধ করিলেন। সা'দ (রা:) দুই তৃতীয়াংশের জন্য। অছিয়তের অনুমতি চাহিলে নবীজী তাহাও নিষেধ করিলেন। অত:পর অর্ধেক মালামালের আবেদনও মঞ্জুর করিলেন না! এবং বলিলেন, এক তৃতীয়াংশও অনেক বেশী, তুমি ওয়ারিশদের দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে তাহাদের ধনী অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া উত্তম, কেননা দরিদ্রাবস্থায় রাখিয়া গেলে তাহারা অন্যের সামনে হাত প্রসারিত করিবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু ব্যয় করা হইবে তাহাতেই সওয়াব পাওয়া যাইবে। এমনকি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি এক লোকমা অন্ন স্ত্রীকে দেওয়া হয় তাহাতেও সওয়াব পাওয়া যাইবে। (মেশকাত)

হাফেজ ইবনে হাজার (র:) বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছে যে বলা হইয়াছে তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যাহার কাছে ওয়ারিশের মালামাল উত্তম তাহা এই হাদীছের পরিপন্থী। কেননা হাদীছের উদ্দেশ্য

হইতেছে নিজের সুস্থতা এবং প্রয়োজনের সময়ে সদকা করার তাকীদ দেয়া। আর হজরত সা'দ (রাঃ) এর ঘটনাতো মৃত্যু শয্যায় সমগ্র অথবা আংশিক মালামাল অছিয়ত করাই উদ্দেশ্য। (ফতেহ)

আমার মনে হয় যে ওয়ারিশদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে অছিয়ত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ স্বরূপ। রাছুলে মাকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন কোন নারী পুরুষ আল্লাহর অনুগত জীবনের ষাটটি বছর কাটাইয়া দেয় অথচ মৃত্যুর সময়ে ওছিয়তের ক্ষেত্রে এমন ক্ষতি করে যে জাহান্নামের আগুন তাহাদের জন্য অবধারিত হইয়া যায়। অতঃপর নবীজীর এ বাণীর সমর্থনে হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ছুরা নেছার একটি আয়াত তেলা-ওয়াত করিলেন। আয়াতটির অর্থ হইতেছে, আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সন্তান সন্ততি সম্পর্কে বলিয়া রাখিয়াছেন। (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) এই আয়াতের মূল তাৎপর্য এই যে, উপরের আয়াতে ওয়ারিশদের মালা-মাল বন্টনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহা অছিয়ত অনুযায়ী মালামাল পরিশোধের পর। যদি মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে কাহারো ঋণ থাকিয়া থাকে তবে ঋণের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া তাহা পরি-শোধের পর দেখিবে যেন ওয়ারিশদের কষ্ট না দেয়া হয় বা তাহাদের ক্ষতি করা না হয়।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে কেহ ওয়ারিশের মীরাছ কর্তন করিবে আল্লাহ তায়া'লা তাহার মীরাছ বেহেশত হইতে কর্তন করিবেন। (মেশকাত)

কাজেই নিজের জীবদ্দশায় সুস্থ সময়ে আল্লাহর পথে সর্বাধিক পরিমাণ ব্যয় করা কর্তব্য। ইহাতে নিজের মৃত্যু আগে হইবে নাকি ওয়ারি-শের মৃত্যু আগে হইবে, কে কে ওয়ারিশ হইবে এসব চিন্তা মনকে আছন্ন করিতে পারিবে না। জীবদ্দশায় এবং সুস্থ থাকার সময়েই অছিয়ত করিতে হইবে, ওয়াকফ করিয়া যাইতে হইবে এবং কিভাবে পুণ্য সঞ্চয় করা যায় সেই চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হইবে। জীদ্দশায় কৃপণতা করিয়া মৃত্যুর সময়ে দানশীল হইবার প্রচেষ্টা কিছুতেই সমীচীন নহে। ইতিপূর্বে নবীজীর হাদীছ উল্লেখ হইয়াছে যে সুস্থ অবস্থায় সদকা করাই উত্তম সদকা, মৃত্যুর সময় সদকা উত্তম নহে। কেননা মৃত্যুর সময়ে বন্টনের ব্যবস্থা করার পূর্বেই প্রকৃত পক্ষে মালামাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিশদের মালিকানায় চলিয়া যায়।

কাজেই অছিয়ত এবং আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে এরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থাকা চলিবে না যে অমুক না জানি ওয়ারিশ হইয়া যায়। বরং ইহাও উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে নিজের প্রয়োজন পুরণ করিয়া নিজের পারলৌকিক সঞ্চয় নিশ্চিত করা। ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা ও নিয়তের বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে! নবীজীর বিখ্যাত একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, নিয়তের উপরই যাবতীয় আমলের ফলাফল নির্ভর করিবে। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আদায় করিলে এতো বেশী সওয়াব হইবে যে অন্য কোন ইবাদত তাহার হমতুল্য হইবে না। এই নামাজই যদি অহংকার প্রকাশের জন্য লোক দেখানোর জন্য আদায় করা হয় তাহা হইলে তাহা শেরেকের পর্যায়ভুক্ত হইয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধে পরিণত হইবে। এ কারণে নিয়তের ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজের প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবার উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে।

সর্বপ্রথম নিজের নফছকে নছিহত করিতেছি। অতঃপর বন্ধু বান্ধবদেরকে নছিহত করিতেছি। আল্লাহর ব্যাঙ্কে যাহা সঞ্চয় করা হইবে তাহাই সঙ্গে যাইবে, তাহা ছাড়া সঞ্চয় করিয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া যাহা রাখিয়া যাইবে তাহা কোন্ কাজে আসিবে না। তবে কেহ কেহ যে মনে করিবে তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। নিজের কৃতকাজই শুধু নিজের কাজে আসিবে আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজনের ভালোবাসার সারমর্ম হইল দুই চারদিন হায় হায় করা এবং অনর্থক কিছু অশ্রুবর্ষণ। যদি অশ্রুবর্ষণে টাকা পয়সা খরচ করিতে হইত তবে তাহাও তাহারা করিত না। সন্তান সন্ততির কল্যাণের জন্য টাকা পয়সা ধন-সম্পদ রাখিয়া যাইতেছি এইরূপ মনে করা নফ্‌ছের ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করিয়া উত্তরাধিকারীদের জন্য রাখিয়া যাওয়াই শুধু তাহাদের কল্যাণ করা নহে বরং ইহাতে অকল্যাণের আশঙ্কা থাকিয়া যায়। যদি সন্তানদের প্রকৃত কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহাদেরকে বিত্তশালী রাখিয়া যাওয়ার চাইতে দ্বীনদার অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া অধিক উত্তম। দ্বীনের জ্ঞান না থাকিলে অর্থ সম্পদও তাহাদের নিকট অবশিষ্ট থাকিবে না বরং আমোদ আহলাদে তাহা খরচ করিয়া ফেলিবে। যদি অবশিষ্ট থাকেও তবু তাহাতে

তাহাদের কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না। পক্ষান্তরে দ্বীনের জ্ঞানের সহিত যদি অর্থ সম্পদ নাও থাকে তথাপি দ্বীনের জ্ঞান চলার পথে তাহাদের বিরাট কাজে আসিবে। মালামাল অর্থ সম্পদরে মধ্যে শুধু তাহাই কাজে আসিবে যাহা পরকালের জন্য সঙ্গে লইয়া যাইবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা দুইজন ধনী ও দুইজন নির্ধন ব্যক্তিকে মৃত্যু দিলেন। অতঃপর একজন ধনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিজের জন্য কি প্রেরণ করিয়াছ, নিজের পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ আমাকে তুমি সৃষ্টি করিয়াছ তাহাদেরও তুমি সৃষ্টি করিয়াছ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির রুজির দায়িত্ব তুমি নিজে গ্রহণ করিয়াছ এবং তুমি কোরানে বলিয়াছ যে তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করে। তোমার এই আয়াতের প্রেক্ষিতে আমি নিজের মালামাল পরকালের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছি, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে তুমি আমার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই রিজিক প্রদান করিবে। আল্লাহ বলিবেন আচ্ছা যাও, তুমি যদি (দুনিয়ায়) জানিতে আমার নিকট তোমার জন্য কি কি রহিয়াছে তাহা হইলে খুব বেশী খুশী থাকিতে এবং দুশ্চিন্তা গ্রস্থ কম হইতে। অতঃপর দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ আর পরিবার পরিজনের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ! আমার সন্তান সন্ততি ছিল, তাহাদের দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্রের জন্য আমি আশঙ্কিত ছিলাম। আল্লাহ বলিবেন আমি কি তোমাকে এবং তাহাদেরকে সৃষ্টি করি নাই, আমি কি সবার রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করি নাই? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ তাহাতো অবশ্যই, কিন্তু আমি তাহাদের দারিদ্রের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন তাহারা তো দারিদ্রের মধ্যে নিপতিত রহিয়াছে তুমি কি তাহাদেরকে রক্ষা করিতে পারিয়াছ? আচ্ছা যাও তুমি যদি জানিতে তোমার জন্য কি কি রহিয়াছে তাহা হইলে তুমি কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। অতঃপর একজন নির্ধন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি নিজের জন্য কি জমা করিয়াছ আর পরিবারের জন্য কি রাখিয়াছ? লোকটি বলিল, হে আল্লাহ আপনি আমাকে সুস্থ সবল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকে কথা

বলার শক্তি দিয়াছেন, আপনার পবিত্র নাম শিখাইয়াছেন, আপনি আমাকে ধন সম্পদ প্রদান করিলে আশঙ্কা ছিল যে আমি তাহাতে লিপ্ত হইয়া থাকিতাম। আমি যে অবস্থায় ছিলাম তাহাতেই সন্তুষ্ট। আল্লাহ বলিলেন, যাও আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। যদি তুমি জানিতে যে তোমার জন্য আমার কাছে কি রহিয়াছে তবে খুব বেশী হাসিতে এবং কম কাঁদিতে। অতঃপর দ্বিতীয় নির্ধন ব্যক্তিকে আল্লাহ জিজ্ঞসা করিলেন, তুমি নিজের জন্য কি পাঠাইয়াছ আর পরিবারের জন্য কি রাখিয়া আসিয়াছ? লোকটি জবাবে বলিল, হে আল্লাহ তুমি আমাকে কি এমন দিয়াছ যে এমন প্রশ্ন করিতেছ? আল্লাহ পাক বলিলেন, আমি তোমাকে সুস্থসবল দেহ ও বাকশক্তি প্রদান করি নাই? কান চোখ প্রদান করি নাই? কোরানে কি আমি বলি নাই আমার কাছে দোয়া করো আমি সেই দোয়া কবুল করিব? লোকটি বলিল হে আল্লাহ নিঃসন্দেহে এসবই সত্য কিন্তু আমি ভুল করিয়াছি। আল্লাহ বলিলেন, যাও আজ আমি তোমাকে ভুলিয়া গিয়াছি। যদি তুমি জানিতে যে আমার কাছে তোমার জন্য কি কি আজাব রহিয়াছে তবে তুমি খুব কম হাসিতে এবং অধিক কাঁদিতে। (কানজ)

অধিক মুনাফার আশায় খাদ্যদ্রব্য জমা করিয়া রাখার পরিণাম

(১০) عن عمر(رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ०

অর্থাৎ হজরত ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাহির হইতে রিজিক আনে তাহাকে রুজি প্রদান করা হয় আর যে ব্যক্তি আটক করিয়া রাখে সে অভিশপ্ত। (মেশকাত)

ফায়েদা ঃ ফকীহ আবুল লায়েছ সমরকন্দী বলেন, বাহির হইতে আনয়নের অর্থ হইল ব্যবসার উদ্দেশ্যে অন্য শহর হইতে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া সেই সব (অল্প দামে) বিক্রয় করে। এরূপ বিক্রয়কারী ব্যবসায়ীকে সেই ব্যবসায়ের দ্বারা রিজিক প্রদান করা হয়। কেননা জনসাধারণ এ ধরণের ব্যবসায়ীর দ্বারা লাভবান হইয়া থাকে। তাহারা ব্যবসায়ীকে দোয়া করে, সেই দোয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে কবুল হয়। আটক রাখা দ্বারা সেই ব্যক্তির কথা বোঝানো হয় যে ব্যক্তি অধিক মূল্যে এবং জনগণের প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সেসব বিক্রয় করে না।

তাহার প্রতি অভিশাপ। অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হইয়া অধিক মুনাফার আশায় নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী মজুদ্দারকে নবী করিম (ছঃ) এর পক্ষ হইতে অভিশাপ দেওয়া হইয়াছে।

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী নকল করা হইয়াছে যে, যেই ব্যাক্তি চল্লিশ দিন যাবত মুসলমানদের খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কুষ্ঠরোগে এবং দারিদ্রাবস্থায় নিপতিত করেন। (মেশকাত) এই হাদীছ দ্বারা বোঝা যায় যেই ব্যক্তি মুসলমান-দের কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য দ্রব্য আটকাইয়া রাখে তাহাকে শারীরিক শাস্তি অর্থাৎ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত করা হয়। এবং দরিদ্র করিয়া আর্থিক কষ্ট ও প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে অন্য হাদীসে উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অন্য শহর হইতে খাদ্য দ্রব্য আনিয়া কম মূল্যে বিক্রয়-কারীকে আল্লাহ রুজি প্রদান করিয়া থাকেন।

একটি হাদীছে আসিয়াছে খাদ্য দ্রব্য যে ব্যক্তি আটকাইয়া রাখে সে এমন মন্দ লোক যে মূল্য কমিয়া গেলে তাহার কষ্ট হয় অথচ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে সে খুশী হয়। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে চল্লিশ দিন যাবত যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য মওজুদ রাখে প্রয়োজন সত্বেও বিক্রি করে না তারপর যদি সে তাহার মওজুদকৃত খাদ্য দ্রব্য জনগণের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতারণ করিয়া দেয় তবুও তাহার পাপের কাফ্‌ফারা হইবে না। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এক বুজুর্গ ব্যক্তি একটি বালুর টিলা অতিক্রম করিয়া কোথাও যাইতেছিলেন। সেই সময় খাদ্য দ্রব্যের অভাব চলিতেছিল। বুজুর্গ ব্যক্তি মনে মনে বলিলেন, এ বালুর টিলা যদি খাদ্য দ্রব্যের স্তুপ হইত তবে আমি তাহা হইতে বনি ইসরাঈলদের মধ্যে ইচ্ছা মতো বণ্টন করিয়া দিতাম, আল্লাহ তায়ালা সেই সময়ের নবীর কাছে ওহী প্রেরণ করিলেন যে অমুক বুজুর্গ ব্যক্তিকে সুসংবাদ দাও যে আমি তাহার আমল নামায় সেই পরিমাণ পুণ্য লিখিয়া দিয়াছি যেই পরিমাণ পুণ্য তুমি ঐ বালুর টিলা খাদ্য শস্য হইতে জগতবাসীর মধ্যে বিতরণ করিয়া লাভ করিতে। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

আল্লাহর দরবারে পূণ্যের কোন কম্‌তি নাই, বিনিময়ে পূণ্য প্রদানের জন্য তাঁহার কোন সঞ্চয়ের বা আমদানীর বা উপার্জনের প্রয়োজন হয় না। তাহার একটি মাত্র ইশারার মধ্যে সমগ্র জগতের শষ্য ভাণ্ডার,

কাজেই তিনি মানুষের আমল এবং নিয়তের পরিচ্ছন্নতাই শুধু দেখিয়া থাকেন। আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে তাহার প্রতি রহমত করিতে তাঁহার দরবারে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হয় না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে আসিয়া এক ব্যক্তি আরজ করিল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বলিলেন তোমাকে ৬টি বিষয়ে উপদেশ দিতেছি। প্রথমত সেই সব বিষয়ে আল্লাহর প্রতি ভরসা ও নির্ভরতা রাখিবে যেই সব বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহর ফরজ সমুহ সঠিক সময়ে আদায় করিবে। তৃতীয়ত জিহবাকে সব সময় আল্লাহর জেকেরে সিক্ত রাখিবে। চতুর্থত শয়তানের কথা কখনো পালন করিবে না সে সমগ্র সৃষ্টির প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। পঞ্চমত দুনিয়াকে আবাদ করার ব্যপারে মনযোগী হইও না ইহাতে পরকালকে নষ্ট করা হইবে। ষষ্ঠত মুসলমাদের কল্যাণের কথা সব সময় মনে রাখিবে।

ফাকীহ আবুল লাইস (রঃ) বলেন, মানুষের সৌভাগ্যের ১১টি নিদর্শন রহিয়াছে এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের ও ১১টি নিদর্শন রহিয়াছে। সৌভাগ্যের নিদর্শন সমূহ হইতেছে (১) দুনিয়ার প্রতি নিরাশক্তি আখেরাতের প্রতি আশক্তি (২) ইবাদত এবং কোরান তেলাওয়াতের আধিক্য (৩) বাহুল্য কথা পরিত্যাগ করা (৪) সময়মত সুষ্ঠু ভাবে নামাজ আদায় করা (৫) অবৈধ জিনিষ যতই ক্ষুদ্র হোক তাহা হইতে আত্মরক্ষা করা (৬) পূণ্য শীল ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ (৭) বিনয়ী থাকা অহংকার না করা (৮) দানশীল এবং দয়ালু হওয়া (৯) আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন (১০) সৃষ্ট জীব সমূহের কল্যাণ সাধন (১১) মৃত্যুর কথা সর্বধিক চিন্তা করা। দুর্ভাগ্যের নিদর্শন সমূহ হইতেছে এই (১) অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের লোভ (২) দুনিয়ার সাধ অহ্লাদ এবং খাহেশাতে মনোনিবেশ (৩) অশ্লীল কথাবর্তা এবং বেশী কথা বলা (৪) নামাজ আদায়ে অলসতা (৫) অবৈধ এবং সন্দেহ মূলক জিনিস আহার করা, এবং পাপাসিক্ত লোকদের সহিত মেলা মেশা (৬) দুশ্চরিত্র হওয়া (৭) অহংকারী হওয়া (৮) মানুষের কল্যাণ সাধিনে বিরত থাকা (৮) মুসলমানদের প্রতি দয়া না করা (১০) কৃপণ হওয়া (১১) মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকা। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

আমার মনে হয় এসব কিছুর মূল হইতেছে মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করা। সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিলে প্রথমোক্ত ১১টি অভ্যাস আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে এবং পরবর্তী ১১টি আভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ সম্ভব হইবে।

নবীকরিম (ছঃ) নির্দেশ দিয়াছেন যে, লজ্জত সমূকে বিলীনকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।

(১১) عن انس (رض) قال توفى رجل من الصحابة فقال رجل ابشر بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا تدرى لعله تكلم فيما لا يعنيه او بخل بما لا ينقصه ٥

অর্থাৎ হজরত আনাছ (রাঃ) বলেন, একজন সাহাবীর মৃত্যু হইলে একজন লোক বাহ্যিক অবস্থা বিচারে তাঁহাকে বেহেশতী বলিয়া আখ্যায়িত করিলেন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি কি করিয়া জানিবে- এমন ও হইতে পারে যে কখনো সে কোন বেহুদা কথা বলিয়াছে অথবা এমন বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছ যাহাতে তাহার ক্ষতি হইতে পারে।

(মেশকাত)

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ এইসব জিনিস প্রাথমিক ভাবে বেহেশতে যাওয়ার পথে অন্তরায় হইতে পারে। অথচ বাহুল্য কথায় সময় নষ্ট করা আমাদের প্রিয় নেশার অন্তর্গত। খুব কম সংখ্যক সমাবেশই এই ধরনের আলাপ আলোচনা হইতে মুক্ত থাকে। কিন্তু নবী করীম (ছঃ) মাত্র তেইশ বছর সময়ে বিশ্বের সকল মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিয়া গিয়াছেন। উম্মতের জন্য তাঁহার ভালোবাসা ছিল অসামান্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মজলিসের কাফফারা হইতেছে এই দোয়া, মজলিস শেষ হইলে এই দোয়া পড়িতে হইবে।

سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ٥

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, সকল প্রশংসা তাঁহারই, হে আল্লাহ তুমি পবিত্র হে আল্লাহ সকল প্রশংসা তোমার প্রাপ্য সাক্ষ্য দিতেছি যে তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নাই তোমার কাছেই ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

উপরোল্লিখিত হাদীছে কৃপণতার কথা বলা হইয়াছে। হয়তো

এমন বিষয়ে কৃপণতা করা হইয়াছে যাহাতে কোন ক্ষতি হইয়া গিয়াছে অন্য একটি হাদীছে কাহিনী একটু অন্য ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। নবীজী সেই খানে বলিয়াছেন হয়তো কোন অর্থহীন বিষয়ে কৃপণতা করিয়াছে। (কান্‌জ)

আমরা অনেক কিছুকেই সাধারণ অর্থাৎ গুরুত্বহীন মনে করিয়া থাকি কিন্তু আল্লাহর দরাবারে পুণ্য ও পাপ উভয় ক্ষেত্রেই হয়তো তাহার বিরাট গুরুত্ব রহিয়াছে বোখারী শরীফে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমন এমন কথা অনেক সময় উচ্চারণ করে যাহাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না কিন্তু সেই কথার কারণে আল্লাহর দরবারে তাহার উচচ মর্যাদা লাভ হইয়া থাকে। আবার এমন কথা অনেক সময় মুখে উচচারণ করে আল্লাহ পাক যেই কথায় অসন্তুষ্ট হন এবং সেই কথার কারণে আল্লাহ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করেন। অন্য এক হাদীছে আছে যে এতো নীচে নিক্ষেপ করা হয় যে সেই দুরত্ব মাশরেক হইতে মাগরেবের (পূর্বদিক হইতে পশ্চিম দিক) সমতুল্য। (মেশকাত)

উম্মুল মোমেনীন হজরত উম্মে সালমার (রাঃ) নিকট একজন লোক এক টুকরা গোশত (রান্না করা) হাদীয়া স্বরূপ প্রদান করিল। যেহেতু নবীজী গোশত খুবই পছন্দ করিতেন এ কারণে উম্মে সালমা (রাঃ) খাদেমকে বলিলেন, ইহা ভিতরে তুলিয়া রাখ নবীজী আসিয়া হয়তো আহার করিবেন। খাদেমা তাহা ভিতরের একটি তাকে রাখিয়া দিল। অল্পক্ষণ পর একজন ভিক্ষুক আসিয়া দরজার কড়া নাড়িল এবং আল্লাহর নামে কিছু ভিক্ষা চাহিল এবং বরকতের জন্য দোয়া করি। ভিতর হইতে ভিক্ষুককে জবাব দেওয়া হইল যে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। (অর্থাৎ এখনতো তোমাকে দিবার মতো কিছু নাই) ভিক্ষুক চলিয়া যাওয়ার কিছুক্ষণ পর নবী করিম (ছঃ) আসিয়া বলিলেন উম্মে সালমা! আমি কিছু খানা খাইতে চাই তোমার কাছে কোন খাবার আছে কিনা। খাদেমাকে উম্মে সালমা (রাঃ) বলিলেন, যাও গোশতের টুকরাটি আনিয়া দাও। খাদেমা ভিতরে যাইয়া দেখিল গোশত নাই সেখানে এক টুকরা সাদা পাথর পড়িয়া আছে। নবীজী (সব কথা শোনার পর) বলিলেন, তুমি গোশ-

তের টুকরাটি ভিক্ষুককে না দেওয়ার কারণেই তাহা পাথরে পরিণত হইয়াছে।

ফায়েদা ঃ এখানে প্রনিধান যোগ্য বিষয় হইতেছে যে নবী সহধর্মিনী গণের দানশীলতার মোকাবিলা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। যদি এক টুকরা গোশ্‌ত হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া রাখিয়া থাকেন তাহাও নিজের প্রয়োজনে নহে স্বয়ং নবী করিম (ছঃ) এর প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহাতেও এমন পরিণাম হইল। নবীজীর বরকতে গোশতের টুকরাটি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছিল অর্থাৎ পাথরে পরিণত হওয়ার পর পুণরায় গোশতে পরিণত হইয়াছিল তবুও ইহাতে একটি শিক্ষা রহিয়াছে। শিক্ষাটি এই যে, ভিক্ষুককে না দিয়া যাহারা নিজের খাওয়ার জন্য রাখিয়া দেয় তাহারা প্রকৃত পক্ষে পাথরের টুকরা ভক্ষণ করে। সে খাদ্য দ্রব্যের উপকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কঠিন হৃদয়ের মালিক হইয়া যায়। এই কারণেই আমরা আল্লাহর এমন অনেক নেয়ামত খাইয়া থাকি কিন্তু তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার পাওয়া যায় না। অতঃপর বলা হইয়া থাকে যে সংশ্লিষ্ট জিনিসে সেই দ্রব্যগুণ অবশিষ্ট নাই। কিন্তু আসলে তাহা নহে। নিজের বদনিয়তের কারণে উপকার কম হইয়া থাকে।

(١٣) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اول صالح هذه الامة اليقين والزهد واول فسادها البخل والامل ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত এই উম্মতের কল্যানের সূচনা বিশ্বাস এবং দুনিয়ার প্রতি নিরাশক্তির মাধ্যমে হইয়াছে এবং অশান্তির সূচনা কৃপণতা এবং দীর্ঘ দীর্ঘ আশার মাধ্যমে হইয়াছে।

ফায়েদা ঃ প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ দীর্ঘ আশার মাধ্যমেই কৃপণতা সৃষ্টি হইয়া থাকে। মানুষ অনেক পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবিতে থাকে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সম্পদ সঞ্চয়ের কাজে নিয়োজিত থাকে। মৃত্যুর কথা মনে পড়িলে সে মনকে এ বলিয়া বু... ত

থাকিবে যে, এই পৃথিবীতে কতদিন বাঁচিব কে জানে? দীর্ঘায়িত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া কি হইবে? অধিক অর্থ সঞ্চয়ের কোন প্রয়োজন নাই মৃত্যুর কথা ঘন ঘন মনে পড়িলে ইহলৌকিক সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য সম্পদ কুক্ষিগত করার পরিবর্তে স্থায়ী জীবনের জন্য সঞ্চয়ের কথা মনে আসিবে।

(১৩) عن ابى هريرة (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر فقال ما هذا يا بلال قال شئى ادخرته لغد فقال اما تخشى ان ترى له غدا بخارا فى نار جهنم انفق يا بلال ولا تخش من ذى العرش اقلالا ○

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার হযরত বেলালের (রাঃ) নিকট গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন তাহার সামনে খেজুরের একটি স্তুপ রহিয়াছে। নবী করিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বেলাল এইগুলি কিসের? বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। নবীজি বলিলেন, বেলাল ইহার কারণে কেয়ামতের দিন তোমাকে দোজখের আগুনের ধোঁয়া দেখিতে হইবে তুমি কি সেই ভয় করিতেছ না? বেলাল, খরচ করিয়া ফেল এই মালের মালিকের নিকট কম রহিয়াছে এমন আশংকা করিও না।

ফায়েদা ঃ প্রতিটি লোকের আলাদা রকমের মর্যাদা এবং অবস্থা হইয়া থাকে। আমাদের মতো দুর্বলমনা দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকদের জন্য ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে কিছু খাদ্য-শস্য প্রস্তুত রাখার অনুমতি থাকিতে পারে। কিন্তু হযরত বেলালের (রাঃ) মতো দৃঢ় ঈমানের মুসলমান আল্লাহর নিকট ঘাটতির বিন্দুমাত্র আশংকাও পোষণ করিতে পারে না। জাহান্নামের ধোঁয়া দেখা মানে জাহান্নামে যাওয়া বুঝায় না কিন্তু যাহারা জাহান্নামের ধোঁয়াও দেখিবে না তাহাদের মর্যাদার চাইতে ইহা কম মর্যাদার পরিচয় প্রকাশ করে। অন্ততপক্ষে আল্লাহর দরবারে হিসাব প্রদানে দীর্ঘায়িত হইবে। কোন কোন হাদীছে স্বল্প পরিমাণ অর্থ এক অথবা দুই দিনার অর্থও কাহারো কাছে পাওয়া গেলে নবী করিম (ছঃ) তাহাকে জাহান্নামের আগুনের হুমকির কথা শুনাইয়াছেন। হিসাব নিকাশের সম্মুখীনতো সবাইকে হইতে হইবে। যাহার অর্থ সম্পদ অধিক

তাহাকে দীর্ঘতর হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমি বেহেশতের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়াছিলাম, প্রবেশকারী-দের মধ্যে অধিক সংখক দরিদ্র লোক আমি দেখিয়াছি। বিত্তশালী লোকদিগকে হিসাবের জন্য ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে, ওদিকে জাহান্নামী দিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইল। জাহান্নামের দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া সেখানে প্রবেশকারীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাইলাম। (মেশকাত)

নারী জাতি অধিক সংখ্যায় দোজখী হইবে কেন?

নারীদের অধিক সংখ্যায় দোজখে প্রবেশের কারণ অন্য একটি হাদীছেও উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন; নবী করিম (ছঃ) ঈদের দিন ইদগাহে গমন করিলেন, সেখানে নারীদের সমাবেশে যাইয়া নবীজি নারীদের বলিলেন, তোমরা বেশী পরিমাণে সদকা কর আমি দোজখে নারীদিগকে অধিক সংখ্যক দেখিয়াছি। যেহেতু মহিলারা লানত বেশী পরিমাণে করিয়া থাকে। এবং স্বামীর নাশুকুরী বেশী করে।

উপরোক্ত দুইটি অভ্যাস নারীদের মধ্যে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। যেই সন্তানকে যখন তখন অভিশাপ দেয় সেই সন্তানের আরাম আয়েশের জন্যই সবসময় সচেষ্ট থাকে। স্বামীর অকৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাহাদের কোন জুড়ি নাই। সব সময় অপদার্থ নারী এই ফিকিরে মরিতে থাকে যে, স্বামী তার মাকে কোন কিছু কেন দান করিল, বাপকে বেতনের টাকা হইতে কেন কিছু দিল, ভাই বোনদের সাথে কেন ভাল সম্পর্ক রাখিতেছে। একটি হাদীছে রহিয়াছে নবী করিম (ছঃ) কুছুফের নামাজের সময়ে বেহেশত ও দোজখ প্রত্যক্ষ করিলে দোজখে নারীদের অধিক সংখ্যায় দেখিলেন। সাহাবাগণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নবীজি বলিলেন, তাহারা অনুগ্রহ স্মরণ রাখে না, স্বামীর শোকর গোজারী করে না, সমগ্র জীবন কোন নারীর সেবা যত্নের পর কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি দেখিলে বলিয়া ফেলে, আমি সারা জীবন তোমার নিকট হইতে কোন প্রকার ভাল ব্যবহার পাই নাই।

নবী করিম (ছঃ) এর উপরোক্ত বাণীও অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নারীদের সহিত যতোই ভালো ব্যবহার করা হোক না কেন,তাহাদের যতোই সেবা যত্ন করা হোক না কেন যদি কোন সময় তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটিয়া যায় তাহা হইলে সমগ্র জীবনের সেবাযত্ন সবই মূহুর্তে তাহারা ভুলিয়া যায়। ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে শুরু করে যে, এই ঘরে আসিয়া আমি কোন প্রকার সুখ শান্তি লাভ করি নাই। এই কথা তাহারা তখন

বলিয়া থাকে। উপরোক্ত বর্ণনায় নারীদের অধিক সংখ্যায় দোজখে যাওয়ার কারণ জানা ছাড়াও দোজখ হইতে মুক্তির উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। অধিক পরিমাণে সদকা করাকে দোজখের আগুন হইতে পরিত্রানের উপায় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ঈদের মাঠের ঘটনা বিষয়ক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করীম (ছঃ) মহিলাদের যখন সতর্ক করিতেছিলেন তখন হজরত বেলালও (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন মহিলারা নবীজীর কথা শুনিয়া তাহাদের হাতের কানের অলঙ্কার সমূহ খুলিয়া হজরত বেলালের (রাঃ) নিকট জমা দিতে লাগিলেন। হজরত বেলাল ঈদগাহে চাঁদা তুলিতেছিলেন।

বর্তমান কালের মহিলারা এই ধরনের কঠিন হাদীছ শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করে না। কাহারো কাহারো মন নরম হইলেও স্বামীর বাহানা দিয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। তাহারা অবলীলায় বলিয়া দেয় যে আমাদের সদকা আমাদের স্বামীরাই আদায় করিবেন। নিজেদের অলঙ্কার তাহাদের নিকট প্রাণাধিক প্রিয়। সেই অলঙ্কারে তাহারা কোন আঁচ লাগিতে দিতে প্রস্তুত নহে। এমনিতে অলঙ্কার চুরি হইয়া যাইতে পারে, হারাইয়া যাইতে পারে, বিবাহ শাদীতে বা অন্য কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে খরচ করা যাইতে পারে কিন্তু আল্লাহর পথে দান করিয়া পরকালের জন্য সঞ্চয় করিতে কিছুতেই রাজি নহে। এমনি করিয়া অলঙ্কার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করে অতঃপর তাহা ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়া যায়, তারপর স্বল্প মূল্যে বিক্রি হইয়া যায়। কিন্তু তাহারা অর্থাৎ অলঙ্কারের মালিকেরা পূর্বাহ্নে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা করে না।

মুহাজিরিনদের সম্পর্কে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন গরীব মুহাজিরিণগণ ধনী মুহাজিরিনদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে বেহেশতের পথে অগ্রসর হইবে (মেশকাত)। অথচ আল্লাহর দ্বীনের কাজে মুহাজিরিনদের আত্মত্যাগের কোন তুলনা নাই। একবার নবী করিম (ছঃ) দোয়া করিয়াছিলেন।

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاَمِتْنِىْ مِسْكِيْنًا وَّاحْشُرْنِىْ

فِىْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنَ ○

অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে দরিদ্র (অর্থাৎ) গরীব) রাখিও। দারিদ্রাবস্থায় মৃত্যু দান করিও এবং দরিদ্রদের সহিত আমার হাশর

করিও। হজরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল তাহা কেন? নবীজী বলিলেন, গরীবেরা ধনীদের চাইতে চল্লিশ বছর আগে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে। হে আয়েশা, গরীবদের কখনো রিক্তহাতে ফিরাইয়া দিয়োনা। এক টুক্‌রা খেজুর সম্ভব হইলেও তাহা দিগকে দান করিও। হে আয়েশা, গরীবদের ভালোবাসিবে, তাহাদেরকে নৈকট্য প্রদান করিবে' আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে নিকটতর করিবেন। (মেশকাত)

কোন কোন ওলামা এ হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, ইহাতে তো মনে হয় যে, সাধারণ গরীব লোকেরা নবীদের চাইতে অগ্রাধিকার পাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় এ প্রশ্ন ঠিক নয়, কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধনীদের সহিত সেই সম্প্রদায়ের গরীবদের মোকাবিলা হইবে, নবীদের মোকাবিলা নবীদের সহিত, সাহাবাদের মোকাবিলা সাহাবাদের সহিত--এইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তুলনা হইবে।

(১৫) عن كعب بن عياض رض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل امة فتنة وفتنة امتى المال ০

অর্থাৎ হজরত কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) কে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, সকল উম্মতের জন্য একটি ফেতনা থাকে আমার উম্মতের ফেতনা হইতেছে মাল।

ফায়েদা ঃ নবীকরিম (ছঃ) এর পবিত্র বাণী সর্বাংশে সত্য। দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে অর্থসম্পদের আধিক্যের কারণে বেহায়াপনা, বিলাসিতা, সূদ, ব্যভিচার, সিনেমা দেখা জুয়া খেলা, জুলুম অত্যাচার, মানুষকে হীন, তুচ্ছ জ্ঞান করা, আল্লাহর দ্বীন ভূলিয়া থাকা ইবাদত বন্দেগীতে গাফলতি, দ্বীনের কাজে সময় না পাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হইয়া থাকে। অথচ দারিদ্র থাকিলে এক তৃতীয়াংশ এমন কি এক দশমাংশও সংঘটিত হইতে পারে না। একারণে একটি উদাহরণ আছে যে, যর নিস্ত এশ্‌ক টেঁটেঁ। অর্থাৎ পকেটে টাকা পয়সা না থাকিলে বাজারের প্রেমও মৌখিক জমা-খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। এইসব কিছু না হইলেও সব সময় টাকা পয়সার অঙ্ক বৃদ্ধির চিন্তা মাথায় লাগিয়া থাকে। এই চিন্তায় পানাহার বিশ্রাম পর্যন্ত ঠিক মত হইয়া উঠে না। নামাজ, রোজা হজ্জ যাকাত সম্পর্কেতো খেয়ালই থাকে না? দিনরাত শুধু আরো কিভাবে টাকার অঙ্ক বাড়িবে

সে চিন্তাই মনকে ঘিরিয়া রাখে। অধিক মুনাফা আসিতে পারে এধনের ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করার চিন্তা ও চেষ্টাতেই অধিকাংশ সময় চলিয়া যায় একারণেই নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, কোন মানুষ যদি দুইটি সম্পদভরা অরণ্য লাভ করে তাহা হইলে তৃতীয়টির সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। মানুষের পেট শুধু কবরের মাটিই পূর্ণ করিতে পারে। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষের জন্য যদি এক উপত্যাকা সম্পদ থাকে তবে সে আরেক উপত্যাকার সন্ধান করে। দুই উপত্যাকা হইলে তৃতীয় উপত্যাকার সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে। মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দিয়া মানুষের পেট পূর্ণ করা যায় না। অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষের জন্য যদি একটি খেজুর বাগান থাকে তবে সে আরো একটির আকাঙ্খা করে, যদি দুইটি হয় তবে তৃতীয়টির আকাঙ্খা করে এইভাবে আকাঙ্খা করিতেই থাকে। তাহার পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া ভর্তি করা যায় না। একটি হাদীছে রহিয়াছে একজন মানুষকে যদি একটি উপত্যাকা ভর্তি স্বর্ণ দেওয়া হয় তবে সে দ্বিতীয় এক উপত্যাকা সন্ধান করে দুইটি হইলে 'তৃতীয়টির সন্ধান করে, মানুষের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছু দিয়া ভর্তি করা যায় না। (বোখারী)

মাটি দ্বারা ভর্তি করা যায় অর্থ হইতেছে কবরে গিয়া সে তাহার এ উচ্চাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় সব সময় আরো অধিক অর্থের চিন্তা তাহার মনে লাগিয়া থাকে। একটি কারখানা কাহারো রহিয়াছে সেই কারখানা ভালোভাবে চলিতেছে, প্রয়োজনীয় উৎপাদন সেখানে হইতেছে, এমতাবস্থার দ্বিতীয় আরেকটার মালিকানা লাভের সুযোগ দেখা দিলে সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া সেই কারাখানার মালিকানা লাভ করা হয়, তারপর আরেকটির মালিকানার চেষ্টা চলে। মোট কথা উপার্জন যতো বাড়িবে মালিকানা লাভের প্রচেষ্টা ততো বাড়িতে থাকিবে। কোন এক সময় যথেষ্ট আছে ভাবিয়া কিছু সময় আল্লাহর স্মরণে মনোনিবেশ করিবে এমন দেখা যায় না। একারণেই নবী করিম (ছঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ! আমার সন্তানদের রিজিক যেন প্রয়োজনানুপাতিক হয়। অর্থাৎ অধিক স্বচ্ছলতা যেন

তাহাদের না আসে যাহাতে তাহারা সেই অর্থ সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রিয় নবী এরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যাহাকে ইসলাম ধর্মের দীক্ষার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার রিজিক প্রয়োজনানুপাতিক এবং সেই ব্যক্তি সেই রিজিকে সন্তুষ্ট। অন্য একটি হাদীছে আছে কেয়ামতের দিন এমন কোন গরীব বা ধনী পাওয়া যাইবে না যে, এ আকাঙ্খা না করিবে যে পৃথিবীতে যদি তাহার রিজিক শুধু প্রয়োজন মাফিক হইত। বোখারী শরীফের হাদীছে রহিয়াছে যে, নবী করীম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদের দারিদ্রের জন্য আশংকা করিতেছি না, আশংকা করিতেছি যে, তোমাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসিবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের আসিয়াছিল অতঃপর তোমরা তাহাতে মগ্ন হইয়া পড়িবে যেমন নাকি তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল অতঃপর ইহা তোমাদের ও ধ্বংস করিয়া দিবে যেমন নাকি তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত আরো বহু হাদীছে নানাভাবে অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য এবং তাহার অকল্যাণ সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে। ইহা একারণে নহে যে অর্থ সম্পদ অপবিত্র জিনিস বা দোষের জিনিস বরং ইহার কারণ এই যে, মনের অতৃপ্তির ও অশান্তির কারণে অর্থসম্পদ খুব শীঘ্র আমাদের মনে গ্লানি ও রোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। যদি কেহ ইহার অপকারিতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, অর্থ সম্পদের মন্দ প্রতিক্রিয়া হইতে বিরত থাকিয়া যথা নিয়মে ভোগ করিতে পারে তবে অর্থসম্পদ কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাধারণ ভাবে অপকারীতার চিন্তা বা আত্মশুদ্ধির কোনই প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। এ কারণেই অর্থ সম্পদ অল্প সময়েই তাহার বিষাক্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলে। ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে উদরাময়ের সময়ে আমরু খাওয়ার মতো। এমনিতে আমরু ফলের মধ্যে কোন দোষ নাই, তাহার উপকারীতা এখনো তাহার মধ্যে একইভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু উদরাময়ের সময়ে তাহা ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। এ কারণেই উদরাময়ের সময় ডাক্তার আমরু খাইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। এমনিতে অসংখ্য আমরু ফল দ্বিধাহীন ভাবে খাইলেও ডাক্তারের নিষেধ শুনার পর জাদরেল পুরুষও আমরু

খাইতে সাহস পায় না। অর্থাৎ ডাক্তারের নিষেধ উপেক্ষা করিতে চায়না। কিন্তু মহানবী হজরত মোহাম্মদ (ছঃ) এর পায়ের জুতার ধূলিকনার যোগ্যতাও যেই সব ডাক্তারের নাই তাহাদের কথাকে আমরা কতটুকু গুরুত্ব দিয়া থাকি অথচ নবীজীর আদেশ নিষেধের প্রতি আমাদের তোয়াক্কা নাই। নবীকরিম (ছঃ) যেহেতু বারবার ধন-সম্পদের অকল্যাণ সম্পর্ক আলোকপাত করিয়াছেন একারণে ধন-সম্পদের অকল্যাণ ও অপকারিতা সম্পর্কে প্রত্যেকের সজাগ ও সতর্ক হওয়া উচিত। ধন সম্পদের শরীয়ত সম্মত ব্যবহার আমরু ফলে লবণ মরিচ মাখাইয়া খাওয়ার মতই উপাদেয় প্রমাণিত হইতে পারে। ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার পর তাহার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ধন-সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় নবীর আদেশ নিষেধের কথা সর্বাগ্রে খেয়াল রাখিতে হইবে। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, বিত্তশালী হওয়া সেই ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর নহে যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে। (মেশকাত)

শাহ আবদুল আজিজ (রহঃ)-এর নিকট হইতে আমার বংশীয় বুজুর্গ মুফ্‌তী এলাহী বখ্‌শ কান্ধালবী (রহঃ)(যিনি বিশিষ্ট ফকীহ ছিলেন) বর্ণনা করিয়াছেন যে তিনি বলেন ধন-সম্পদ মানুষের জন্য আল্লাহর মর্জি মোতাবেক আমল করার উত্তম সহায়ক। নবী করিম (ছঃ) লোকদেরকে আল্লাহর পথে ডাকিবার পর ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই বরং পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদের ভেতরই থাকিতে বলিয়াছেন। কাজেই ধন-সম্পদ এবং স্বজন পরিজন পরিত্যাগ করার প্রচার মূর্খ লোকদের প্রচারণা ছাড়া আর কিছু নহে। হজরত ওসমান (রাঃ)-এর ইন্তেকালের সময় তাহার খাজাঞ্চির নিকট একলাখ পঞ্চাশ হাজার আশরাফী এবং দশ লাখ দিরহাম ছিল। ইহা ছাড়া খয়বর এবং কোরা উপত্যাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যেই সম্পত্তি ছিল তাহার মূল্য ছিল দুইলাখ দীনার। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর ধনসম্পদের মূল্য ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার; ইহা ছাড়া তিনি এক হাজার ঘোড়া এবং এবং এক হাজার গোলাম রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমর ইবনে আস (রাঃ) ইন্তেকালের সময় তিন লাখ দীনার রাখিয়া গিয়াছিলেন। হজরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের (রাঃ) ধন-সম্প-

দের কোন হিসাব নিকাশ ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে কোরানে বলিয়াছেন, "তাহারা তাহাদের প্রভুর ইবাদত সকাল সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়) শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্যই করিয়া থাকে।" (কাফ, রুকু ৪), আল্লাহ তায়ালা আরো বলিয়াছেন, তারা এমন লোক যে ব্যবসায় ইত্যাদি আল্লাহর স্মরণ হইতে তাহাদেরকে বিরত রাখে না। (নুর, রুকু ৫)

উপরোক্ত বর্ণনা মোটেই অসত্য নহে। সেই সময়ে বিজয়ের আধিক্যের কারণে সাধারণ ভাবে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। অর্থ সম্পদ যেন তাঁহাদের পায়ে গড়াগড়ি করিত কিন্তু তাঁহারা সেই অর্থ-সম্পদ দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক তাহাদের একটি মুহুর্তও শিথিল হয় নাই। ফাজায়েলে নামাজ এবং হেকায়েতে ছাহাবা গ্রন্থে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু কিছু ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই সব পাঠ করিলে অনেক কিছু জানা যাইবে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) এত ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন নামাজ পড়িতে দাঁড়াইতেন তখন মনে হইত যেন একটি খুঁটি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে, এতো দীর্ঘ সময় তিনি সেজদায় থাকিতেন যে পিঠের উপর পাখী আসিয়া নির্বিঘ্নে বসিত। সেই সময় তাহার উপর বিপক্ষ দলের আক্রমণ হইয়াছিল, তাঁহার উদ্দেশ্যে গোলাবর্ষণের সময়েও তিনি একাগ্রচিত্ত্বে নামাজ আদায় করিতেছিলেন। একটি গোলা মসজিদের দেয়ালে আঘাত করায় একাংশ ধ্বসিয়া তাঁহার পাশেই পড়িল কিন্তু তিনি নামাজে এতো বেশী মগ্ন ছিলেন যে জানিতেও পারিলেন না। একজন সাহাবীর বাগানে খেজুর পাকিয়াছিল, সেই বাগানে নামাজ আদায়ের সময় নামাজের মধ্যে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথা মনে পড়িয়া গেল। গোলা বর্ষণে বাগানের ক্ষতি হওয়ার কথা ভাবিয়া নামাজ শেষে তিনি তদানীন্তন আমিরুল মোমেনীন হজরত ওসমানের (রাঃ) নিকট যাইয়া বাগানটি ক্রয় করার প্রস্তাব করিলেন। হজরত ওছমান (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দীনার মূল্যে বাগানটি বিক্রয় করিয়া প্রাপ্ত অর্থ দ্বীনি কাজে ব্যয় করিলেন।

হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট দুই খাঞ্চা দেরহাম হাদিয়া স্বরূপ আসিয়াছিল। উহাতে এক লক্ষাধিক দেরহাম ছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) সব দেরহাম বন্টন করিয়া দিলেন। সেদিন তিনি রোজা রাখিয়াছিলেন ইফতারের জন্য কিছু যে ঘরে নাই ইহাও স্মরণ ছিল না। ইফতারের সময় দাসী দুঃখ করিয়া বলিল, এক দেরহামের গোশ্‌ত যদি আনাইতেন তবে আজ আমরাও গোশ্‌ত খাইতে পারিতাম। হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সে সময় মনে করিলে না কেন, এখন দুঃখ করিয়া কি হইবে।

হেকায়াতে ছাহাবা গ্রন্থে এই ঘটনা এবং এ ধরণের আরো অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাসে আরো প্রচুর ঘটনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঘরের খড়কুটোর সমান গুরুত্ব বহন করে যেই ধন—সম্পদ উহা তাহাদের কি ক্ষতি করিতে পারিবে? আল্লাহ যদি অনুরূপ মানসিকতার অধিকারী এই অধম বান্দাকেও করিতেন তবে কি যে ভালো হইত? একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে ছাহাবায়ে কেরামের আর্থিক স্বচ্ছলতার এসব বিবরণের দ্বারা ধন-সম্পদের আধিক্যের বৈধতার সমর্থন পাওয়া যায় বটে কিন্তু এ বিষ আমাদের কাছে রাখা কিরূপ? এসব ধনসম্পদ রাখা এবং তাহাদের অনুযায়ী হওয়া টিবি রোগীর নিকট একজন সুস্থসবল ব্যক্তি টি-বি আক্রান্ত রোগীর সয্যাপার্শ্বে কয়েকদিন কাটাইলে যেমন সহজেই রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে তেমনি অবস্থা আমাদেরও হইবে। গ্রন্থশেষে একজন খোদা ভক্তের কাহিনী মনযোগ সহকারে পাঠ করার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করা যাইতেছে।

ইমাম গাজ্জালীর নছীহত

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদ হইল সাপের মত। সাপের মধ্যে যেমন বিষও রহিয়াছে। ধন-সম্পদের উপকারিতা সেই বিষ নাশকের অনুরূপ। তাহার ক্ষতি সর্পবিষের মতোই ভয়ানক। যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের ক্ষতি ও উপকারিতা সম্পর্কে সজাগ হইতে পারে তাহার পক্ষেই ক্ষতি কাটাইয়া উপকার গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে। ধন-সম্পদের মধ্যে দুনিয়াবী এবং দ্বীনী এই দুই ধরনের উপকারিতা

রহিয়াছে। দুনিয়ার উপকারিতাতো প্রত্যেকেই জানে এ কারণে দুনিয়ার সবাই ধন-সম্পদ উপার্জনে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে। দ্বীনি উপকারিতা হইতেছে তিনটি। প্রথমত, ধন-সম্পদ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ইবাদতের জন্য ইহা উপকরণ স্বরূপ। পরোক্ষ ইবাদত হইতেছে হজ্জ, জেহাদ ইত্যাদি। এইসব কিছু টাকা পয়সা ব্যয় করিয়া সম্পূন্ন করা যায় প্রত্যক্ষ ইবাদত হইতেছে নিজের পানাহার এবং প্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয় করা। এই সব প্রায়োজন পূরণ সম্ভব না হইলে মানুষের মন এদিক সেইদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, যাহার ফলে দ্বীনী কাজে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইবে না। প্রত্যক্ষ ইবাদত হওয়ার কারণে ইহা নিজেও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। তবে ধর্মীয় কাজে সহায়তার জন্য যতোটা প্রয়োজন ততটাই প্রত্যক্ষ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হইবে। দ্বিতীয়ত দ্বীনী উপকার, ইহাতে অন্য কাহারো জন্য খরচ করা বুঝায়। ইহা চার প্রকার। (ক) গরীবদের জন্য যে দান খয়রাত করা হয় তাহার পূণ্য অপরিসীম। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) সামাজিক বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ এবং উপহার উপঢৌকনের মাধ্যমে যাহা ব্যয় করা হয়। ইহা সদকা হইবে না, কেননা সদকা শুধু গরীবদের জন্য ব্যয় করা হয়। তবে ইহাতেও দ্বীনী উপকারীতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারা পারস্পরিক সৌন্দর্য্য ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং দানশীলতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি হইতে পারে। হাদীয়া অর্থাৎ উপঢৌকন এবং অন্যকে খাওয়ানোর কল্যাণ কারিতা সম্পূর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। গরীবদের জন্য খরচের ব্যাপার এ পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত নহে। আমার মনে হয় যে এ পর্যায়ের উপকারিতা প্রকৃত পক্ষে প্রথম নম্বরের চাইতে অধিক। কিন্তু যাহারা নিরানব্বই এর চক্করে পড়িয়া যায় তাহাদের জন্য এসব কল্যাণ কারিতা এবং ফজিলত সম্পৃকিত হাদীছ কোন উপকার সাধন করিতে পারে না।

(গ) নিজের সম্মান রক্ষার জন্য অর্থ ব্যয়। অর্থাৎ এমন ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করা যে, যদি ব্যয় না করা হয় তবে নীচু প্রকৃতির লোকেরা মন্দ কথা বলিবে, অশালীন ব্যবহার করিবে এরূপ আশঙ্কা থাকে। ইহাও সদকার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন নিজের সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ যাহা ব্যয় করে তাহাও সে সদকা করিয়া

থাকে। আমার মনে হয় যুলুম প্রতিরোধের জন্য ঘুষ দেয়া এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। লাভজনক কোন কাজে ঘুষ দেওয়া হারাম, দাতা গ্রহীতা উভয়েই গুনাহগার হয়। কিন্তু জুলুম প্রতিরোধের জন্য ঘুষ দাতার ঘুষ দেয়া জায়েজ কিন্তু তাহা গ্রহীতার জন্য হারাম হইবে। (ঘ) শ্রমিকদের মজুরী দান। মানুষ নিজের হাতে সব কাজ করিতে পারে না, আবার অনেক কাজ এমন আছে যে নিজ হাতে করিতে সক্ষম হইলেও তাহাতে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হয়। যদি মজুরীর বিনিময়ে সেই কাজ করানো যায় তবে নিজের সময় জ্ঞানার্জন আল্লাহর স্মরণ, ইবাদত ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যায়। অথচ এ সকল কাজে অন্যের প্রতিনিধিত্ব চলে না।

তৃতীয়ত: দ্বীনী উপকারিতা রহিয়াছে এ রকম জনকল্যাণ মুলক কাজ। যেমন মসজিদ নির্মাণ মুছাফিরখানা নির্মাণ, সেতু নির্মাণ মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ এগুলোতে নির্মাতা মৃত্যুর পরও ফায়েদা লাভ করে। যাহারা উপকার লাভ করে তাহারা নির্মাতার জন্য দোয়া করিতে থাকে ইহাতে মৃত্যুর পরও তিনি পূণ্য লাভ করেন।

শাহ আবদুল আজীজ (রঃ) এর মতে ধন সম্পদ খরচ করার মধ্যে সাত প্রকারের ইবাদত রহিয়াছে। (১) যাকাত, যাহাতে উশরও অন্তর্ভুক্ত। (২) সদকাতুল ফেতের। (৩) নফল দান খয়রাত। ইহাতে মেহমানদারী এবং ঋণগ্রস্তদের সাহায্য অন্তর্ভুক্ত। (৪) ওয়াকফ মসজিদ সরাইখানা, সেতু ইত্যাদি নির্মাণ। (৫) হজ্জ, ফরজ বা নফল। অন্য কাহারো হজ্জে সাহায্য করিতে হইলে পথের বা যানবাহন দ্বারা সাহায্য (৬) জেহাদের জন্য ব্যয় করা ইহাতে এক দেরহাম ব্যয়ে সাতশত দেরহাম ব্যয়ের পুণ্য পাওয়া যায়। (৭) যাহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিজের উপর ন্যস্ত তাহাদের ভরণ-পোষণ, যেমন স্ত্রী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের ভরণ-পোষণ, নিজের সাধ্যে কুলাইলে গরীব আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন ইত্যাদি। (তাফসীরে আজীজী)।

ইমাম গাজ্জালী বলেন, ধন-সম্পদের ক্ষতি দু'প্রকারের। দ্বীনী ও দুনিয়াবী। দ্বীনী ক্ষতি তিন প্রকার। (ক) ধন-সম্পদ পাপের উপকরণ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করে। ধন সম্পদের কারণেই মানুষ প্রবৃত্তির তাড়-

নায় পাপপথে অগ্রসর হয়। দরিদ্রাবস্থায় সেদিকে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ হয় না। মানুষ যখন কোন পাপ করার চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া পড়ে তখন সেদিকে মনের তেমন আকর্ষণ থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ করার জন্য নিজেকে সক্ষম মনে করে। তখন সেদিকে অধিক মনযোগ নিবদ্ধ করে। ধন-সম্পদ কুদরতের এক বিশিষ্ট উপকরণ। এ কারণে ধন সম্পদের ফেতনা সব চেয়ে মারাত্মক। (খ) বৈধ জিনিস সমূহের মধ্যে নেয়ামতের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। পানাহার, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে বিত্তবান ব্যক্তি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। বিত্তবান ব্যক্তি যবের রুটি খেয়ে মোটা কাপড় পরিধান করে দিন যাপনের কথা ভাবিতে পারে না। পর্যায়ক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু ব্যয় অনুপাতে আয় না থাকিলে অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনের চিন্তা জাগ্রত হয়। মিথ্যাবাদিতা, অন্যায় উপায় অবলম্বন ইত্যাদি অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। অর্থ সম্পদের আধিক্যের কারণে সাক্ষাত প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এধরণের সম্পর্কের ফলে পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে হিংসা ঘৃণা শত্রুতা ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। ফলে এমন কিছু সমস্যা ও সঙ্কট অনেক সময় সৃষ্টি হয় যে টাকা-পয়সা খরচ করিয়া সেসব হইতে পরিত্রাণ লাভ সম্ভব হয় না। চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষতিকর প্রভাব হয় সুদূর প্রসারী, এসবই অর্থ সম্পদের কারণে সৃষ্টি হইয়া থাকে।

(গ) ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও সে সব বৃদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করিতে করিতে বিত্তবান আল্লাহর স্মরণ হইতে দুরে সরিয়া যায়। যে জিনিস আল্লাহকে ভুলাইয়া দেয় তাহার ক্ষতি তো স্পষ্ট। একারণেই হজরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের আপদ তিনটি প্রথমত অবৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয়। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি বৈধ উপায়ে উপার্জন করা হয় তাহা হইলে? হজরত ঈসা আঃ বলিলেন, অন্যায় পথে ব্যয় করা হয়। একজন বলিল যদি ন্যায় পথে খরচ করা হয়? তিনি বলিলেন, ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধান ও পরিমাণ বৃদ্ধির চিন্তা আল্লাহর স্মরণ ভুলাইয়া দেয় এবং ইহা এমন এক অসুখ

যাহার কোন চিকিৎসা নাই। অথচ সকল ইবাদতের মূল হইতেছে আল্লাহর স্মরণ। তাহার ইবাদতের জন্য পরিচ্ছন্ন মনমানসিকতা প্রয়োজন। অধিক ধন-সম্পত্তি যাহার রহিয়াছে সে দিবারাত্রি কৃষক শ্রমিকদের ঝগড়াবিবাদ, মীমাংসা ইত্যাদির চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায়ের ফিকিরে থাকে। কৃষকের সমস্যা এক ধরনের, শাসকবর্গের সমস্যা এক ধরনের, ব্যবসায়ীদের সমস্যা অন্য ধরনের, মোট কথা ধন সম্পদ কাহাকেও স্বস্তি দেয় না, নিজের কাছে গচ্ছিত নগদ অর্থ খুব কম সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই অর্থেও চুরি ডাকাতি অপচয়ের আশঙ্কা লাগিয়াই থাকে। ইহা ছাড়া সেই অর্থ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যবহার সম্পর্কে সব সময় চিন্তা করিতে হয়। এই চিন্তার কোন শেষ নাই। ধন-সম্পদের সহিত এসব দুনিয়াবী সমস্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই ব্যক্তির কাছে শুধু নিত্যকার প্রয়োজন পুরনের মতো ধন-সম্পদ থাকে সে এই সব চিন্তাভাবনা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে।

নিত্যকার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ধন-সম্পদ রাখিয়া বাকিটুকু সৎকাজে ব্যয় করাই হইতেছে ধন-সম্পদের ব্যাপারে বিষনাশক উপায়, কেননা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সম্পদ প্রকৃতই বিষের মতো মারাত্মক। তাহা শুধু আপদই সৃষ্টি করে। আল্লাহ তায়ালা এই বিষ হইতে তাঁহার অধম এ বান্দাকেও রক্ষা করুন এবং পুন্যশীল হওয়ার তওফীক দান করুন। ধন-সম্পদের উদাহরণ প্রকৃতই সাপের মতো। যাহারা ধরিতে পারে তাহারা বিষনাশক সম্পর্কে অভিজ্ঞ। একারণে ধন-সম্পদ তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না, বরং তাহারা বিষনাশকের দ্বারা অন্যান্য কল্যাণ কর কাজ করিতে পারে। কিন্তু অনভিজ্ঞ লোভী মূর্খ লোকেরা এ সাপ পাকড়াও করিলে বিষের প্রভাবে তাহাদের ধ্বংস অবধারিত। বিত্তবান সাহাবাদের মতো ধনী হওয়ার প্রত্যাশাও আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে, কেননা সাহাবাদের ঈমানের দৃঢ়তার কণা মাত্রও আমাদের নাই। তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী সাক্ষী দিতেছে যে তাঁহারা ধন-সম্পদকে লাকড়ির চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন নাই। ধন-সম্পদ তাঁহাদিগকে আল্লাহর স্মরণ হইতে বিন্দুমাত্রও টলাইতে পারে নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা ধন-সম্পদকে ভয় করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার

এই পরিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিচ্ছেদেরই শেষাংশ। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার পাক কালামে এবং প্রিয়নবী (ছঃ) তাঁহার পাক বানীতে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তাগিদ দিয়াছেন। সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে। এ কারণে গুরুত্ব বিচার করিয়া ইহাকে আলাদা পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ছদকা করার ছওয়াব দ্বিগুন হইয়া থাকে। উম্মুল মোমেনীন হজরত মায়মুনা (রাঃ) একটি বাঁদী আজাদ করিয়া দিলে নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি যদি তাহাকে তোমার মামাদেরকে দিয়া দিতে তবে ভালো হইত। কাজেই ছদকার ব্যাপারে যদি অন্য কোন ধর্মীয় প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ না হয় তবে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ছদকা করা উত্তম। তবে যদি কোন দ্বীনী প্রয়োজন দেখা দেয় তাহা হইলে আল্লাহর পথে খরচ করার ছওয়াব শত শত গুণ পর্যন্ত হইতে পারে। পবিত্র কোরানে ও হাদীছে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক গড়িয়া তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সতর্কতা উচ্চারণ করা হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সম্পর্ক রক্ষার তাগিদ বিষয়ক তিনটি আয়াত এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক তিনটি আয়াত এবং কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হইলে আমরা তাহা পাঠ করিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিব না। কিন্তু বিষয়টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে সংক্ষেপে লিখিবার পরও গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এক খণ্ডের পরিবর্তে সম্ভবত দুই খণ্ড করিতে হইবে।

(১) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ নির্দেশ করিতেছেন ন্যায় বিচারের ও উপকার কর-

নের এবং প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য দানের আর তিনি নিষেধ করিয়াছেন নির্লজ্জতা গর্হিত কাজ হইতে এবং অত্যাচার হইতে, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।

ফায়েদা ঃ পবিত্র কোরানে আল্লাহ তায়ালা বহু জায়গায় আত্মীয় স্বজনের কল্যান সাধন, তাহাদের দান করার তাগিদ দিয়াছেন এখানে কয়েকটি আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা যাইতেছে। "এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও আর আত্মীয় স্বজনের প্রতি। (বাকারাহ রুকু ১০) বলিয়া দাও, সৎকাজে যাহাই ব্যয় কর তোমাদের মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয় এতিম ও অভাব গ্রস্থ মিছকীনদের প্রাপ্য। (বাকারাহ, রুকু ৬) সূরা নেছার প্রথম রুকু সম্পূর্ণ। এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও আর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি। (নেছা রুকু ৬) এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিও। (আনয়াম, রুকু ১৯) উহারাই তোমাদের আপনজন এবং আত্মীয়-স্বজনগণ খোদার বিধানে পরস্পরের নিকটতর বন্ধু। (আনলাফ রুকু ১০) এখন তোমাদের উপর কোন প্রকার অভিযোগ নাই, আর আল্লাহ তোমাদের দোষ মাফ করিবেন (ইউসুফ রুকু ১০) আর যাহারা সম্পর্ক কায়েম রাখে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন যাহা কায়েম রাখিতে (রাআদ রুকু ৩) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করিবেন। (ইব্রাহীম রুকু ৬) এবং পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করেন (বনি ইসরাইল রুকু ৩) তবে উহাদের উদ্দেশ্যে উহ্ শব্দ টুকু বলিবে না, (বনি ইসরাইল রুকু ৩) আর তুমি পৌঁছাইতে থাকিবে নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে তাহার প্রাপ্য। (বনি ইসরাইল রুকু৩) ইয়াহিয়া পরহেজগার ছিলেন আর খেদমতগার ছিলেন পিতামাতার। (মরিয়ম রুকু ১) আর তিনি আমাকে খেদমতগার বানাইয়াছেন তাহার মাতার। (মরিয়ম রুকু ২) ইব্রাহীম বলিল, পিতা আপনার প্রতি ছালাম, (মরিয়ম রুকু ৩) আর ইছমাইল নিজের পরিবার বর্গকে নামাজ ও জমাতের জন্য তাম্বি করিতে থাকিতেন। (মরিয়ম রুকু ৪) আর তুমি নিজের পরিবারভূক্ত লোকদের নামাজের তাগিদ কর। (ত্বা-হারুকু ৮) আর তাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের স্ত্রীগণের ও বংশধরদের মধ্য হইতে আমাদিগকে নয়ন তৃপ্তিকর বস্তু

প্রদান করুন। (আহকাফ রুকু ২) হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার পিতামাতাকে মার্জনা করুন (নুহ রুকু ২)।

উদাহরণ স্বরূপ অল্প কয়েকটি আয়াতের কিয়দাংশ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ব্যাখ্যা হিসাবে শেষ আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে ঐসব আয়াত ব্যতীত ও নানাভাবে এ বিষয়ে আল্লাহ পাক কোরানে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন, কাজেই বিষয়টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হজরত কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি দরিয়াকে মুসা (আঃ) এবং বনি ইসরাইলের জন্য দ্বিখণ্ডিত করিয়াছেন, তাওরাতে লিখিত আছে যে, আল্লাহকে ভয় করিতে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার কর, তোমার আয়ু বৃদ্ধি করা হইবে, সহজ সাধ্য জিনিসসমূহ পাওয়া তোমার জন্য সহজ করা হইবে, সমস্যা সমূহ দুর করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদ্বব্যহারের জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছে। সূরা নেছার প্রথম রুকুতে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি পালককে ভয় কর, যাহার নামে তোমরা বারবার প্রার্থনা করিয়া থাক এবং আত্মীয়তাকে ও ভয় কর। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, পিতামাতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষদিগের হিস্যা রহিয়াছে এবং মাতাপিতা এবং আত্মীয়দিগের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে নারীদিগেরও হিস্যা রহিয়াছে। তৃতীয় এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে তওহীদের নির্দেশ দিতেছেন, লোকদের উপকার করা এবং তাহাদের ক্ষমা করার নির্দেশও দিতেছেন এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিতেছেন। তিনটি বিষয়ে আদেশ প্রদানের পর তিনটি বিষয়ে নিষেধ করিয়াছেন।

শরীয়ত বহির্ভূত কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, জুলুম অত্যাচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন, পাপ কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা এইসব আদেশ নিষেধ একারণেই করিয়াছেন যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

হজরত ওছমান ইবনে মাজউন (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) আমাকে স্নেহ করিতেন, এই লজ্জায়ই আমি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি

যে নবী করিম (ছঃ) আমাকে মুসলমান হইতে বলিয়াছেন। কিন্তু মুসলমান হইলেও ইসলামের প্রতি আমার মনের গভীর কোন আকর্ষণ ছিল না। একবার আমি নবীজীর দরবারে বসিয়াছিলাম, তিনি আমার সহিত কথা বলিতেছিলেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, মনে হইল তিনি অন্য কাহারো সহিত কথা বলিতেছেন। কিছুক্ষণ পর আমার প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালার ফেরেশতা) জিব্রাইল কোরানের এই বানী লইয়া আসিয়াছেন, "আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ন্যায় বিচার এবং লোকদের প্রতি উপকারের আদেশ প্রদান করিতেছে।" নবীজী আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলেন। ইহাতে ইসলামের প্রতি আমার মন বসিয়া গেল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া নবীজীর পিতৃব্য আবুতালেবের নিকট গিয়া বলিলাম, আমি আপনার ভ্রাতুষ্পত্রের নিকট ছিলাম' সেই সময় তাঁহার উপর এই আয়াত নাজিল হইল। নবীজীর চাচা সেকথা শুনিয়া বলিলেন, মোহাম্মদের (ছঃ) অনুসরণ কর কামীয়াব হইতে পারিবে। আল্লাহর শপথ তিনি নবুয়তের দাবীতে সত্য হউন বা মিথ্যা হউন, কিন্তু তোমাদের ভালো অভ্যাস এবং প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়ার শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

ইহা এমন এক ব্যক্তির উপদেশ যিনি নিজে মুসলমান হন নাই, কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে নবুয়তের দাবী সত্য হোক বা মিথ্যা হোক কিন্তু ইসলামের শিক্ষা উত্তম ও উন্নত শিক্ষা, ইসলামের প্রচারক মানুষকে সৎগুণাবলী শিক্ষা দিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়; বর্তমানে আমরা মুসলমান হইয়াও চারিত্রিক অধঃপতনের পরিচয় দিয়া চলিয়াছি।

(৮) ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولى القربى والمسكين والمهجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور الرحيم ٥

অর্থাৎ আর যেন কছম খাইয়া না বসে তোমাদের মধ্যকার যাহারা বুজুর্গ এবং অবস্থা[illegible] এ বিষয়ে যে তাহারা আত্মীয় স্বজন, মিছকীন ও আল্লাহর পথে [illegible]তকারীদেরকে সাহায্য করিবে না, এবং তাহাদের উচিত তাহারা যেন উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তোমরা কি ইহা

পছন্দ কর যে আল্লাহ পাক তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (নুর রুকু ৩)

প্রথম পরিচ্ছেদে ১৮নং আয়াতে উপরোক্ত আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হইয়াছে। এতদসত্বেও তাহার পুনরাবৃত্তি করার কারণ এইযে, আমরা যেন আমাদের পূর্ববর্তী ঐ সকল বুজুর্গের আচার আচরণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করি। একই সাথে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ সম্পর্কেও যেন চিন্তা করি। উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশার (রাঃ) প্রতি তাঁহারাই সন্তানতুল্য লোকজন ভিত্তিহীন অপবাদ রটাইয়াছিল এবং সেই অপবাদ তাঁহার এমন সব আত্মীয়স্বজন ছড়াইয়াছিল আয়েশার (রাঃ) পিতা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) এর সাহায্য সহযোগিতায় যাহারা জীবিকা নির্বাহ করিত। ইহাতে হজরত আবুবকর (রাঃ) পিতা হিসাবে কতটুকু মনকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না। এতদসত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ক্ষমা করার নির্দেশ দিতেছেন। অন্যদিকে হজরত আবুবকর (রাঃ) তাঁহার এইসব আত্মীয়স্বজনের জন্য পূর্বে যাহা খরচ করিতেন সেই খরচের অঙ্ক বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে আমরা কি নিজেদের আত্মীয়স্বজনের সহিত এরূপ উদার ব্যবহার করিতে পারিব যে তাহারা এমন গুরুতর অপবাদ রটাইলেও তাহাদের সাহায্য সহযোগীতা অব্যাহত রাখিব? কোরানের উপরোক্ত আয়াত পাঠ করিয়াও কি অকৃতজ্ঞ ও জঘন্য মানসিকতার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমাদের মনে বিন্দুমাত্র করুণার উদ্রেক হইবে? সেই সব আত্মীয়স্বজনতো দুরের কথা তাহাদের বংশধরদের প্রতিও কি আমরা যুগ যুগ ধরিয়া শত্রুতা পোষণ করিব না? সামাজিকভাবে তাহাদের বয়কট করিব না? তাহারা যেই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিবে আমরা কি সেই সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিব না? অপবাদ যাহারা দিয়াছে তাহাদের নিমন্ত্রণে যাহারা অংশ গ্রহণ করিবে তাহাদের প্রতিও কি আমরা বিরূপ বিরক্ত হইব না? কেননা ওরা এমন লোকের নিমন্ত্রণ বা অন্যবিধ উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়াছে যাহারা আমাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছে। অথচ অংশ গ্রহণ করিয়া যদিও অপবাদদানকারীদের কাজে অসন্তুষ্ট থাকে তবুও

তাহাদেরও আমরা ভালো চোখে দেখিব না। পারতপক্ষে তাহাদের সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করিব। আল্লাহ বলিয়াছেন তিনি তাহাদের নিজেও সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমরা তাহাদের সাথেও সম্পর্ক রাখিতে প্রস্তুত নহি, যাহারা অপবাধ রটানকারীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু যাহাদের অন্তরে সত্যিকার ঈমান রহিয়াছে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার ছাপ রহিয়াছে তাহাদের মনে আল্লাহর পবিত্র বাণীর বিরাট প্রভাব বিদ্যমান। তাঁহারা আল্লাহর বাণীর উপর আমল করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে ইহাকেই বলে আনুগত্য, ইহাকেই বলে আদেশ পালন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের অসীম রহমত তাঁহাদের উপর নাজিল করিয়াছেন এবং নিজের দরবারে তাহাদের মর্যাদা অনুযায়ী জায়গা বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা ও ত মানুষ ছিলেন, ক্রোধ, ঘৃণা, আত্মসম্মানবোধ তাহাদেরও ছিল তাহাদের বুকেও চেতনা প্রবণ অন্তর ছিল। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির মোকাবিলায় তাঁহারা নিজেদের সকল ক্রোধ, রাগ, দুর্ণাম ইত্যাদি বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন।

মাতা পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের তাকীদ।

(٣) ووصينا الانسان بوالديه احسانا - حملته امه كرها ووضعته كرها - وحمله وفصله ثلثون شهرا - حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضه واصلح لي في ذريتي - اني تبت اليك واني من المسلمين - اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سياتهم في اصحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ٥

অর্থাৎ “এবং আমি মানবকে স্বীয় জনক জননীর সহিত সদ্ব্যবহার করিবার জন্য চুড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহার জননী তাহাকে কষ্টের সহিত গর্ভে ধারণ করিয়াছে এবং কষ্টের সহিত তাহাকে প্রসব করিয়াছে এবং তাহাকে গর্ভে ধারণ ও স্তন্য পান হইতে বিরত করিতে ত্রিশ মাস লাগিয়াছে এমন কি সে যখন যৌবনে পদার্পণ করে ও চল্লিশ

বৎসরে উপনীত হয় তখন সে বলিতে থাকে হে আমার প্রতিপালক আপনি আমার ও আমার পিতামাতার প্রতি যে সমস্ত নেয়ামত দান করিয়াছেন তৎসমূহের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার শক্তি আমাকে প্রদান করুন এবং এরূপ সৎকার্য করিবার শক্তি প্রদান করুন যাহা আপনার সন্তোষ বিধান করে ও আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদিগকে সৎকর্মশীল করুন। নিশ্চয় আমি আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি নিঃসন্দেহে আমি অনুগতদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি। তাহারাই ঐ সব লোক আমি যাহাদের কৃত উত্তম কার্যাবলি গ্রহণ করি এবং তাহাদের মন্দ কাজগুলি ছাড়িয়া দেই তাহারাই বেহেশতবাসী এবং ইহাই প্রতিশ্রুত সত্য ওয়াদা যাহা তাহাদের সহিত দুনিয়াতে করা হইত।"

(আহকাফ, রুকু ২)

ফায়েদা ঃ আল্লাহ তায়ালা কোরান পাকে আত্মীয় স্বজন এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের বার বার তাগিদ দিয়াছেন। ইতি পূর্বে ও এ ধরনের আয়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আয়াতে বিশেষভাবে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের তাগিদ রহিয়াছে। "আমি পিতা মাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের আদেশ দিয়াছি" এ ধরনের আয়াত কোরানের তিন জায়গায় রহিয়াছে। প্রথমতঃ ছুরা আনকাবুতের প্রথম রুকুতে, দ্বিতীয়তঃ ছুরা লোকমানের দ্বিতীয় রুকুতে তৃতীয়তঃ আহকাফের দ্বিতীয় রুকুতে। তাফছীরে খাজেনে লিখিত আছে যে, এই আয়াত হজরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) শানে নাজিল হইয়াছে। সিরিয়া সফরের সময় সর্বপ্রথম নবী করিম (ছঃ) এর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সেই সময় তাঁহার বয়স ছিল আঠার বছর নবীজীর বয়স ছিল বিশ বছর। এ সফরের সময়ে একটি কুলগাছের তলায় তাঁহারা বিশ্রাম করার সময়ে নবীজীকে একাকী রাখিয়া হজরত আবু বকর (রাঃ) পাদ্রীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। পাদ্রী আবুবকরকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, গাছের ছায়ায় যিনি বসিয়া রহিয়াছেন তিনি কে? হজরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালেব। পাদ্রী বলিলেন, আল্লাহর কসম ইনি নবী। হজরত ঈসার (আঃ) পর হইতে এই গাছের নীচে আর কেহ

বসেন নাই। ইনিই সর্বশেষ নবী। নবীকরিম (ছঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর পরই হজরত আবুবকর (রাঃ) ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দুই বছর পর তাঁহার বয়স চল্লিশ বছর হইলে তিনি মোনাজাত করিলেন, হে আল্লাহ! আমার প্রতি এবং আমার পিতামাতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহার শুকরিয়া আদায় করিবার তওফীক দিন।

হজরত আলী (রাঃ) বলেন মুহাজিরিনদের মধ্যে পিতামাতা উভয়ই মুসলমান হইয়াছেন এমন সৌভাগ্য অন্য কাহারো হয় নাই। দ্বিতীয় দোয়া ছিল সন্তানদের সম্পর্কে সেই দোয়াও আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছেন তাঁহার সন্তানরা মুসলমান ছিলেন! সূরা আনকাবুত এর আয়াত সবচেয়ে কঠিন নির্দেশ সম্বলিত, সেখানে কাফের পিতামার সহিতও উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। কাফের পিতামাতার সাথেও আল্লাহ তায়ালা যখন উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন এমতাবস্থায় মুসলমান পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহারের তাগিদ যে আরো কত অধিক তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হজরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন যে তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সঃ) এর দীন পরিত্যাগ না করি। এমতাবস্থায় তাহার মুখে জোর পূর্বক খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইত। এই সময় এ আয়াত নাজিল হয়। (দুররে মনছুর)

প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইতেছে এতো কঠিন সময়েও আল্লাহ বলিয়াছেন আমি মানুষকে তাহার পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছি। তবে তাহারা যদি মুশরিক বানাইবার চেষ্টা করে তাহাদের আনুগত্য করার প্রয়োজন নাই।

হজরত হাছানকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের মাপকাঠি কি? তিনি বলিলেন, তোমার মালিকানায় যাহা রহিয়াছে তাহাদের জন্যে উহা ব্যয় কর। তাহারা যেই আদেশ করেন সেই আদেশের আনুগত্য কর তবে তাহারা

কোন পাপের আদেশ করিলে তখন আনুগত্য করিতে হইবে না কেননা এক্ষেত্রে আনুগত্য প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল ইসলামের শিক্ষা এবং মুসলমানদের কার্য কলাপের নমুনা। পৌত্তলিক অর্থাৎ মুশরিক পিতামাতা যদি সন্তানকে ইসলাম থেকে দূরে সরাইতে চাহে তবুও তাহাদের সহিত সদ্‌ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। তবে শেরেক করার আদেশের ব্যাপারে তাহাদের আনুগত্য করা যাইবে না কেননা ইহা স্রষ্টার হক। পিতামাতার হক যতই হোকনা কেন স্রষ্টার হকের মোকাবেলায় তাহা অনুসরণ যোগ্য নহে। তবে তাহাদের ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টার মুখেও তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে। অন্য একটি হাদীছেও ছুরা লোকমানের আয়াত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে ইহা হযরত সা'দ (রাঃ) এর ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। হজরত সা'দ (রাঃ) বলেন আমি আমার মায়ের সহিত সব সময় ভাল ব্যবহার করিতাম। আমার ইসলাম গ্রহণের পর আমার মা বলিলেন, তুই এ কি করলি সা'দ এই নতুন দ্বীন ছাড়িয়া দে, তাহা না হইলে আমি পানাহার গ্রহণ বন্ধ করিব এবং মরিয়া যাইব। তোকে এই কথা বলিয়া লোকে সব সময় মাতৃহত্যাকারী বলিয়া লজ্জা দিবে। আমি বলিলাম, মা তুমি অমন কাজের প্রতিজ্ঞা করিও না, ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। অতঃপর আমার মা দুই দিন যাবত অনশন করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মা যদি তোমার একশতটি প্রাণ থাকে এবং অনশনে প্রতিটি প্রাণ দেহত্যাগ করে তথাপি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ঈমানের দৃঢ়তা দেখিয়া আমার মা অনশন ভঙ্গ করিলেন। (দুররে মনছুর)

এই আয়াতে পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়েছ (রহঃ) বলেন, যদি আল্লাহ তায়ালা পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ নাও দিতেন তবুও বিবেক সম্মতভাবে ইহা বোঝা যায় যে, পিতামাতার আনুগত্য করাও তাহাদের হক আদায় করা কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা তাহার সকল কিতাব তওরাত, ইঞ্জিল, জবুর, ও কোরানে পিতামাতার হকের

প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন। সকল নবীকে ওহী পাঠাইয়া তাগিদ দিয়াছেন। নিজের সন্তুটিকে পিতামাতার সন্তুষ্টির সহিত সম্পৃক্ত বলিয়াছেন এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টির সহিত নিজের অসন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

উপরোক্ত তিনটি আয়াত ছিল উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে অতঃপর তিনটি আয়াতে দুর্ব্যবহারের পরিনাম সম্পর্কে সতর্ক করা হইয়াছে।

(১) وما يضل به الا الفسقين - الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخسرون ○

অর্থাৎ "কিন্তু ইহা দ্বারা কেবল কপট বিশ্বাসীদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন যাহারা আল্লাহর সহিত সুদৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার পর তাহা ভঙ্গ করে এবং সেই সম্বন্ধ ছিন্ন করে যাহা অক্ষুন্ন রাখিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহারা পৃথিবীতে কলহ বিবাদ করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।" (বাকারাহ; রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ আল্লাহ তায়ালা কোরানে পাকের কয়েক জায়গায় নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক রাখার বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। একইভাবে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করণ বিশেষতঃ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। আল্লাহ পাক বলেন, "এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট নিবেদন করিয়া থাক। (নেছা রুকু ১)

এবং দরিদ্রতাহেতু নিজেদের সন্তানকে হত্যা করিও না।

(আনয়াম রুকু ১৯)

আর তোমরা হত্যা করিও না তোমাদের সন্তানগণকে দারিদ্রতার ভয়ে (বনি ইসরাইল রুকু ৪) এবং আমি মানবকে স্বীয় পিতামাতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবার জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। (আহকাফ রুকু ২) অনন্তর ইহাও সম্ভাবনা যে যদি তোমরা বিমূখ হও তাহা হইতে তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি ও তোমাদের আত্মীয়-

তার বন্ধন কর্তন করিবে, (মোহাম্মদ রুকু ৩।)।

হযরত মোহাম্মদ বাকেরকে (রহঃ) তাঁহার পিতা বিশেষভাবে সে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রথম পরিচেছদের ২৩নং হাদীছের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা হযরত জয়নুল আবেদীন (রহঃ) অসিয়ত করিয়াছেন যে, পাঁচ প্রকারের লোকের ধারে কাছেও যাইও না। (১) ফাছেক লোকের সান্নিধ্যে যাইও না, সে তোমাকে এক লোকমা আহার্যের বিনিময়ে এমনকি তাহার কম মূল্যের বিনিময়েও তোমাকে বিক্রয় করিয়া দিবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, এক লোকমা খাদ্য প্রদানের আশ্বাস পাইয়াই তোমাকে বিক্রি করিয়া দিবে অথচ সেইখাদ্য ও সে পাইবে না। (২) কৃপনের সান্নিধ্যে যাইও না। তোমার দারিদ্রের সময়ে সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। (৩) মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে প্রতারণার মধ্যে রাখিবে। যাহা দুরে তাহা নিকটে বলিবে যাহা নিকটে তাহা দুরে বলিবে। (৪) নির্বোধের সংস্পর্শে যাইও না। সে তোমাকে উপকার করার ইচ্ছা করিয়াও নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণে পারিবে না। প্রবাদ রহিয়াছে যে, নাদান দোস্তের চাইতে জ্ঞানী দুশমন উত্তম। আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর নিকট যাইও না। আল্লাহ তায়ালা কোরানে তিন জায়গায় তাহাদের প্রতি লানত করিয়াছেন।

(২) والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون فى الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ٥

অর্থাৎ আর যাহারা ভঙ্গ করে আল্লাহর ওয়াদা একবার তাহার সহিত পরিপক্ক কওল ও কারারের পরে, আর ছিন্ন করে ঐসব সম্পর্ককে যাহাকে মজবুত রাখার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়াছেন এবং দেশে কলহ বিবাদের সৃষ্টি করে, ইহারাই উহারা যাহাদের জন্য লা'নত রহিয়াছে আর উহাদের জন্য জঘন্য পরিণতি রহিয়াছে।

(রা'দ রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে। তিনি বলেন, অঙ্গীকার পালন না করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তায়ালা ইহা অপছন্দ করিয়াছেন এবং বিশটির অধিক আয়াতে এ সম্পর্কে সাবধান করিয়াছেন। যাহা উপদেশ হিসাবে কল্যাণ কর নির্দেশ হিসাবে ও দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। অঙ্গীকার পালন সম্পর্কে যতো বেশী সতর্ক করা হইয়াছে অন্য কোন বিষয়ে এত সতর্ক করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করে সে যেন তাহা পালন করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করমি (ছঃ) তাঁহার এক ভাষণে বলিয়াছেন যে ব্যক্তি আমানত পরিশোধ না করে তাহার ঈমান নাই। আর যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন না করে তাহার দ্বীন নাই। হজরত অবু ওমামা (রাঃ) এবং ওয়াদা (রাঃ) হইতেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণনা করা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

হজরত মায়মুন ইবনে মোহরান (রাঃ) বলেন, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহাতে কাফের ও মুসলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই সবার জন্যই সমান নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (১) অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিতে হইবে, কাফেরের সহিত বা মুসলমানের সহিত যাহার সহিতই অঙ্গিকার করা হোক না কেন। কেননা অঙ্গিকার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর সহিত করা হইয়া থাকে। (২) যাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্কের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। সেই আত্মীয় মুসলমান বা কাফের যাহাই হোকনা কেন। (৩) যেই ব্যক্তি আমানত রাখে তাহার আমানত যথাযথভাবে ফিরাইয়া দেওয়া, সে মুসলমান বা কাফের যাহাই হোক না কেন।

(তাম্বীহুল গাফেলীন)

কোরানে বহু জায়গায় নির্দেশ দেওয়া ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বনি ইসরাঈলের চতুর্থ রুকুতে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার পালন কর নিঃসন্দেহ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, যেইসব সম্পর্ক জোড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়তার

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। (তুররে মনছুর)

দ্বিতীয়ত সম্পর্ক জোড়া দেওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে। হজরত ওমর বিন আবদুল আজিজ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে তাহার সহিত মেলামেশা করিও না। পবিত্র ছুরা রা'দ এবং ছুরা মোহাম্মদে এ ধরণের বন্ধন ছিন্নকারীদের সম্পর্কে লা'নত করা হইয়াছে। ছুরা মোহাম্মদের আয়াত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে উক্ত আয়াতের পর আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, "আল্লাহ এইসব লোককে বধির করিয়া দিয়াছিন এবং অন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

হজরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রাঃ) দুই জায়গায় এবং হজরত ইমাম জয়নুল আবেদীন তিন জায়গায় লানতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার কারণ সম্ভবত এই যে, রা'দ ও ছুরা মোহাম্মদে লানত শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। তৃতীয় জায়গায় এধরণের লোককে পথভ্রষ্ট এবং ক্ষতিগ্রস্ত বলা হইয়াছে, যাহা লানতের কাছাকাছি। যেমন ইতিপূর্বে ছুরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হজরত সালমান (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, যখন কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং কাজ কোষাগারে চলিয়া যাইবে, (অর্থাৎ কথা অনেক থাকিবে কিন্তু আমল থাকিবে না) পারস্পরিক মৌখিক ঐক্য তো থাকিবে কিন্তু মন বিভিন্নমূখী এবং আত্মীয়স্বজন পরস্পর সম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দুরে সরাইয়া দিবেন এবং তাহাদিগকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন।

হজরত হাছান (রাঃ) হইতেও নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, লোকেরা যখন এলেম প্রকাশ করিবে এবং আমল ধ্বংস করিবে এবং মৌখিক ভালবাসা প্রকাশ করিবে অথচ মনে মনে শত্রুতা পোষণ করিবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে নিজের রহমত হইতে দুরে সরাইয়া দিবেন, তাহাদেরকে অন্ধ ও বধির করিয়া দিবেন। (তুররে মনসুর)

ইহাতে সরল পথ তাহারা দেখিতে পাইবে না, সত্য কথা তাদের কানে প্রবেশ করিবে না। একটি হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বেহেশতের সুবাস এতো দুরে চলিয়া যায়, যাহার দুরত্ব পাঁচশত বছরের পথের

দূরত্বের সমান। পিতামাতার অবাধ্যতাকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বেহেশতের সুবাস ও পাইবে না। (এহ্ইয়া)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আরাফার বিকালে নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলাম। নবীজী বলিলেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন কারী কেহ মজলিশে থাকিলে সে যেন উঠিয়া যায় এবং আমার নিকটে না বসে। একজন লোক উঠিয়া যায় এবং ক্ষণকাল পরে আসিয়া বসিল। নবীজী তাহাকে বলিলেন, তুমি আমার কথা শুনিয়া দূরে যাইয়া আবার আসিয়া বসিলে, ইহার কারণ কি? লোকটি বলিল, আপনার কথা শোনার পর আমি আমার খালার নিকট গেলাম। তিনি আমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া খালা বলিলেন, তুমি অপ্রত্যাসিত ভাবে আসিয়াছ কেন? আমি তাহাকে আপনার বাণী শুনাইলাম। তিনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর আমিও তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। (পারস্পরিক সমঝোতার পর এখানে আসিলাম)।

নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তুমি খুবই ভাল কাজ করিয়াছ, বসিয়া পড়। সেই কওমের উপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না যেই কওমের কেহ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। ফকীহ আবুল লায়েসও (রহঃ) এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা হইতে বোঝা যায় সম্পর্ক ছিন্ন করা এত মারাত্মক পাপ যে ইহার ফলে ছিন্নকারীর নিকটে উপবেশনকারীও আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কাজেই আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী কেহ থাকিলে তওবা করিয়া সম্পর্ক পুনঃ-স্থাপন করা উচিত। নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করার চাইতে কোন কাজের পুণ্য এত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় না। আখেরাতের শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ায় যেই কাজের শাস্তি ভোগ করিতে হইবে তাহা হইতেছে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করণ এবং জুলুম।

বিভিন্ন বর্ণনায় ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার শাস্তি আখেরাতে ছাড়া দুনিয়ায়ও ভোগ করিতে হয়। আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে তো উপরোক্ত আয়াতেই উল্লেখ রহিয়াছে।

একটি আজব কেচ্ছা

ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) এক বিস্ময়কর ঘটনা লিখিয়াছেন। তিনি বলেন মক্কায় একজন খোরাসানবাসী পুণ্যবান ও আমানতদার হিসাবে পরিচিত ছিল। তাঁহার কাছে অনেকে নিজেদের দ্রব্যাদি ও অর্থ সম্পদ গচ্ছিত রাখিত। একব্যক্তি তাহার নিকট দশহাজার আশরাফী (স্বর্ণ-মুদ্রা) আমানত রাখিয়া নিজের বিশেষ প্রয়োজনে সফরে চলিয়া গিয়াছিল। সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে সেই খোরাসানবাসীর মৃত্যু হইয়াছে। পরিজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কিছু জানেনা বলিয়া জানাইল। যিনি আমানত রাখিয়াছেন তিনি চিন্তায় পড়িলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় মক্কা শরীফে কিছু সংখ্যক আলেম অবস্থান করিতেছিলেন। তাহাদের কাছে সব কথা বলিলে তাঁহারা অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে লোকটি পুণ্যবান ছিল, আমাদের ধারনা সে জান্নাতবাসী হইয়াছে। তুমি এক কাজ কর। অর্ধেক রাত অথবা রাতের দুই তৃতীয়াংশ কাটিয়া যাওয়ার পর তুমি যমযম কূপের তীরে যাইয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে এবং তাহাকে নিজের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। লোকটি তিন দিন যাবত এরূপ তদ্বীর করিয়াও কোন সাড়া পাইল না। ওলামাদের নিকট ইহা জানাইলে তাহারা ইন্নালিল্লাহ পড়িয়া বলিলেন লোকটি জান্নাতী কিনা এ ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। যাক, তুমি অমুক উপত্যাকায় গমন কর? লোকটি সেই উপত্যাকায় গিয়া মৃত ব্যক্তিকে ডাক দিলে প্রথম আওয়াজেই জওয়াব আসিল যে তোমার আমানত আমি যথাস্থানেই গচ্ছিত রাখিয়া আসিয়াছি, পূর্বে যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানেই আছে আমার সন্তানদের উপর আস্থা না হওয়ায় আমি এসম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করি নাই। আমার সন্তানদের বল তাহারা যেন গৃহের অভ্যন্তরে অমুক জায়গায় তোমাকে লইয়া যায়। সেখানে মাটি খুঁড়িয়া তোমার অর্থ বাহির করিয়া লও। লোকটি তাহাই করিল এবং তাহার স্বর্ণমুদ্রা ফিরিয়া পাইল। নিজের আমানতের সন্ধান পাওয়ার পর মৃত ব্যক্তিকে লোকটি এ বিষয় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি তো খুব পুণ্যশীল ছিলে তুমি এখানে আসিলে কি

কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল আমি তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই অন্যায় অপরাধে আমি এখানে পাকড়াও হইয়া রহিয়াছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সকল উপত্যাকার চাইতে শ্রেষ্ঠ উপত্যকা হইতেছে মক্কার উপত্যকা। হিন্দুস্তানের সেই উপত্যাকাও উত্তম, যেখানে হজরত আদম (আঃ) বেহেশত হইতে অবতরন করিয়াছিলেন। সেখানে লোকের ব্যবহৃত সুগন্ধির আধিক্য রহিয়াছে। নিকৃষ্ট উপত্যাকা হইতেছে আহক্বাফ এবং হাজরামাউতের উপত্যাকা যাহাকে বারহুত বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব নিকৃষ্ট কূপ হইতেছে বারহুতের কূপ। কাফেরদের আত্মাসমূহ সেখানে একত্রিত হইয়া থাকে। (দুররে মনছুর)

এই সকল আত্মার কোন সময়ে এখানে অবস্থান করা শরীয়তের যুক্তি ভিত্তিক নয় বরং ইহা হইতেছে কাশফী বিষয়ক। যাহা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা মাফিক কাহারো উপর প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কাশফ শরীয়তের দলিল বা যুক্তি নহে।

মাতাপিতার সহিত কিরূপ আচারণ করিতে হইবে।

(٣) اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا -

অর্থাৎ "আর মাতাপিতার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। যদি তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছিয়া যায় উভয়ের একজন কিম্বা উভয়েই তবে উহাদের উদ্দেশ্যে উহ্ শব্দটুকু বলিবে না। আর না উহাদিগকে ধমক দিবে, আর উহাদের সাথে কথা বলিবে আদবের সাথে। আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নম্রতার মস্তক ভালোবাসার সহিত, আর দোয়া করিবে যে হে আমার পালনকারী তাঁহাদের প্রতি ঐরূপ রহম প্রদর্শন করুন যেইরূপ ইঁহারা আমাকে

পালন করিয়া আসিতেছেন শিশু কাল হইতে। হে লোক সকল, তোমাদের মনের মধ্যে কি রহিয়াছে তোমাদের প্রভু উহা খুব ভাল করিয়া জানেন, যদি তোমরা পুণ্যবান হও তবে তিনি সব তওবাকারীগণের দোষ ক্ষমাকারী। (বনি ইসরাইল, রুকু ৩)

ফায়েদা ঃ হজরত মোজাহেদ (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যদি তাহারা বৃদ্ধ হইয়া যায় এবং তোমাদের প্রস্রাব পায়খানা ধুইতে হয় তবু কখনো উহ্ শব্দ করিও না, যেমন নাকি শৈশবে তাহারা তোমার পায়খানা প্রস্রাব ধুইয়াছেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে আদবী প্রকাশের ক্ষেত্রে যদি উহা ছাড়া অন্য কোন ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি থাকিত তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাও হারাম করিয়া দিতেন। হজরত হাছানকে (রাঃ) কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন নাফরমানির মাপকাঠি কি? জবাবে তিনি বলিলেন, নিজের ধন সম্পদ হইতে পিতামাতাকে বঞ্চিত রাখা তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না করা এবং তাহাদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিতে তাকানো। হজরত হাছানকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, আদবের সহিত বলিতে কি বোঝায়? তিনি জবাবে বলিলেন, তাহাদিগকে আম্মা আব্বা বলিয়া সম্বোধন করিবে, কখনো তাহাদের নাম মুখে আনিবে না।

হজরত যোবায়ের ইবনে মোহাম্মদ (রাঃ) হইতে তাহার তাফসীরে নকল করা হইয়াছে যে, পিতামাতা যখন আহ্বান করিবে তখন জ্বী-হাজির জ্বী-হাজির বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিবে।

হজরত কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, পিতামাতার সহিত নম্রভাবে কথা বলিবে।

হজরত সাঈদ ইবনে মোছাইয়েব (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে সদ্ব্যবহারের আদেশ বহু জায়গায় রহিয়াছে আমি তাহা বুঝিয়াছি কিন্তু আদবের সহিত কথার অর্থ (কওলে করীম) বুঝিতে পারি নাই। হজরত সাঈদ (রাঃ) বলিলেন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী গোলাম কঠোর বদ মেজাজ মনিবের সহিত যেভাবে কথা বলে সেইভাবে কথা বলিতে হইবে।

হজরত মা আয়েশা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (সঃ) এর নিকট একব্যক্তি হাজির হইল। তাহার সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকও ছিল। নবীজী

জিজ্ঞাসা করিলেন এই লোকটি কে ? লোকটি বলিল, ইনি আমার পিতা নবীজী বলিলেন তাহার আগে পথ চলিবে না, তাহার আগে বসিবে না তাহার আগে বলিবে না তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে না এবং তাহাকে কটু কথা বলিবে না। হজরত ওরওয়াকে (রাঃ) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, পবিত্র কোরানে বলা হইয়াছে "আর নত করিয়া রাখিবে উহাদের সামনে নম্রতার মস্তক" ইহার অর্থ কি ? তিনি বলিলেন পিতামাতা যদি তোমার পছন্দ নহে এমন কোন কথাও বলে তবু তাহাদের প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাইবে না, মানুষের বিরক্তির প্রথম প্রকাশ তাহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠে।

হজরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবীজী বলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতার প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকায় সে আনুগত্য পরায়ন নহে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ কি ? নবীজী বলিলেন, সময় মত নামাজ আদায় করা। বলিলাম তারপর ? নবীজী বলিলেন, পিতামাতার সহিত ভালো ব্যবহার ; বলিলাম ; তারপর ? নবীজী বলিলেন জেহাদ।

অন্য এক হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)

মাজাহের গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন পিতামাতার সহিত এমন বিনীত ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, বৈধ কাজ সমূহে তাহাদের আনুগত্য করিতে হইবে, বেআদবী, অহংকার করা চলিবে না যদিও তাহারা কাফের হয় না কেন, কথার মাঝে উচ্চ বাচ্চ করা চলিবে না তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা চলিবে না, কোন কাজ তাহাদের আগে আরম্ভ করা চলিবে না, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে শান্ত স্বরে নম্রভাবে কথা বলিবে। এক বার বলিলে যদি তাহারা গ্রহণ না করে নিজে পালন করিতে থাকিবে এবং তাহাদের ক্ষমা করিবার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিবে। এইসব কথা কোরান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে যেভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে লওয়া হইয়াছে। একবার হজরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁহার পিতাকে উপদেশ দেয়ার পর বলিয়াছেন, আচ্ছা, এবার আমি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করিতেছি। ছুরা কাহাফের তৃতীয় রুকুতে ইহা উল্লেখ রহিয়াছে। কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, অবৈধ কাজে পিতামাতার অনুকরণ হারাম কিন্তু সন্দেহমূলক বিষয় সমূহে ওয়াজিব। কেননা সন্দেহমূলক ব্যাপার সমূহ থেকে দূরে থাকা পরহেজগারীর পরিচায়ক অথচ পিতামাতার সন্তুষ্টি বিধান ওয়াজিব। যদি পিতামাতার উপার্জিত মালামাল সন্দেহমূলক হইয়া থাকে এবং তাহারা তোমার আলাদা আহার্য গ্রহণে নারাজী প্রকাশ করেন তাবে তাহাদের সহিতই খানা খাইতে হইবে।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এমন কোন মুসলমান নাই যাহার পিতামাতা জীবিত রহিয়াছেন যে তাহাদের সহিত উত্তম ব্যবহার করে অথচ তাহার জন্য বেহেশতের দ্বার খোলা হয় না। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করা হইলে তাহাদেরকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হয় না। একজন জিজ্ঞাসা করিল যদি তাহারা জুলুম করে? ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন যদি তাহারা জুলুম ও করে!

হজরত তালহা (রাঃ) বলেন নবীকরিম (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইয়া এক লোক জেহাদে অংশ গ্রহণের আবেদন জানাইল। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা বাঁচিয়া আছেন? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন। নবীজী বলিলেন যথার্থভাবে তাঁহার সেবা কর, বেহেশত তাহার পদতলে রহিয়াছে। দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ও নবীজী একই কথা বলিলেন।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীজীর কাছে আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল জেহাদে অংশগ্রহণ করার আমার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু আমি তাহাতে সক্ষম নহি। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার পিতামাতার মধ্যে কেহ কি বাঁচিয়া আছেন? লোকটি বলিল হ্যাঁ বাঁচিয়া আছেন, নবীজী বলিলেন তাহার সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। যদি ভয় কর তাহা হইলে তুমি হজ্ব ওমরা এবং

জেহাদকারীরূপে পরিগণিত হইবে।

হজরত মোহাম্মদ ইবনে আল মোনকাদের (রহঃ) বলেন, আমার ভ্রাতা জীবনভর রাত্রিকালে নামাজ পড়িতেন আর আমি মায়ের পা টিপিয়া দিতাম। আমার রাতের পরিবর্তে ভাইয়ের রাত লাভ করিবার ইচ্ছা আমার কখনো হয় নাই।

আম্মাজান হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করিম (সঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম নারীর উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন স্বামীর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পুরুষের উপর সবচেয়ে বেশী অধিকার কাহার? নবীজী বলিলেন মায়ের।

একটি হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, তোমরা অন্য নারীদের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিও, তোমাদের নারীদের সম্মান রক্ষিত হইবে, তোমরা পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও তোমাদের সন্তান ও তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। (দুররে মনছুর)

পিতার খেদমত করার আশ্চর্য পরিণাম

হজরত তাউস (রহঃ) বলেন একটি লোকের চারটি পুত্র ছিল। লোকটি অসুখে পড়িলে চার পুত্রের একজন ভাইদেরকে বলিল, তোমরা যদি পিতার সম্পত্তির অংশ কিছুই গ্রহণ করিবে না এমন শর্তে পিতার দেখাশোনা করিতে রাজি থাক তবে কর, অন্যথায় অনুরূপ শর্তে আমি পিতার দেখাশোনা করিতেছি। ভাইয়েরা বলিল, তুমিই সম্পত্তির অংশ গ্রহণ না করার শর্তে পিতার দেখাশোনা কর, আমরা তাহা করিব না। সেই পুত্র পিতার সেবাযত্নে কোন ত্রুটি করিল না। অসুখে লোকটি মারা গেল; শর্ত অনুযায়ী সেবাকারী পুত্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন অংশ গ্রহণ করিল না। রাতে সে স্বপ্নে দেখিল, একজন লোক বলিতেছে, অমুক জায়গায় একশত দীনার আশরাফী মাটির তলায় লুকানো রহিয়াছে? তুমি তাহা গ্রহণ কর সে জিজ্ঞাসা করিল, উহাতে কি বরকত রহিয়াছে? লোকটি বলিল, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী দীনারগুলো খুঁড়িয়া বাহির করিতে স্বামীকে পীড়া-পীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে স্ত্রীর কথা শুনিল না। পরদিন রাতে একই রকম স্বপ্ন দেখিল।

এবার অন্যত্র দশ দীনারের কথা বলা হইল। সে একই ভাবে বরকতের প্রশ্ন তুলিল। তাহাকে বলা হইল যে, বরকত উহাতে নাই। সকালে স্ত্রীর নিকট স্বপ্নের বিবরণ বলিলে স্ত্রী মুদ্রাগুলো তুলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু সে মানিল না। তৃতীয় রাতেও স্বপ্ন দেখিল। এবার পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাকে একটি স্বর্ণ মুদ্রা মাটির তলা হইতে খুঁড়িয়া লইবার স্থান নির্দেশ করিতেছিল। লোকটি বরকতের প্রশ্ন তুলিল, এবার তাহাকে বলা হইল যে এই স্বর্ণ মুদ্রায় বরকত হইবে। লোকটি সেই স্বর্ণ মুদ্রা তুলিয়া বাজারে যাইয়া দুইটি মাছ ক্রয় করিল। বাড়ীতে আসিবার পর সেই মাছের পেটে এমন অপরূপ দুইটি মুক্তা পাওয়া গেল, এমন মুক্তা ইতিপূর্বে কেহ দেখে নাই। বাদশাহ তাহার নিকট হইতে দর কষাকষি করিয়া ৩০টি খচ্চর বোঝাই স্বর্ণের বিনিময়ে সেই মুক্তা দুইটি ক্রয় করিলেন।

আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার সম্পর্কীয় হাদীছ সমূহ

(১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله من احق بحسن صحابتى قال امك قال ثم من قال امك ثم امك ثم اباك ثم ادناك فادناك -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত কে? নবীজী বলিলেন মা। দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বারের জিজ্ঞাসার জবাবেও নবীজী বলিলেন, মা। অতঃপর বলিলেন বাবা। অতঃপর পর্যায়ক্রমিকভাবে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন।

ফায়েদা ঃ এ হাদীছ হইতে কোন কোন ওলামা অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন যে, উত্তম ব্যবহার এবং অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মায়ের অধিকারের তিনটি অংশ রহিয়াছে আর পিতার রহিয়াছে একটি অংশ। কেননা নবীকরিম (ছঃ) তিনবার মায়ের কথা বলিয়া চতুর্থবার পিতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। একারণে ওলামাগণ বলিয়াছেন যে, সন্তানের জন্য

মা তিনটি কষ্ট সহ্য করেন। গর্ভধারণ, প্রসব এবং দুগ্ধপান। একারণে ফেকাবিদগণ বলিয়া থাকেন যে অনুগ্রহ এবং উত্তম ব্যবহার পাওয়ার ক্ষেত্রে পিতার চাইতে মাতার অগ্রাধিকার রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি দারিদ্রের কারণে পিতা মাতা উভয়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে সক্ষম না হয় তবে মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহার করিতে হইবে। অবশ্য সম্ভ্রম, আদব ও তাজিমের ক্ষেত্রে পিতার অধিকার অগ্রগন্য।

(মাজাহেরে হক)

ইহাও লক্ষ্যনীয় যে নারী হওয়ার কারণে মায়ের অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার পাওয়ার অধিক প্রয়োজন পিতামাতা উভয়ের পর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পর্যায়ক্রমিকভাবে উত্তম ব্যবহার লাভ করিবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিজের মায়ের সহিত উত্তম ব্যবহারের সূচনা করে, তারপর পিতার সাহিত তারপর বোনের সহিত তারপর ভাই-য়ের সহিত। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী এবং পরমুখাপেক্ষীদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে। তাহাদের কাহারো প্রয়োজন পূরণ না হইয়া থাকিবে।

(কানজ)

হজরত বাহাজ ইবনে হাকিম তাহার দাদার নিকট হইতে নকল করিয়াছেন যে, তিনি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট উল্লেখ করিয়াছেন নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হুজুর, আমি অনুগ্রহ এবং সদ্ব্যবহার কাহার সহিত করিব? নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত। তিনি পুনরায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নবীজী একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বারও অনুরূপ জবাব দেওয়ার পর চতুর্থবার নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত, তার পর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, একব্যক্তি নবীজীর দরবারে যাইয়া আবেদন জানাইল আমাকে পালন করার মত কোন আদেশ প্রদান করুন। নবীজী বলিলেন, আপন মায়ের সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর। দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার একই কথা বলার পর নবীজী বলিলেন, পিতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ কর।

(তুরুরে মনছুর)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি গুণ বৈশিষ্ট্য যাহার মধ্যে পাওয়া যাইবে, আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকাল তাহার জন্য সহজ করিয়া দিবেন। এবং তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। দুর্বলের প্রতি

অনুগ্রহ, পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা এবং অধীনস্থদের প্রতি অনুগ্রহ।
(মেশকাত)

ধনী ও দীর্ঘায়ু হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

(٣) عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له فى رزقه و ينسأ له فى اثره فليصل رحمه -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার পদচিহ্ন দীর্ঘায়িত করা হইবে সে যেন নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফায়েদা ঃ পদচিহ্ন দীর্ঘায়ীত করা অর্থাৎ হায়াত বৃদ্ধি হওয়া। যাহার বয়স অধিক হইবে সে-ই দীর্ঘদিন যাবত ভূপৃষ্ঠে পদচিহ্ন রাখিতে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি মরিয়া যাইবে তাহার পদচিহ্ন ভূপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারণ করা রহিয়াছে। পবিত্র কোরানে কয়েক জায়গায় বলা হইয়াছে যে প্রতিটি লোকের বয়সই নির্ধারিত ইহাতে এক মুহূর্তও এদিক সেদিক হইতে পারে না। একারণে কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে রেজেক বৃদ্ধির মতো বরকতপূর্ণ ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা ইহাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয়ুবৃদ্ধির ফলে অন্যরা যাহা দিনের পুরা অংশে করিতে অক্ষম তাহা সেই ব্যক্তি এক ঘন্টায় সম্পন্ন করিতে পারে। অন্য লোক যাহা এক মাসে করে সে তাহা এক দিনে করিতে পারে। কোন কোন ওলামা বয়োবৃদ্ধিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পুণ্যময় কীর্তি সমূহকে বলিয়াছেন কেন না যতদিন সে বাঁচিয়া থাকে ততদিন তাহার কীর্তিচিহ্ন অক্ষুন্ন থাকে কেহ কেহ লিখিয়াছেন বয়োবৃদ্ধির ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার মৃত্যুর পরও এ ধারা অব্যাহত থাকে। একারণেই মহান সত্যবাদি নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর পূর্ণতা বিধান তথা সত্যতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা সকল কাজে সক্ষম তিনি যাহা কিছু করিতে চান কোন উপকরণ ছাড়াই করিতে পারেন। অনেক সময় তাঁহার কুদরত দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইতে

হয়। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা থাকা সত্বেও এ পৃথিবীকে তিনি দারুল আসবাব হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রতিটি জিনিসের জন্যই তিনি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উপকরণ ও কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন। পেটের পীড়া ইত্যাদি অসুখ হইলে মানুষ চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে, হয়ত ঔষধের ফলে উপকার হইবে। ঔষধের উপকারের তাৎপর্য কি? ইহাতে আয়ু বৃদ্ধি পাইবে অথচ মৃত্যু অবধারিত ব্যাপার। ঔষধের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তাহা কমবেশী হইবে কেন? তবুও দেখা যায় যে ডাক্তারের তথা চিকিৎসকের কথায় আয়ু কম বৃদ্ধির আমল মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে অথচ উপরোক্ত হাদীছ এমন এক চিকিৎসকের কথা যাহার ভুল ভ্রান্তি প্রমাণিত হয় নাই। এমনিতে আমরা যাহাদিগকে চিকিৎসক হিসাবে স্বীকার করি তাহাদের ব্যবস্থাপত্রে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে।

একটি হাদীছে হজরত আলী (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করে আমি তাহার জন্য চারটি কথার দায়িত্ব গ্রহণ করি। যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের সহিত ভাল ব্যবহার করে তাহার বয়স বৃদ্ধি পায়, সম্মানীয় লোকেরা তাহাকে ভালোবাসে, তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে। (কানজ)

নবীকরিম (ছঃ) হজরত আবুবকরকে (রাঃ) বলিয়াছেন, তিনটি বিষয় সম্পূর্ণ সত্য। কেহ অত্যাচার করিলেও যে ব্যক্তি তাহা গোপন রাখে তাহার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, যে ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভিক্ষা করে তাহার ধন সম্পদ কমিয়া যায়, যে ব্যক্তি দান ও নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করার দরোজা উন্মুক্ত করে তাহার ধনসম্পদ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। (দুররে মনছুর)

ফকীহ আবুল লায়েছ (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েমের মধ্যে দশটি বস্তু প্রশংসনীয়। (১) যেহেতু ইহা আল্লাহর আদেশ একারণে ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয় (২) আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট করা হয়। নবীজী বলিয়াছেন, মোমেনকে সন্তুষ্ট করা হইতেছে সর্বোত্তম আমল। (৩) ইহাতে ফেরেশতারাও আনন্দিত হন। (৪) মুসলমানরা তাহার প্রশংসা করেন। (৫) তাহার ব্যাপারে অভিশপ্ত শয়তান

খুবই দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হইয়া পড়ে। (৬) ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় (৭) রেজেকে বরকত হয়। (৮) তাহার ইন্তেকালে তাহার কবরের আত্মীয়রা আনন্দিত হয় (৯) পারস্পরিক সম্পর্ক শক্তিশালী হয়। তুমি কাহারো প্রতি অনুগ্রহ করিলে তোমার প্রয়োজনের সময় সে তোমাকে সাহায্য করিবে। তোমার কষ্ট দেখিলে সে তোমার সাহায্য করার জন্য মানবিক তাগিদ অনুভব করিবে (১০) মৃত্যুর পর তুমি যাহাদের উপকার করিয়াছ তাহারা তোমাকে স্মরণ করিয়া দোয়া করিবে।

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন পরম করুণাময়ের আরশের ছায়ায় তিন শ্রেণীর মানুষ স্থান লাভ করিবে। (১) আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহারকারী, দুনিয়াতেও তাহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়, রেজেক বাড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহার কবরও প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (২) যেই নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের কারণে তাহাদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে পুনরায় আবদ্ধ না হয়। কেননা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রাখিয়া বিবাহ করিলে তাহাদের লালান পালনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। (৩) যে ব্যক্তি খাবার তৈরী করিয়া এতিম মিসকিনদেরকে দাওয়াত দেয়।

হজরত হাসান (রাঃ) নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দুইটি পদচারণা আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। যে ব্যক্তি ফরজ নামাজ আদায়ের জন্য পা বাড়ায় এবং যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়দের সহিত সাক্ষাতের জন্য পা বাড়ায়।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে যাহার দ্বারা স্থায়ীভাবে আল্লাহর দরবারে এমন পুন্য পাওয়া যায় যেমন নাকি উঁচু উঁচু পাহাড়। ইহা ছাড়া আল্লাহ তাহার রেজেক বাড়াইয়া দেন। তাহা হইতেছে অল্প হোক বা বেশী হোক আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখা। তৃতীয়ত আল্লাহর পথে জেহাদ করা। চতুর্থত সব সময় ওজুসহ থাকা। পঞ্চমত পিতামাতার আনুগত্য অব্যাহত রাখা। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে একটি আমলের সওয়াব

খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় তাহা হইল আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার।

কোন কোন লোক পাপী হইয়া থাকে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের কারণে তাহাদের ধন সম্পদে বরকত হয় এবং তাহাদের সম্মানেও বরকত হয়।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে নিয়ম মাফিক ছদকা আদায় করা এবং ন্যায় পথ অবলম্বন করা, পিতামাতার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করা এবং আত্মীয় স্বজনের প্রতি উত্তম ব্যবহার দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তিত করে। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হয় এবং কষ্টকর মৃত্যু হইতে সেই ব্যক্তি মুক্তি পায়।

বয়স এবং রেজেক বৃদ্ধির বহুসংখ্যক বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট। এদু'টি বিষয়ের সফলতার জন্য প্রতিটি মানুষই সচেষ্ট। পৃথিবীর যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টা এ দু'টি বিষয়কে ঘিরিয়াই আবর্তিত হইয়া থাকে। এ দু'টি বিষয়ে সফলতা লাভের জন্য নবী করিম (ছঃ) খুবই সহজ পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়াছেন। আত্মীয় স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে উভয় প্রত্যাশাই পূর্ণ হইবে। নবী করিম (ছঃ) এর বাণীর প্রতি যাহাদের বিশ্বাস রহিয়াছে তাহারা যদি রেজেক ও আয়ুবৃদ্ধির জন্য আগ্রহী হইয়া থাকেন তবে এই বাণীর প্রতি আমল করিতে থাকুন। ইহাতে বয়োবৃদ্ধি হওয়া এবং রেজেক বৃদ্ধি নিশ্চিত হইবে।

মৃত্যুর পরেও পিতার সহিত সদ্ব্যবহারের তরীকা

(৩) عن ابن عمر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولى -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, পিতার সহিত সদ্ব্যবহারের উন্নত পর্যায় এই যে, তাহার চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার সহিত সম্পর্কিত লোকদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

ফায়েদা ঃ চলিয়া যাওয়া দ্বারা সাময়িকভাবে চলিয়া যাওয়া ও

হইতে পারে আবার চিরতরে চলিয়া যাওয়াও হইতে পারে। অর্থাৎ মরিয়া যাওয়া। মৃত্যুর পর পিতার সহিত সম্পর্ক তাদের সহিত সদ্ব্যবহারের গুরুত্ব এই কারণেও বেশী যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় তাহার বন্ধুবান্ধবের সহিত সদ্ব্যবহার হয়তো কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সদ্ব্যবহারের সেইরূপ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে পিতার প্রতি সম্মান ও মর্যাদাই প্রকাশ পায়। একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মক্কার পথ দিয়া যাইতেছিলেন, পথে একজন বেদুইনকে পথ চলিতে দেখিয়া ইবনে ওমর (রাঃ) নিজের সওয়ারী ও মাথার পাগড়ী তাহাকে প্রদান করিলেন। ইবনে দীনার (রাঃ) বলিলেন, মহাত্মন, এ ব্যক্তি তো ইহার চাইতে কম উপহারেও সন্তুষ্ট হইত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন তাহার পিতা ছিল আমার পিতার অন্যতম বন্ধু, আমি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট শুনিয়াছি পিতার বন্ধুদের সহিত অনুগ্রহ প্রদর্শন নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের মধ্যে উত্তম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি মদিনায় গমন করিলে ইবনে ওমর (রাঃ) আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জানো আমি কেন আসিয়াছি? আমি নবীকরিমকে (ছঃ) বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিজের পিতার সহিত কবরে সুসম্পর্ক স্থাপন করিতে চায় সে যেন পিতার বন্ধুদের সহিত সদ্ব্যবহার করে। আমার পিতা হজরত ওমরের (রাঃ) সহিত তোমার পিতার বন্ধুত্ব ছিল একারণে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। (তারগীব)

বন্ধুর সন্তানও বন্ধু হইয়া থাকে। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হজরত আবু সাইয়েদ মালেক ইবনে রাবিয়া (রাঃ) বলেন, আমরা নবীজীর নিকট উপস্থিত ছিলাম, বনু সালমা গোত্রের একব্যক্তি নবীজীর নিকট আসিয়া বলেন, হে আল্লাহর রাছুল আমার পিতার মৃত্যুর পর তাহার সহিত সদ্ব্যবহারের কোন পথ আছে কি! নবীজী বলিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তাহাদের জন্য দোয়া করা তাহাদের মাগফেরাতের দোয়া করা কাহারো সাথে কৃত তাহাদের অঙ্গীকার পালন, তাহার আত্মীয়স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং তাহাদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্য এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ রহিয়াছে যে

লোকটি বলিল, হে আল্লাহর রাসুল ইহা কতো উত্তম এবং উপাদেয় ব্যবস্থা। নবীজী বলিলেন তুমি ইহা পালন করিও। (তারগীব)

মাতাপিতার নাফরমান ছেলে কিভাবে বাধ্যগত হইতে পারে

(৩) عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد ليموت والداه اواحد هما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعولهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا - مشكواة

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ে অথবা তাহাদের মধ্যে কোন একজন মারা যায় এবং সে ব্যক্তি তাহার নাফরমানি করিয়াছিল তবে সব সময় যেন তাহার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে। ইহা ছাড়া যদি তাহাদের জন্য আরো দোয়া করিতে থাকে তবে আল্লাহ পাক তাহাকে অনুগতদের মধ্যে শামীল করিবেন।

ফায়েদা ঃ পিতামাতার জীবদ্দশায় তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করিলেও তাহাদের মৃত্যুর পর পিতামাতার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আপাতদৃষ্টিতে সেই সময় অনুশোচনা করিয়া কোন ফল হয় না। আল্লাহ তাআলা নিজের অনুগ্রহের দ্বারা সেই ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পর পিতামাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদের জন্য ছওয়াব রেছানি করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দান খয়রাত করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে সন্তান কর্তৃক পিতামাতার জীবদ্দশায় দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার ক্ষতি-পূরণ হইবে এবং অবাধ্য শ্রেণী হইতে সেই অনুতপ্ত সন্তান অনু-গতের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইবে। ইহা আল্লাহর এক অপার মেহেরবাণী সময় চলিয়া যাওয়ার পরও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাখিয়া দিয়াছেন। এই ধরনের সুযোগ গ্রহণে গাফলতি করিলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হইতে পারে? পিতামাতার সন্তুষ্টি সব সময় অর্জন করা খুব কম লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থাকিয়াই যায়। যদি তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের প্রতি পুণ্য বখশাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে তাহা কতই না উত্তম

একটি হাদিছে রহিয়াছে যে কেহ পিতামাতার নামে হজ্ব করিলে সে হজ্ব তাহাদের জন্য বদল হজ্ব হইতে পারে, তাহাদের আত্মাকে আকাশে সেই সুসংবাদ জানাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তি আল্লাহর দরবারে অনুগত বান্দাদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া যায় যদিও ইতিপূর্বে সে নাফরমানদের তালিকাভুক্ত থাকে। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে ব্যক্তি পিতামাতার কাহারো নামে একবার হজ্ব পালন করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে একটি হজ্ব লেখা হয় এবং হজ্ব পালনকারীর নামে নয়বার হজ্ব পালনের সওয়াব লেখা হয়। (রহমতল মোহ্দাত)

আল্লামা আইনী শরহে বোখারীতে একটি হাদীছ নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি একবার নিম্নোক্ত দোয়া পড়িবে এবং পড়ার পর সেই দোয়ার সওয়াব পিতামাতাকে পৌছানোর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিবে সে পিতামাতার প্রতি আরোপিত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিল। দোয়াটি এই :

الحمد لله رب العلمين رب السموت رب الارض رب العلمين و له الكبرياء فى السموت والارض وهو العزيز الحكيم لله الحمد رب السموت والارض وهو العزيز الحكيم هو الملك رب السموت و رب الارض و رب العلمين و له النور فى السموت و الارض و هو العزيز الحكيم -

অন্য একটি হাদীছে রহিয়াছে কেহ যদি নফল স্বরূপ কোন ছদকা দিয়া তাহা পিতামাতাকে বখশাইয়া দেয়, যদি সে ব্যক্তি মুসলমান হইয়া থাকে তবে সে সওয়াব তাহাকে পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে ছদকা প্রদানকারীর সওয়াব কম হইবে না।

এ হাদীছ হইতে বোঝা যায় যে পিতামাতার জন্য আলাদা কিছু করিবারও দরকার হয় না, যাহা কিছু খরচ করা হয় অথবা অন্যভাবে পুণ্য করা হয় তাহার সওয়াব পিতামাতাকে বখশাইয়া দিলেই চলে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, সেই পাক জাতের কছম যিনি নবীয়ে করীমকে (ছঃ) সত্যবাণী সহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা

আল্লাহর কালাম, যে ব্যক্তি তোমার পিতার সাহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক কায়েম করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিও না যদি কর তবে নূর চলিয়া যাইবে।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার বা তাহাদের মধ্যেকার একজনের কবর প্রতি জুমার দিনে জেয়ারত করে তাহাকে মার্জনা করা হইবে এবং অনুগতদের তালিকা ভুক্ত করা হইবে। আওজায়ী (রহঃ) বলেনঃ আমি শুনিয়াছি যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাহাদের নাফরমানী করে অতঃপর তাহাদের মৃত্যুর পর দোয়া প্রার্থনা করে, তাহাদের জিম্মায় ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে এবং তাহাদিগকে মন্দ না বলে তবে সে অনুগতদের তালিকা ভুক্ত হইবে। আর যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় পিতামাতার অনুগত থাকা সত্বেও মৃত্যুর পর পিতামাতার দুর্নাম করে তাহাদের ঋণ থাকিলে সে ঋণ পরিশোধ করে না। তাহাদের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা চায় না সে ব্যক্তি নাফরমানদের তালিকাভুক্ত হইয়া যায়। (দুররে মনছুর)

(৮) عن سراقة بن مالك (رض) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على افضل الصدقة ابنتك مردودة اليك ليس لها كاسب غيرك -

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) একবার বলিলেন আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম ছদকার কথা বলিয়া দিব? তোমার মেয়ে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার তুমি ব্যতীত অন্য যদি কোন উপার্জনক্ষম না থাকে তবে তাহার জন্য তোমার ব্যয়িত অর্থ সর্বোত্তম ছদকা বলিয়া গণ্য হইবে।

ফায়েদা ঃ ফিরিয়া আসার অর্থ হইতেছে, নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ার পর স্বামীর যদি মৃত্যু হয় বা স্বামী তাহাকে তালাক দেয় অথবা অন্য কোন প্রকার অঘটন ঘটে, যে কারণে মেয়ে পিতার সংসারে ফিরিয়া আসে তবে সেই ঘরের দায়িত্ব পিতাকেই পালন করিতে হয়। সেই মেয়ের তত্ত্বাবধান এবং তাহার ব্যয় নির্বাহ করা উত্তম ছদকার অন্তর্ভুক্ত। ইহা উত্তম এজন্যেই হইবে যেহেতু ইহা ছদকা।

দ্বিতীয়ত বিপদগ্রস্থের প্রতি সাহায্য। তৃতীয়ত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হইতেছে, পঞ্চমত দুশ্চিন্তা গ্রস্থের দুশ্চিন্তা লাঘব হইবে। প্রাথমিক জীবনে সন্তান পিতামাতার সংসারে থাকা আনন্দের ব্যাপার হইয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর সংসারে চলিয়া যাওয়ার পর পুনরায় পিতার সংসারে ফিরিয়া আসা গভীর বেদনা ও দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থকে সাহায্য করে তাহার জন্য ক্ষমাশীলতার ৭৩ দরজা লেখা হয়। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে তাহার যাবতীয় কার্যকলাপের সংস্কার ও সংশোধন হইয়া থাকে, এবং ৭২ দরজা তাহার জন্য উন্নতির কারণ হইবে। এ বিষয়ে বহু সংখ্যক বর্ণনা প্রথম পরিচ্ছেদের ২৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উম্মুল মোমেনীন হজরত সালমা (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রথম স্বামী আবু সালমার যে সন্তান আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য খরচ করিলে কি আমার সওয়াব হইবে? সেতো আমারই সন্তান। নবীজী বলিলেন, তাহার জন্য খরচ কর, তুমি ইহার সওয়াব পাইবে। (মেশকাত)

সন্তানের প্রতি স্নেহ ভালবাসার কারণেই তাহার প্রয়োজনে আগাইয়া যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই পিতামাতার জন্য প্রিয়তর বিষয় হিসাবে পরিগণিত। একবার নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট তাঁহার উভয় দৌহিত্র হাসান হোসায়েন (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। নবীজী তাহাদের আদর করিলেন। তামিম গোত্রের সর্দার আমর ইবনে হাবেছ (রাঃ) সেখানে ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার সন্তান সংখ্যা দশ, আমি তাহাদের কাউকে কখনো আদর সোহাগ করি নাই। নবীকরিম (ছঃ) তাঁহার প্রতি তীর্যক দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার প্রতি দয়া করা হয় না। অন্য এক হাদীছে, এক বেদুইন নবীজীকে বলিল, আপনারা সন্তানকে আদর করেন আমিতো করি না। নবীজী বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার হৃদয় হইতে দয়ার বৈশিষ্ট্য বাহির করিয়া দিয়াছেন আমার কি করার আছে।

(তারগীব)

সন্তানের পিতা হওয়া ছাড়াও তাহার বিপদে সহায়ক হওয়ার জন্য আলাদা ছওয়াব রহিয়াছে।

(৭) عن سليمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدقة على المسكين صدقة و هى على ذى الرحم ثنتان صدقة و صلة۔

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, গরীবের প্রতি ছদকা করা শুধুই ছদকা এবং আত্মীয়স্বজনের প্রতি ছদকা করা ছদকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন—এ উভয় ছওয়াব রহিয়াছে।

ফায়েদা ঃ আত্মীয়স্বজন এবং প্রতিবেশীদের সদকা করা অর্থাৎ দান খয়রাত করা সাধারণ গরীব দুঃখীকে দান খয়রাত করার চাইতে উত্তম। নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হইতে বিভিন্ন হাদীছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন একটি স্বর্ণমুদ্রা আল্লাহর পথে দান করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা গোলাম আজাদের জন্য খরচ করা, একটি স্বর্ণমুদ্রা কোন ভিক্ষুককে দেয়া, একটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করা—ইহার মধ্যে শেষোক্তটি উত্তম (তবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাহা খরচ করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রয়োজন রহিয়াছে কিনা তাহাও দেখিতে হইবে)। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে হযরত মায়মুনা (রাঃ) এক দাসীকে মুক্তি দিলেন, নবীকরীম (ছঃ) ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, উহাকে যদি তোমার মামাদেরকে দান করিতে তবে বেশী ছাওয়াব হইত।

একবার নবী করিম (ছঃ) নারীদের বিশেষভাবে দান খয়রাত করার তাগিদ দেন। বিশিষ্ট সাহাবী ও ফকীহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত জয়নব(রাঃ)স্বামীকে বলিলেন, নবীকরিম(ছঃ) আজ আমাদেরকে দান খয়রাত করার আদেশ দিয়াছেন আপনার আর্থিক অবস্থা তো ভাল নয়, নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন আমার অর্থ আপনাকে দান করিলে হইবে কিনা। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি নিজেই নবীজীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কর। হজরত যয়নব (রাঃ) নবীজীর নিকট গিয়া দেখিলেন আরো একজন

মহিলা একই মাছআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কিন্তু নবীজীর বুজুর্গীর কারণে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছেন না। এমন সময় হজরত বেলাল (রাঃ) আসিলে উভয় মহিলা তাঁহাকে বলিলেন আপনি নবীজীকে জিজ্ঞাসা করুন যে দু'জন মহিলা জানিতে চাহিতেছেন যদি তাহারা স্বামীকে এবং প্রথম স্বামীর এতিম সন্তানের জন্য দান করেন তবে তাহা বৈধ হইবে কিনা। নবীজীকে উহা জানাইলে তিনি মহিলা দু'জনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন একজন অমুক আনসার মহিলার আর অন্যজন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী জয়নব (রাঃ)। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, হঁ্যা তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব, ছদকার সওয়াব এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ব পালনের ছওয়াব।

(মেশকাত)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের কোন ভাইকে এক দিরহাম দিয়া সাহায্য করা অন্য কারো জন্য বিশ দিরহাম খরচের চেয়ে অধিক পছন্দ করি। নিজের কোন ভাইয়ের জন্য বিশ দিরহাম খরচ করা একটি দাসকে মুক্ত করে দেয়ার চাইতে অধিক পছন্দ করি।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে কোন লোক যখন অভাবগ্রস্ত হয়, তখন সে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, নিজের অভাব মিটাইবার পর পর্যায় ক্রমে অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের জন্য খরচ করিবে।

(কানজ)

ইহা কানজুল ওম্মালসহ বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বোঝা যায় নিজের এবং নিজের আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনের পর অন্যকে দান করিতে হইবে। তবে যদি নিজে আল্লাহর প্রতি ভরসা বিশ্বাস ও ধৈর্য ধারনে সক্ষম হয় তবে অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। এ ব্যাপারে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

তাছবীহে ফাতেমীর ছওয়াব

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে আমার এবং নবীজীর সবচেয়ে আদরের দুলালী ফাতেমার (রাঃ) কাহিনী শোনাব। তিনি আমার গৃহে থাকিতেন, নিজে চাক্কি পিষিতেন, ইহাতে হাতে ফোস্কা পড়িয়া গিয়াছিল, নিজে পানি তুলিতেন, ইহাতে গায়ে পানিপাত্র তোলাও রশির দাগ পড়িয়া গিয়াছিল, ঘর ঝাড়ু দেয়া ইত্যাদি নিজের হাতে করিতেন, ইহাতে পোষাক অপরিস্কার থাকিত, নিজে রান্না করিতেন, ধোঁয়ায় ও অন্যান্য কারণে পোষাক কালো হইয়া যাইত, মোট-কথা তিনি সকল প্রকার কষ্টকর কাজ করিতেন। একবার নবীজীর নিকট দাসদাসী প্রভৃতি আসিলে আমি বলিলাম, তুমিও যাইয়া একটি দাসীর জন্য আবেদন কর। ইহাতে কষ্ট কম হইবে। তিনি নবীজীর নিকটে গেলেন, সেখানে লোকজন থাকায় লজ্জায় বলিতে পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। অন্য এক হাদীছে উল্লেখ আছে যে হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট বলিয়া আসেন। পরদিন নবীজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ফাতেমা, তুমি গতকাল কি বলিতে গিয়াছিলে? ফাতেমা লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হজরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি তাহার যাবতীয় কষ্টের কথা বলিয়া উল্লেখ করিলাম যে, আমিই তাহাকে একটি দাসী চাহিবার জন্য পাঠাইয়াছি। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, আমি তোমাকে দাসী পাওয়ার চাইতে উৎকৃষ্ট একটা বিষয় বলিয়া দিতেছি। ঘুমাইবার জন্য শয়ন করিলে সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পাঠ করিবে ইহা দাসী পাওয়ার চাইতে উত্তম।

(আবু দাউদ)

অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর এ বাণীও নকল করা হইয়াছে যে, আহলে ছোফ্ফার পেট ক্ষুধায় কাতর থাকিতেছে এমতাবস্থায় আমি দাস দাসীদের বিক্রি করিয়া তাহাদের মূল্য উহাদের জন্য ব্যয় করিব।

(ফতহুল বারী)

(৭) عن اسماء بنت ابى بكر (رض) قالت قدمت علی امی و هو مشركة فی عهد قريش فقلت يا رسول

الله ان امى قدمت على وهى راغبة افا صلها قال نعم صليها -

অর্থাৎ হজরত আসমা (রাঃ) বলেন, যেই সময় নবীকরিম (ছঃ) এর সহিত কোরাইশদের চুক্তি হইয়াছিল সেই সময় আমার কাফের মা (মক্কা হইতে মদীনায়) আসিলেন। আমি নবীজীকে বলিলাম, আমার মা আমার প্রত্যাশী হইয়া আসিয়াছেন। তাহাকে কি সাহায্য করিব ? নবীজী বলিলেন, হ্যাঁ সাহায্য কর।

ফায়েদা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের পক্ষ থেকে মুসলমানের উপর যেসব অত্যাচার করা হইয়াছে সেসব অবর্ণনীয়। ইতিহাস গ্রন্থাবলী সেই সব বর্ণনায় পরিপূর্ণ। এমনকি বাধ্য হইয়া মুসলানদের মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিতে হয়। মদীনায় পৌঁছার পরও মুশরিকদের পক্ষ হইতে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন অব্যাহত থাকে। নবীকরিম (ছঃ) সাহাবাদের একটি জামাতের সহিত শুধু ওমরাহ করিতে গিয়াছিলেন, মক্কার বাহির হইতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য করা হইল। কাফেরগণ তাহাদের মক্কায় প্রবেশ করিতে দিল না। তবে উভয় পক্ষে সেখানে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সন্ধিতে পরস্পর কয়েকটি শর্তে কয়েক বছর যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। হজরত আসমা (রাঃ) এই হাদীছে সেই চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কোরায়েশদের সহিত যখন চুক্তি হইতেছিল সেই চুক্তির সময়ে হজরত আবু বকরের (রাঃ) অন্যতমা স্ত্রী যিনি আসমার (রাঃ) মা ছিলেন তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই—তিনি কিছু সাহায্য সহানুভূতির আশায় নিজ কন্যা আসমার (রাঃ) কাছে গমন করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন পৌত্তলিক একারণে হজরত আসমার (রাঃ) মনে সন্দেহ দেখা দিল তাহাকে সাহায্য করিবেন নাকি করিবেন না বিষয়টি তিনি নবীকরিমকে (ছঃ) জিজ্ঞাসা করেন। নবীজী আসমাকে (রাঃ) তার মায়ের সাহায্যের আদেশ দেন। এ ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মুসলমান আত্মীয় স্বজনের অনুরূপ কাফের আত্মীয়দেরও আর্থিক সাহায্য করা প্রয়োজন।

একটি বর্ণনায় রহিয়াছে পবিত্র কোরআনের ছুরা মোমতাহেনার

দ্বিতীয় রুকুতে একটি আয়াত এ ঘটনা উপলক্ষে নাজিল হয়। উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, "আল্লাহ পাক নিষেধ করেন না তোমাদেরকে, যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই, তোমাদেরকে আপন বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে নাই তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করিতে। কেননা আল্লাহ তায়ালা সুবিচারকগণকে ভালবাসেন।"

হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন এখানে সেইসব কাফেরের কথা বলা হইয়াছে যাহারা জিম্মি, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহাকে ন্যায়পরায়ন বলা হইয়াছে। কাজেই ইনসাফ দ্বারা বিশেষ ইনসাফ বুঝানো হইয়াছে। অন্যথা স্বাভাবিক ইনসাফ বা ন্যায়পরায়নতামূলক ব্যবহার তো প্রত্যেক কাফের এমনকি জীবজন্তুর সহিতও ওয়াজিব। (বয়ানুল কোরান)।

হজরত আসমার (রাঃ) মা কায়সা অথবা কোতায়লা বিনতে আবদুল ওজ্জা যেহেতু মুসলমান হয় নাই একারণে হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহাকে তালাক দেন। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি আপন কান্যার জন্য কিছু পনীর ইত্যাদি লইয়া মদীনা গিয়াছিলেন। হজরত আসমা (রাঃ) তাহাকে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে দেন নাই এবং বৈপিতৃয় ভগ্নি হজরত আয়েশার (রাঃ) নিকট লোক পাঠাইলেন এসম্পর্কে নবীজীর মতামত জানিয়া আসার জন্য। নবীজী হজরত আসমাকে (রাঃ) তাহার মায়ের সহিত সদ্ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। সেই সময় কোরআনের এ আয়াত নাজিল হইল। ঈমানের দৃঢ়তা ও আল্লাহ এবং রাছুলের প্রতি তাঁহার ভালোবাসা কত গভীর ছিল যে সুদূর মক্কা হইতে কন্যার সহিত দেখা করিতে আসা সত্ত্বেও নবীজীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত হজরত আসমা (রাঃ) কোন প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

বিভিন্ন বর্ণনায় এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। অমুসলমানদেরকে দান খয়রাত করা সাহাবাগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে পছন্দ করিতেন না। আল্লাহ তায়ালা তখন সূরা বাকারার ৩৭ রুকুর এ আয়াতটি নাযিল করেন: উহাদের ঠিক পথে লইয়া আসা তোমার দায়িত্ব নহে এবং আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা ঠিক পথে লইয়া আসেন, বস্তুত তোমরা

যাহা কিছু ব্যয় কর তাহা তোমাদের নিজেদেরই জন্য।

অর্থাৎ তোমরা ছদকা ইত্যাদি যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাক উহাতে কাফের হোক বা মুসলমান সকল পরমুখাপেক্ষীই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন মুসলমানেরা নিজেদের কাফের আত্মীয় স্বজনকে সাহায্য করা পছন্দ করিতেন না তাহারা চাহিতেন যে উহারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করুক। এ ব্যাপারে তাহারা নবী করিম (ছঃ) এর নিকট অনুযোগ করিলেন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করিলেন। এ প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বর্ণনা রহিয়াছে।

ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) লিখিয়াছেন একজন অগ্নিপূজক হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কাছে গিয়া তাঁহার মেহমান হওয়ার আবেদন করিলে তিনি বলিলেন তুমি মুসলমান হইলে আমি তোমার মেহমানদারী করিতে পারি। অগ্নিপূজক চলিয়া গেল। আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করিলেন যে ইব্রাহীম, তুমি এক বেলা অন্ন অগ্নিপূজককে দিতে পারিলে না অথচ আমি তাহাকে ৭০ বছর যাবত তাহার কুফুরী সত্ত্বেও অন্ন দান করিতেছি। এক বেলা অন্ন দিলে কি এমন অসুবিধা হইত। ওহী নাযিলের পর ইব্রাহিম (আঃ) উক্ত অগ্নি পূজকের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন, এবং তাহাকে আহার করাইলেন। ইব্রাহিম (আঃ) ওহীর ঘটনা বর্ণনা করিলে লোকটি অভিভূত হইয়া মুসলমান হইয়া গেল। (এহইয়া)

একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে, তিনটি জিনিস এমন রহিয়াছে, যে ব্যাপারে কাহারো কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। (১) পিতামাতা মুসলমান হোক বা কাফের হোক তাহাদের সহিত অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করিতে হইবে। (২) মুসলমান বা কাফের যাহার সাথেই ওয়াদা করা হোক না কেন সেই ওয়াদা পালন করিতে হইবে। মুসলমানের হোক বা কাফেরের হোক যাহারই আমানত রাখা হোক না কেন তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। (জামেউস সগীর)

মোহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া, আতা, (রাঃ) এবং কাদাতা তিনজন হইতে বর্ণিত আছে যে ছুরা আহকাফের এই আয়াতে—'কিন্তু যাহা তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি উপকার কর"—মুসলমাদেরকে ইহুদী

নাসারা এবং অমুসলমান আত্মীয়জনের জন্য ওসিয়তের কথা বলা হইয়াছে।

সমস্ত মাখলুক আল্লাহর পরিবারভুক্ত

(৮) عن انس (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهِ - مشكوة -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার যে ব্যক্তি তাঁহার পরিবারের সহিত সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ তাহাকে ভালবাসেন।

ফায়েদা ঃ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কাফের মুসলমান জীবজন্তু পশু-পাখী সবই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। প্রতিটি সৃষ্টির সহিত সদ্ব্যবহার করা আল্লাহর নির্দেশ এবং ইহা আল্লাহর পছন্দনীয়। প্রথম পরিচ্ছেদের ১০নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে,একজন ফাহেশা নারীকে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে মার্জনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৮নং হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে যে একজন নারীকে এ কারণেই শাস্তি দেওয়া হইয়াছে যে সে একটি বিড়াল পালন করিত কিন্তু তাহাকে খাইতে দেয় নাই। জীবজন্তুর ব্যাপারে এইরূপ অবস্থা হইলে মানুষ তো সৃষ্টির সেরা জীব তাহাদের সহিত অনুগ্রহ এবং সদ্ব্যবহারের বিনিময় কত বেশী হইবে।

নবীকরিম (ছঃ) বলেন, ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের প্রতি তোমরা দয়া কর আকাশে যিনি থাকেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করিবেন আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি দয়া করেন না, যে অন্যের প্রতি দয়া করে না। অন্য এক হাদীছে নবীজী বলেন যেই ব্যক্তির অন্তর হইতে দয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় সে ব্যক্তি হতভাগ্য। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) এর সারাটি জীবন সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা এবং তাহার অনুসরণ করা উম্মতের

জন্য অবশ্য কর্তব্য আল্লাহ তায়ালা কোরানে বলিয়াছেন, হে নবী আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যাহারা নবীজীর প্রতি ঈমাম আনয়ন করে তাহাদের জন্য তাঁহার সত্তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য রহমত স্বরূপ, কিন্তু যাহারা ঈমান আনয়ন করে না তাহাদের জন্যও তিনি রহমত স্বরূপ, কেননা তাহারা পূর্ববর্তী উম্মতদের মত কুফুরীর কারণে ইহলৌকিক জীবনের আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ফলে তাহারা ভূপৃষ্ঠে ধ্বসিয়া যাওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষিত হইয়া ও হত্যার আজাব হইতে রক্ষা পাইতেছে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, কতিপয় লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট আবেদন করিলেন যে কোরায়েশগণ মুসলমানদের অনেক কষ্ট দিয়াছে অনেক অত্যাচার করিয়াছে আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। নবীজী বলিলেন, আমি বদদোয়া করারজন্য প্রেরিত হই নাই আমি মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি! আরো বহু সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয় উল্লেখিত রহিয়াছে। (দুররে মনছুর)

নবীকরিম (ছঃ) এর তায়েফ সফরের হৃদয় বিদারক ঘটনা হেকায়েতে ছাহাবায় প্রথম দিকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হতভাগ্য তায়েফবাসীরা নবীজীকে এতকষ্ট দিয়াছে যে তাঁহার পবিত্র দেহ হইতে রক্ত ধারা জারি হইয়াছিল। ইহাতে পাহাড় সমুহের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা নবীজীর কাছে আবেদন করিলেন যে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে দুইদিক হইতে পাহাড় একত্রিত করিয়া উহাদিগকে পিষ্ট করিয়া দিব। নবীজী বলিলেন, আমি আশা করি ইহারা মুসলমান না হইলেও আল্লাহ তায়ালা উহাদের বংশধরদের কাউকে হয়তো তাঁহার নাম লওয়ার তওফীক দিবেন।

ওহুদের যুদ্ধে নবীকরিন (ছঃ) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়। কাফেরদের প্রতি বদদোয়ার আবেদন জানানো হইলে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা আমার কওমকে হেদায়েত করুন, তাহারা বুঝে না। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল। আপনিও

যদি হজরত নুহের (আঃ) মত বদদোয়া করিতেন তাহা হইলে আমরা সবাই ধ্বংস হইতাম। নবীজীকে সকল প্রকার কষ্ট দেওয়া সত্বেও তিনি সব সময় মোনাজাত করিতেন, হে আল্লাহ আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দাও, কেননা তাহারা জানে না।

কাজী আয়াজ (রহঃ) বলেন এ অবস্থাকে গভীরভাবে দেখা দরকার নবীজীর কতো উন্নত চরিত্র ছিল, কতো করুণাপ্রবন অন্তর ছিল যে সকল প্রকার অত্যাচার নির্যাতন সত্বেও তিনি স্বজাতির পথভ্রষ্ট লোক-দের জন্য কখনো মাগফেরাতের কখনো হেদায়েতের দোয়া করিতেন। গাওয়াছ ইবনে হারেসের ঘটনা বিখ্যাত যে এক সফরে নবী করিম (ছঃ) একাকী ঘুমাইয়াছিলেন এমন সময় সে তলোয়ার হাতে নবীজীর শিয়রে পৌছিল। হুঙ্কার দিয়া সে বলিল, এবার তোমাকে কে রক্ষা করিবে? নবীজীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ জাল্লা-শানুহু, একথা বলার সাথে সাথে তাহার হাত কাঁপিতে কাঁপিতে তলোয়ার পড়িয়া গেল। নবীজী তলোয়ার হাতে লইয়া বলিলেন, বল, তোমাকে এবার কে রক্ষা করিবে? সে বলিল আপনি। নবীজী তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

ইহুদী নারী কর্তৃক নবীজীকে বিষ প্রদানের ঘটনাতো সুবিখ্যাত। সেই নারী স্বীকারও করিয়াছিল কিন্তু নবীজী প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। লবিদ ইবনে আসেম নবীজীর উপর যাদু করিয়াছিল নবীজী তাহা জানিতেও পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা ও পছন্দ করেন নাই। এই ধরণের দুই চারটি ঘটনা নহে শত্রুদের প্রতি করুণা প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা নবীকরিম (ছঃ) এর জীবনে রহিয়াছে। (শামা)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পরস্পরের সহিত করুনা পূর্ণ ব্যবহার না করা পর্যন্ত তোমরা মোমেন হইতে পারিবে না। সাহাবাগণ বলি-লেন হে আল্লাহর রাসূল, আমরা সবাইতো করুণা প্রদর্শন করিয়াই থাকি। নবীজী বলিলেন, নিজের সাথে যাহা করা হয় তাহা করুণা নহে বরং করুণা হইল সার্বজনীন। নবীকরিম (ছঃ) একটি গৃহে গমন করিলেন, সেখানে কয়েকজন কোরায়েশ উপস্থিত ছিলেন। নবীজী

বলিলেন, লালন ক্ষমতা এবং সালতানাতের ধারা কোরায়েশদের মধ্যেই থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত মানুষ তাহাদের কাছে করুণার আবেদন করিয়া বিমুখ হইবে না, আদেশ প্রদানে ন্যায় পরায়নতা অবলম্বন করিবে, কোন জিনিস বন্টন করার সময় সুবিচার করিবে। যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে না তাহার প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

একবার নবীজী একটি গৃহে গমন করিলেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কয়েকজন লোক সেখানে হাজির ছিলেন, নবীজীকে দেখিয়া সবাই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন নবীজী উপবেশন করিবেন। নবীজী দরজায় রহিলেন এবং দরজার দু'পাশে হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমাদের উপর আমার অনেক হক রহিয়াছে? রাজ্য পরিচালনার ভার কোরায়েশদের উপর থাকিবে যতোদিন পর্যন্ত তাহারা তিনটি বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করে। (১) যে ব্যক্তি দয়ার আবেদন জানায় তাহাকে আবেদন অনুযায়ী দয়া করিবে। (২) বিচার করিলে সুবিচার করিবে (৩) কাহারো সহিত অঙ্গীকার করিলে তাহা পালন করিবে। যাহারা এইসব পালন করিবে না তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত ফেরেশতাদের লানত এবং সকল মানুষের লানত।

নবীকরীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি একটি চড়ুইকেও অন্যায় ভাবে জবাই করিবে কেয়ামতের দিন তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। সাহাবাগণ আরজ করিলেন, এ ব্যাপারে ন্যায় কি? নবীজী বলিলেন জবাই করিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে, এমন নহে যে জবাই করিয়া ফেলিয়া দিবে। অনেক হাদীছে অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজের অনুরূপ পানাহার করানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। নিজের মতই পোশাক পরিধান করাইতে বলা হইয়াছে। যাহার সাথে বনিবনা হয় না তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিবে কিন্তু নির্যাতন করিতে পারিবে না।

(তারগীব)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের কোন ভৃত্য তোমাদের জন্য কোন জিনিস রান্না করিয়া আনিলে তাহাকে নিজের সহিত

আহার করাইবে। এই রান্নায় সে গরম ও ধোঁয়ার কষ্ট সহ্য করিয়াছে। যদি তাহাকে পুরাপুরি খাওয়ানোর মত পরিমিত পরিমাণ না থাকে তবে অল্প কিছু হইলেও দিয়ো। (মেশকাত)

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, অধিনস্থদের সহিত সদ্ব্যবহার করা উৎকৃষ্ট কাজ আর তাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করা দুর্ভাগ্যজনক। (মেশকাত)

মোটকথা নবীকরিম (ছঃ) সকল শ্রেণীর সৃষ্টির সহিত করুণাপূর্ণ ব্যবহারের এবং নানাভাবে তাহাদের সহিত সহৃদয়তামূলক আচরণের জন্য বিশেষ ভাবে তাগিদ দিয়াছেন।

(৭) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهٗ وَصَلَهَا ـ

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি নিকট আত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপনকারী নহে যে নাকি সমতা ভিত্তিক কর্মকলাপ করে বরং সম্পর্ক স্থাপনকারী সেই ব্যক্তি যে নাকি অন্যের সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সম্পর্ক স্থাপন করে।

ফায়েদা ঃ ইহা অতিশয় স্পষ্ট ব্যাপার যখন আপনি সকল বিষয়ে অন্যের অনুকরণ করিবেন তবে কি আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী বলা যাইবে? অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গেও ইহা হইতে পারে, আপনার প্রতি যে লোক অনুগ্রহ করিবে আপনিও তাহার সহিত অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবস্থা করিবেন। করিতে বাধ্য থাকিবেন বলা যায়। পক্ষান্তরে যদি কেহ অবহেলা করিয়া তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তবে সেই ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করাটাই নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক স্থাপন বলিয়া অভিহিত করা যায়। অন্য পক্ষের আচরণ কিরূপ তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, বরং সব সময় নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। এমন যেন না হয় যে অন্য পক্ষের কোন হক্ নিজের উপর থাকিয়া যায়, যে জন্য কেয়ামতের দিন জবাবদিহি করিতে হয়। অন্যপক্ষের নিকট হইতে আসানুরূপ সদ্ব্যবহার না পাইলেও দুঃখিত হওয়ার কিছুই নাই বরং এ জন্য আনন্দিত

হইতে হইবে যে, পরকালে যে পুরস্কার পাওয়া যাইবে তাহা এখানের পুরস্কারের চাইতে অনেক বেশী।

রাসূলে করিম (ছঃ) এর নিকট একজন সাহাবী আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে, আমি তাহাদের সহিত অনুগ্রহ স্থাপন করি কিন্তু তাহারা মন্দ ব্যবহার করে। প্রতিটি বিষয়ে আমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেই কিন্তু তাহারা মুর্খতার পরিচয় দেয়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যদি এইসব সত্য হয় তবে তুমি তাহাদের মুখে মাটি প্রবেশ করাইতেছ এবং তোমার সহিত আল্লাহর সাহায্য সামিল থাকিবে যতদিন তুমি নিজের এইরূপ অভ্যাস অব্যাহত রাখিবে। (মেশকাত)

আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকিলে কাহারো ক্ষতিই তোমার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না, কাহারো অসদ্ব্যবহার তোমাকে সদ্ব্যবহার হইতে বিরত করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা যাহার সাহায্যকারী হন অন্য কাহারো সাহায্যের তাহার প্রয়োজন হয় না সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করিলেও তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ৯টি বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন। (১) ভিতরে বাহিরে উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাহেরে বাতেনে আল্লাহর ভয়। (২) সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থায়ই সত্যন্যায়ের কথা অর্থাৎ ইনসাফ করিতে হইবে। (৩) দারিদ্র ও স্বাচ্ছন্দ উভয় অবস্থায় মিতব্যয়িতার আশ্রয় গ্রহণ। (৪) সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (৫) নিজের দান হইতে যে আমাকে বঞ্চিত করে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার। (৬) যে ব্যক্তি জুলুম করে তাহাকে মার্জনা করা। (৭) নীরবতা যেন আল্লাহর নিদর্শনের স্মরণ হয়। (৮) কথায় আল্লাহর জিকির প্রকাশ পায়। (৯) দৃষ্টি যেন নসিহত পূর্ণ হয়। (১০) সৎকাজের আদেশ। প্রথমে ৯টি বলিয়াছেন কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনায় ১০টি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই দশটি পূর্বোক্ত ৯টির ব্যাখ্যা হইতে পারে আবার ৭টি বা ৮টিও হইতে পারে। দুইটি মুখোমুখি হওয়ায় তাহা একটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেন প্রথম জাহের বাতেন একটি ধরা হইয়াছে, সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকে একটি ধরা

হাকিম ইবনে হাজাম (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম (ছঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিল উত্তম সদকা কি ? নবীজী বলিলেন, কাশেহ আত্মীয়স্বজনের সহিত সুসম্পর্ক স্থাপন। (মেশকাত) কাশেহ সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তির মনে কাহারো প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা পোষণ করে। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চায় যে কেয়ামতে উঁচু উঁচু বাসভবন এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করিবে তাহার উচিত তাহার প্রতি জুলুমকারীকে ক্ষমা করা, তাহাকে দান হইতে বঞ্চিত কারীকে অনুগ্রহ করা তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন। (দোররে মনছুর)

একটি হাদীছে রহিয়াছে যখন ছুরা আরাফের চব্বিশতম রুকুর এই আয়াত নাজিল হইল, ক্ষমাশীলতা গ্রহণ কর, পুণ্য কাজের আদেশ কর এবং মুর্খদের সংস্পর্শ হইতে দুরে থাক—তখন নবীকরিম (ছঃ) হজরত জিব্রাইল (আঃ)-কে এই আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন। জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, যিনি জানেন তাহার নিকট হইতে (আল্লাহ তায়ালা) জানিয়া উত্তর দিব। একথা বলিয়া জিব্রাইল (আঃ) চলিয়া গেলেন, তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আপনার প্রতি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবেন, যে ব্যক্তি আপনাকে দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান করিবেন আর যে ব্যক্তি আপনার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

অন্য এক হাদীছে এ ঘটনার পর উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অতঃপর নবী করিম (ছঃ) লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদেরকে ইহ পরকালের সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিব ? সাহাবাগণ বলিলেন, জ্বী অবশ্যই বলুন। নবীকরীম (ছঃ) বলিলেন, তোমার উপর যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে ক্ষমা করিবে, তোমাকে যে দান হইতে বঞ্চিত রাখিবে তাহাকে দান করিবে, তোমার সহিত যে সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন আমি তোমাকে প্রথম ও শেষের উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করিব ?

আমি আরজ করিলাম জী অবশ্যই বলুন। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, তোমাকে যে ব্যক্তি নিজের দান হইতে বঞ্চিত করিবে তাহাকে দান কর। তোমার প্রতি যে ব্যক্তি জুলুম করিবে তাহাকে মার্জনা কর। তোমার সহিত যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিবে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করিবে।

হজরত ওকবা (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আমি তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের উৎকৃষ্ট চরিত্রের কথা বলিতেছি অতঃপর তিনি উপরোক্ত তিনটি বিষয় উল্লেখ করিলেন। অন্যান্য সাহাবাগণও একই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী নকল করিয়াছেন যে, মানুষ প্রকৃত ঈমান পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না যতক্ষণ না সে তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে তাহার উপর জুলুম কারীদের ক্ষমা করে, তাহার প্রতি গালীগালাজকারীদের মার্জনা করে এবং তাহার সহিত মন্দ ব্যবহরকারীদের সহিত ভাল ব্যবহার করে। (দুররে মনছুর)

দুইটি পাপের সাজা দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়

(১০) عن ابى بكر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر له فى الاخرة من البغى و قطيعة الرحم -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, দুইটি গুণাহ এমন রহিয়াছে যাহার শাস্তি পরকালের জন্য সঞ্চিত থাকা সত্বেও ইহকালেও ভোগ করিতে হইবে। এই দুইটি গুনাহ হইতেছে জুলুম এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

ফায়েদা ঃ জুলুম অত্যাচার এবং নিকটাত্মীয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন দুটি পাপ যে আখেরাতে তাহার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ তো করিতে হইবেই, এ পৃথিবীতেও তাহার শাস্তি ভোগ করিতে হয়। হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ ইচ্ছা করিলে সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাফরমানী করার শাস্তি মৃত্যুর আগেই প্রদান করেন। (মেশকাত)

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রত্যেকটি পাপের শাস্তিই আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে দিয়া থাকেন কিন্তু পিতামাতার সহিত নাফরমানীর শাস্তি খুব শীঘ্রই পৃথিবীতেই প্রদান করেন। (জামেউস, সগীর)

অনেক হাদীছে এমন ও উল্লেখ রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন আত্মীয়তার সম্পর্ককে কথা বলার শক্তি দিবেন, সে আরশে মুয়াল্লা ধরিয়া আল্লাহর কাছে আবেদন করিবে, হে আল্লাহ! যে আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে তুমি তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন কর। আর যে আমাকে ছিন্ন করিয়াছে তাহার সহিত তুমি সম্পর্ক ছিন্ন কর।

অনেক হাদীছে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, রেহম শব্দ পবিত্র নাম রহমান হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রেহম (আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক) স্থাপন করিবে রহমান তাহার সহিত সম্পর্ক করিবে আর যে ব্যক্তি ছিন্ন করিবেন আল্লাহ তাহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে, প্রতি শুক্রবার রাতে আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয় কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর কোন আমল কবুল হয় না। (দুররে মনছুর)

ফকীহ আবুল লায়েস (রহঃ) বলেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এতো নিকৃষ্ট পাপ যে এধরনের পাপকারীর নিকট যাহারা বসে তাহাদের ও আল্লাহ তাঁহার দয়া হইতে দূরে সরাইয়া দেন। এ কারণে প্রত্যেকের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ হইতে তওবা করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব অনুধাবন করা।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আত্মীতায় সম্পর্কের বন্ধন স্থাপন কারীর পুণ্যসম অন্য কোন পুণ্য নাই, যাহার বিনিময় অতি শীঘ্র পাওয়া যায় আর এই বন্ধন ছিন্ন করা ও জুলুম করার মতো কোন পাপ নাই যাহার শাস্তি পরকালে সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও খুব শীঘ্রই দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার ফজরের পর একটি সমাবেশে উপবিষ্ট ছিলেন, সেখানে তিনি বলিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিতেছি, যদি তোমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের বন্ধনছিন্নকারী কোন ব্যক্তি থাকিয়া থাকে তবে সে যেন চলিয়া

যায় আমরা আল্লাহর কাছে একটি বিষয়ে দোয়া করিতে চাই। নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহারের সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য আকাশের দরওয়াজা বন্ধ হইয়া যায়। (তারগীব)

অর্থাৎ তাহার দোয়া আকাশে পৌঁছায় না তাহার আগেই আকাশের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়া হয়। এ ধরনের লোকের দোয়ার সহিত আমাদের দোয়া মিলিত হইলে দরওয়াজা বন্ধ থাকার কারণে সেই দোয়া (দুনিয়াতেই) থাকিয়া যাইবে। বহু সংখ্যক বর্ণনায় এ বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। দুনিয়ার ঘটনাবলী হইতেও জানা যায় যে নিকটাত্মীয়দের সহিত সম্পর্ক ছিন্নকারী পৃথিবীতে এমন সব বিপদে পতিত হয় যাহাতে শুধু কাঁদিতেই থাকে। অথচ নিজের নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতার কারণে জানিতেও পারে না যে এ পাপ হইতে তওবা না করিলে সেই পাপের প্রতিকার না করিলে, বদল না নিলে এ বিপদ ও আজাব হইতে নিষ্কৃতির জন্য যতই চেষ্টা তদবির করা হোকনা কেন নিষ্কৃতি মিলিবে না। তবে দুনিয়ার শাস্তি ও আজাবে জড়িত হওয়া কোন প্রকার বদদ্বীনীতে জড়িত হওয়ার চাইতে বরং ভাল। কারণ ইহাতে অনেক সময় তওবা করার সুযোগও হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাহার দয়া ও করুনায় সবাইকে নিরাপদে রাখুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাকাত প্রদানের তাগিদ এবং ফাজায়েলের বিবরণ

জাকাত আদায় করা ইসলামের স্তম্ভ সমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কোরআনে ৮২ জায়গায় নামাজ কায়েমের সাথে সাথে জাকাত প্রদানেরও নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাছাড়া বিভিন্ন স্থানে আলাদা ভাবে জাকাত প্রদানের নির্দেশ রহিয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি জিনিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা তাইয়্যেবার প্রতিবিশ্বাস, নামাজ জাকাত, রোজা এবং হজ্জ। একটি হাদীছে রহিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির নামাজ কবুল করেন না যে ব্যক্তি জাকাত প্রদান করে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কোরানে জাকাতকে নামাজের সহিত এক-

ত্রিত করিয়াছেন, কাজেই এই দুইটির প্রতি পার্থক্য করিও না। (কান্‌জ)

ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমতে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন একটি অস্বীকারকারী কাফের। এই পাঁচটি জিনিস ইসলামের ভিত্তি এবং ইবাদত হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। এইসব জিনিসের উপরই ইসলামের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলে ইহার মূলকথা তা বুঝে আসে কি আল্লাহকে মাবুদ বা উপাস্য বলিয়া স্বীকার করিলে প্রিয়তমের দরবারে দুইটি হাজিরা অবশিষ্ট থাকে। প্রথম হাজিরা হইতেছে আত্মিক হাজিরা বা উপস্থিতি, যাহা নামাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ কারণেই নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নামাজের মাধ্যমে নামাজী আল্লাহ তায়ালার সহিত আলাপ করে। একারণেই ইহাকে মেরাজুল মোমেনীন বলা হয়। এই উপস্থিতিতে সর্বক্ষণের প্রয়োজনের চাহিদা মালিকের দরবারে পেশ করার সময়।

একারণেই বারবার হাজিরার প্রয়োজন দেখা দেয়, যেহেতু মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা সর্বক্ষণ লাগিয়াই থাকে। হাদীছে বার বার উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবীকরিম (ছঃ) এবং সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম কোন প্রয়োজন দেখা দিলে নামাজ পাঠে আত্মনিয়োগ করিতেন। এই হাজিরায় বান্দার পক্ষ হইতে আল্লাহর গুনগানের পর তাঁহার নিকট সাহায্যের আবেদন জানানো হয়। এই আবেদন আল্লাহ তায়ালার নিকট মঞ্জুর করারও অঙ্গীকার রহিয়াছে। হাদীছ শরীফে ছুরা ফাতেহার তাফছীরে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে। একারণে যখন নামাজের জন্য আহবান জানানো হয় তখন নামাজের জন্য আস বলার সাথে সাথে ঘোষণা করা হয় যে কামিয়াবীর জন্য আস। অর্থাৎ উভয় জাহানের সাফল্যের জন্য আস। নামাজের মাধ্যমে যেহেতু উভয় জাহানের কল্যাণও সাফল্য মহান প্রতিপালকের দরবারে পাওয়া যায়। দ্বীন দুনিয়া উভয়ই লাভ হয়ঃ একারণে জাকাত যেন তাহার পূর্ণতা বিধান। আল্লাহ যেন বলিয়া দেন যে; আমার দরবার হইতে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা হইতে অতি সামান্য অংশ শতকরা আড়াই টাকা আমার নামোচ্চারনকারী ফকিরদেরকেও দান কর। ইহা যেন শুকরিয়া স্বরূপ।

ইহা বিবেক সম্মত এবং স্বভাব সম্মত ব্যাপার যে, দরবারে পাওয়া দানের মধ্যে দরবারের ভৃত্যদেরও কিছু দেওয়া হয়। একারণে কোরানে যেখানে নামাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সাথে সাথে যাকাতের ও নির্দেশ রহিয়াছে। অর্থাৎ নামাজের মাধ্যমে আমার নিকট সাহায্য চাও এবং গ্রহণ কর। অতঃপর ইহা হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ আমার নাম স্মরণ কারীদেরকেও দান কর। এই সামান্য দানের কারণে পৃথকভাবে সওয়াব এবং প্রচুর পুরস্কারের অঙ্গীকারও রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত প্রিয়তমের গৃহে শারীরিক ভাবে উপস্থিতি। ইহাকে হজ্জ বলা হয়। যেহেতু এই ইবাদতে আর্থিক ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এ কারণে সমর্থ থাকিলে সমগ্র জীবনে শুধু একবার হাজির হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে সেখানে হাজিরার জন্য নিজেকে সকল প্রকার অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে কিছুকাল রোজা পালন অত্যাবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এইভাবে পবিত্র হইলে আল্লাহর গৃহে হাজীর হওয়ার যোগ্যতা অর্জিত হইবে। একারণে রোজার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে হজ্জের সময় শুরু হয়। ফেকাহবিদগণ সম্ভবত এই যুক্তি-কতার কারণেই এ সকল ইবাদতের তরতীব তাহাদের গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত রোজার মধ্যে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা এই বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী নহে। ধন-সম্পদ ব্যয় না করার ব্যাপারে কোরানের আয়াতে যে সব সতর্কতা উচ্চারিত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ওলামার মতে এই সতর্কতা যাকাত আদায় না করার প্রেক্ষিতেই নাজিল হই-য়াছে। মুসলমানদের জন্য তো একটি আয়াত বা একটি হাদীছ উল্লেখ করাই যথেষ্ট, আর যাহারা নামমাত্র মুসলমান তাহাদের জন্য সমগ্র কোরানে এবং হাদীছের দপ্তরও নিষ্ফল। অনুগতদের জন্য আল্লাহ ও রাসূলের ফরমান একবার জানাটাই যথেষ্ট, কিন্তু অবাধ্য অর্থাৎ নাফরমানদের জন্য হাজার তাগিদ ও নিরর্থক।

আয়াত

(১) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ -

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সহিত রুকু কর।

ফায়েদাঃ মাওলানা থানবী (রহঃ) লিখিয়াছেন, ইসলামের বিধি-বিধানের মধ্যে দুই প্রকারের আমল রহিয়াছে। জাহেরী ও বাতেনী জাহেরী বাতেনী দুইভাগে বিভক্ত, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত। ইহার মধ্যে নামাজ শারীরিক ইবাদত যেহেতু ইবাদতে বাতেনীর ক্ষেত্রে বিনয়ী ও অনুগত লোকদের সহায়তার বিরাট প্রভাব রহিয়াছে একারণে রুকুকারীর সহিত রুকু কথাটি অত্যন্ত সুসঙ্গত হইয়াছে।

(বয়ানুল কোরান)

একথা অনুসারী রুকু দ্বারা নম্রতা ও বিনয় বোঝায়। কোরানের উপরোক্ত আয়াতে স্পষ্টতা বোঝা যায় যে এসকল ইবাদতের মধ্যে নামাজ হইতেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একারণেই এই ইবাদতকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে। যাকাত দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় অতঃপর যাকাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইবাদতকে ইহাদের জাহেরী অবস্থা বাতেনী অবস্থার উপর অগ্রাধিকার পাইয়াছে। এ কারণে বিনয় ও নম্রতা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে! কেননা বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টির জন্য অনুগত বান্দাদের দলভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মাশায়েখরা একারণে খানকায় অবস্থানকে অগ্রাধিকার দিয়া থাকেন। তাহাদের সংস্পর্শে থাকিলে এই গুণবৈশিষ্ট্য শীঘ্র গড়িয়া উঠে এই তিন প্রকারের ইবাদতে সাধারণ মুসলমানদের আমলসমূহ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একারণে বহুবচন ব্যবহার সর্বত্র করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় রুকু দ্বারা নামাজের রুকুর কথা বুঝানো হইয়াছে। শাহ আবদুল আজীজ (রহঃ) তাফসীরে আজীজীতে লিখিয়াছেন, নামাজ যাহারা পড়ে তাহাদের সহিত নামাজ পড় ইহার অর্থ এই যে জামাতের সহিত নামাজ আদায় কর। ইহাতে জামাতের প্রতি তাগিদ দেওয়া

ইহুদীদের নামাজে রুকু থাকে না। অর্থাৎ এখানে ইঙ্গিত করা হয় যে, মুসলমানদের মত নামাজ পড়।

নামাজের মধ্যে জামাতের বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফাজায়েলে নামাজ গ্রন্থে এ সম্পর্কে সবিশেষ আলোকপাত করা হইয়াছে ফেকাহগণ জামাত ব্যতীত নামাজ আদায় করাকে ত্রুটিপূর্ণ আদায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৮) وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيٰتِنَا يُؤْمِنُونَ -

অর্থ "কিন্তু আমার রহমত সমস্ত বিশ্বকে জুড়িয়া রহিয়াছে, সুতরাং উহা আমি তাহাদের জন্য লিখিয়া দিব, যাহারা খোদাকে ভয় করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতগুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে।

(আরাফ রুকু ১৯)

ফায়েদা ঃ হজরত হাসান (রাঃ) এবং কাতাদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, আল্লাহর রহমত পৃথিবীর সব কিছুর মধ্যে পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাহারা পাপী অথবা পুণ্যবান যাহাই হোক না কেন কিন্তু আখেরাতে পুরস্কার শুধু পুণ্যবানদের জন্যই রহিয়াছে। একজন বেদুঈন মসজিদে আসিয়া নামাজ পড়িয়া তার পর দোয়া করিল হে আল্লাহ আমার উপর এবং মোহাম্মদ (ছঃ) এর উপর রহমত নাজিল কর এবং আমাদের রহমতের সহিত অন্য কাহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিও না। নবীকরিম (ছঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহর ব্যাপক রহমতকে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছ, আল্লাহ পাক তাহার রহমতকে একশত ভাগ করিয়া একভাগ পৃথিবীতে প্রদান করিয়াছেন, ইহার ফলে জীন জাতি, মানব, পশুপাখী প্রভৃতি একে অন্যকে ভালবাসে। আর ৯৯ ভাগ রহমত আল্লাহ নিজের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন।

করে এবং জীবজন্তু তাহাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা রাখে এবং ৯৯ ভাগ কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আরো বহু হাদীছে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

মায়েরা সন্তানের সামান্যতম দুঃখেও ব্যথিত হন তাহার রোগে কাতর হইয়া পড়েন, পিতা সন্তানের বিপদে অধীর হইয়া পড়েন। আত্মীয় স্বজন আপন পর একে অন্যকে বিপদ গ্রস্থ দেখিলে অস্থির হইয়া পড়ে এসকল দয়া ও ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক মানুষের হৃদয়ে স্থাপন করা ভালোবাসার প্রভাবেই প্রকাশ পায়। এক ভাগ রহমতের অভিব্যক্তিতেই এইরূপ হইলে আল্লাহ তায়ালা যিনি ৯৯ ভাগ রহমত নিজের আয়ত্বে রাখিয়াছেন তাহার হুকুম আহকামের অবাধ্যাচরণ করা কতো বড় অত্যাচার এবং অকৃতজ্ঞতা তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? সন্তানের প্রতি করুণা প্রকাশকারিনী মা সন্তানকে অবাধ্য দেখিলে মনে কত দুঃখ পান অথচ মায়ের করুণা আল্লাহর করুণার মোকাবিলায় কিছুই নহে। ইহাতেই আল্লাহর বিধিবিধান পালন না করার পরিণাম আন্দাজ করা যাইতে পারে।

(৩) وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون -

অর্থাৎ আর যাহা তোমরা সুদ দিতেছ লোকের ঐশ্বর্য বর্ধিত হইবে বলিয়া ফলতঃ উহা আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয়না, আর যাহা তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করিয়া যাকাত প্রদান কর তাহারাই তাহাদের প্রদত্ত সম্পদকে আল্লাহর নিকট বর্ধিত করিতেছে। (রুম, রুকু৪)

ফায়েদা ঃ মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, বর্ধিত হওয়ার উদ্দেশ্যে মালামাল প্রদানের মধ্যে সেইসব মালামাল অন্তর্ভুক্ত যাহা তাহার চেয়ে উত্তম পাওয়ার প্রত্যাশায় প্রদান করা হয়। অর্থাৎ দুনিয়ায় অধিক পাওয়ার জন্য বা আখেরাতে অধিক পাওয়ার জন্য খরচ করাটাই অধিক পাওয়ার আশায় খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একারণে সুদকে যাকাতের

সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্য একটি হাদীছে হজরত মোজাহেদ (রহঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে ইহা দ্বারা হাদিয়ার কথা বলা হইয়াছে। (দুররে মনছুর)

অর্থাৎ কাউকে হাদিয়া বা উপহার ইত্যাদি আরো অধিক পাওয়ার আশায় দান করা। যেমন কাউকে একারণে দাওয়াত করা যে সে দাওয়াত রক্ষা করিতে আসিয়া যা খাইবে তাহার অধিক উপহারস্বরূপ দিয়া যাইবে নওতা ইত্যাদিও এরকম দানের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আল্লার সন্তুষ্টির জন্য যাহা খরচ করা হয় আল্লাহর কাছে শুধু তাহাই বৃদ্ধি পায়।

হজরত সা'ঈদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে বিনিময় পাওয়ার আশায় যে হাদিয়া দেওয়া হইবে আখেরাতে তাহার কোন সওয়াব পাওয়া যাইবে না। লক্ষ্যণীয় যে, আখেরাতে পাওয়ার আশায় যখন দানই করা হয় নাই তবে সেখানে কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে।

হজরত কা'ব কায়জী (রহঃ) বলেন, দুনিয়ায় অধিক পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি কিছু দান করে আল্লাহর নিকট এ দান বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে যাহাকে দান করা হইল তাহার নিকট হইতে প্রাপ্তির প্রত্যাশা না রাখিয়া যদি আল্লাহর নিকট হইতে প্রাপ্তির আশা করা হয় তবে তাহা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। কাজেই যাহারা কাউকে যাকাত ইত্যাদি মালামাল দান করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছে এইরূপ চিন্তা করে এবং সেজন্য তাহার মুখাপেক্ষী থাকিবে এইরূপ প্রত্যাশা করে তাহারা এইরূপ বদ নিয়তের কারণে প্রাপ্ত সওয়াবের পরিমাণ নিজেরাই কমাইয়া দেয়।

প্রথম অধ্যায়ের ৬৭ নং আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ বলিয়াছেন, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আহার করাই আমরা তোমাদের কাছে ইহার বিনিময় চাই না কৃতজ্ঞতাও চাই না।

অধিক বিনিময় চাওয়ার উদ্দেশ্যে খরচ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নবীকরিম (ছঃ) কে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছেন। ছুরা মোদ্দাছেরে আল্লাহ নবীজীকে বলিয়াছেন, "আপনি দান করিবেন না অধিক প্রতি-দান দাবীর উদ্দেশ্যে।"

আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে দানের কারণে ইহপরকালে সওয়াব পাওয়ার কথা বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীছে উল্লেখ করিয়াছে। সেইসব প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি। একারণে যাহারা দান করে তাহারা যাহাকে দান করিল তাহার নিকট হইতে কোন প্রকার প্রতিদান অথবা কৃতজ্ঞতা যেন প্রকাশ না করে। দ্বিতীয় কথা হইল, গ্রহণকারীর উচিত সে যেন অনুগৃহীত হইয়াছে এইরূপ ভাব প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা জানায়। কিন্তু দাতা যদি এইরূপ নিয়ত করে তবে সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান না হইয়া দুনিয়ায় প্রতিদানের উদ্দেশ্যে দান বলিয়া গণ্য হইবে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রেতো এধরনের চিন্তা কিছুতেই করা যাইবে না যেহেতু ইহা অবশ্য কর্তব্য হিসাবে আদায় করিতে হয়। একারণে উল্লেখিত আয়াতে যাকাত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দানের সহিত বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।

(১) عن ابن عباس رض قال لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين فقال عمر (رض) انا افرج عنكم فانطلق فقال يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الاية فقال ان الله لم يفرض الزكوة الا ليطيب ما بقي من اموالكم وانما فرض المواريث وذكر كلمة لتكون لمن بعدكم فقال فكبر عمر رض ثم قال له الا اخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة اذا نظر اليها سرته واذا امر اطاعته واذا غاب عنها حفظته ۔

হাদীছ

অর্থাৎ—হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পবিত্র কোরানের এ আয়াতটি যখন নাজিল হয়—যাহারা সোনা এবং রূপা কুক্ষিগত করে—তখন এ আয়াতটি সাহাবায়ে কেরামের জন্য কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। হজরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এ মুশকিল সমাধান করিব। এই কথা বলিয়া তিনি (হজরত) ওমর (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর নিকট গিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল (ছঃ)! এই আয়াতটির কারণে লোকদের খুব কষ্ট হইতেছে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, অবশিষ্ট ধন-

সম্পদকে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক যাকাত ফরজ করিয়াছেন। এবং ধনসম্পদ পরবর্তীকালে অবশিষ্ট রাখার উদ্দেশ্যেই মীরাছ ফরজ করা হইয়াছে। হজরত ওমর (রাঃ) আনন্দে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আমি কি মানুষের জন্য সবচেয়ে সঞ্চিত উত্তম বস্তু কি তা বলিব? তাহা হইতেছে, পূণ্যশীলা নারী যাহাকে দেখিয়া স্বামী খুশী হয়, তাহাকে যখন আদেশ প্রদান করা হয় সে তখন তাহা পালন করে, আর স্বামী কোথাও গেলে সেই নারী (স্বামীর জিনিসপত্র) হেফাজত করে।

ফায়েদা ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং আয়াতে উল্লেখিত আয়াত এবং তাহার অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যাকাতের এই আয়াত দ্বারা মনে হয় যে, যতো প্রয়োজনেই সঞ্চিত করা হোক না কেন সকল প্রকার সঞ্চয়ই কঠিন শাস্তির কারণ। একারণেই সাহাবাদের জন্য ইহা কষ্টকর হইয়াছিল কেননা আল্লাহ এবং নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীর অনুসরণ ছিল সাহাবাদের প্রাণ। অথচ প্রয়োজনের কারণে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করা জরুরী হইয়া পড়ে। ওমর (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিলেন। নবী করিম (ছঃ) তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন যে যাকাত একারণেই ফরজ করা হইয়াছে যে তাহা আদায় করিলে অবশিষ্ট ধন সম্পদ পবিত্র হইবে। ইহাতে ধন-সম্পদ রাখার যুক্তি পাওয়া গেল। অর্থাৎ সমগ্র বছর ধন-সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখা যদি জায়েজ না হইত তবে যাকাত কেন ফরজ হইল? ইহাতে যাকাতের বিরাট ফজিলত প্রমাণিত হইতেছে যে, যাকাত আদায়ের জন্য আলাদা সওয়াব পাওয়া যাইবে অথচ অবশিষ্ট ধন-সম্পদ ও পবিত্র হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরানেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

পবিত্র হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের ধনসম্পদ পবিত্র হওয়ার উপায়, অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যাকাত আদায় কর, ইহা তোমাদের মালকে পবিত্র করিবে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে পবিত্র করিবেন। অন্য এক হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, নিজেদের ধন-সম্পদকে

যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর এবং সদকা দিয়া তোমরা রুগীদের চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবতের বিরুদ্ধে দোয়া তৈরী কর।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, যাকাতের মাধ্যমে নিজের ধন-সম্পদকে নিরাপদ কর, নিজের রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর, এবং বালামুসিবত দূরীকরণের জন্য দোয়া ও বিনয়ের সহিত সাহায্য চাও।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) উল্লিখিত হাদীছে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার দ্বিতীয় যুক্তি উল্লেখ করিয়াছেন যে, উত্তরাধিকার আইন যে ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের কারণেই জারী করা হইয়াছে। যদি ধন-সম্পদ সঞ্চয় বৈধ না হয় তবে মীরাছ বন্টন কোন্ জিনিসের হইবে? অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) এ ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন যে, বৈধ হওয়া অন্য কথা। কিন্তু (ধন-সম্পদ) কোষাগারে রাখার মত উপযুক্ত জিনিস হইল পুণ্যবতী স্ত্রী।

কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে এক্ষেত্রে সাহাবাগণ নবী-জীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে নবীকরিম (ছঃ) উপরোক্ত কথা বলিয়াছেন।

হজরত ছাওবান (রাঃ) বলেন পবিত্র কোরানে সোনারূপা কুক্ষিগত না করা সম্পর্কীয় আয়াত যখন নাজিল হয় তখন আমরা নবীকরিম (ছঃ)-এর সহিত সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবা আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাছুল! সঞ্চয় করিয়া রাখার মত জিনিস কি আছে যদি তাহা জানা যাইত, নবীকরিম (ছঃ) তখন বলিলেন, জেকেরকারী জিহবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হৃদয় এবং দ্বীনের কাজে সহায়তা দানকারিণী পুন্যশীলা স্ত্রী সবচেয়ে উত্তম জিনিস। (দুররে মনছুর)

একটি হাদীছে আছে যে, উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার পর নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, সোনারূপার সর্বনাশ হউক, কী খারাপ জিনিস? নবীজী তিনবার একথা বলিলেন, তখন ছাহাবারা বলিলেন হে আল্লাহর রাছুল, সংগ্রহ করিয়া রাখার মত উত্তম জিনিস কি? নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জেকেরকারী জিহ্বা, আল্লাহকে ভয় করে এমন হৃদয়, দ্বীনের কাজে সাহায্যকারিণী পুণ্যশীলা স্ত্রী।

(তাফসীরে কবীর)

নবীকরিম (ছঃ)· এর শিক্ষা কত পবিত্র এবং জ্ঞানগর্ভ যে, তিনি ধনসম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার কথাও বলিলেন অথচ ইহা যে পছন্দনীয় কাজ নহে তাহাও বলিয়া দিলেন। দুনিয়াতে শান্তিময় জীবন যাপনের কথাও তিনি বলিলেন, যেই জীবন পরকালে কাজে আসিবে তাহা হইতেছে, জেকেরকারী জিহবা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তকরণ। দুনিয়ায় শান্তি ও লজ্জতের এমন জিনিসের কথাও বলিয়াছেন যাহা শান্তিতে জীবন যাপনের উপকরণ হইবে এবং ধন সম্পদের মধ্যকার ফেতনার মত ফেতনা ইহাতে থাকিবে না। যাহার মধ্যে সকল প্রকার শান্তি ও আরামের উপকরণ রহিয়াছে। তাহা হইতেছে, এমন স্ত্রী যে নাকি পূণ্যশীলা, ধর্মপরায়না, অনুগত এমন বুদ্ধিমতী যে স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাজত করিতে পারে।

(২) عن ابى الدرداء رض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكوة قنطرة الاسلام ـ

অর্থাৎ নবী করিম (সঃ) বলিয়াছেন, যাকাত হইতেছে ইসলামের সেতু।

ফায়েদা ঃ কোথাও যাওয়ার জন্য যেমন শক্ত সেতু সহজতর উপায় তেমনি ইসলামের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য যাকাত মাধ্যম এবং পথ স্বরূপ। আবদুল আজিজ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) যিনি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের (রহঃ) পৌত্র ছিলেন, তিনি বলেন নামাজ তোমাকে অর্ধেক পথ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে। রোজা তোমাকে বাদশাহর দরবার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে এবং ছদকা তোমাকে বাদ-শাহর নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। বিশিষ্ট বুজুর্গ এবং সুফী হজরত শকীক বলখীর (রহঃ) কথায়ও সেতুর সহিত একটি সূক্ষ্ম সম্পর্ক আন্দাজ করা যায়? তিনি বলেন, আমি পাঁচটি জিনিস সন্ধান করিয়াছি এবং উহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। চাশতের নামাজে রুজির বরকত, তাহাজ্জুদের নামাজে কবরের রোশনী কোরান তেলাওয়াতে মনকির নাকিরের জওয়াব, রোজা ও সদকায় পূলসিরাত সহজ ভাবে পার হওয়া এবং নির্জন ধ্যানের মধ্যে আরশের ছায়া পাইয়াছি। (ফাজায়েলে নামাজ)

(৩) عن جابر رض قال قال رجل يا رسول الله ارأيت

ان ادى الرجل زكوة ماله فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم من ادى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা তাহা হইতে চলিয়া যায়।

ফায়েদা ঃ কোন কোন বর্ণনায় এবিষয় এভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করিয়া তুমি সেই ধন-সম্পদে অনিষ্ঠকারীতা দুর করিয়া দিয়াছ। অর্থাৎ ধন-সম্পদ অনেক অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে কিন্তু যদি তাহার যাকাত সুষ্ঠভাবে আদায় করা হয় তবে সেই ধনসম্পদ তাহার নিজস্ব অনিষ্টকারীতা হইতে নিরাপদ থাকে। আখেরাতের দৃষ্টিকোন হইতে বোঝা যায় যে, এই ধন-সম্পদের কারণে আজাব হইতে নিরাপদ থাকিবে। যদি যাকাত আদায় না করা হয় তবে সেই ধন-সম্পদ ধবংস হইয়া যায়। এসম্পর্কে ৬নং হাদীছে উল্লেখ করা হইবে।

(৫) عن الحسن رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حصنوا اموالكم بالزكوة وداووا مرضاكم بالصدقة
واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, নিজের ধন-সম্পদকে যাকাতের মাধ্যমে নিরাপদ কর, নিজ রোগীদের সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালামুসিবতের ঢেউকে দোয়া ও আল্লাহর সামনে বিনয়ের সহিত কান্নাকাটি করিয়া স্বাগত জানাও।

ফায়েদা ঃ তাহচীন অর্থ চারিদিকে দুর্গ তৈরী করা। দুর্গের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করিয়া মানুষ যেমন চারিদিক হইতে নিরাপদ হইয়া যায় তেমনি ভাবে যাকাত আদায় করিয়া ধন-সম্পদকে নিরাপদ করা হয়। একটি হাদীছে আছে প্রিয়নবী (ছঃ) কা'বার হাতীমে অবস্থান রত ছিলেন। এসময় এক ব্যক্তি উল্লেখ করিল যে, অমুক লোকদের বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের ঢেউ তাহাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে, হুজুর (ছঃ) বলেন জল স্থলের যেখানেই মাল ধবংস হউক না কেন তাহা যাকাত আদায় না করার কারণেই

বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিজেদের ধন-সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে চিকিৎসা কর এবং বালা মুসিবত অবতরণকে দোয়ার মাধ্যমে দুর কর। দোয়া সেই বালাকে মিটাইয়া দেয় যাহা নাজিল হইয়াছে এবং সেই বালাকে প্রতিরোধ করে যাহা এখনো অবতরণ করে নাই। আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতির স্থায়ীত্ব চান অথবা তাহাদের উন্নতি চান তখন সেই জাতির মধ্যে পাপ হইতে পবিত্র এবং দানশীলতার গুণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যখন কোন জাতিকে বিলপ্ত করিয়া দিতে চান তখন সেই জাতির মধ্যে খেয়ানত তৈরী করেন।

(৫) روى علقمة انهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا النبى صلى الله عليه وسلم ان تمام اسلامكم ان تؤدوا زكوة اموالكم -

অর্থাৎ হজরত আলকামা (রাঃ) বলেন, আমাদের জামাত যখন নবী (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমরা জাকাত আদায় কর, ইহার মধ্যে তোমাদের ইসলামের পূর্ণতা নিহীত।

ফায়েদা ঃ ইসলামের পূর্ণতা যে যাকাত আদায়ের সহিত সমপৃক্ত ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ কালেমা, নামাজ রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মধ্যে যাকাত একটি স্তম্ভ, যাহা ব্যতীত ইসলাম পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

হজরত আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন এক ব্যক্তি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইয়া আরজ করিল, বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার মধ্যে একটি আমল আমাকে শিখাইয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন আল্লাহর ইবাদত কর, কাহাকেও তাঁহার শরীক করিও না, নামাজ আদায় করিতে থাক, নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক হাদীসে আছে, একজন বেদুইন নবীজীকে বলিল যে, আমাকে এমন আমল শিখাইয়া দিন যাহা পালন করিয়া আমি বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি। নবীজী বলিলেন, আল্লাহর ইবাদত কর তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক।

যাকাত আদায় করিতে থাক, রমজানের রোজা পালন করিতে থাক।

লোকটি তখন বলিল, সেই মহান খোদার কছম যাঁহার নিয়ন্ত্রনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি ইহার মধ্যে কম বেশী করিব না। লোকটি চলিয়া গেলে নবীজী বলিলেন, যে ব্যক্তি কোন বেহেশতী মানুষ দেখিয়া মন খুশী করিতে চায় সে যেন এই লোকটিকে দেখিয়া লয়। (তারগীব)

(৭) عن عبد الله بن معوية الغاضرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان من عبد الله وحده وعلم ان لا اله الا الله واعطى زكوة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة لكن من وسط اموالكم فان الله لم يسالكم خيره ولم يامركم بشره -

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলেন যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করিবে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করিবে। শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করিবে এবং ভালভাবে জানিয়া রাখিবে যে আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, প্রতিবছর হৃষ্টচিত্তে জাকাত আদায় করিবে, ইহাতে (পশুদের জাকাতের ক্ষেত্রে) বৃদ্ধ পশু লোম উঠা পশু রোগাক্রান্ত বা নিকৃষ্ট পর্যায়ের পশু দান করিবে না বরং মধ্যম শ্রেণীর পশু দিবে। আল্লাহ তায়ালা জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের উৎকৃষ্ট মালামাল চান না কিন্তু তিনি নিকৃষ্ট মালামাল প্রদানেও নির্দেশ দেন না।

ফায়েদা ঃ এই হাদীছে যদিও পশুদের যাকাতের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে কিন্তু সকল প্রকার যাকাতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মালামাল আদায় করা ওয়াজিব নয়। আবার নিকৃষ্ট মালামাল আদায় করাই রীতি। যদি কেহ নিজের মনের সন্তুষ্টিতে সওয়াব লাভের জন্য, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য উত্তম মালামাল আদায় করে তবে ইহা তাহার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি গভীরভাবে লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

মুসলিম ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, নাফে ইবনে আলকামা (রাঃ) আমার পিতাকে কওমের চৌধুরী মনোনীত করিয়াছিলেন। একবার তিনি

আমার পিতাকে হুকুম দিলেন যে সমগ্র কওমের যাকাত সংগ্রহ করুন। আমার পিতা আমাকে সবার নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া একত্রিত করার জন্য প্রেরণ করেন। আমি হজরত সা'র (রাঃ) নামক একজন বড় মিয়ার নিকট যাকাত আদায় করিতে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা কি ধরনের মালামাল নিবে। আমি বলিলাম, সবচেয়ে ভাল মাল, এমনকি গ্রহণ করিবার সময় ওলানও দেখিব ছোট নাকি বড়। অর্থাৎ সবকিছু দেখিয়া ভালো ভালোগুলি বাছাই করিব। তিনি বলিলেন, প্রথমে আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাইয়া দেই। আমি হুজুর (ছঃ) এর জীবদ্দশায় এখানেই থাকিতাম। একদিন দুইজন লোক নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট হইতে আসিয়া বলিল, নবীকরিম (ছঃ) আমাদেরকে আপনার নিকট হইতে যাকাত গ্রহণ করিতে পাঠাইয়াছেন। আমি তাহাদেরকে আমার বকরীসমূহ দেখাইয়া বলিলাম, এগুলির মধ্যে কি কি ওয়াজিব? তাহারা বলিলেন, এগুলির মধ্যে একটি বকরি ওয়াজিব। আমি চর্বিযুক্ত দুগ্ধবতী একটি বকরী বাছিয়া তাহাদের দেওয়ার জন্য বাহির করিলাম, তাহারা বলিলেন এটি শাবক বিশিষ্ট বকরী, এধরনের বকরী গ্রহণের জন্য নবীকরিম (ছঃ) এর অনুমতি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কোন্ বকরী গ্রহণ করিবেন? তাহারা বলিলেন, ছয় মাসের শাবক অথবা একবছর বয়সের বকরী আমি ছয় মাসের একটি সাবক তাহাদেরকে দিলাম। তাহারা লইয়া চলিয়া গেলেন। (আবু দাউদ)

এ ঘটনায় হজরত সা'র (রাঃ) এর প্রথমে ইচ্ছা ছিল সবচেয়ে ভালো বকরী যাকাত হিসাবে দিবেন, তবে ইবনে নাফে'কে (রাঃ) এই ঘটনা এজন্যই শুনাইয়াছেন তিনি যেন মাছআলা জানিতে পারেন। ইবনে নাফে (রাঃ) ইহা শুনিয়া নিশ্চয় বুজিতে পারিলেন যে হজরত সা'র (রাঃ) উত্তম মালই যাকাত হিসাবে দিতে চাহিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তিনি বলেন, নবীকরিম (ছঃ) একবার আমাকে যাকাত আদায় করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি একজন লোকের নিকট গেলে তিনি নিজের উটগুলো আমার নিকট হাজির করিলেন আমি দেখিলাম উহাদের মধ্যে এক বছরের একটি উট্নী ওয়াজিব, আমি তাহাকে

বলিলাম, এক বছরের একটি উট্‌নী দিন। তিনি বলিলেন, এক বছরের উট্‌নী কি কাজে লাগিবে, সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না দুধও দিবে না। একথা বলিয়া তিনি একটি মোটা তাজা বড় উট্‌নী দিয়াছিলেন আমি বলিলাম, আমিতো ইহা গ্রহণ করিতে পারি না তবে নবীকরিম (ছঃ) সফরে রহিয়াছেন এবং তিনি নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অবস্থানের মনজিল বেশী দূরে নহে। আপনি ইচ্ছা করিলে, নবীজীর নিকট এই উট্‌নী হাজির করিতে পারেন। যদি নবীজী অনুমতি দেন তবে আমি গ্রহণ করিব। তিনি তখন উট্‌নী লইয়া আমার সঙ্গে রওয়ানা হইলেন। নবীজীর নিকট হাজির হইয়া তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর রাছুল, আপনার দুত আমার নিকট যাকাত গ্রহণ করিতে গিয়াছিল। আল্লাহর কছম এরকম সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার হয় নাই যে আপনি নিজে অথবা আপনার দুত আমার নিকট হইতে কোন মাল চাহিয়াছেন। আমি আপনার দুতের সামনে আমার উটগুলি হাজির করিলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন একবছরের একটি উটনী দিন আমি বলিলাম এক বছরের উটনী সওয়ারী হিসাবেও কাজে লাগিবে না, দুধও দিতে পারিবে না, একারণে আমি উৎকৃষ্ট মানের এই উট্‌নী তাহার সামনে হাজির করিলাম। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। একারণে আমি উটনী আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি। হে আল্লাহর রাছুল, আপনি এই উট্‌নী গ্রহণ করুণ। নবীজী বলিলেন, তোমাকে যাহা বলা হইয়াছে তোমার উপর তাহাই ওয়াজিব, যদি তুমি তাহার চাইতে ভালো অধিক বয়স্ক উট্‌ নফল হিসাবে দাও তবে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাকে তাহার পুরষ্কার দিবেন। লোকটি আরজ করিল, হে আল্লাহর রাছুল, একারণেই আমি উহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আপনি গ্রহণ করুণ। নবীকরিম (ছঃ) উহা গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

(আবু দাউদ)

তাঁহাদের অন্তরে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে এইরূপ উদ্দীপনা ছিল এবং তাহারা এ জন্য গর্ববোধ করিতেন। ইহাকে সম্মানজনক বলিয়া মনে করিতেন যে আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয়নবীর দুত আজ আমার নিকট আসিয়াছে এবং আমি এইরূপ যোগ্য হইয়াছি। যাকাত আদায়কে তাহারা শুল্ক এবং নিস্ফল কাজ মনে করিতেন না এবং নিজের প্রয়োজন

এবং নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন, আমরা উৎকৃষ্ট মালামাল নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া দেই অথচ তাঁহারা আল্লাহর পথে ব্যয় করাকেই নিজের কাজ বলিয়া মনে করিতেন।

প্রথম পরিচ্ছেদে ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবুজর (রাঃ) এর ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হয় যে বনি সলিম গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলে তিনি বলেন, আমার নিকট থাকিতে হইলে একটি শর্ত তোমাকে মানিতে হইবে। তাহা এই যে আমি যখন কাউকে কিছু দিতে বলিব তখন আমার মালামাল হইতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস বাছাই করিয়া দিবে। পূর্বে বিস্তারিত ভাবে এঘটনা ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং আগামী পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখ করা হইবে যে, যাকাত ও ছদকার মধ্যে বিশেষ করিয়া যাকাতে নিকৃষ্ট মালামাল কিছুতেই প্রদান করা উচিত নহে।

(৮) عن ابى هريرة (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اديت الزكوة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له اجر وكان اجره عليه ○

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যখন তুমি ধন সম্পদের যাকাত আদায় করিবে তখন তোমার দায়িত্ব পালিত হইল, কিন্তু যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া সেই ধন সম্পদের সদকা আদায় করে সে সদকা প্রদানের জন্য কোনরূপ সওয়াব পাইবে না এবং হারাম উপার্জনের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

ফায়েদা ঃ এই পবিত্র হাদীছে দুইটি বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে একটি হইতেছে ওয়াজিব শ্রেণীতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত, ইহা ছাড়া যেসব শ্রেণী রহিয়াছে তাহা হইতেছে সাদাকাত এবং নফল। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি তাহার উপর আরোপিত ওয়াজিব তো আদায় করিল, তবে ইহার চাইতে অধিক আদায় করা উত্তম।

হজরত জামাম ইবনে ছা'লাবার (রাঃ) বিখ্যাত হাদীছ বোখারী মুসলিম শরীফসহ বিভিন্ন গ্রন্থে নানাভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। এ

হাদীছে তিনি নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট ইসলাম ও তাহার স্তম্ভ সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নবীজী সবকিছু বিস্তারিতভাবে বলিয়া দেন। ইহাতে নবীজী যাকাতের কথাও উল্লেখ করেন। হযরত জামাম (রাঃ) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যাকাত ব্যতিত অন্য কিছু কি আমার উপর ওয়াজিব? নবীজী বলিলেন না তবে নফল হিসাবে আদায় করিতে পার।

হজরত ওমরের (রাঃ) সময়ে একব্যক্তি গৃহ বিক্রি করিলে তিনি বলিলেন, প্রাপ্ত অর্থ নিজ গৃহে মাটি খুঁড়িয়া সেখানে রাখিয়া দিয়ো। লোকটি বলিল কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত হইবে না তো। হজরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যাহার জাকাত আদায় করা হয় তাহা কুক্ষিগত করার অন্তর্ভুক্ত বিবেচিত হইবে না।

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমার নিকট অহুদ পাহাড় সমতুল্য সোনা থাকিলেও আমি কোন পরোয়া করি না। যেহেতু আমি তাহার যাকাত আদায় করি এবং তাহার দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য করি।

(দুররে মনছুর)

হাদীছ গ্রন্থসমূহে এ ধরণের বহু বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সব হাদীছের আলোকে ওলামায়ে জমহুর এবং চারজন ইমাম অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে, মালামালের মধ্যে অনুরূপ মালামাল ব্যতীত যাকাত প্রদানের জন্য অন্য কোন জিনিস ওয়াজিব নহে। অবশ্য যদি অন্যভাবে ওয়াজিব হয় তবে তাহা ভিন্ন বিষয়, যেমন স্ত্রীর ও অপ্রাপ্ত আওলাদের ব্যয়নির্বাহের মতো অন্যান্য ব্যয় নির্বাহকরন। ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণে মরণাপন্ন ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা ফরজে কেফায়া।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোন কোন তাবেয়ীর মজহাব অনুযায়ী ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কিছু দায়িত্ব রহিয়াছে। নাখায়ী শা'বী, আতা এবং মুজাহিদের মজহাব এইরূপ। ইমাম শা'বীকে (রহঃ) একজন জিজ্ঞাসা করিল ধনসম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও কি কোন দায়িত্ব রহিয়াছে? তিনি বলিলেন রহিয়াছে। অতঃপর কোরানের "অ আতাল মালা আ'লা হুব্বিহি" —এ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। প্রথম পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এসম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। উপরোক্ত

ইমামদের মতে ধনশালী ব্যক্তিরা কোন পরমুখাপেক্ষীকে দেখিলে তাহার প্রয়োজন পূরন করিবেন। ইহা মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ফেকাহ শাস্ত্রের দৃষ্টিকোন হইতে যাহা ছহী তাহা এই যে, ক্ষুধায় কেহ মরণাপন্ন হইলে তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করা ফরজে কেফায়া। তবে সেই খাদ্য তাহাকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে নাকি সাহায্য হিসাবে—সে ব্যাপারে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। (এহইয়া)

মরণাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য এমনিতেও ওয়াজিব। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা অন্য যে কোন প্রকারেই মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছায়না কেন। কিন্তু ইহা ধনাঢ্য ব্যক্তির যাকাত আদায়ের চাইতে অধিক ওয়াজিব নহে। এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত—আমরা কোন কিছুর প্রতি অগ্রসর হইতে শুরু করিলে সীমা সরহদের তোয়াক্কা করি না। একারণে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অন্য কাহারো ধন সম্পদ তাহার সম্মতি ব্যতীত গ্রহণ করা জায়েজ নহে। ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর ব্যক্তিকে অন্যের মালামাল ভক্ষণের জন্য ফেকাহবিদগণ অবশ্য অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু এব্যাপারে হানাফী মজহাব ভুক্তদের মধ্যেও দুইটি বক্তব্য রহিয়াছে। প্রথমত অন্যের মালামাল ভক্ষণের চাইতে মৃত পশুর গোশত খাইয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়? দ্বিতীয়ত—মৃত পশুর খাওয়ার চাইতে অন্যের মালামাল খাওয়া শ্রেয়। ফেকাহর কিতাবসমূহে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এটা ঠিক যে কেউ যদি এমন অবস্থায় পৌছিয়া যায় যে তাহার জন্য মৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হইয়া যায় তাহা হইলে সে অন্যের মালামাল খাইতে পারে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলিয়াছেন "এবং তোমরা অন্যায় ভাবে পরস্পরের মাল গ্রাস করিও না এবং জানা সত্বেও অসদুপায়ে লোকের মাল গ্রাস করার উদ্দেশ্যে উহাকে বিচারকের নিকট লইয়া যাইও না। (বাকারাহ রুকু ২৩)

নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন, কাহারো উপর জুলুম করিও না। কাহারো মালামাল তাহার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করা জায়েজ নহে।

নবীকরিম (ছঃ) এর বিখ্যাত হাদীছ যে ব্যক্তি কাহারো এক বিঘৎ পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করিবে কেয়ামতের দিন সপ্ত জমিনের অনুরূপ অংশ বেড়ী বানাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া

হইবে। (মেশকাত)

হাওয়াজেন গোত্রের এ ঘটনা বিখ্যাত। তাহারা যখন পরাজিত হইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নবীজীর নিকট হাজির হইল তখন আবেদন করিল যে গণিমত হিসাবে যেসব বন্দী এবং মালা-মাল তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা যেন ফেরত দেওয়া হয়। নবীকরিম (ছঃ) কতিপয় কারণ বিবেচনা করিয়া কথা দিলেন যে দুইটি তো ফেরত দেওয়া হইবে না। তবে যে কোন একটি ফেরত দেওয়া যাইতে পারে। মুসলমানদেরকে বলিলেন, আমি উহা-দের বন্দী ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছি, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বেচ্ছায় নিজ অংশ ফেরত দিতে চাও দিতে পারো আর যাহারা স্বেচ্ছায় দিবে না আমি তাহাদের বিনিময় প্রদান করিব। নবীজীর কথা শুনিয়া সবাই বলিল, আমরা স্বেচ্ছায় নিজ দাবী প্রত্যাহার করিতেছি। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, দলের মধ্যে তোমাদের সম্মতির ব্যাপারে খুশী অখুশী বিষয়ে জানা সম্ভব নহে এ কারণে তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করিবে। তাহারা তোমাদের সহিত পৃথক পৃথক আলোচনা করিয়া আমাকে জানাইবে।

(বোখারী)

অন্যের মালামালের ব্যাপারে এরূপ আদর্শের উপস্থাপক এক-মাত্র নবীকরিম (ছঃ)। বহু সংখ্যক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে কাহারো অসম্মতিক্রমে জোর পূর্বক তাহার মালামাল গ্রহণ করা জায়েজ নহে। এ কারণে ওলামায়ে কেরাম জনসমাবেশের লজ্জায় কোন কল্যাণকর কাজে চাঁদা প্রদান ও পছন্দ করেন নাই। কোন সাময়িক আন্দোলনে প্রভাবিত হইয়া কথা ও কাজে নির্ভরযোগ্য ওলামাদের মতামতকে উপেক্ষার ব্যাপারে কিছুতেই সীমা লংঘন করা চলিবে না।

নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই নিকৃষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত যে নাকি অন্যের দুনিয়ার কারণে নিজের আখেরাতের ক্ষতি করিল।

(আবু দাউদ)

কাজেই এ ব্যাপারে সীমা লংঘন সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ধন সম্পদের মধ্যে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু শুধু ওয়াজিব আদায় করিয়া যথেষ্ট হইয়াছে এইরূপ মনে করা উচিত নহে। এ যাবত যাহা আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যে জীবদ্দশায় আল্লাহর পথে ব্যয় করা ধন সম্পদই শুধু কাজে আসিবে। কেননা তাহা আল্লাহর দরবারে সঞ্চিত থাকিবে। মৃত্যুর পর পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা কেহই যথার্থভাবে মনে রাখে না। সাময়িকভাবে বিনা পয়সায় কিছু অশ্রু বিসর্জন দিয়া সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। বছরের পর বছর কাটিয়া গেলেও মৃত ব্যক্তির খবর নিবে না। অনেকে এমন উক্তি করিয়া থাকে যে, আমরা দুনিয়াদাররা ফরয আদায় করিতেছি। ইহাইতো যথেষ্ট, নফল তো বড়লোকদের কাজ। ইহা শয়তানের ধোকা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেহ কি এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করিতে পারিবে যে, আমি আল্লাহর হক পুরাপুরি আদায় করিয়াছি। ত্রুটি থাকিলে তাহা পুরণের জন্য নফল প্রয়োজন।

নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মানুষ নামাজ এমতাবস্থায় আদায় করে যে তাহার জন্য নামাজের এক দশমাংশ লিখিত হয়। নবম, অষ্টম, সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ, তৃতীয়, দুই, এক, অর্ধ ও অংশ লিখিত হয়। (আবু দাউদ)

ইহাত উদাহরণ স্বরূপ নবীজী উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তাহাতে প্রকৃত নামাজের হাজার হাজার অংশের একাংশও লিখিত হয় কিনা সন্দেহ। অন্য এক হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, কোন কোন নামাজ পুরানা কাপড়ের মত জড়াইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করা হইবে যেহেতু তাহার মধ্যে কবুল করার মত কিছু নাই। এমতাবস্থায় আমাদের আদায়কৃত ফরজের কতটুকু লিখিত হয় তাহা বলা শক্ত। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে নামাজের হিসাব লওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের বলিবেন, আমার বান্দার নামাজ দেখ, যথাযথ রহিয়াছে না কি ত্রুটিপূর্ণ। যদি যথাযথ হইয়া থাকে তবে পূর্ণরূপে লিখিয়া দেওয়া হয় আর যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে যতোটা ত্রুটিপূর্ণ তাহা লিখিয়া

দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ বলিলেন, দেখ, তাহার কাছে কোন নফল আছে কি না। যদি নফল থাকে তবে তাহা দিয়া ফরজ পূর্ণ করা হয়। অতঃপর অনুরূপভাবে অন্যান্য আমলের হিসাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে। (আবু দাউদ)

এমতাবস্থায় কাহারো এমন গর্ব করা উচিত নহে যে, আমি হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকি। কত ত্রুটি তাহাতে থাকিয়া যাইতেছে কে জানে? সেই সব ত্রুটি পূরণের জন্য নফল সাদাকাতের সঞ্চয় থাকা দরকার। আদালতে মামলা করিতে গেলে মামলাকারীরা পকেটে সব সময় হিসাব অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টাকার চাইতে বেশী টাকা রাখিয়া দেয়। কখন কি কাজে আসিবে কে জানে। আখেরাতের আদালত সবচেয়ে উচ্চ আদালত। সেখানে মিথ্যা, বাক চাতুরতা, সুপারিশ কিছুই কাজে আসিবে না। আল্লাহর রহমত সব কিছুর উর্ধে। তিনি ন্যায়বিচারক। সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিলেও কাহারো কিছু বলার থাকিবে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত কোন ব্যাপার নহে যে তিনি ক্ষমা করিবেনই। ক্ষমার আশায় অপরাধে লিপ্ত হওয়া যায় না। কাজেই যথাযথভাবে ফরজসমূহ পালন করা দরকার, এবং তাহা করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত নহে, বরং ত্রুটি দূরীকরণের প্রয়োজনে নিজের কাছে নফলের সঞ্চয় রাখা চাই।

আল্লামা সূয়ুতী (রহঃ) মেরকাতুস সুউদ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ৭০টি নফল একটি ফরজের সমতুল্য। কাজেই ফরজ সমূহ যথাযথভাবে আদায় করা দরকার। পাশাপাশি নফলও নিজের আমলনামায় সঞ্চিত রাখিতে হইবে।

উপরোল্লিখিত হাদীছে অন্য একটি কথা রহিয়াছে যে, হারাম মাল সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে সদকা করিলে সেই সদকাতে সওয়াব পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ভাবে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে আল্লাহ তায়ালা হালাল ধন-সম্পদ হইতে প্রদত্ত সদকাই শুধু গ্রহণ করিয়া থাকেন।

একটি হাদীছে রহিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা গলুল মালামালের সদকা কবুল করেন না। গণিমতের ধনসম্পদে খেয়ানতকে গলুল বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, গণিমতের ধন-সম্পদে নিজেরও

অংশ থাকে অথচ সেই ধনসম্পদ খেয়ানত করিলে তাহা হইতে প্রদত্ত সদকা কবুল হইবে না, এমতাবস্থায় নিজের অংশ না থাকা ধন সম্পদের মধ্য হইতে প্রদত্ত সদকা কিছুতেই কবুল হইবে না।

একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহা খরচ করিলেও বরকত পাওয়া যায় না। সদকা করিলে কবুল হয় না, মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে রাখিয়া যাওয়া দোযখের পাথেয় রাখিয়া যাওয়ারই শামিল।

হজরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হালাল ধন সম্পদ উপার্জন করে তাহার যাকাত না দেয়া সেই ধন সম্পদকে অপবিত্র করিয়া দেয় আর যে ব্যক্তি হারাম ধন সম্পদ উপার্জন করে, যাকাত আদায় করিয়া তাহা পবিত্র করা যায় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জাকাত আদায় না করার শাস্তির বিবরণ

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে বহু আয়াত নাজিল হইয়াছে, সে সব আয়াতের কিছু কিছু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অর্থাৎ ধন-সম্পদ খরচ না করার শাস্তির বিবরণের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। ধন সম্পদ খরচ না করার ব্যাপারে যেসব শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে সেসব ওলামা-দের মতে জাকাত আদায় না করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, কেননা যাকাত সর্ব সম্মতিক্রমে ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য।

(১) وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - الاية ٥

অর্থাৎ যাহারা সোনারূপা সঞ্চয় করে এবং আল্লাহর পাথে ব্যয় করেনা।"—এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৫নং এ উল্লেখ করা হইয়াছে। ওলামাদের মতে আয়াতটি যাকাত আদায় না করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। এ আয়াতের মধ্যে যে কঠিন শাস্তির কথা বলা

হইয়াছে তাহা যাকাত আদায় করে না এমন লোকদের উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ)-এর হাদীছেও এ সম্পর্কে সমর্থন পাওয়া যায়, উল্লিখিত আয়াতে এইরূপ শাস্তির কথা উল্লেখ রহিয়াছে যে “যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের ধন-সম্পদ তপ্ত করিয়া তাহাদের কাপলে, পার্শ্বদেশে, প্রভৃতি স্থানে দাগ দেওয়া হইবে। ইহা যাকাত আদায় না করার শাস্তি। পোড়া ধাতুর সামান্য স্পর্শও কী গভীর যন্ত্রণাদায়ক, অথচ যত বেশী ধন সম্পদ থাকিবে ততই বেশী দাগ দেওয়া হইবে। অল্প কিছু দিন এ দুনিয়ায় সোনারূপার কয়েকটি কড়ি রাখার দরুণ কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে।

(২) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ الآية ○

অর্থাৎ এবং আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে যাহারা কৃপণতা করে—।

তরজুমাসহ এ আয়াত দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সমর্থনে বোখারী শরীফে সংকলিত নবীকরিম (ছঃ) এর বাণীও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন সম্পদ দিয়াছেন, অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে না এমতাবস্থায় সেই ধন সম্পদকে সাপ সাজাইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে এই হইতেছে তোমার ধন সম্পদ, কোষাগার। যেই গৃহে কখনো একটি সাপ বাহির হয় আতঙ্কে ভয়ে সে ঘরে অন্ধকারের মধ্যে যাওয়া যায় না, মনে ভয় জাগে, যদি সাপ আসিয়া কামড় দেয়? কিন্তু আল্লাহর পবিত্র রাছুল (ছঃ) বলিতেছেন, এই ধন সম্পদ আজ যাহাকে দুনিয়ায় নিরাপদ কোষাগারে এবং লোহার আলমারীতে আবদ্ধ রাখা হয় ইহার যাকাত আদায় না করিলে কাল (কেয়ামতে) তোমাদেরকে সাপরূপে জড়াইয়া দেওয়া হইবে। ঘরের সাপ দংশন করিবে এমন সম্ভাবনা অনেক সময় থাকে না। তবু মনের আশঙ্কা দূর হইতে চায় না, কোনদিন হয়ত না জানি আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কা এবং বারবার চিন্তার কারণেই ব্যাপারটা

ভুলিয়া থাকা যায় না। অথচ যাকাত আদায় না করিলে শাস্তি অবধারিত কিন্তু তবু আমরা সেই শাস্তির ভয় করিতেছি না।

(৫) اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ ...... وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(قصص ع ٨)

অর্থাৎ "নিশ্চয় এই কারুণ মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তৎপর সে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল, এবং আমি তাহাকে এতধন ভাণ্ডার প্রদান করিয়াছিলাম যে, কয়েক জন শক্তিশালী পুরুষ (তাহার ধন ভাণ্ডার পূর্ণ সিন্দুকের) চাবি সমূহ অতি কষ্টে বহন করিত। যখন তাহাকে তাহার সম্প্রদায় বলিল তুমি উল্লসিত হইও না নিশ্চয় আল্লাহ উল্লাসকারীদের পছন্দ করেন না, তুমি আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ দ্বারা পরকালের শান্তি অনুসন্ধান কর এবং ইহজগতে তোমার অংশও ভুলিও না। আর তুমি পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি উপকার করিয়াছেন। এবং দেশে শান্তি ভঙ্গ করিয়া বেড়াইও না নিশ্চয় আল্লাহ শান্তি ভঙ্গকারীগণকে পছন্দ করেন না। সে বলিল —আমার লব্ধ জ্ঞানবলে আমি উহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সে কি জানিত না যে আল্লাহ তাহার পূর্বে বিনষ্ট করিয়াছেন এমন বহু গোত্রকে যাহারা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সঞ্চয় কারী ছিল? আর পাপীদের অপরাধ সম্বন্ধে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করা হইবে না। অতঃপর সে আড়ম্বরের সহিত স্বীয় সম্প্রদায়ের দিকে বহির্গত হইল। পার্থিব জীবনাকাঙ্খীরা বলিতে লাগিল—আফছোছ! কারুণের মত যদি আমাদিগকেও দান করা হইত! নিশ্চয় সে খুব সৌভাগ্যশালী। আর যাহারা জ্ঞান সম্পদে শক্তিশালী ছিল তাহারা বলিতে লাগিল —রে হতভাগাগণ? আল্লাহর পূণ্য প্রতিদান তাহাদের জন্য শ্রেষ্ঠ যাহারা ধর্মবিশ্বাস করিয়া সৎকার্য করিয়াছে, এবং ইহা ধৈর্য্যশীলগণই পাইয়া থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার অট্টালিকাকে মাটির নীচে প্রোথিত করিলাম, তারপর আল্লাহ ব্যতীত তাহার এমন কোন দল ছিল না যে তাহাকে সাহায্য করে, এবং কোন প্রতিরোধকারীও ছিল না।

যাহারা গতকল্য তাহার মত হওয়ার আকাঙ্খা করিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে বলিতে লাগিল—হায়! আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে প্রচুর আহার্য দেন, অথবা অপ্রচুর দেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ না করিতেন তবে আমরাও কারুণের মত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতাম, হায়! ধর্মদ্রোহীগণ কখনো কামিয়াব হইবে না।"

মুছা (আঃ) ও কারুণের কেচ্ছা

ফায়েদা ঃ হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কারুণ ছিল হজরত মুসা (আঃ) এর চাচাতো ভাই। পার্থিব জ্ঞানে সে প্রভুত উন্নতি করিয়াছিল এবং হজরত মুসা (আঃ) কে হিংসা করিত। হযরত মুসা (আঃ) তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু আমাকে তোমার নিকট হইতে যাকাত আদায় করার আদেশ দিয়াছেন। কারুণ যাকাত দিতে অস্বীকার করিল এবং লোকদেরকে বলিল, মুসা যাকাতের নামে তোমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিতে চায়। সে নামাজের আদেশ দিয়াছে তোমরা তাহা সহ্য করিয়াছ, অন্যান্য আদেশ করিয়াছে তাহাও তোমরা সহ্য করিতেছিলে এবার তোমাদেরকে যাকাত প্রদানের আদেশ করিতেছে, তোমরা কি এ আদেশও সহ্য করিবে? লোকেরা বলিল আমরা সহ্য করিব না তুমি আমাদেরকে এ আদেশ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা বুদ্ধি শিখাইয়া দাও।

কারুণ বলিল আমি বুদ্ধি করিয়াছি যে, একজন অসতী নারীকে এ মর্মে রাজী করাইব যে সে মুসার নামে অপবাদ দিবে যে তিনি আমার সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন। লোকেরা একজন অসতী নারীকে অনেক টাকার লোভ দেখাইয়া রাজি করাইল যে, সে হযরত মুসার (আঃ) নামে অপবাদ দিবে। মেয়েলোকটি রাজী হওয়ার পর কারুণ হজরত মুসার (আঃ) নিকট যাইয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যেসব আদেশ দিয়াছেন সেসব আদেশ বনি ইসরাইলদেরকে সমবেত করিয়া জানাইয়া দিন। হযরত মুসা (আঃ) প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন এবং একদিন বনি ইসরাইলদেরকে এক জায়গায় সমবেত করিলেন।

সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন আল্লাহ

আমাকে তাঁহার সহিত অন্য কাউকে শরীক না করার আদেশ দিয়াছেন, নিকটাত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়াছেন। বিবাহিত কোন লোক ব্যভিচার করিলে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যার (সঙ্গেসার) আদেশ দিয়াছেন। এ সময় লোকেরা বলিল, যদি আপনি নিজে ব্যভিচার করেন তাহলে? হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন। আমার প্রতিও সেই আদেশ কার্যকর হইবে। অর্থাৎ আমাকেও পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হইবে। সবাই বলিল আপনি ব্যভিচার করিয়াছেন হজরত মুসা (আঃ) অবাক হইয়া বলিলেন, আমি? তাহারা বলিল হ্যাঁ আপনি। একথা বলিয়া তাহারা মেয়েলোকটিকে ডাকিয়া বলিল, তুমি হজরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? হজরত মুসা (আঃ) তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করেন তখন সে সত্য কথা বলিল। প্রকৃত কথা এই যে, ওরা আমাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আপনার প্রতি অপবাদ দেওয়ার জন্য রাজী করাইয়াছে। আপনি এ অপবাদ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র।

একথা শুনিয়া হজরত মুসা (আঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে সেজদায় গেলেন আল্লাহর পক্ষ হইতে সেজদাতেই ওহী নাজিল হইল যে, কাঁদিবার কি আছে। উহাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি ভূ-পৃষ্ঠকে আজ্ঞাবহ করিয়া দিয়াছি, তুমি যাহা চাও সে সম্পর্কে ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ কর। হজরত মুসা (আঃ) ছেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া হুকুম করিলেন হে জমীন। তাহাদিগকে গিলিয়া ফেল। সাথে সাথে জমীন প্রথমে তাহাদের পায়ের গোড়ালী গিলিয়া ফেলিল, ইহাতে অনুনয় বিনয় করিয়া তাহারা হজরত মুসা (আঃ)-কে ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) আবার আদেশ করিলেন, বক্ষে ধারণ করিয়া ফেলো ভূ-পৃষ্ঠ তাহাদের কণ্ঠনালি পর্যন্ত গিলিয়া ফেলিল। তাহারা তখন জোরে সোরে হজরত মুসাকে (আঃ) ডাকিতে লাগিল। হজরত মুসা (আঃ) পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠকে আদেশ করিলেন, গিলিয়া ফেল। ভূ-পৃষ্ঠ তখন তাহাদেরকে গিলিয়া ফেলিল। আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসার (আঃ) কাছে অহী পাঠাইলেন যে, ওরা তোমার নিকট যতবার মিনতি জানাইতেছিল, তোমাকে ডাকিতেছিল, আমার ইজ্জতের কছম যদি তাহারা ঐভাবে আমাকে ডাকিত তবে আমি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিতাম। তাহাদের দোয়া কবুল করিতাম।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, আয়াতে বলা হইয়াছে "দুনিয়ায় নিজ অংশ ভুলিয়া যাইও না" অর্থ হইতেছে আখেরাতের জন্য আমল কর। হজরত মোজাহেদ (রহঃ) বলেন, আল্লাহর আনুগত্য করা দুনিয়ার সেই অংশ যেখানে আখেরাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে দুনিয়ায় যাহা প্রয়োজন তাহা অবশিষ্ট রাখ, যাহা অতিরিক্ত আছে তাহা সামনে পাঠাইয়া দাও। অন্য এক হাদীছে হজরত হাসান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে এক বছরের রুজী বাকী রাখিয়া ইহার অধিক যাহা আছে তাহা ছদকা করিয়া দাও। (দুররে মনছুর) ইহার কিছু অংশ কৃপণতার বর্ণনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৮নং আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীছ

(১) عن ابى هريرة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت اعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار-

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের মালিকানা লাভ করিবে অথচ উহার হক আদায় করিবে না কেয়ামতের দিন সেই স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত বানাইয়া দোজখের আগুনে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হইবে যেন আগুনের পাত। তারপর ঐসব পাত দিয়া মালিকের বাহু, কপাল ও কোমরে দাগ দেওয়া হইবে। বারবার দাগ দেওয়া হইবে কেয়ামতের এমন এক দিন যাহার পরিমাণ দুনিয়ার হিসাব অনুযায়ী ৫০ হাজার বছর। অতঃপর সেই ব্যক্তি বেহেশত বা দোজখ যেখানে যাওয়ার চলিয়া যাইবে।

ফায়েদা ঃ এ হাদীছটি খুব দীর্ঘ। এখানে উটের মালিককে উটের যাকাত না দেওয়ার শাস্তি এবং সে শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে সাধারণত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার মত পশু কাহারো মালিকানাভুক্ত থাকে না। আরব দেশে উহাদের

সংখ্যাধিক্য ছিল। তবে স্বর্ণ চাঁদী এবং তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিস এখানে সাধারণভাবে হয় একারণে উপরোল্লিখিত হাদীছের অংশ বিশেষ তুলিয়া ধরাই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতেই জাকাত পরিশোধ না করার পরিণাম সম্পর্কে জানা যায়। স্বর্ণ রৌপ্য আগুনে উত্তপ্ত করিয়া শাস্তি প্রদানের যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কেয়ামতের একদিনের শাস্তি, কিন্তু সেই দিনের মেয়াদ ও দুনিয়ার হিসাবে ৫০ হাজার বছর হইবে। এত মারাত্মক শাস্তি প্রদানের পর যদি তাহার অন্যান্য আমল এইরূপ হইয়া থাকে যে, সেসব আমল অনুযায়ী ক্ষমা পাইয়া সে বেহেশতে যাইতে পারে অথবা যদি বেহেশতে যাওয়ার উপযুক্ত না হয় ও ক্ষমা পাওয়ার উপযুক্ত না হয় অথবা যাকাত না দেওয়ার কারণে আরো কিছু শাস্তি এখনো অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে তবে দোজখে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইবে এবং যেইরূপ শাস্তি সেখানে দেওয়া হইবে তাহা বলিবার ও লিখিবার মত নহে। অর্থাৎ তাহা বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নহে।

এই আয়াতে কেয়ামতের দিনের পরিমাণ ৫০ হাজার বছর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোরানে ছুরা মায়েরেজের প্রথম দিকেই কেয়ামতের দিনের অনুরূপ পরিমাণের কথা উল্লেখ রহিয়াছে, কিন্তু কোন কোন হাদীছে, রহিয়াছে, আল্লাহর অনুগত বান্দাদের জন্য সেই (৫০ হাজার বছর) সময় এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করিবার মতই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। কাহারো কাহারো আমল অনুযায়ী জোহর হইতে আছরের সময়ের মত অতিবাহিত হইবে। (দুররে মানছুর) এত তাড়াতাড়ি সময় কাটিয়া যাওয়ার অর্থ হইতেছে সেইদিন তাহারা এখানে সেখানে ভ্রমণে ব্যস্ত থাকিবে। সুখ ও আনন্দের সময় অল্পতেই ফুরাইয়া যায় একথা কে না জানে।

একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন। এমন নহে যে টাকার উপর টাকা স্বর্ণ মুদ্রার উপর স্বর্ণমুদ্রা রাখা হইবে বরং শাস্তিভোগকারীদের দেহ বিস্তৃত করিয়া সমভাব দেহের বিভিন্ন অংশে এইসব স্বর্ণ চাঁদী রাখা হইবে তারপর তাহাদের বলা হইবে যে নিজেদের খাজিনার স্বাদ গ্রহণ কর।

হজরত ছাওবান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যত স্বর্ণচাঁদী

তাহার নিকট থাকিবে তাহার প্রতি কিরাত এক একটি আগুণের টুকরায় পরিণত করা হইবে। তারপর তাহার দেহের সকল অংশে দাগ দেওয়া হইবে। অতঃপর হয়ত তাহাকে ক্ষমা করা হইবে অথবা দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। (দুররে মানছুর)

আগুনে উত্তপ্ত করিয়া যে শাস্তি দেওয়ার কথা পবিত্র হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অন্য আয়াতেও এসম্পর্কে উল্লেখ করা হইতেছে। কোন কোন হাদীছে, ধন-সম্পদ সাপ বানাইয়া শিকলের মত গলায় পরাইয়া দেওয়ার কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। এ সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হইতেছে।

(২) عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكوته مثل له ماله يوم القيمة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيمة ثم ياخذ بلهزمتيه يعنى شدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الاية ○

অর্থাৎ রাছুলে মকবুল (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ জাল্লাশানুহু যেই ব্যক্তিকে ধন সম্পদ দিয়াছেন অথচ সে উক্ত ধন সম্পদের যাকাত আদায় করে নাই সেই ধন সম্পদ কেয়ামতের দিন একটি সাপে পরিণত করা হইবে সেই সাপ গুঞ্জা হইবে এবং তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। তারপর সেই সাপ যাকাত আদায় না করা ব্যক্তির গলায় শিকলের মত পরাইয়া দেওয়া হইবে। সেই সাপ লোকটির মুখের দুইদিকে কামড়াইয়া ধরিয়া বলিবে, আমি তোমার ধন-সম্পদ তোমার কোষাগার। অতঃপর নবী করিম (ছঃ) কোরানের এ আয়াত পড়িলেন যেখানে বলা হইয়াছে, "যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করে—।"

ফায়েদা ঃ এ আয়াতটি অর্থসহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই সাপের একটি বৈশিষ্ট এই যে সুজা হইবে। ইহাতে কোন কোন আলেম পুরুষ প্রজাতির সাপকে বুঝাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন সুজা এমন সাপকে বলা হয় যে সাপ লেজের উপর খাড়া হইয়া মোকাবিলা করে। (ফতহুল বারী)

এই সাপের অন্য একটি বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলেমগণ বলিয়াছেন

এই সাপ গুঞ্জা হইবে, গুঞ্জা বলার কারণ এই যে সাপ অত্যন্ত বিষধর হইলে তাহার মাথার লোম উঠিয়া যায়। তৃতীয় বৈশিষ্ট বলা হইয়াছে যে তাহার মাথায় দুইটি কালো বিন্দু থাকিবে। কালো দুইটি বিন্দু মাত্রার দ্বারাও সাপের অত্যন্ত বিষধর হওয়া বুঝায়। এই ধরনের সাপের বয়স খুব বেশী হইয়া থাকে। কোন কোন ওলামা দুইটি বিন্দুর বদলে সাপের মুখে বিষের আধিক্যে ফেনা বাহির হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কেহ কেহ সাপের মুখের দুই দিকের দাঁতের কথা অর্থ করিয়াছেন। কেহ কেহ মুখের দুই পাশে ঝুলন্ত দুইটি বিশেষ থলি অর্থ করিয়াছেন।

(কতহুল বারী)

এ হাদীছে যাকাত না দেয়ার কারণে সেই ধন-সম্পদের শিকল পরানোর উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম হাদীছে আগুনের পাত দিয়া দাগ দেওয়ার কথা ছিল। উভয় প্রকার শাস্তির কথাই কোরানের দুই জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। উভয় প্রকার আজাবের মধ্যে কোন বিরোধ বুঝা যায় না। বিভিন্ন সময়ের প্রেক্ষিতে আজাবের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে আবার উভয় আজাব একই সঙ্গে হইতে পারে।

শাহ অলিউল্লাহ (রহঃ) হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, সাপ হইয়া পিছনে লাগা এবং আগুনের পাত তৈরী করিয়া দাগ দেওয়ার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, মানুষ যদি সকল প্রকার মালামালের প্রতিই ভালাবাসা পোষণ করে, বিশেষ শ্রেণীর মালামালের প্রতি তাহার দুর্বলতা না থাকে তবে তাহার মালামাল একটি জিনিস হইয়া তাহার পিছনে লাগিবে। আর যে ব্যক্তি মালামালের শ্রেণী বিভাগের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, যাহা কিছু পায় সেগুলো বিশেষ প্রকারের মুদ্রায় পরিণত করিয়া সঞ্চয় করে তবে তাহার ধন সম্পদ বানাইয়া তাহাকে দাগ দেওয়া হইবে। একটি হাদীছে রহিয়াছে, যাহারা মৃত্যুর পর ধন ভাণ্ডার রাখিয়া যায় সেই ধন ভাণ্ডার একটি গুঞ্জা দুই বিন্দুবিশিষ্ট সাপ হইয়া কেয়ামতের দিন তাহার পিছনে লাগিয়া যাইবে। সেই ব্যক্তি ভয় পাইয়া বলিবে তুমি আমার কোন বিপদ। সে বলিবে, আমি তোমার পরিত্যক্ত ধন-ভাণ্ডার। সেই সাপ প্রথমে লোকটির হাত খাইয়া ফেলিবে, তারপর সমগ্র দেহ ভক্ষণ

করিবে। (তারগীব)

কেয়ামতের শাস্তির ব্যাপারে বিভিন্নভাবে এটা উল্লেখ রহিয়াছে যে, শাস্তির কারণে কোন কোন লোক টুকরা টুকরা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে পুনরায় তাহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাহার পূর্বাবস্থায় আপনি আপনি তৈরী হইয়া যাইবে।

(৩) عن عبد الله بن مسعود (رض) قال امرنا باقام الصلوة وايتاء الزكوة ومن لم يزك فلا صلوة له ٥

অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমাদেরকে নামাজ কায়েম করিতে এবং যাকাত পরিশোধ করিতে বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ না করে তাহার নামাজ কবুল হয় না।

ফায়েদা ঃ অর্থাৎ নামাজ আদায় করিলে যে পুণ্য আল্লাহর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে যাকাত পরিশোধ না করিলে তাহাও মিলিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে ব্যক্তি জাকাত পরিশোধ না করে সে (পরিপূর্ণ) মুসলমান নহে। তাহার নেক আমল তাহার উপকারে আসিবে না। (তারগীব)

অর্থাৎ অন্যান্য পুণ্য বা নেক কাজ যাকাত পরিশোধ না করার শাস্তি টলাইতে পারিবে না। অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, যাকাত পরিশোধ ব্যতীত দ্বীন পূর্ণ হয় না। (কানজ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালা সেই লোকের নামাজ কবুল করে না যে ব্যক্তি যাকাত দেয় না। আল্লাহ তায়ালা নামাজ এবং যাকাত একত্র ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কাজেই উহাকে পৃথক করিও না। (কানজ)

পৃথক করার অর্থ হইতেছে নামাজ আদায় করিয়া যাকাত প্রদান না করা।

(৪) عن على (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله فرض على اغنياء المسلمين فى اموالهم القدر الذى يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا اواعروا الا بما يمنع اغنياءهم الا وان الله يحاسبهم

حسابا شديدا او يعذبهم عذابا اليما ০

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের উপর তাহাদের ধন-সম্পদের মধ্যে সেই পরিমাণই ফরজ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট এবং তাহাদিগকে ক্ষুধার্ত ও নগ্ন থাকা অবস্থায় তাহাদের কষ্টের মধ্যে না ফেলে। কিন্তু বিত্তবানেরা সেই পরিমাণ ও আটক করিয়া রাখে। ভালোভাবে শুনিয়া রাখ আল্লাহ তায়ালা বিত্তবানদের নিকট হইতে কঠিন হিসাব গ্রহণ করিবেন।

ফায়েদা ঃ আল্লাহ তায়ালা গায়েবের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্বেও যাকাতের যেই পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। যদি এই পরিমাণ যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা হয় এবং ধনীদের নিকট হইতে তোলা হয় তাহা হইলে কোন মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না এবং পোষাকের অসুবিধা কাহারও থাকিবে না।

হজরত আবুজর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে এসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। ফকীহ আবুল লায়ছ সমরকন্দী (রাঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে এ হাদীছে উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য প্রশ্নের সহিত সেখানে এ প্রশ্নও ছিল যে আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রাছুল আপনি যাকাতের আদেশ দিয়াছেন, এই যাকাত কি? নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, আবুজর যে ব্যক্তি আমানতদার নহে তাহার ঈমান নাই। যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাহার নামাজও নাই। (অর্থাৎ কবুল হয় না)! আল্লাহ তায়ালা ধনীদের উপর যাকাতের এমন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাদের ধন-সম্পদের যাকাত দাবী করিবেন। এবং তাহাদের শাস্তি দিবেন।

এ হাদীছ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, নবীকরিম (ছঃ) শুধু যাকাতের কথাই বলিয়াছেন, ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এহইয়াউল উলুম গৃন্থে লিখিয়াছেন, যাকাত পরিশোধে যাহারা অমনোযোগী আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কঠিন শাস্তির কথা বলিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যাহারা সোনারূপা কুক্ষিগত করিয়া রাখে —। আল্লাহর রাহে খরচ করা অর্থ হইল যাকাত পরিশোধ করা। যাকাত তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী

৬ প্রকার। পশুদের যাকাত, সোনারূপার যাকাত, বাণিজ্যক মালা-মালের যাকাত, খনিজ সম্পদের যাকাত, উৎপাদিত শস্যের যাকাত এবং সদকাতুল ফেতের।

এক মাত্র খনিজ সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য প্রভৃত্তির যাকাত সম্পর্কে চারজন ইমাম ঐক্যমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে এক পঞ্চমাংশ দান করিতে হইবে। ইহা ওয়াজিব। এই ওয়াজিব হওয়া যাকাতেরই অনুরূপ।

ধনী ব্যক্তিরা যদি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এ সকল কিছুর যাকাত পরিশোধ করে তবে কোন গরীবকে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতে হইবে না এবং পোষাকের অভাবে নগ্ন থাকিতে হইবে না। কোন কোন ওলামা হজরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীছ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে যাকাতের চাইতে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করাই উদ্দেশ্য। এটা ঠিক নহে। কেননা এটা ঠিক হইলে হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত অন্য একটি হাদীছের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না। সেখানে রহিয়াছে যে, নবী করিমের (ছঃ) বাণী হজরত আলী (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা, মনছুখ হইয়া গিয়াছে। এ হাদীছটি মারফু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইমাম রাজী (রহঃ) আহকামুল কোরানে, হজরত আলীর (রাঃ) বক্তব্য উৎকৃষ্ট সূত্র হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কানজুল আমাল গ্রন্থের লেখক বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে এ বর্ণনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। হাদীছের বক্তব্য হইতেছে কোরানে বর্ণিত অন্যান্য সদকাকে যাকাত মনছুখ করিয়া দিয়াছে। অপবিত্রতা হইতে পবিত্র হওয়ার গোসল অন্যান্য গোসলকে মনছুখ করিয়াছে রমজানের রোজা অন্যান্য রোজাকে মনছুখ করিয়াছে কোরবাণী অন্যান্য জবাইকে মনছুখ করিয়াছে। হজরত আলী (রাঃ) নিজে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমগ্র পৃথিবীর ধন-সম্পদ ও গ্রহণ করে সে ব্যক্তি পরহেজগার।

কোন কোন ওলামা লিখিয়াছেন, যাকাত ফরজ হইবার আগে নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন সম্পদ খরচ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যাকা-

তের বিধান তাহা বাতিল করিয়া দিয়াছে। আল্লামা সূয়ুতী (রহঃ) সূরা আরাফের ২৪ রুকুতে যাকাত সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যায় একথা ছুদ্দী (রহঃ) হইতে নকল করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বারা যদি ওয়াজিব বুঝানো হয় তবে তাহাও মনছুখ। উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা যাকাতের অধিক অর্থ গ্রহণ করা যে বুঝায়নি নবীজীর অন্য হাদীছে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। সে হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যাকাত পরিশোধ করিল সে তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করিল। অতিরিক্ত যাহা দান করা হইল তাহা উত্তম কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

এ ধরনের অনেক বর্ণনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছ ইহার চাইতে স্পষ্ট বক্তব্য সম্বলিত এবং তাহা হজরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের সমর্থক সে হাদীছে নবীজী বলিয়াছেন, যদি এটা আল্লাহ পাক বুঝিতেন যে ধনীদের অর্থ সম্পদের নির্ধারিত যাকাত গরীবদের জন্য যথেষ্ট হইবে না তবে তাহাদের জন্য অন্য জিনিস ও ফরজ করিয়া দিতেন। কাজেই গরীবরা যদি এখন ক্ষুধার্ত থাকে তবে ধনীদের কারণেই থাকে। (কানুজ)

অর্থাৎ ধনীরা নিয়মিত যাকাত আদায় না করার কারণেই গরীবদের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এ কারণেই মোহাদ্দেছ হায়ছামী (রাঃ) মাজমাউজ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে হজরত আলীর (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছের দ্বারা যাকাত ফরজ বলিয়াছেন। এমন কি এ হাদীছ দ্বারাই তিনি যাকাত সংক্রান্ত অধ্যায় শুরু করেন।

কানজুল ওম্মাল গ্রন্থের লেখকও এ কারণেই কিতাবুজ যাকাত শীর্ষক অধ্যায়ে এ হাদীছ উল্লেখ করেন। হাফেজ ইবনে আবদুল বার (রাঃ) লিখিয়াছেন, যাহারা সোনা-রূপা কুক্ষিগত করে—কোরানের এ আয়াত এবং এ ধরণের অন্যান্য আয়াতের দ্বারা যাহারা যাকাত আদায় করে না তাহাদের কথাই বলা হইয়াছে। ফেকাবিদগণ এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। হজরত ওমর, ইবনে ওমর, হজরত জাবের ইবনে মাসুদ (রাঃ) এ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। এর সমর্থনে আবু দাউদ শরীফে সংকলিত একটি হাদীছ লক্ষ্যণীয়। উক্ত হাদীছে বলা হইয়াছে,

হজরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন আমি সোনার একটি অলঙ্কার পরিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় নবীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহাও কি কুক্ষিগত করণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, যে জিনিস যাকাতের পরিমাণে পৌছে এবং তাহার যাকাত আদায় করা হয় সে জিনিস কুক্ষিগত করনের আওতায় পড়িবে না। তিরমিজি এবং হাকেমে উল্লেখিত আবু হোরায়রার (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও ইহার সমর্থন রহিয়াছে। উক্ত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে, তোমার উপর অরোপিত ওয়াজিব পালন করিয়াছ। হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলেন, তুমি যাকাত পরিশোধ করিলে সেই ধন-সম্পদের অনিষ্টকারীতা দুর করিয়া দিয়াছ। হাকেম (রহঃ) এ হাদীছকে 'মারুফ' বলিয়া উল্লেখ করেন, বায়হাকী (রহঃ) হজরত জাবেরের (রাঃ) বরাত দিয়া ইহাকে মওকুফ বলিয়াছেন। আবু জোরয়াও (রহঃ) হজরত জাবেরের বরাত দিয়া মওকুফ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তবে তাঁহার উল্লেখিত হাদীছে এ কথা ও রহিয়াছে যে, যে ধন-সম্পদের যাকাত আদায় করা হয় তাহা কান্জ (কুক্ষিগত) নহে।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট হইতেও এইরূপ নকল করা হইয়াছে যে, যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হইয়াছে তাহা ভূ-গর্ভের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেও তাহা কুক্ষিগত করণ হইবে না। পক্ষান্তরে যে ধন সম্পদের যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা মাটির উপর থাকিলেও কুক্ষিগত করণ অর্থাৎ কান্জ এর অন্তর্ভুক্ত হইবে। আভিধানিক পরিভাষায় যদিও মাটির তলায় রাখা ধন-সম্পদকে কান্জ বলা হয় কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় তাহা কানজ হইবে না। যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই তাহা যে কান্জ অর্থাৎ কুক্ষিগত করণ এর বিরুদ্ধ মতামতকারীদের সংখ্যা আমি বেশী দেখি নাই। অবশ্য হজরত আলী (রাঃ) হজরত আবুজর (রাঃ) হজরত জহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য কয়েকজন বুজুর্গ অভিমত প্রকাশ করেন যে, যাকাত ছাড়াও ধণ-সম্পদের মধ্যে কিছু হকুক রহিয়াছে। হজরত আবুজর (রাঃ) এমন অভিমত প্রকাশ করেন যে, যেই ধন সম্পদ রুজি এবং জীবন যাপনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহাই কান্জ

বলিয়া গণ্য হইবে। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, চার হাজার দিরহামের অধিকই কান্জ। জহাক (রাঃ) বলেন, দশ হাজার দিরহাম পরিমাণের ধন-সম্পদ অধিক বলিয়া গণ্য হইবে! ইব্রাহীম নাখায়ী, মোজাহেদ সা'বী এবং হাছান বছরীও বলিয়াছেন, ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়াও অন্য অধিকার (হকুক) রহিয়াছে।

ইবনে আবদুল বার (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যসব পুর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামা অভিমত প্রকাশ করেন যে, ইতিপূর্বে যেই মতামত উল্লেখ হইয়াছে তাহাই কান্জ (কুক্ষিগত করন) অর্থাৎ যাহার যাকাত পরিশোধ করা হয় নাই। সেই সকল আয়াত ও হাদীছ হইতে দ্বিতীয় দলের ওলামায়ে কেরাম অভিমত দিয়াছেন, জমহুরে ওলামার মতে তাহা আল্লাহর প্রতি অধিক ভালোবাসা প্রকাশ অথবা যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বেকার নির্দেশ, যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পর এই নির্দেশ মনছুখ হইয়া গিয়াছে। রমজানের রোজার বিধান নাজিল হওয়ার পর যেমন আশুরার রোজা মনছুখ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ফজিলত এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। (ইতহাফ)

ইহার সমর্থনে হজরতের পরবর্তী একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) মদীনায় আনসার মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করিয়া দেওয়ার পর আনসারগণ আবেদন করিলেন যে আমাদের ধন সম্পদ ও তাহাদের মধ্যে অর্ধেক হিসাবে বন্টন করিয়া দিন। নবীকরিম (ছঃ) তাহা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে, আনসারগণ মুজাহিদদের বাগানে কাজ করিবে এবং ইহাতে তাহারা বাগানের ফলের অংশ লাভ করিবে। সেই সময়ে নবীকরিম (ছঃ) হজরত সা'দ (রাঃ) এবং হজরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রাঃ) মধ্যে ভাই বন্ধুত্ব পাতাইয়া দিলেন। হজরত সা'দ (রাঃ) আবদুর রহমানকে (রাঃ) বলিলেন সবাই জানে যে, আমি আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য। আমি নিজের ধন সম্পদের অর্ধেক তোমাকে ভাগ করিয়া দিতে চাই। হজরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন, আমাকে বাজারের পথ বলিয়া দাও। তার পর তিনি বাজারে যাইয়া

জিনিস পত্র ক্রয় বিক্রয়ের কাজ শুরু করিলেন। যদি ধনিদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদে গরীবদের বাধাহীন অধিকার থাকিত? কেনই বা আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁহার অধিকার গ্রহণে রাজি হইলেন না। আর হুজুর (ছঃ) ও আনছারদের প্রস্তাবিত সমভাবে বন্টনে অস্বীকৃতি জানাইলেন।

আসহাবে সুফফার ঘটনাবলী হাদীছের গ্রন্থাবলী এবং সীরাত গ্রন্থাবলীতে এতো বেশী সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যাহা হিসাব করা মুশকিল। তাঁহারা কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকিতেন। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেন। অথচ আনসারদের মধ্যে অনেক ধনাঢ্য মুসলমানও ছিলেন কিন্তু হুজুর বলেন নাই যে নিজের প্রায়োজনের অধিক ধন-সম্পদ আছহাবে সুফফার মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। অবশ্য নবীজী এমনিতে তাহাদেরকে দান করার জন্য প্রায়ই তাগিদ দিতেন।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন; আসহাবে সুফফার সংখ্যা ছিল ৭০ জন তাহাদের কাহারো নিকটেই চাদর ছিল না। (দুররে মনসুর)

হুজুর (ছঃ)-এর মো'জেজা

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) নিজের এ সংক্রান্ত ঘটনা এই ভাবে বর্ণনা করেন যে সেই খোদার কছম যিনি ব্যতীত উপাস্য নাই আমি ক্ষুধার যাতনায় ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম কখনো পেটে পাথর বাঁধিতাম। একবার রাস্তার পাশে পড়িয়া রহিলাম যে হয়তো কেহ আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পর হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন আমি কোরানের একটি আয়াত সম্পর্কে তাঁহাকে এ উদ্দেশ্যেই জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি এমনিতেই চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর নবী করিম (ছঃ) আগমন করিলেন এবং আমার অবস্থা দেখিয়া মৃদু হাসিলেন, তারপর বলিলেন আমার সহিত চল। আমি হুজুরের সাথে সাথে চলিলাম, হুজুর (ছঃ) ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে এক পেয়ালা দুধ রাখা হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে। তাঁহাকে বলা হইল অমুক ব্যক্তি হাদিয়া হিসাবে (উপঢৌকন) পাঠাইয়াছেন। নবীজী বলিলেন, আবু

হোরায়রা, ছুফ্ফার সবাইকে ডাকিয়া আন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে ছোফ্ফা ছিলেন ইসলামী মেহমান, নবীজীর পরিবারের কেহ ছিলেন না, তাঁহাদের নিকট অর্থ সম্পদ কিছুই ছিল না, না ছিল পরিবার পরিজন, তাঁহাদের অন্ন বস্ত্রের দায়িত্ব কাহারো উপর ন্যস্ত ছিল না। নবীজীর নিকট কোথাও হইতে সদকা স্বরূপ মালামাল আসিলে তাহা আহলে ছোফফার মধ্যে বন্টন করিয়া দিতেন, নিজে তাহা হইতে গ্রহণ করিতেন না। হাদীয়া স্বরূপ কিছু আসিলে তিনি নিজে তাহা আহার করিতেন এবং অন্যদেরকেও দিতেন। আসহাবে ছোফফাকে ডাকিতে বলায় মনে মনে আমি কিছুটা ক্ষুন্ন বোধ করিলাম, বলিলাম, এক পেয়ালা দুধে আহলে ছুফফার কি হইবে? নবীজী আমাকে দিতেন তবে আমি তাহা পান করিয়া কিছুটা ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, এখন আমি তাহাদের আনিলে নবীজী আমাকেই বলিবেন, সবাইকে পান করাও। বন্টনকারী হিসাবে আমার নম্বর সংখ্যা শেষে আসিবে, তখন কতটুকু অবশিষ্ট থাকিবে কে জানে। কিন্তু নবীজীর আদেশ না মানিয়া উপায় ছিল না। আমি সবাইকে ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহারা আসিবার পর নবীজী আমাকে আদেশ করিলেন, সবাইকে পান করাও। আমি সবাইকে তৃপ্তি সহকারে পান করাইলাম। অবশেষে নবীজী বলিলেন, আবু হোরায়রা, এবার আমি আর তুমি বাকি রহিয়াছি। আমি আরজ করিলাম জী নবীজী বলিলেন, নাও বসিয়া পড় পান কর। আমি তৃপ্তির সহিত পান করিলাম নবীজী বলিলেন, আরো পান কর। আমি আরো পান করিলাম। নবীজী আবার বলিলেন, আমার পক্ষে আর সম্ভবপর নহে। অবশিষ্ট দুধ নবীজী পান করিলেন।

অন্য এক দিনের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, তিন দিন যাবত আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, ছোফফায় যাওয়ার পথে ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। বালকেরা বলাবলি করিল আবু হোরায়রাকে মাতলামীতে পাইয়াছে। আমি বলিলাম তোমাদিগকে মাতলামীতে পাইয়াছে। ছোফফায় গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে নবী করিম (ছঃ) এর নিকট দুই পাত্র 'ছারিদ' (গোশত রুটি মিশ্রিত) খাবার কোথাও

হইতে আসিয়াছিল। নবীজী আসহাবে ছুফফাকে তাহা খাওয়াইতেছিলেন। আমি উপরের দিকে মুখ তুলিলে নবীজী আমাকে ডাকিলেন। ইতিমধ্যে সবার আহার শেষ হইয়া গিয়াছে। পাত্রে তেমন কিছুই ছিল না। নবী করিম (ছঃ) পাত্র দুইটি চারিদিক হইতে আঙ্গুল দিয়া মুছিলে এক লোকমা পরিমাণ খাদ্য পাওয়া গেল। নবীজী তাঁহার আঙ্গুলের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া ইহা খাও। আমি তাহা খাইলাম। ইহাতে আমার পেট ভরিয়া গেল।

হজরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) প্রত্যুষে নামাজ পড়িতে গেলে আছহাবে ছোফফার মধ্যে কেহ কেহ চরম ক্ষুধায় পড়িয়া যাইতেন। নবী করিম (ছঃ) তাহাদের প্রতি তাকাইয়া বলিতেন আল্লাহর নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে যদি তোমরা অবহিত হইতে তবে ইহার চাইতে অধিক ক্ষুধার কষ্ট ও স্বীকার করিতে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোজার গোত্রের একটি ঘটনা বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) নিজের গৃহে তাদের জন্য সন্ধান করিয়াও কিছু পাইলেন না। সবাইকে একত্রিত করিয়া তিনি সদকা প্রদানের তাগিদ দিলেন এবং ভালোভাবে তাগিদ দিলেন। ইহাতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী দুই স্তপে পরিণত হইল। এই দ্রব্য সামগ্রী নবীজী সমভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন। দান আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার জোরজবরদস্তি ও করিলেন না কাহারো উপর চাপও দিলেন না।

প্রিয় নবী (ছঃ) এর অপূর্ব শিক্ষা

হজরত আনাস (রাঃ) বলেন, একজন আনসার আসিয়া নবী করিম (ছঃ) এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। নবীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? সে বলিল, একটি চট আছে, অর্ধেক বিছাইয়া শয়ন করি অর্ধেক গায়ে দেই। পানি পান করার একটি পেয়ালা আছে। নবকরিম (ছঃ) এই দুইটি জিনিস দুই দিরহাম মূল্যে বিক্রি করিলেন। এক দিরহাম লোকটির হাত দিয়া নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহা দিয়া বাসায় খাবার কিনিয়া নিবে অন্য এক দিরহাম দিয়া বলিলেন এই দিরহাম নিয়া একখানা কুঠার কিনিয়া আনিবে।

কুঠার কিনিয়া আনার পর নবীজী নিজহাতে হাতল লাগাইয়া দিলেন। তারপর তাহাকে দিয়া বলিলেন, তুমি এই কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে, পনের দিন যেন তোমাকে এখানে না দেখি। পনের দিন পর লোকটি দশ দিরহাম উপার্জন করিয়া নবীজীর দরবারে আসিল। সে জানাইল যে, এই অর্থ দিয়া সে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং কিছু কাপড় ক্রয় করিবে। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন ভিক্ষা করার চাইতে এই কাজ উত্তম। তুমি ভিক্ষা করিলে তোমার চেহারায় কেয়ামতের দিন দাগ থাকিয়া যাইবে। অতঃপর নবীজী বলিলেন, তিনজন লোকের ভিক্ষা করার অবকাশ রহিয়াছে। (১) এমন ব্যক্তি ক্ষুধায় যাহার মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দেয় (২) এমন ব্যক্তি যাহার উপর কোন ঋণ মারাত্মক হইয়া দেখা দেয় (৩) এমন ব্যক্তি যে নাকি বেদনাদায়ক কোন খুনের ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ে। এ তিন অবস্থায় নবীকরিম (ছঃ) ভিক্ষার অনুমতি দেন, এবং উক্ত লোকটিকে দান করার জন্য কাউকে আদেশও প্রদান করেন নাই। মোটকথা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের বহু ঘটনায় এ সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে ওয়াজিবের যতোটা সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা হইতেছে শুধু যাকাত। ইহার সহিত নবীজীর এ কথাও সন্নিবেশিত হইয়াছে যে সদকার ক্ষেত্রে কমবেশী করা ব্যক্তি সদকা প্রদান না করারই শামিল হবে।

জহাক ইবনে কয়েছকে নবীকরিম (ছঃ) সদকা আদায়ের জন্য প্রেরণ করিলে তিনি উত্তম উট বাছাই করিয়া আনেন। নবী করিম (ছঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন তুমি উহাদের উৎকৃষ্ট মালামাল লইয়া আসিয়াছ। জহাক (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর রাসূল আপনি জেহাদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছেন, একারণে আমি এমন উট আনিয়াছি, যে উট ছওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং যাহার পিঠে সাজসরঞ্জাম বোঝাই করা যায়। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন এগুলো ফিরাইয়া দিয়া আস এবং সাধারণ জিনিস লইয়া আস। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

জেহাদের প্রয়োজনীয়তায় নবীকরিম (ছঃ) এমন জোরে উৎসাহ দিলেন যে হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার গৃহের অর্ধেক সাজ সরঞ্জাম লইয়া আসিলেন। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ

(রাঃ) একবার বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমার নিকট-চার হাজার দিরহাম রহিয়াছে। পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য দুই হাজার দিরহাম রাখিয়া আসিয়াছি। আর দুই হাজার দিরহাম আল্লাহর জন্য লইয়া আসিয়াছি। অন্য একজন সাহাবী নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল সারারাত মজুরী করিয়া আমি দুই সাআ (সাতসের) খেজুর পাইয়াছি অর্ধেক রাখিয়া বাকী অর্ধেক লইয়া আসিয়াছি?

(দুররে মনছুর)

হজরত আবু মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) সদকার আদেশ দিতেন অথচ আমাদের কারো কারো নিকট কিছুই থাকিত না। যাহার নিকট কিছুই থাকিত না তিনি শুধু শ্রম বিক্রি করার উদ্দেশ্যে বাজারে যাইতেন এবং পরিশ্রমিক হিসাবে এক মুদ (দেড়পোয়া) খেজুর পাইতেন এবং তাহাই ছদকা করিয়া দিতেন। (বোখারী)

প্রথম পরিচ্ছেদের ১৪নং হাদীছে এ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তীব্রতা সত্বেও সাধারণ উটের স্থলে উত্তম উট গ্রহণ করা হয় নাই। কাজেই ধন-সম্পদের দিক হইতে ওয়াজিব শুধু মাত্র যাকাত ইহাছাড়া আল্লাহর পথে ব্যয়ের প্রশ্নে বলিতে হয় যে, তাহা কুক্ষিগত করিয়া রাখার জন্য নহে। কোরানের আয়াতে এবং নবীজীর হাদীছে একথা জোরের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে ধন-সম্পদ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খরচ করিতে হইবে। নিজে সাধ্যমাফিক কষ্ট করিয়া অপরের জন্য খরচ করিতে হইবে। আল্লাহর কোষাগারে যাহা সঞ্চয় করা হইবে তাহাই শুধু কাজে আসিবে। তাঁহার ব্যাংকে সঞ্চয়ের পর তাহা নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নাই, ব্যাংক ফেল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। এমন কঠিন সময়ে সেই সঞ্চিত অর্থ কাজে আসিবে যখন মানুষ খুব বেশী বিপদগ্রস্ত হইবে। আল্লাহর বাণী নবীকরিম (ছঃ) নকল করেন যে, আল্লাহ বলেন, হে মানুষ! তুমি আমার নিকট তোমার কোষাগার গচ্ছিত রাখ তাহাতে আগুণ লাগিবার আশংকা থাকিবে না, চুরি বা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিবে না, আমি এমন সময়ে তোমাকে তাহা পরিপুর্ণরূপে ফেরত দিব যখন তুমি খুব বেশী পরমুখাপেক্ষী হইবে। (তারগীব)

প্রথম পরিচ্ছেদের ৫০নং আয়াতে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রত্যেকে যেন এটা চিন্তা করে যে সে কেয়ামতের দিনের জন্য কি জিনিস সামনে প্রেরণ করিয়াছে। যাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে তাহাদের মত হওয়া উচিত নহে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাদেরকে আত্মবিস্মৃতিতে নিমজ্জিত করিয়াছেন। উক্ত পরিচ্ছেদের ৩১নং আয়াতে আল্লাহ বলিয়াছেন, তোমাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষার জিনিস, আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে থাক উহা উত্তম হইবে। নবী করিম (ছঃ)-এর বাণী উক্ত পরিচ্ছেদের ১নং হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, যদি আমার নিকট ওহুদ পাহাড় সম পরিমাণ স্বর্ণ থাকিত তবে ঋণ পরিশোদের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু রাখা ব্যতীত সেই স্বর্ণ নিজের নিকট রাখিবার ইচ্ছা আমার হইত না। ৩নং হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখিত ছিল যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করা উত্তম, সঞ্চয় করিয়া রাখা অকল্যাণকর। ১২নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলেন, হিসাব করিয়া খরচ করিও না যতো বেশী সম্ভব খরচ করিয়া ফেল। ২০নং হাদীছে এ ঘটনার উল্লেখ ছিল যে, একটি বকরি জবাই করার পর তাহার উরু ব্যতীত সবটুকু বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নবীকরিম (ছঃ) জিজ্ঞাসা করিয়া একথা জানিবার পর বলিলেন, এই উরু ব্যতীত সবটাই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে নবী করিম (ছঃ) এর এধরনের বহু বাণী উল্লেখ করা হইয়াছিল। কাজেই কি ওয়াজিব কি মোস্তাহাব তাহা চিন্তা না করিয়া জীবদ্দশায় যতোটা ধন-সম্পদ পরকালের জন্য প্রেরণ করা যায় তাহাই কাজে আসিবে। শ্রমের উপার্জনের মাল যদি প্রয়োজনের সময় কাজে আসিবার জন্য সঞ্চিত রাখিতে হয় তবে আল্লাহর পথে খরচ করিতে হইবে, তাহার মুনাফা পরকালে তো পাওয়া যাইবেই উপরন্ত দুনিয়াবী জীবনেও পাওয়া যাইবে। কেননা যে কোন মছীবত দুর হওয়ার জন্য সদকার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। মৃত্যুকালীন কষ্ট হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়।

নবী করীম (ছ) বলিয়াছেন, ইর্ষাযোগ্য মানুষ হইলেন দুইজন, প্রথমত যাহাকে আল্লাহ পাক কোরান শিক্ষার তওফীক দিয়াছেন এবং সে

দিন রাত তাহা তেলাওয়াত করে এবং কোরানের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করে। দ্বিতীয়ত আল্লাহ যাহাকে ধন সম্পদ দিয়াছেন এবং সে সব সময় সেই ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে সচেষ্ট থাকে।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩নং হাদীছে নবী করিম (ছঃ) এর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে সে, আল্লাহর পথে এদিকে ওদিকে যাহারা ব্যয় করে তাহারা ব্যতীত সকল ধনশালী লোক ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। ৭নং হাদীছে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি মোমেন নহে যে নিজে পেট ভরিয়া খায় কিন্তু তাহার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। প্রথম পচ্ছিদে এটা বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, ধন সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখা মুসলমানের জন্য শোভনীয় নহে। এস ধন সম্পদের উদাহরণ পায়-খানার মত, দুইদিন বাহিরে না আসিলে ডাক্তার কবিরাজের নিকট ছুটাছুটি করিতে হয় অথচ পরিমাণের চাইতে বেশী আসিলেও বন্ধ করার জন্য অর্থাৎ নিয়মিত করার জন্য ডাক্তার কবিরাজের শরনাপন্ন হইতে হয়। এতো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় পায়খানা ঘরে জমা করিয়া রাখিলে দুর্গন্ধে ঘর নষ্ট হইয়া হইবে, রোগ ছড়াইয়া পড়িবে। টাকা পয়সার ব্যাপারও একই রকম, হাতে না থাকিলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয় অথচ অতিরিক্ত অংক ঘর হইতে বাহির না করিলে তাহার দ্বারা অহংকার জন্ম নেয় মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার মনোভাব সৃষ্টি হয় বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি হয়। মোটকথা সকল প্রকার আপদ জন্ম নেয়। একারণেই নবী করিম (ছঃ) তাঁহার সন্তানদের জন্য দোয়া করিয়াছেন, হে আল্লাহ, মোহাম্মদ (ছঃ) এর সন্তানদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিজিক প্রদান কর।

সৈয়দগণ একারণেই ধনশালী হন না তবে দু'একজনের ধনশালী হওয়া নবীজীর দোয়ার সাহায্যের পরিপন্থী নহে। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অপার অনুগ্রহে এই অধমকেও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হইতে রক্ষা করুন।

(৮) عن بريدة (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منع قوم الزكوة الا ابتلاهم الله بالسنين ٥

অর্থাৎ নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে কওমই যাকাতকে আটকাইয়া রাখে আল্লহ তায়ালা সেই কওমকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেন।

ফায়েদা ঃ দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ দারিদ্র আমাদেরকে এমনভাবে ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা তাহা হইতে পরিত্রান লাভ করিতে পারিতেছিনা। আল্লাহ তায়ালা পাপের কারণে কোন বিপদ নাজিল করিলে যতো চেষ্টাই করা হোক না কেন যত আইন প্রনয়ণ করাই হোকনা কেন তাহা ঠেকানো যায় না। তিনি রোগ এবং প্রতিষেধক দুটোই জানাইয়া দিয়াছেন। যদি রোগ দূর করিতে হয় তবে সঠিক চিকিৎসা করিতে হইবে। আমরা নিজেরাই রোগের উপকরণ তৈরী করিব আবার রোগ আসিলে কান্নাকাটি করি এটা কেমন ধরণের বুদ্দিমত্তা। হুজুর (ছঃ) ইহকালীন জীবনে সকল বালা মছীবত এবং তাহা হইতে মুক্তির উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করিয়াছে।

নবী করিম (ছঃ) বিশেষভাবে তাঁহার উম্মতকে সতর্ক করিয়াছেন যে আমার উম্মত যখন এইরূপ কাজ করিবে তখন তাহাদের উপর বিপদ নামিয়া আসিবে। ঝড়তুফান, ভূমিকম্প, চেহারা বিকৃত হওয়া আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ হওয়া, অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া পূন্যবানদের দোয়াও কবুল না হওয়া—এ সকল বিপদের কথা নবীজী বলিয়াছেন। আমরা বর্তমানে সেইসব প্রত্যক্ষও করিতেছি। নবীজীর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় নবীজীর কথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যই সত্য প্রমাণিত হইতেছে তাঁহার কথা পালন করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ উপকার লাভ করিতেছে কিন্তু ইসলামের দাবীদার হইয়াও যদি মুসলমানরা তাঁহার কদর না করে তবে অন্যদের দোষ দিয়া কি হইবে? নবীজীর বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করিয়াই এইসব বিপদ হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব। মুসলমান চিকিৎসক মুসলমানের চিকিৎসা করিতেছে অথচ মহানবীর বাণীর উপর আমল করিলেই আমরা শান্তি সুখে পরিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইতে পারি।

হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করিম (ছঃ) একবার বলিয়াছেন হে মুহাজিরিন সম্প্রদায়। পাঁচটি জিনিস এমন রহিয়াছে, আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করিতেছি যাহাতে তোমরা সেই জিনিস সমূহে জড়াইয়া না পড়। (১) অশ্লীল পাপাচার, এ পাপাচার খোলাখুলিভাবে যে জাতির মধ্যে দেখা দেয় সে জাতির মধ্যে অজানা রোগ সমূহ ছড়াইয়া

পড়ে (২) যাহারা ওজনে কারচুপি করে তাহারা দুর্ভিক্ষ, দুঃখকষ্ট এবং শাসন কর্তার জুলুমের শিকার হয়। (৩) যে জাতি জাকাত দেয় না ! তাহার উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যদি জীব জন্তু না থাকিত তবে আসমান হইতে এক ফোটা বৃষ্টিও বর্ষন করা হইত না। (৪) যাহারা ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর অন্য জাতির প্রভুত্ব কায়েম করিয়া দেওয়া হইবে যাহারা উহাদের লুণ্ঠন করিবে। (৫) আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যাহারা আদেশ জারি করিবে তাহাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিবে। (তারগীব) বর্তমানে আমরা উপরোল্লিখিত কোন্ দোষে দোষী নই এবং কোন্ বিপদে নিপতিত হই নাই ? এ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখা দরকার।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন পাঁচটি জিনিস, পাঁচটি জিনিসের বিনিময় স্বরূপ। একজন জিজ্ঞাসা করিল হে আল্লাহর রাছুল ইহার অর্থ কি ? নবীজী বলিলেন, যে জাতি ওয়াদা ভঙ্গ করে তাহাদের উপর শত্রুদল জয়যুক্ত হয় এবং যাহারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ করিবে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে যাহারা যাকাত বন্ধ করিবে তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হইবে। যাহারা ওজনে কারচুপি করিবে তাহাদের উৎপাদন কম হইবে। এবং দারিদ্র ব্যাপকতা লাভ করিবে। (তারগীব) এই হাদীছে সম্ভবত সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, কারণ সর্বমোট চারটি বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। আল্লাহার বিধানের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের শাস্তি এখানে মৃত্যুর সংখ্যাধিক্য এবং পুর্বোক্ত হাদীছে গৃহযুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ার কথা বলা হইয়াছে। উভয় বিপদ একত্রেও দেখা দিতে পারে আবার গৃহযুদ্ধের কারণেও মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পারে। এ ধরনের মৃত্যুতো এখন অহরহ দেখা যায়।

হজরত আলী (রাঃ) এবং হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে যে, নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, আমার উম্মত ১৫টি দোষে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। উক্ত হাদীছে উপরোক্ত দোষ সমুহ ব্যতীত এটাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে যাকাত আদায় করা তাদের নিকট ট্যাক্সের মত মনে হইবে। এমন অবস্থা যখন হইবে

তখন তাদের উপর ঝড় তুফান, প্লাবন ভূমিকম্প চেহারার বিকৃতি সাধন আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ—এ ধরনের বিপদ এত বেশী আসিতে থাকিবে তাছবীর সূতা ছিঁড়িয়া গেলে দানা যেমন একের পর এক পড়িতে থাকে। এ'তেদাল নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি সেখানে ১৫টি দোষ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। এখানে শুধু যাকাতের প্রসঙ্গ আলোচনা হওয়ায় সেদিকে শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

(৭) عن ابى هريرة (رض) قال سمعت عمر بن خطاب (رض) حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته منه وكنت اكثرهم لزوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلف مال فى بر ولا بحر الا بحبس الزكوة ٥ (طبرانى)

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে স্থলভাগে বা সমুদ্রে ধন-সম্পদ যেখানেই বিনষ্ট হউক না কেন তাহা যাকাত আটকাইয়া রাখার কারণেই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ফায়েদা ঃ যাকাত পরিশোধ না করার জন্য আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তিতো পাইতেই হইবে, দুনিয়াতে ও তাহা ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার কারণ হইয়া দেখা দেয়। অন্য একটি হাদীছে এ হাদীছ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) মক্কায় হাতীমের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। একজন লোক আসিয়া বলিল হে আল্লাহর রাছুল, অমুক পরিবারের ধন-সম্পদ সমুদ্রের তীরে ছিল তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন, জলে স্থলে যাকাত পরিশোধ না করার কারণেই ধন সম্পদ ধ্বংস হইয়া থাকে। যাকাত যথারীতি পরিশোধ করিয়া নিজেদের ধন-সম্পদ হেফাজত কর। নিজেদের রোগ বালাইয়ের ব্যাপারে সদকার মাধ্যমে চিকিৎসা কর। আকস্মিক বিপদ সমূহকে দোয়ার মাধ্যমে সরাইয়া দাও। দোয়া বিপদকে দূর করিয়া দেয়, যে বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা দোয়া দূর করে এবং যে বিপদ এখনো আসে নাই তাহা প্রতিরোধ করে।

নবী করিম (ছঃ) বলিতেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু যে জাতিকে উন্ন

ও স্থায়িত্ব দান করিতে চান সে জাতির মধ্যে, লজ্জাশীলতা, নম্রতা ও দান শীলতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। আর যে জাতিকে ধ্বংস করিতে চান সে জাতির মধ্যে খেয়ানতের অভ্যাস সৃষ্টি করেন।

অতঃপর নবীকরিম (ছঃ) আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, "তবে যখন আমার আজাব তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা প্রার্থনা জানায়নি? এ আয়াত ছুরা আনয়ামের পঞ্চম রুকুর প্রথমে কয়েকটি আয়াতে বলিয়াছেন, 'আমি তোমার পূর্ববর্তী জাতি সমূহের নিকটও আমার রাছুল প্রেরণ করিয়াছি; অতঃপর তাহাদের নাফরমানীর জন্য তাহাদিগকে সাজা দুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলিয়াছি। তবে যখন আমার আজাব তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিল তখন কেন তাহারা কাতর প্রার্থনা জানায়নি? তাহাদিগের অন্তর সমূহ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের কার্যাবলীকে শয়তান অত্যন্ত হৃদয়াগ্রাহী করিয়া দেখাইয়াছিল। অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত সদুপদেশ বিস্মৃত হইয়া গেল, অতঃপর আমি আরাম ও আয়েশের যাবতীয় দুয়ার খুলিয়া দিলাম, যাহার ফলে প্রদত্ত জিনিস লইয়া তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত হইতে লাগিল, তারপর হঠাৎ তাহাদিগকে পাকড়াও করিলাম ইহাতে তাহারা ভগ্ন মনোরথ হইয়া পড়িল। এইভাবে অত্যাচারী জাতির মুলোৎপাটন করা হইল। তাহা এই জন্য যে, সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা রহিয়াছে।

উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে আল্লাহর নাফরমানী করা সত্ত্বেও যদি তিনি কোন শাস্তি দানের পরিবর্তে তাহাদের আরাম আয়েশ ও বিলাসিতার উপকরণ সরবরাহ করেন তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা বিপজ্জনক। একটি হাদীছে নবী-করিম (ছঃ) বলিয়াছেন' পাপাচার সত্ত্বেও যখন দেখিবে যে কোন ব্যক্তির দুনিয়াবী ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাইতেছে তবে মনে করিবে যে তাহার জন্য রশি ঢিলা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর নবীজী কোরানের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন, অতঃপর তাহারা তাহাদিগকে প্রদত্ত উপদেশ ভুলিয়া গিয়াছে।

হজরত আবু হাজেম (রাঃ) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে যখন

তুমি দেখিবে যে আল্লাহর নাফরমানী করিতেছ অথচ তোমার উপর আল্লাহর নেয়ামত ক্রমাগতভাবে বর্ষণ করা হইতেছে তখন তুমি তাহাকে ভয় কর। যে নেয়ামত আল্লার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া দেয় সেই নেয়ামত বিপদ স্বরূপ। (দুররে মনছুর)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৭ নং হাদীছে বিস্তারিতভাবে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। ধন-সম্পদ যেহেতু আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কাজেই ধন সম্পদের মালিকানা লাভ করিলে তাহাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাওয়ার উপায় হিসাবে গ্রহণ কর। কেহ যদি ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় না করে বরং যাকাত আদায় করিতে ও কুণ্ঠিত হয় তবে ইহা আল্লাহর নাফরমানী ছাড়া আর কি হইতে পারে? এ ধরনের লোকের ধনসম্পদ স্থায়ীভাবে থাকিবে এমন আশা করা সমীচীন নহে। কেননা সে নিজেই ধনসম্পদ ধংস করার তৎপরতায় নিয়োজিত। যদি এ ধরণের অবস্থায় ধংস না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে ইহা আরো কঠিন বিপদের পূর্বাভাস। আল্লাহ পাক তাঁহার অপার অনুগ্রহে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(৭) عن عائشة (رض) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكوة مالا قط الا اهلكته ٥

অর্থাৎ নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ধন-সম্পদের সহিত যাকাতের ধন-সম্পদ মিলিয়া যায় তাহা সেই ধন-সম্পদকে ধবংস না করিয়া ছাড়ে না।

ফায়েদা ঃ—এ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওলামাগণ দুইটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুইটি অভিমতই নির্ভুল। প্রথমত যে মালামাল বা ধন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হইয়াছে অথচ তাহা হইতে যাকাতের মালামাল বাহির করা হয় নাই তবে সেই মালামাল সমুদয় মালামালকে ধবংস করিয়া দিবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হইতে বর্ণিত দ্বিতীয় অর্থ এই, যে ব্যক্তি নিজে যাকাত আদায় করার মত ছাহেবে নেছাব সে যদি নিজেকে দরিদ্র হিসাবে প্রকাশ করিয়া যাকাতের মাল গ্রহণ করে তবে সেই মাল তাহার নিজের সমুদয় মালকে ধবংস করিয়া দিবে।

(৮) عن عبد الله بن مسعود (رض) قال من كسب طيبا خبثه منع الزكوة ومن كسب خبيثا لم تطيبه الزكوة ٥

অর্থাৎ হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পবিত্র মালামাল উপার্জন করে যাকাত পরিশোধ না করা সে মালামালকে অপবিত্র করিয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি হারাম মালামাল উপার্জন করে, সেই মালামালের যাকাত পরিশোধ করিলেই তাহা পবিত্র হইয়া যায় না।

ফায়েদা ঃ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে মালামাল উপার্জন করা হইয়া থাকে, কৃপণতার কারণে সেই মালামালে যাকাতের সামান্য পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করা হইলে আল্লাহর নিকট সমস্ত মালামাল অপবিত্র অর্থাৎ নাপাক হইয়া যায়। একটি হাদীছে নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে মালামাল উপার্জন করে অতঃপর তাহা হইতে সদকা করে তাহার জন্য উহাতে কোন প্রকার বিনিময় নাই বরং এ কাজের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। (তারগীব) অর্থাৎ হারাম উপার্জনের শাস্তিও ভোগ করিবে আবার কোন প্রকার পুণ্যও পাইবে না।

(৭) عن اسماء بنت يزيد (رض) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما امراة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها من النار يوم القيمة وايما امراة جعلت فى اذنها خرصا من ذهب جعل فى اذنها مثله من النار ○

অর্থাৎ হজরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে নারী নিজের গলায় সোনার হার পরিবে তাহার গলায় কেয়ামতের দিন অনুরূপ আগুনের হার পরাইয়া দেওয়া হইবে। আর যে নারী নিজের কানে সোনার বালি পরিধান করিবে তাহার কানে কেয়ামতের দিন অনুরূপ আগুনের বালি পারাইয়া দেওয়া হইবে।

ফায়েদা ঃ এই হাদীছ পড়িয়া মনে হয় যে নারীদের জন্য সোনার অলঙ্কার পরিধান করা হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। এ কারণে কোন কোন আলেম বলিয়াছেন যে ইহা ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিধান ছিল। কেননা অন্যান্য হাদীছের প্রেক্ষিতে নারীদের স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করা জায়েজ করা হইয়াছে। তবে কোন কোন ওলামা এ হাদীছ এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদীছের নিষেধাজ্ঞাকে যাকাত না দেয়ার সহিত

সম্পৃক্ত করিয়াছেন। হজরত আছমা (রাঃ) বলেন আমি ও আমার খালা নবীকরিম (ছঃ) এর সমীপে হাজির হইলাম। আমাদের হাতে ছিল সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, এগুলোর যাকাত আদায় করিয়া থাক? আমরা আরজ করিলাম জী না। নবীকরিম (ছঃ) বলিলেন ইহার দরুণ যে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো হইবে তোমরা কি সে ভয় করিতেছ না? এগুলোর যাকাত আদায় করিও। (তারগীব)

এ বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারে যাকাত আদায় না করিলেই তাহা দোযখের আগুনের শাস্তি ভোগের কারণ হইবে। নারীদের এ সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগ থাকিতে হইবে।

হজরত আসমা (রাঃ) যাকাত আদায় করেন নাই বলার কারণ সম্ভবত এই যে তখনো তিনি যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। অন্য একটি হাদীছে উল্লেখিত তাঁহার জিজ্ঞাসা হইতে তাহা বুঝা যায়। অথবা এমনও হইতে পারে যে তখন পর্যন্ত হজরত আসমা (রাঃ) স্বর্ণালঙ্কারকে নারীর অত্যাবশ্যকীয় ব্যবহার্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু আসলে তাহা ঠিক নহে। রূপার অলঙ্কার সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য। একটি হাদীছে রহিয়াছে, হজরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবীকরিম (ছঃ) আমার হাতে রূপার চুড়ি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? আমি বলিলাম, আপনার জন্য সৌন্দর্যস্বরূপ নিজেকে সাজাইতে ইহা পরিধান করিয়াছি, নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? আমি বলিলাম জী না। নবীজী বলিলেন, জাহান্নামের আগুনের জন্য তোমার এটাই যথেষ্ট। (তারগীব)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে একজন নারী নবী করিম (ছঃ) এর নিকট হাজির হইল, তাহার সঙ্গে তাহার মেয়েও ছিল। মেয়েটির হাতে ছিল দু'গাছি সোনার কাঁকন। নবীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার যাকাত দিয়া থাক? সে বলিল, জী-না। নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, কেয়ামতের দিন ইহার বদলে তোমাকে আগুনের কাঁকন পরিধান করানো তুমি পছন্দ করিবে? এ কথা শুনিয়া মেয়েটি দু'গাছি চুড়ি খুলিয়া নবীজীর হাতে দিয়া বলিল, আমি এগুলি আল্লাহর জন্য দিতেছি।

ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ছিল এইরূপ, তাঁহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের কথা শুনিলে কোন প্রকার টালবাহানার আশ্রয় নিতেন না। এ রকম বর্ণনা হইতে সোনা ও রূপার অলঙ্কার সম্পর্কে একই রকম নির্দেশ রহিয়াছে বুঝা যায়। যে সকল বর্ণনায় যাকাতের উল্লেখ করা হয় নাই এবং সোনারূপার পার্থক্য করা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে অহংকার প্রকাশক হিসাবেই অলঙ্কারকে কেয়ামতের দিনে শাস্তির কারণ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবু দাউদ ও নাছাই শরীফের একটি হাদীছে নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, হে নারীগণ তোমাদের অলঙ্কার তৈরীর জন্য কি রূপাই যথেষ্ট নহে? মনে রাখিবে যে নারী সোনার অলঙ্কার তৈরী করাইবে এবং তাহা প্রকাশ করিবে সেই কারণে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। (তারগীব)

মহিলাদের মধ্যে অলঙ্কার অন্যকে দেখানোর ব্যাপারে একটা মজ্জাগত অভ্যাস লক্ষ্য করা যায়। নানা বাহানায় তাহারা নিজের পরিহিত অলঙ্কার অন্যদেরকে দেখাইয়া থাকে। রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিলে ততটা প্রদর্শন বাতিক না থাকিলেও সোনার অলঙ্কার পরিলে মাছি তাড়ানো, আঁচল ঠিক করা ইত্যাদি বাহানায় অন্যদের নিজের অলঙ্কার না দেখাইয়া মহিলারা যেন স্বস্তি পায় না। ইহা যে অহংকারের প্রকাশ তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই সোনারূপার অলঙ্কার পরিধান করিলেও সে জন্য কোন প্রকার অহংকার যেন প্রকাশ না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং ব্যবহৃত অলঙ্কারের জাকাত নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে। যদি অহংকার প্রকাশ হইতে বিরত না থাকা হয় এবং যাকাত পরিশোধ না করা হয় তবে শাস্তির জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

(১০) عن الضحاك (رض) قال كان اناس من المنافقين حين امر الله ان تؤدى الزكوة يجيئون بصدقاتهم بارذل ما عندهم من الثمرة فانزل الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون اخرجه ابن جرير وغيره ٥

অর্থাৎ হজরত জহাক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা জাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়ার পর মোনাফেকগণ নিকৃষ্ট ফলসমূহ যাকাত হিসাবে প্রদান করিত। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (সূরা বাকারার) এ আয়াত

নাজিল করিলেন, "এবং নিকৃষ্ট বস্তু হইতে ব্যয় করিবার নিয়ত করিও না।

ফায়েদা ঃ উল্লিখিত আয়াত ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুর অন্তর্গত রুকুর প্রথম দিকের এ আয়াতে আল্লাহ বলেন, হে মোমেনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদসমূহ হইতে এবং তোমাদের জন্য ভূমি হইতে আমার উৎপন্ন ফসল হইতে যাহা উৎপন্ন করিয়াছ ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট ফসল হইতে ব্যয় করার নিয়ত করিও না। বস্তুতঃ তোমরা নিজে তাহা গ্রহণ কর না, তবে হ্যাঁ অনেক সময় না দেখার ভানে তাহা গ্রহণ কর এবং জানিয়া রাখ আল্লাহ পাক কাহারও মুখাপেক্ষী নন যে কাহারো নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করিবেন।

এ আয়াত সমূহ সম্পর্কে বহু হাদীছে রহিয়াছে। ধন সম্পদ সকলের একই প্রকৃতির। হজরত বারা (রাঃ) বলেন, এ আয়াতগুলি আমাদের অর্থাৎ আনছারীদের সম্পর্কে নাজিল হইয়াছে। আমরা মালিক ছিলাম এবং সাধ্য মত সবাই কিছু না কিছু হাজির করিতাম। কেহ কেহ দুই এক কাঁদি খেজুর মসজিদে টাঙ্গাইয়া দিত। আহলে সুফ্ফার পানাহারের কোন বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহার ক্ষুধা পাইত তিনি ফলের কাঁদিতে লাঠি দিয়া আঘাত করিতেন, ইহাতে পাকা খেজুর নীচে পড়িলে তিনি তাহা কুড়াইয়া খাইতেন। পুণ্যকাজে যাহার তেমন আগ্রহ ছিল না সে নিকৃষ্ট ধরনের ফল টাঙ্গাইয়া দিত। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরানের এই আয়াত নাজিল করিলেন, ইহাতে বলা হয় যে অনুরূপ নিকৃষ্ট বস্তু কেহ তোমাদেরকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিলে চক্ষু লজ্জার কারণে তোমরা হয়তো গ্রহণ করিবে, মনের খুশীতে গ্রহণ করিবে না। এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর ভাল ভাল কাঁদি আসিতে লাগিল।

এ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একটি হাদীছে আছে যে, কেহ কেহ বাজার হইতে সস্তা জিনিস ক্রয় করিয়া সদকা স্বরূপ প্রদান করিত। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হইল।

হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি ফরজ জাকাত সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। লোকেরা খেজুর কাটিলে ভাল ভাল খেজুর আলাদা করিয়া রাখিত, যাকাতের জন্য গ্রহীতারা তাহাদের

সামনে আসিলে নিকৃষ্ট খেজুর হাজির করিত।

একটি হাদীছে আছে যে একবার নবী করিম (ছঃ) মসজিদে গমন করিলেন। নবীজীর হাতে একটি লাঠি ছিল। মসজিদে কে যেন নিকৃষ্ট খেজুরের কাঁদি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (ছঃ) কাঁদিতে লাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি ইহা টাঙ্গাইয়াছে, ইহার চেয়ে ভাল কাঁদি টাঙ্গাইলে কি অসুবিধা হইত? এই লোকটি বেহেশতেও অনুরূপ নিকৃষ্ট খেজুর পাইবে। (দুররে মনছুর)

হজরত আয়েশা (রাঃ) নবী করিম (ছঃ) এর বাণী বর্ণনা করিয়াছেন যে, মিসকিনকে এমন জিনিস খাইতে দিয়ো না যাহা তোমরা নিজেরা খাও না। (কানজ)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, (রান্না করা) গোশত গন্ধ হইয়া গিয়াছিল, হযরত আয়েশা (রাঃ) সেই গোশত কাউকে আল্লার ওয়াস্তে প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নবী করিম (ছঃ) বলিলেন, এমন জিনিস কি সদকা করিতেছ যাহা নিজে খাইতে পার না? (জামেউল ফাওয়ায়েদ)

অর্থাৎ আল্লাহর নামে যখন দিবে তখন যতোটা সম্ভব ভাল জিনিস দিবে। যদি একান্তই ভাল দেওয়ার সাধ্য না থাকে তবে না দেওয়ার চাইতে খারাপ জিনিস দেওয়া উত্তম। ফরজ জাকাত পরিশোধের ব্যাপারে নিকৃষ্ট বা খারাপ জিনিস দেওয়া জাকাত না দেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৬নং হাদীছে যাকাত দেওয়ার বিধান সম্বলিত নবীজীর বাণী উল্লেখ করা হইয়াছে। নবীজী বলিয়াছেন, আল্লাহ উৎকৃষ্ট জিনিস ও চান না, নিকৃষ্ট জিনিস দেয়ার ও অনুমতি দেন না বরং তিনি মধ্যম শ্রেণীর জিনিস দাবী করেন। এটাই যাকাত পরিশোধের মূলনীতি।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁহার অধিনস্থদেরকে যাকাত গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেখানে যাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত লিখিয়াছেন। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী যাহারা যাকাত প্রদান করিবে তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিবে আর যাহারা ইহার অতিরিক্ত আদায় করিতে চাহিবে তাদের কাছে যাকাত দিবে না।

নবী করিম (ছঃ) হজরত মোআজকে (রাঃ) ইয়েমেনের শাসনকর্তা রূপে প্রেরণের সময় নামাজের সাথে সাথে যাকাত সম্পর্কেও তাগিদ দেন এবং বলেন, যাকাত গ্রহণের সময়ে দাতাদের উৎকৃষ্ট জিনিস গ্রহণের

চেষ্টা করিও না। মজলুমের বদদোয়া কবুল হওয়ার পথে কোন পর্দা থাকে না।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, সরকারের লোক যাকাত গ্রহণ করিতে আসিলে বকরীগুলোকে তিন ভাগ করিবে। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট এবং মধ্যম। অতঃপর মধ্যম শ্রেণী হইতে যাকাত গ্রহণ করিবে। (আবু দাউদ)

যাকাত গ্রহীতার জন্য ইহাই মুলনীতি! তবে দাতা যদি স্বেচ্ছায় উৎকৃষ্ট জিনিস দেয় তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। ৬নং হাদীছে এ সংক্রান্ত হাদীছ রহিয়াছে। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন যদি তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট জিনিস নির্ধারিত প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিমাণে পরিশোধ কর তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের পুরুস্কার দিবেন। একারণেই প্রদত্ত জিনিস নিজের কাজে আসিবে—এইরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া দাতার উচিত উৎকৃষ্ট জিনিস দান করা।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে যাকাত আদায় করিতে চায় তাহার জন্য কিছু নিয়ম কানুন রহিয়াছে। গাজ্জালী (রহঃ) এ পর্যায়ে ৮টি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন, আমি এখানে তাহার কিয়দাংশ উল্লেখ করিতেছি। প্রথমত দেখিতে হইবে যাকাত কেন ওয়াজিব হইল। কেন ইহাকে ইসলামের স্তম্ভ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহার কারণ ৩টি। কালেমার স্বীকারোক্তি আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসাবে বিশ্বাস করিবার স্বীকারোক্তি। তাঁহার কোন অংশীদার নেই। এই বিশ্বাসের পূর্ণতা তখনই হইবে যখন আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার দাবীদার অন্য কাউকে শরীক করিবে না। কেননা ভালোবাসা অংশগ্রহণ সহ্য করে না। উপরন্তু মৌখিক দাবীর কোন মূল্য নাই অন্যান্য প্রিয় জিনিসের সহিত মোকাবিলা হইলেই ভালোবাসার পরীক্ষা হয়। স্বভাবতই ধন সম্পদ প্রত্যেকেরই প্রিয়। একারণে ইহাতে আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাই ছুরা তওবার ১৪ রুকুতে বলিয়াছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জান ও মাল ইহার বদলে ক্রয় করিয়াছেন যে তাহারা জান্নাত লাভ করিবে।

জেহাদের মাধ্যমে জীবন ক্রয় করা হয়। ধন-সম্পদ ব্যয় করা

জীবন দানের চাইতে সহজ। ধনসম্পদ ব্যয় করা ভালোবাসার মাপকাটি হওয়ার কারণে এ পরীক্ষায় মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা তাহারা যাহারা আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে কিছুমাত্র অংশীদারিত্বকেও প্রশ্রয় দেয় নাই, নিজের সকল সম্পদ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করিয়াছে। একটি দিনার দিরহামও নিজের জন্য রাখে নাই। তাহারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার প্রশ্নই আসিতে দেয় না। একারণেই একজন বুজুর্গকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দুই শত দিরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব। তিনি বলিলেন, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ৫ দিরহাম কিন্তু আমাদের জন্য সবকিছু ব্যয় করা জরুরী। একারণেই হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) নিজের সবকিছু আল্লাহর নবীর নিকট হাজির করিয়া বলেন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ঘরে রাখিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। তাহারা নিজেদের প্রয়োজনের সামগ্রী রাখিয়া দেন, অবশিষ্ট অংশ ব্যয় করেন। ব্যয় বাহুল্য এবং বিলাস বস্তুতে তাহারা নিয়োজিত হন না। ইহারা যাকাতের নির্দিষ্ট পরিমাণের কথা চিন্তা করেন না বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। একারণেই ইমাম নাখায়ী শাবী (রহঃ) প্রমুখ তাবেয়ী বলিয়াছেন, ধন-সম্পদে যাকাত ছাড়াও প্রাপ্য রহিয়াছে। তাঁহাদের মতে ওর মুখাপেক্ষী লোক দেখিলেই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে হইবে। কিন্তু ফেকাহর দৃষ্টিকোণ হইতে ক্ষুধায় মরণাপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য দান ফরজে কেফায়া ওলামাদের মধ্যে এধরনের লোককে সাহায্য করার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার মতো সাহায্য মুফত দেওয়া অথবা ঋণ দেওয়া কাহারো কাহারো মতে যথেষ্ট। ঋণ দানের কথা যাহারা বলেন তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে নীচ পর্যায়ভুক্ত। তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতই শুধু আদায় করিয়া থাকে। কম বেশী করে না। সাধারণ মুসলমানেরা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ধন সম্পদের প্রতি ইহাদের ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। আল্লাহর পথে ব্যয় করিতে তাহারা কৃপণতা করে।

আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা কম। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তিন শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ শ্রেণীর কথা বলেন নাই। কেননা তাহারা নির্ধারিত পরিমাণ জাকাতও আদায় করে না। তাহাদের ভালোবাসার দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ ধরণের মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে কি আর আলোচনা করা হইবে।

(খ) যাকাত মানুষকে কৃপণতা হইতে রক্ষা করে। কৃপণতা একটি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস। নবীকরিম (ছঃ) বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস ধ্বংসাত্মক প্রথমত এমন লোভ ও কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়। দ্বিতীয়ত এমন প্রবৃত্তি যাহার আনুগত্য করা হয়। তৃতীয়ত নিজের মতামতকে সর্বোত্তম মনে করা।

পবিত্র কোরানের অনেক আয়াতে এবং বহু হাদীছে কৃপণতার নিন্দা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ সম্পর্কে কিছু কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। মানুষের মধ্য হইতে কৃপণতার অভ্যাস দূর করিতে হইলে তাহাকে জোরপূর্বক ব্যয়ে বাধ্য করিতে হইবে। যেমন নাকি কাহারো কাহারো সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইলে তাহার সংস্পর্শ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে ভালোবাসা হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই যাকাতকে পবিত্রতা সৃষ্টির মাধ্যম বলা হইয়া থাকে। কেননা যাকাত তাহার দাতাকে কৃপণতার নোংরামী হইতে মুক্ত রাখে। আল্লাহর পথে যত বেশী পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হইবে আল্লাহর ভালোবাসার স্বাদ পাইয়া ততই কৃপণতা হইতে পবিত্রতা হাছেল করা সম্ভব হইবে।

(গ) ইহা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। আল্লাহ তাবারক অ-তায়ালা প্রতিটি মানুষকে এত বেশী নেয়ামত দিয়াছেন যাহার সীমা রেখা নাই। শারীরিক আনুগত্য করা শারীরিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ। অনুরূপভাবে আর্থিক দান-খয়রাত আল্লাহর প্রদত্ত আর্থিক নেয়ামতের শোকরিয়া স্বরূপ।

ভিক্ষুক অর্থাৎ পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া যাহার মনে করুণার উদ্রেক হয় না সে কত বড় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে তাহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না অথচ তাহার চিন্তা করা উচিত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাহাকে ভিক্ষা করার মতো দুর্ভাগ্যজনক

অবস্থায় নিমজ্জিত করেন নাই। উপরন্তু পরমুখাপেক্ষীরা তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে তাহাকে এইরূপ ভাগ্যবান করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের মালামালের এক দশমাংশ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর পথে ব্যয় করা কি উচিত নয়? (একদশমাংশ দ্বারা ফসলের যাকাত বুঝানো হইয়াছে।)

(২) যাকাত পরিশোধ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিতে হইবে। ওয়াজিব হওয়ার আগেই যাকাত পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাতে আল্লাহর আদেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাইবে এবং দরিদ্র লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে। দেরী করিলে মালামালের উপর এবং নিজের উপরও বিপদ আসিয়া পড়িতে পারে। যাহারা তাড়াতাড়ি যাকাত আদায় করিয়া থাকেন তাহারা দেরীতে যাকাত আদায় করাকে রীতিমত পাপ বলিয়া মনে করেন। কাজেই যাকাত পরিশোধের ইচ্ছা মনে জাগ্রত হইলেই তাহাকে ফেরেশতার তাকিদ মনে করিতে হইবে। হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে মানুষের সহিত তাকিদ দেওয়ার একজন ফেরেশতা থাকে এবং একটি শয়তান থাকে। ফেরেশতা কল্যাণ ও সত্যের প্রতি তাকিদ করেন। শয়তান মন্দের প্রতি এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার তাকিদ দেয়। শয়তানের তাকিদ অনুভব করিলে আউজুবিল্লাহ পড়িবে।

(ছাদাত)

অন্য এক হাদীছে রহিয়াছে যে, মানুষের মন আল্লাহর দুই অঙ্গুলের মধ্যে নিবদ্ধ। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাহা ঘুরাইয়া দেন।

কাজেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার চিন্তা মনে আসিলে সেই চিন্তা পরিবর্তিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। উপরন্তু শয়তান দারিদ্রের ভয় দেখায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২নং আয়াতে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতার তাকিদের পর শয়তানের তাকিদ আসিতে পারে। এ কারণে শয়তানের তাকিদের আগেই যাকাত আদায় করিতে হইবে। সমুদয় যাকাত একই সঙ্গে পরিশোধ করিতে চাহিলে উত্তম কোন মাস বাছিয়া লইতে হইবে। ইহাতে অধিক ছওয়াব মিলিবে। যেমন—মহররম মাস। এ মাসের মধ্যেই আশুরা রহিয়াছে, আশুরায়

দান খয়রাত এবং স্বজন-পরিজনের জন্য ব্যয় করিলে প্রচুর ছওয়াবের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। মহররম মাসে পরিশোধ করিলে দশ তারিখে পরিশোধ করাই উত্তম। রমজান মাসও বাছিয়া নেওয়া যাইতে পারে। নবীকরিম (ছঃ) দান-খয়রাতের ব্যাপারে সকল মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রমজান মাসে তাঁহার দান-খয়রাত দ্রুত চলমান বাতাসের মত ছিল। উপরন্তু এ মাসে রহিয়াছে লায়লাতুল কদর। এ রাত হাজার মাসের চাইতে উত্তম। কদরের এ রাত্রে আল্লাহর অপরিসীম রহমত নাজিল হয়। জিলহজ্ব মাসও ফজিলতপূর্ণ। এ মাসে আল্লাহকে স্মরণ করার তাগিদ কোরানেও রহিয়াছে। রমজান মাস নির্ধারণ করিলে উহার শেষ দশ দিন উত্তম আর জিলহজ্ব মাস নির্ধারণ করিলে প্রথম দশ দিন উত্তম।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের প্রদত্ত যাকাত সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই ধারণা করিতে পারে। কাজেই আমার অভিমত এই যে, বছরের শুরু হইতেই যাকাতের প্রয়োজনীয় অর্থ হিসাব করিয়া কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। বছরের শেষে চূড়ান্ত হিসাব করিয়া যদি দেখা যায় যে, তখনো যাকাত দেয়া বাকী রহিয়াছে তখন তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। যদি বেশী দেওয়া হইয়া থাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিবে যে তিনি নির্ধারিত পরিমাণের চাইতেও অধিক অর্থ তাঁহার পথে ব্যয় করিবার তাওফীক দিয়াছেন। এইরূপে পরিশোধের তিনটি যুক্তি রহিয়াছে। প্রথমত পুরা যাকাত একত্রে পরিশোধ করিতে স্বতস্ফূর্ত মানসিক সমর্থন পাওয়া সহজ নহে। অথচ যাকাত পরিশোধে মানসিক পরিছন্নতা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, প্রয়োজনের সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পরিশোধ করলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই ব্যয় করা হইবে। যদি বছর শেষে হিসাব করিয়া পৃথক করিয়া রাখে যে সময় সুযোগমত ব্যবহার করিব তবে প্রতিদিন দেরী হইতে থাকিবে। উপরন্তু পরিশোধের আগে জান মালের কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। যাকাত ওয়াজিব হইলে তাহা পরিশোধ না করা সর্বসম্মতভাবে পাপ।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, সময়ে সময়ে অল্প অল্প করিয়া পরিশোধ করিলে নির্ধারিত অঙ্কের চাইতে বেশী খরচ করা সম্ভব হইবে। ইহাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অধিক মিলিবে। অথচ এককালীন হিসাব

করিয়া অনুরূপ পরিমাণ দান করা অনেকের জন্যই সাধ্যাতিরিক্ত হইবে। একটা কথা মনে রাখা দরকার হে, যাকাত চন্দ্রমাসের হিসাব অনুযায়ী দিতে হয়। সৌরবর্ষের হিসাব অনুযায়ী নহে। কেহ কেহ ইংরেজী মাসের হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিয়া থাকে। ইহাতে প্রতি বছর দেরী হইয়া যায়। এমনি করিয়া দিতে থাকিলে ৩৬ বছর সময়ে এক বছরের যাকাত কম হইয়া যাইবে। ইহা অনাদায়ীই থাকিবে।

(৩) যাকাত গোপনীয়ভাবে পরিশোধ করিবে। কারণ ইহাতে লোক দেখানো, অহংকার এবং সুনামের কোন ব্যাপার থাকে না। প্রকাশ্যে দেওয়ার বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে গোপনে দেওয়াই উত্তম। কেননা সদকার উদ্দেশ্য হইতেছে কৃপণতা দূরীকরণ ধন সম্পদের প্রতি ভালবাসা দূরীকরণ। অথচ লোক দেখানোর মধ্যে খ্যাতিপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পদের প্রতি ভালবাসার চাইতে ইহা মারাত্মক, মানুষের উপর সম্পদের প্রতি ভালোবাসার চাইতে ইহা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কৃপণতার পাপ কবরে বিচ্ছু হইয়া মানুষকে দংশন করে কিন্তু খ্যাতিপ্রিয়তা অজগর হইয়া দংশন করে। কৃপণতার পাপকে নষ্ট করিয়া অংহকারকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ হইতেছে কেহ যেন বিচ্ছুকে মারিয়া সাপকে খাওয়াইল, ইহাতে বিচ্ছুর অনিষ্টকারীতা দূর হইল ঠিকই কিন্তু সাপ অধিক শক্তিশালী হইয়া পড়িল।

অথচ দুটিকে মারিয়া ফেলাই জরুরী বরং সাপকে মারিয়া ফেলা অধিক জরুরী।

(৪) যদি কোন ধর্মীয় প্রয়োজনের কথা বলা হইয়া থাকে, যেমন অন্যদের তাকিদ দেওয়া অন্য লোকেরা তাহার কাজের অনুসরণ করিবে বলিয়া অনুমিত হয়, অথবা ধর্মীয় অন্য কোন যৌক্তিকথা থাকে তবে তখন প্রকাশ করা উত্তম হইবে। এই দুইটি নম্বরের বিবরণ প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৫) দান খয়রাতকে অনুগ্রহ প্রকাশের খোঁটা দিয়া নষ্ট করা। প্রথম পরিচ্ছেদের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৬) নিজের দানকৃত সদকাকে তুচ্ছ ও সামান্য জিনিস মনে করিতে হইবে। বড় কিছু দান করিয়াছি এইরূপ মনে করিলে অহংকার সৃষ্টির সম্ভবনা থাকে। ইহা ধ্বংসাত্মক। ইহা সকল পূণ্যকে নষ্ট করিয়া

দেয়। ছুরা তওবার চতুর্থ রুকুতে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন এবং হোনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদিগকে আত্মহারা করে কিন্তু তোমাদের কোন কাজে উহা আসে নাই বরং জমীন প্রশস্ত হওয়া সত্বেও তোমাদের প্রতি সংকীর্ণ হয় এবং তোমরা পিছন দিকে পলায়ন করিতেছিলে। পরিশেষে আল্লাহ তাঁহার রাছুলের প্রতি ও ঈমানদারদের প্রতি সান্ত্বনা অবতীর্ণ করেন, সৈন্য প্রেরণ করেন, যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই।

হাদীছ গ্রন্থ সমূহে এ ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে। মক্কা বিজয়ের পর নবীকরিম (ছঃ) হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রমজান মাসেই রওয়ানা হন। ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের চাইতে অধিক সংখ্যক হওয়ায় মুসলমানদের মনে অহংকার দেখা দিয়াছিল, তাহারা ভাবিয়াছিল আমরা কিছুতেই পরাজিত হইব না। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা তাহাদের এ অহংকার পছন্দ করেন নাই। প্রথমদিকে তাই মুসলমানরা পরাজিত হয়। উপরোক্ত আয়াতে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তোমরা অহংকার করিয়াছিলে কিন্তু সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন কাজে আসে নাই।

হজরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাছুল (ছঃ) মক্কা জয় করার পর হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের লোকেরা অভিযান চালাইল এবং হোনাইনে তাহারা সমবেত হইল। হজরত হাছান (রাঃ) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, মক্কাবাসীরা মক্কা বিজয়ের পর মদীনাবাসীদের সহিত একত্রিত হইয়া বলিল, আল্লাহর কছম আমরা হোনাইন ওয়ালাদের সহিত মোকাবিলা করিব। নবীকরিম (ছঃ) তাহাদের এইরূপ অহংকার উক্তি পছন্দ করিলেন না। (দুররে মনছুর)

ওলামাগণ লিখিয়াছেন, নেকী করিয়া তাহা যতই কম মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই বড় বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে পাপকে নিজের দৃষ্টিতে যতই বড় মনে করা হইবে আল্লাহর নিকট তাহা ততই হালকা ছোট বলিয়া বিবেচিত হইবে। ওলামাগণ লিখিয়াছেন তিনটি জিনিসের দ্বারা নেকী পূর্ণতা লাভ করে। (১) নেকী যতই করিবে তাহা কম মনে করিতে হইবে (২) নেকী করিবার ইচ্ছা মনে

জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তাহা করিয়া ফেলিবে, কারণ পরে মনোভাব পরিবর্তিত হইতে পারে অথবা কোন অসুবিধার ফলে তাহা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। (৩) গোপনীয় ভাবে নেকী করিতে হইবে। নেকীকে তুচ্ছ সামান্য মনে করার উপায় হইতেছে, আল্লাহর জন্য খরচের তুলনায় নিজের জন্য খরচ ও সঞ্চিত অর্থ সম্পদ সামগ্রীর এক তৃতীয়াংশ খরচ করিলে প্রিয়তমের জন্য এক ভাগ খরচ করা হইল অথচ ভালোবাসার দাবীদারের নিকট দুই তৃতীয়াংশ রহিয়া গেল। আল্লাহর জন্য সবকিছু খরচ করিলেও মনে করিতে হইবে যে অর্থ সম্পদতো আল্লাহরই ছিল তিনি আমাকে নিজের অনুগ্রহে যাহা দান করিয়াছেন, তাহা আমি খরচ করিয়াছি, নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্যওত তিনি অনুমতি দিয়াছেন কিন্তু আমি তাহা করি নাই। যদি কাহারো নিকট কেহ কিছু আমানত রাখে এবং রাখিবার সময় বলে যে আপনি নিজের প্রয়োজনে ইহা নিজ সম্পদ মনে করিয়া খরচ করিতে পারিবেন। অতঃপর যদি আমানতদার ধন সম্পদের প্রকৃত মালিককে তাহা কিছু কম করিয়া ফেরত দেয় তবে ইহাতে কি আমানত দারের কৃতিত্ব দাবী করিবার কোন কারণ থাকে? যেহেতু আল্লাহর নামে খরচ করিলে তিনি বিরাট পুরস্কারের অঙ্গীকার করিয়াছেন সেইহেতু এমনও বলা যাইবে না যে আমরা তাঁর আমানত ফেরত দিয়াছি বরং এইরূপ বলা যায় যে, যেমন এক বক্তি একশত টাকা আমানত রাখিয়া ৫০/৬০ তাহা হইতে ফেরত নিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে শীঘ্রই ইহার কয়েকগুণ বেশী তোমাকে দেওয়া হইবে। অথবা এইরূপ বলা যাইতে পারে যে একশত টাকা হইতে ০ টাকা ফেরত দিয়া ৫০০ টাকার ব্যাংক চেক লিখিয়া দিয়াছেন। এমনি অবস্থায় অহংকার করিবার কি থাকিতে পারে যে আমানত যিনি রাখিয়াছেন তাঁহাকে ফেরত দিয়াছি। কাজেই সৌজন্য রক্ষা তখনই হইবে যখন লজ্জিতাবস্থায় খরচ করিবে যেমন নাকি কাহারো আমানত কম করিয়া ফেরত দেওয়া হইতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একশত টাকা কেহ আমানত রাখিয়াছে, সেই টাকা ফেরত দেওয়ার সময় ৫০ টাকা খরচ করিয়া ৫০ টাকা দেওয়া হইল। নিজের সাফাই গাহিয়া বলিল, আপনি যেহেতু আমাকে নিজের প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্য অথবা রাখিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন তাই আমি তাহা

করিয়াছি। বলিবার সময় যেমন বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায় আল্লাহর পথে খরচের সময় অনুরূপ বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিতে হইতে।

দান-খয়রাতের যাহা কিছু দরিদ্রকে দেয়া হয় প্রকৃতপক্ষে তাহা আল্লাহকেই ফেরত দেওয়া হয়। ভিক্ষুক বা পর মুখাপেক্ষী দরিদ্র ব্যক্তি আমানত যিনি রাখিয়াছেন তিনি তাহাকে তাঁহার আমানত ফেরত আনিতে পাঠাইাছেন। এমনি অবস্থায় বাহকের নিকট দাতার কত অনুনয় বিনয় করা উচিত যে তুমি মালিককে বলিও তাঁহার আমানত যথারিতী ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। মোটকথা যত বেশী সম্ভব বিনয় ও নম্রতার পরিচয় দিতে হইবে কেননা যিনি দিয়াছেন তিনি সবকিছু কাড়িয়া নিতে পারেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহার জন্য সবকিছু খরচ করা অত্যাবশ্যক করেন নাই, যদি সবকিছু খরচ করার নির্দেশ দিতেন তবে আমাদের স্বভাবজাত কৃপণতার কারণে তাহা খুবই কঠিন হইত।

(৭) আল্লাহর পথে খরচের সময় বিশেষত যাকাত পরিশোধের সময় উত্তম জিনিস প্রদান করিতে হইবে, কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং দোষমুক্ত। তিনি পবিত্র ও উত্তম জিনিসই পছন্দ করেন ও গ্রহণ করেন। মানুষ যদি মনে করে যে, আল্লাহকে যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা প্রকৃত পক্ষে তাহারই মালিকানা তাহা হইলে নিজের জন্য উৎকৃষ্ট জিনিস রাখিয়া আল্লাহর জন্য নিকৃষ্ট জিনিস দেওয়া কত বড় বেয়াদবী। এইরূপ করাত সেই ভৃত্যের আচরণের মত হইবে, যে নাকি মনিবের জন্য ডাল ও বাসি রুটি রাখিয়া নিজের জন্য পোলাও কোর্মার ব্যবস্থা করে। এই রকমের ভৃত্যের সহিত মনিব কিরূপ ব্যবহার করিবেন ভাবিয়া দেখা দরকার। দুনিয়ার মনিবরাতো সব খবর জানেন ও না। কিন্তু সবজান্তা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি মনের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কেও অবহিত। এমতাবস্থায় তাঁহারই দেয়া মালামাল হইতে তাঁহার জন্য নিকৃষ্ট জিনিস প্রদান কত বড় নেমক হারামী। নিজের তীব্র প্রয়োজনে কাজে আসিতে পারে জানিয়াও যদি কেহ নিকৃষ্ট জিনিস নিজের জন্য রাখিয়া ভাল ভাল জিনিস অন্যকে বিলাইয়া দেয় তবে তাহা চরম নির্বুদ্ধিতার পারিচায়ক হইবে। হাদীছ শরীফে আছে যে, মানুষ বলে, আমার মাল আমার মাল অথচ তাহার মাল উহাই যাহা সে সদকা করিয়া সামনে প্রেরণ

করিয়াছে। যাহা বাকি রহিয়াছে অথবা নিজে খাইয়া শেষ করিয়াছে তাহা অন্যদের মালিকানাভুক্ত। অর্থাৎ ওয়ারিশদের। একটি হাদীছে আছে, এক দিরহাম কখনো লাখ দিরহামের চাইতে বৃদ্ধি পায়, যদি উত্তম মাল হইতে সন্তুষ্টির সহিত আল্লাহর পথে ব্যয় করে। পক্ষান্তরে ঘৃণ্য মাল এক লাখ দিরহাম খরচ করিয়াও অমন বৃদ্ধি হয় না।

(৮) সদকা এমন জায়গায় খরচ করিতে হইবে যে, যাহাতে তাহার সওয়াব বৃদ্ধি পায়। ছয়টি গুণ এমন রহিয়াছে যদি তাহার একটিও দাতার মধ্যে পাওয়া যায় তবে সদকার সওয়াব বৃদ্ধি পাইবে। যাহার মধ্যে এই গুণাবলী বেশী থাকিবে তাহার সওয়াবের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। উক্ত গুণাবলী নিম্নরূপ :

(ক) মোত্তাকী অর্থাৎ পরহেজগার হইতে হইবে। দুনিয়ার কাজের চাইতে আখেরাতের কাজে অধিক আগ্রহ থাকিবে। নবীকরীম (ছঃ) বলিয়াছেন, তোমার খাবার যেন মোত্তাকী ব্যতীত কেহ না খায়। প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩নং হাদীছে ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মোত্তাকী বা পরহেজগার ব্যক্তি এই সদকার মাধ্যমে নিজের তাকওয়ার সাহায্যকারী হইবে। তাহার ইবাদতে সওয়াবের ভাগ তুমিও পাইবে।

(খ) ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। ইহাতে তোমার সহায়তায় তাহার জ্ঞানার্জন সকল ইবাদতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত যত ভাল থাকিবে এই ইবাদত ততই উত্তম হইতে থাকিবে। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাঃ) বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবং বুজুর্গ ব্যক্তি। তিনি তাঁহার দান-খয়রাতে ওলামাদেরকে অন্তর্ভুক্ত রাখিতেন। তাঁহাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল যে, আলেম যাহারা নহে তাহাদের জন্যও যদি আপনি ব্যয় করিতেন তবে কতই না ভাল হইত। তিনি জবাবে বলিলেন, নবুয়তের মর্যাদার পর ধর্মীয় জ্ঞানের (এলেম) সম মর্যাদার কাউকে আমি পাই নাই। ধর্মীয় জ্ঞানের অধি-কারীরা যদি অন্য দিকে মনোনিবেশ করে তবে তাহার জ্ঞানবিষয়ক তৎপরতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এই কারণে তাহাদের জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত রাখাই উত্তম কাজ।

(গ) পরহেজগারী এবং জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সত্যিকার

অর্থে নিয়োজিত। অর্থাৎ তাহার প্রতি কেহ অনুগ্রহ করিলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং মনে মনে চিন্তা করেন যে, প্রকৃত করুণা ও দয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রাপ্য তিনিই সত্যিকার দানশীল। তিনিই অন্যের মাধ্যমে তাহাকে সাহায্য করিতেছেন। হজরত লোকমান (আঃ) তাঁহার পুত্রকে অছিয়ত করিয়াছিলেন যে, কাহারো অনুগৃহীত হইওনা অন্যের অনুগ্রহকে নিজের উপর বোঝাস্বরূপ মনে করিও। অনুগ্রহের মাধ্যমকে যাহারা প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করে তাহারা আসল অনুগ্রহকারীকে চেনে না। তাহারা বুঝিতে পারে না যে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অনুগ্রহ করার জন্য অমুকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যে এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি হইতে তাহারা সৃষ্টির চাইতে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এই ধরণের মানুষের প্রতি দান-খয়রাতের মাধ্যমে অনুগ্রহ করিলে উহাতে দাতা অধিক উপকৃত হয়। মানুষকে প্রকৃত অনুগ্রহকারী মনে করিয়া তাহার প্রশংসায় মুখর হইলেও পরদিনই অনুগ্রহ না করা অবস্থায় তাহার নিন্দা করিতে শুরু করিবে। কাজেই আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ সম্পর্কে অবহিত পরহেজগার ব্যক্তি মানুষের দান বা অনুগ্রহ না হইলেও মানুষের প্রতি নিন্দায় মুখর হইবে না কেননা সেই ব্যক্তি প্রকৃত দাতা আল্লাহকে মনে করে এবং মানুষকে শুধু আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের বাহক মনে করে।

(ঘ) যাহাকে দান করা হইবে সে ব্যক্তি নিজের অভাব ও দৈন্য প্রকাশ করার চাইতে গোপন রাখিতে অধিক সচেষ্ট। নিজের স্বচ্ছলতার সময়ে তাহার মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ ছিল অস্বচ্ছলতার সময়ও তাহা কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই। এই প্রকারের লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু ছুরা বাকারার ৩৭ রুকুতে বলিয়াছেন, ইহা সেই অভাবগ্রস্তদিগের প্রাপ্য যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে, দুনিয়ায় কোথাও যাইতে পারেনা, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনকারী না হওয়ার কারণে অজ্ঞব্যক্তিরা তাহাদিগকে ধনী মনে করে, তাহাদের চেহারাদৃষ্টে তুমি তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে, তাহারা লোকদিগের কাছে আকড়াইয়া ভিক্ষা করে না এবং তোমাদের মাল হইতে যাহা কিছু ব্যয় করিবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহা সুপরিজ্ঞাত।

ফায়েদা ঃ তবে এই ধরণের লোক ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনাকারীদেরও সাহায্য করা প্রয়োজন। যেখানে লোকেরা সাহায্য পাওয়ার জন্য উত্তম বিবেচিত হইবে। সাহায্য প্রার্থনাকারী মুত্তাকী না হইলে এমনকি মোমেন না হইলেও উহাদের আবেদন উপেক্ষা করা সমীচীন হইবে না। উপরে যেসব গুণাবলীর উল্লেখ করা হইয়াছে সেইরূপ লোক আমাদের দেশে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত তালেবে এলেমরাই হইবে। যেসব নির্বোধ বলে যে, উহাদের দিয়া কি হইবে উহারা উপার্জন করিতে সক্ষম। কোরানে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। সেই উত্তরের সারাংশ এই যে, কোন লোক একই সঙ্গে দুইটি কাজে মনযোগ দিতে পারে না। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে যাহারা কিছুমাত্রও অবহিত তাহারা জানেন যে, এই জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক মনোনিবেশ কত বেশী প্রয়োজন। এই জ্ঞান অর্জনের সময়ে অর্থ উপার্জনের চিন্তা তাহাদের মাথায় আসিতে পারে না। কারণ তাহা করিলে জ্ঞান সাধনা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ফোকারা বলিতে সুফফাকে বোঝানো হইয়াছে। আহলে সুফফার জামাত ছিল প্রকৃত অর্থেই তালেবে এলেম। তাঁহারা জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান লাভের জন্য নবীজীর দরবারে পড়িয়া থাকিতেন।

মোহাম্মদ ইবনে কারজী (রহঃ) বলেন, ইহা দ্বারা আমাদেরকে সুফফার বিষয় বুঝানো হইয়াছে। যাহাদের বাড়িঘর স্বজন পরিজন ছিল না, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে সদকা প্রদানের জন্য তাকিদ দিয়াছেন।

কাদাতা (রাঃ) বলেন, এই আয়াতে ঐ সকল ফকীরদের কথা বলা হইয়াছে যাহারা নিজেদেরকে আল্লাহর পথে জেহাদে আবদ্ধ রাখিয়াছে। ব্যবসা ইত্যাদি করিতে পারে না। (দুররে মনছুর)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন যাহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভিক্ষা করে না, ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তাহাদের হৃদয় ধনশালী, প্রবৃত্তির চাইতে তাহাদের সাধনা শক্তিশালী। এই ধরনের লোকদের বিশেষ ভাবে খুঁজিয়া সাহায্য দিতে হইবে, দ্বীনদারদের আর্থিক অবস্থার

খোঁজ খবর নিতে হইবে। ইহাদের জন্য ব্যয় করিলে ভিক্ষা প্রার্থীদের জন্য ব্যয়ের চাইতে অধিক সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ ধরনের লোক খুঁজিয়া বাহির করা মুশকিল, ইহারা নিজেদের অবস্থা অন্যের নিকট পারতপক্ষে প্রবেশ করে না। আর একারণে অন্যরা তাহাদিগকে ধানশালী মনে করে।

(ঙ) গ্রহীতার পরিবার রহিয়াছে অথবা যে কোন রোগে আক্রান্ত অথবা অন্য কোন বিশেষ কারণে উপার্জনে সক্ষম নহে। এইরূপ লোকেরাও কোরানের আয়াতে যাহারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ আছে—এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই আবদ্ধ থাকা নিজেদের দারিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে, রিজিকের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হইতে পারে অথবা নিজের মনের সংস্কার সাধনায় আবদ্ধ হইতে পারে। নিজেদের ব্যস্ততার কারণে যাহারা প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয় না। একারণেই হজরত ওমর (রাঃ) এই ধরনের কোন কোন পরিবারকে দশটি বা ততোধিক বকরী প্রদান করিতেন। নবীকরিম (ছঃ) এর নিকট ফাঈ এর মালামাল আসিলে স্ত্রীপরিজন যাহাদের রহিয়াছে তাহাদের দুইভাগ এবং অবিবাহিত লোকদের একভাগ প্রদান করিতেন। কাফেরদের সহিত যুদ্ধ না করিয়া যে মালামাল পাওয়া যায় তাহাকে ফাঈ বলা হয়।

(গ) আত্মীয়স্বজনের দান। ইহাতে সদকার সওয়াব এবং আত্মীয়দেরকে দান করা—এই দুইটি আদেশ পালনের সওয়াব পাওয়া যাইবে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৬নং হাদীছে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত ৬টি গুনাবলী উল্লেখের পর ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন, যাহার জন্য অর্থব্যয় করা হইবে তাহার মধ্যে উপরোক্ত গুনাবলী প্রত্যাশিত। প্রতিটি গুণের কম বেশীর প্রেক্ষিতে গ্রহীতার মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি হইবে। তাকওয়ার উচ্চ ও তুচ্ছ শ্রেণীর মধ্যে আসমান জমীন ফারাক। প্রতিটি গুণের ক্ষেত্রে উচ্চ শ্রেণীর সন্ধানই বাঞ্ছনীয়। কোন লোকের মধ্যে উপরোক্ত সকল গুণের সমাবেশ দেখিতে পাইলে তাহা বিরাট পাওনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এরকম লোকের জন্য খরচ করিতে সচেষ্ট হইবে। না পাইলেও এই রকমের লোক খুঁজিয়া দেখিবে, পাওয়া গেলে এবং তাহার জন্য খরচ করিলে দ্বিগুণ

ছওয়াব পাওয়া যাইবে। যদি অনুরূপ লোক পাওয়া না যায় তবু চেষ্টা করার জন্যও আলাদা ছওয়াব পাওয়া যাইবে। এ ধরনের চেষ্টাকারী লোক মোট তিন প্রকার ছওয়াব পাইবে। প্রথম কৃপণতা হইতে নিজের হৃদয়কে পবিত্র করার ছওয়াব দ্বিতীয়ত আল্লাহর পথে তাঁহার ভালবাসা পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করার ছওয়াব, তৃতীয়ত তাঁহার প্রিয় বান্দাকে খুঁজিয়া বাহির করার ছওয়াব। এ তিনটি গুণাবলী দাতার অন্তরকে শক্তিশালী করিবে। এবং আল্লাহর সহিত মিলনাকাঙ্খা বৃদ্ধি করিবে। এই মুনাফা তো অর্জিত হইল। যদি সঠিক লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় তবে তাহাকে দান করিলে তাহার নেক দোয়া এবং মনযোগ হাসিল করিবে। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রের ব্যাপারেই আল্লাহর নেক বান্দাদের মনে প্রভাব ও বরকত বিরাজমান থাকে। তাঁহাদের দোয়ায় আল্লাহ জাল্লাশানুহু প্রচুর প্রভাব ও বরকত সন্নিহিত রাখেন। (এহ্ইয়াউল উলুম)

সমাপ্ত